বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা

(পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
এম.এ (ঢাকা) এম.এ (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া) পিএইচ. ডি. (এডিনবরা)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোহাঃ মোকবুল হোসেন
পিএইচ.ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
জানুয়ারি- ২০০৪

DIGITIZED

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। আমি নিশ্চিত যে, এই বিষয়ে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেন নি। আমার উপস্থাপিত গবেষণাকর্মটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ সাময়িকীতে– ডিগ্রী/ প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

মোহাঃ মোকবুল হোসেন
২২.০১.২০০৪
(মোহাঃ মোকবুল হোসেন)
পিএইচ.ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401425

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাঃ মোকবুল হোসেন কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২২.০১.০৪.

(ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী। প্রথমেই সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা নির্দেশক প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-কে। তাঁর সার্বিক সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও নির্দেশনায় শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দান করেছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আবু জাফর স্যারের কথা। তিনি আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। পরামর্শ ও প্রেরণা দিয়ে কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করেছেন ড. সাঈদ-উর রহমান, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। রাজশাহীতে অবস্থান করে কাজ করার সুবাদে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আবদুর রহীম খোন্দকার, ড. খোন্দকার সিরাজুল হক, ড. শেখ আতাউর রহমান, মোঃ আবুল ফজল আমাকে বইপত্র ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কোন ফর্ম্যাল ব্যাপার নয়। বিশেষভাবে স্মরণ করি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আই বি এস-এর ড. প্রীতিকুমার মিত্র এবং ইতিহাস বিভাগের ড. আবুল কাশেম-এর কথা। তাঁদের কাছে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই ও পরামর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আপত্যস্নেহ ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছন ড. তসিকুল ইসলাম। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত আমার গবেষণাকর্মটি কখনই সম্পন্ন হতো কি না তা আমাকে এখনও সন্ধিৎগ্ধ করে। সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি আমার প্রিয় শিক্ষক ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত গবেষক মরহুম মজির উদ্দীন মিয়ার প্রতিও। তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক ও তৎকালীন উপাচার্য মহোদয়কে সুপারিশ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে, শেষ পর্যন্ত আমার কাজটির সম্পন্ন রূপ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ড. সুজিত সরকার, ড. শহীদ ইকবাল, ফোকলোর বিভাগের ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান। রাজশাহী কলেজের আমার বিভাগীয় প্রধান ড. ফরিদা সুলতানা, সহকর্মী ও বন্ধু শিমুল মাহমুদ প্রমুখ। এদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কৌশল সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি রাজশাহী কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ও ঘনিষ্ঠস্বজন ড. অলীউল আলমের কাছেও। এছাড়াও রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারিক মুহাম্মদ মহীউদ্দিন আমাকে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র রিসার্চ লাইব্রেরী, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, শাহ মখদুম ইনস্টিটিউট, পানিহার লাইব্রেরী, নওগাঁর ভাতশাইল লাইব্রেরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, প্রেস ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত চার কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন-এর সঙ্গে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ও বইপত্র পেয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা অশেষ। বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করি দেশের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক-

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান রাজশাহী এসোসিয়েশনের প্রতিও। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাকে এককালিন বৃত্তি প্রদান করে আংশিক হলেও গবেষণার ব্যয়ভার লাঘব করেছে। এসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ আবুবকর সিদ্দীক ও তাঁর সহযোগী মোঃ আব্দুল লতিফ। তাঁদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি অনেকের কাছে ঋণী। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী সালমা পারভীনের কাছে আমার ঋণ অন্য রকম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এই গবেষণার সুযোগ প্রদান করায় আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে।

মোহাঃ মোকবুল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

ভৌগোলিক জনপদ, গ্রামবাহী জীবন ও ভাষিক অনুষঙ্গ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বলিষ্ঠ পরিসর। জীবনমূলকেন্দ্রসন্ধানী কথাশিল্পীরা বাংলাদেশের তিনটি ভৌগোলিক জনপদ-কে পটভূমি করে গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐক্য বরাবরই একটি সংহতিময় চেতনায় সুস্থিত। তবুও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কারণে, এমনকি কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাভ্যাসের ক্ষেত্রেও, প্রকৃতিগতভাবে বৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক তারতম্য রয়েছে। নদনদী সমুদ্র পাহাড় অরণ্য প্রধান পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে, অসমতল লালমাটি, খরাপ্রধান রুক্ষ আবহাওয়ার ধূসরভূমি উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্র নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তিক জীবন গড়ে উঠলেও উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। স্বাভাবিকভাবেই এই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনসংস্কৃতিতে দেখা দেয় স্বতন্ত্রমাত্রা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও উত্তরবঙ্গের জনপদ অবলম্বন করায় সমাজের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অবয়বটি ধরা দেয়। এই অভিসন্দর্ভে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক জনপদকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক ও ভাষিক পরিস্থিতির মূলসূত্রসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। ফলে, সমাজের বিভিন্ন প্রবণতাগুলো যেমন চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি এই অনুসন্ধান দেশের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে আলাদা লোকায়ত ভাষাছাঁদটিও লোকায়ত চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যসূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে- তা যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সমাজ ও সাহিত্যের তাত্ত্বিকসূত্রসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। সমাজ ও কথাসাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক, জনপদের ব্যবহার প্রসঙ্গে ভূমিকায় বিস্তৃত উল্লিখিত হয়েছে। কথাসাহিত্যে বস্তুবাদী চেতনার উন্মেষ, ফরাসী বস্তুবাদী দর্শন, পরবর্তীকালে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসীয় বস্তুবাদ, বাখতিনতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এইসব তত্ত্ব ও চিন্তা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেই আধুনিক কথাসাহিত্যে জনপদের ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যকর্মে জনপদ ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে কথাসাহিত্য সত্যিকার অর্থেই সমাজসচেতন শিল্পকর্ম। প্রথমত কথাশিল্পীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমকালের ও সমাজের মুখপত্র। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিকতার আবহে জীবনভাষ্য নির্মাণ করলেও তার মর্মমূলে থাকে বিশ্বজনীন মানবিকবোধ। অর্থাৎ বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন সৃষ্টিও কথাশিল্পীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের কথাসাহিত্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তার অনুপুঙ্খ সূত্রসন্ধানে লোকায়ত ভাষাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের স্থানিক সমাজ ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের দেশকাল পটভূমি ও আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাক্রমও এই আলোচনায় গুরুত্বের অধিকারী। সেই সঙ্গে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের উপভাষা পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য এবং কথাসাহিত্যে স্থানিক চরিত্র ও স্থানিক সমাজভাষার ব্যবহার সম্পর্কের ওপর। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের সমাজভাষার রূপরেখা এবং কথাসাহিত্যে তার প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্যেই এই দুই জনপদের জনজীবন ও ভাষিক বৈচিত্র্য প্রভাবিত কথাসাহিত্যের আলোচনা পূর্বতম পটভূমিরূপে গৃহীত। এক্ষেত্রে মনে করা যায় যে, এর মাধ্যমেই অপরাপর জনপদ নিয়ে রচিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কথাসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের ধারাক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার একটি নতুন মাত্রাযোগ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, উত্তরবঙ্গ প্রশাসনিক নামকরণ নয়, এটি পূর্বকাল থেকেই লৌকিকভাবে প্রচলিত নামকরণ। রাজনৈতিক কারণে এই জনপদের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলে নানা জাতি ও ধর্মের মানুষ বসতি গড়ে তোলে। ফলে, জনতত্ত্বে ও ভাষাতত্ত্বে লক্ষ্য করা যায় নানা বৈচিত্র্য। ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশে কালপরম্পরা পরিবর্তিত রূপ ও বর্তমান রূপ স্পষ্ট করা হয়েছে মানচিত্রের মাধ্যমে। জনতত্ত্বের বৈচিত্র্যও নির্দেশিত হয়েছে গাণিতিকসূত্রে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের স্থানিক ভাষা কাঠামোও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের প্রধান প্রধান জেলাসমূহের উপভাষাবৈচিত্র্য এই আলোচনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে, জনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের নিবিড় পাঠপর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিস্তৃত পরিসর আলোচনায় যুক্ত হয়েছে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতাসমূহ। উত্তরজনপদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নদনদী, বিল প্রভাবিত জীবনধারা, খরাপীড়িত জীবন, দুর্ভিক্ষ, স্থানীয় ঐতিহ্য ও আন্দোলনের অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে কথাসাহিত্যের বলিষ্ঠ পরিসর, যা উত্তরবঙ্গের সমাজের স্বাতন্ত্র্যময় বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, কথাসাহিত্যের বহুমাত্রিকতাও নির্দেশিত হয়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজীবনকে অবলম্বন করে রচিত গল্প উপন্যাসের বিশ্লেষণসূত্রে তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংকটের নানাচিত্র মূর্ত হতে লক্ষ্য যায়। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়, গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক টানাপোড়নের ফলে তাদের বৃত্তিক ও সামাজিক জীবনের নগ্নচিত্র কথাসাহিত্যে রূঢ়বাস্তবতার ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে এইসব বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। দেশবিভাগ, দাঙ্গা, অভিবাসন, দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষের দুঃস্থ যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন কথাশিল্পীরা। সামন্তকাল থেকে ঔপনিবেশিককাল এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশেও শ্রমশোষণের নানা অপকৌশলের চিত্রপট সাহিত্যে উঠে এসেছে। বর্তমান আলোচনায় এইসব বিষয় গুরুত্বসহ বিশ্লেষিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসূত্রে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত উত্তরবঙ্গের সমাজ অবয়বের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কথাসাহিত্যে স্থানিক চরিত্রের সংলাপে স্থানিক ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গ। মূলত উত্তরবঙ্গের যে সব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গল্পউপন্যাস রচিত হয়েছে, তা সনাক্ত করে চরিত্রের বৃত্তিক পরিচয় ও মুখের বুলির সমাজভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পেশাগত ভাষা, ধর্মগত ভাষা, লিংগগত ভাষাভেদও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আরো একটি প্রসঙ্গ গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে– তা হলো কথাসাহিত্যের চরিত্রে ফোকমোটিফ ও ট্যাবুর ব্যবহার। বস্তুত, চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় উত্তরবঙ্গের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের সমাজভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অভিসন্দর্ভে সমাজ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে বর্তমান গবেষণার মূল বিষয়বস্তুকেই পূর্ণমূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য বা উপযোগিতাকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাবি করা যায় যে, এই গবেষণাকর্মের দ্বারা এদেশের কথাসাহিত্যের একটি অনাবিস্কৃত বিষয় আলোচিত ও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গবেষণাসূত্র ধরে বাংলাদেশের অপর দুই অঞ্চলের কথাসাহিত্যের সমাজ ও ভাষাতাত্ত্বিক পাঠপর্যবেক্ষণেরও নতুন পরিসর সৃষ্টি হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। ভবিষ্যতের গবেষক অপর দুই জনপদ নিয়ে পৃথক গবেষণা করলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমাজ ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হবে। যদিও এই গবেষণায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বিষয়টি আলোচনারা চেষ্ট করা হয়েছে।

তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায়, 'বাংলাদেশের কথাসহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে একটি জনপদের সামাজিক ও সাহিত্যিক সম্পর্কসূত্র যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়ও স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত চিহ্ন ও সংকেত

%	:	শতকরা হার
< >	:	রূপমূল নির্দেশক
//	:	মূলধ্বনি নির্দেশক
√	:	মূলধাতু নির্দেশক
+	:	সংযোজিত নিয়ম বোঝাতে
/	:	ধ্বনি বা শব্দের ভিন্নরূপ
—	:	নিম্নরেখ শব্দের বিশিষ্ট রূপ নির্দেশক
ঃ	:	সংলাপের পরম্পরা
□	:	তুলনার্থক প্রভেদ
→	:	সংশোধিত নিয়ম
#	:	বাক্যের সীমা নির্দেশক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসংক্ষেপ ও বিন্যাস

আ.ই.	:	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
আ.সি.	:	আবুবকর সিদ্দিক
তা. হো.	:	তাসাদদ্‌ক হোসেন
হা.আ.হ.	:	হাসান আজিজুল হক
শ.আ.	:	শওকত আলী
শা.হ.	:	শামসুল হক
সৈ.শা.হ.	:	সৈয়দ শামসুল হক
সে.হো.	:	সেলিনা হোসেন
ম.স.	:	মঞ্জু সরকার
ভা.চৌ.	:	ভাস্কর চৌধুরী
উ. স.	:	উপন্যাস সমগ্র
র. স.	:	রচনা সমগ্র
গ. স.	:	গল্প সমগ্র
স. গ.	:	সব গল্প
ব্য	:	ব্যঞ্জনধ্বনি
ব্য ব্য	:	ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন
স্ব	:	স্বরধ্বনি
স্ব ব্য	:	স্বর-ব্যঞ্জন
বি	:	বিশেষ্য
আ. চ. বা	:	আদর্শ চলিত বাংলা
রা. উ. ভা.	:	রাজশাহীর উপভাষা
ব. উ. ভা.	:	বরেন্দ্রী উপভাষা
উ. ভা	:	উপভাষা
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
জ.	:	জন্ম
মৃ.	:	মৃত্যু

Dhaka University Institutional Repository

সারণি–চিত্র ও মানচিত্র

সারণি :

সারণি–১ : বাংলা উপভাষার শ্রেণী বিভাজন : ৩৯

সারণি–২ : বাংলা উপভাষার অবস্থান নির্দেশ : ৪০

সারণি–৩ : উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির ক্রমবিন্যাস : ৮৭

সারণি–৪ : এক নজরে উত্তরবঙ্গের জেলাওয়ারী জনসংখ্যাবিন্যাস : ৮৯

সারণি–৫ : ধর্মভিত্তিক শব্দসারণি : ২২৯

চিত্র :

চিত্র–১ : চিত্রে বাংলাদেশের উপভাষা পরিস্থিতি : ৪১

চিত্র–২ : রেখাচিত্রে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস : ৯০

চিত্র–৩ : ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের চিত্র : ৯০

চিত্র–৪ : শ্রেণীভিত্তিক বাচক পরিস্থিতি : ২২৪

মানচিত্র :

মানচিত্র–১ : বৃহৎবঙ্গের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান : ৮১

মানচিত্র–২ : দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান : ৮৩

মানচিত্র–৩ : দেশবিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

পৃষ্ঠা

ঘোষণাপত্র i

প্রত্যয়নপত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii-iv

সারসংক্ষেপ v-vii

ব্যবহৃত চিহ্ন ও সংকেত viii

শব্দসংক্ষেপ ও বিন্যাস ix

সারণি–চিত্র ও মানচিত্র x

প্রস্তাবনা ঃ ১

প্রথম অধ্যায় ঃ সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব: স্থানিক সমাজ ও ভাষা ঃ ৪

১.০১ ভূমিকা

১.০২ সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব

১.০৩ কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ ও ভাষা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যঃ স্থানিক সমাজের ভাষা ঃ ২৭

২.০১ ভূমিকা

২.০২ বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ঃ দেশ–কাল পটভূমি

২.০৩ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ ও ভাষাঃ প্রেক্ষাপট পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়– জনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব ঃ ৭৮

৩.০১ ভূমিকা

৩.০২ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় ও সীমানা নির্দেশ

৩.০৩ উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও ভাষাপরিস্থিতি

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ঃ ১০৩

৪.০১ ভূমিকা

৪.০২ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজ

৪.০৩ নদনদী বিল প্রভাবিত সমাজ জীবন

Dhaka University Institutional Repository

৪.০৪ স্থানীয় ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের প্রভাব

৪.০৫ উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজ

৪.০৬ দুর্ভিক্ষের প্রভাব

৪.০৭ সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রপট

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কথাসাহিত্যে স্থানিক চরিত্র ও সমাজভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্য ঃ ২০২

৫.০১ ভূমিকা

৫.০২ স্থানিক চরিত্র ও সমাজভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্য

৫.০৩ লিঙ্গভিত্তিক ভাষাভেদ

৫.০৪ ধর্মভিত্তিক ভাষাভেদ

৫.০৫ নিষিদ্ধবাচকতা বা ট্যাবু

৫.০৬ ফোকমোটিফ

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার ঃ ২৫২

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

সমাজনিষিক্ত জীবনচিন্তনকে নিয়েই কথাসাহিত্যের আত্মপ্রকাশ। তাই কথাসাহিত্য জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই আত্মীয়তা স্বীকার করেই কথাশিল্পী জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। জীবনের সামগ্রিকতা পূর্ণতা না পেলে কথাসাহিত্য সফল হয়ে ওঠে না।[১] বৃহৎ তাৎপর্যে বলা যায়, দেশ-কাল সমাজ, ভৌগোলিক জলহাওয়াসহ মানুষের জৈবিক (Biological) এবং অর্থনৈতিক (Economical)-সত্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে কথাসাহিত্যেই। মূলত এই জীবনপ্রত্যয়ের পথে এগোতেই গদ্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য (Prose fiction) মহাকাব্য ও রোমান্স অপেক্ষা একটি স্বতন্ত্র স্বরূপ খুঁজেছিল। তাই র‍্যালফ ফকস্ বলেনঃ 'আমাদের আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের মহাকাব্যিক শিল্প হলো উপন্যাস; এই সমাজের যৌবনাবস্থায় উপন্যাস তার গোটা রক্ত-মাংসের চেহারাটা পায় এবং আমাদের সময়ের বুর্জোয় সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয় অবধারিতভাবে তার উপর প্রতিক্রিয়া ফেলে।'[২] ফলে, কথাসাহিত্য ব্যক্তির একক সৃষ্টি হলেও এই শিল্প একটি সামাজিক ক্রিয়ারূপে বিবেচিত হয়। কারণ, কথাসাহিত্যই প্রথম এই শিল্পাঙ্গিকে মেলে ধরে কোন একটি জাতি ও সমাজসত্তার অবয়ব।

লক্ষণীয়, বাংলা কথাসাহিত্যের আদি আয়োজন থেকে আধুনিকতার বিস্তারে জীবন ও সমাজ ভাবনায় সার্বিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধেরও পালাবদল ঘটেছে। বিষয়ের সঙ্গে রূপান্তর ঘটেছে শিল্পগত আঙ্গিক-কৌশলেরও। দেখা যায়, রোমান্স ও সৌন্দর্যবোধ পরিপুষ্ট ভাবালুতার প্রকোপে আদিপর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃতজীবনঘনিষ্ঠতা প্রায় অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ছিল। যদিও টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ রক্তমাংসের মানুষ গুরুত্ব পেয়েছিল ঠিকই। তথাপি বৈদগ্ধ্যের রুচিমনস্কতার কারণেই পরবর্তী প্রতিভাধর লেখকের হাতে এই ধারা অনুসৃত হয়নি। ফলে, বঙ্কিম কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, নীতিবাদী মানুষ (Ethical man)-ও রবীন্দ্র উপন্যাসে সৌন্দর্যবাদী মানুষ (Aesthetic man)।[৩] কেবল ব্যতিক্রম সত্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ সৃষ্টি ছোটগল্পগুলো। তাঁর ছোটগল্পগুলো বাংলাসাহিত্যের পূর্ব ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সূচিত করে। সাধারণ মানুষ সাহিত্যে আশ্রয় পায়। জীবন ও পরিবেশের জটিলতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্রাকৃতজনদের বহুমুখী সমস্যা রবীন্দ্রনাথ নিটোল বাস্তবতায় রূপায়িত করেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষ এবং সমাজ সাহিত্যে অনুপ্রবেশের অধিকার পেল। সেই সঙ্গে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিবর্তনের ধারা সূচিত হলো। অচিরেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিম্নসমাজ থেকে অপজাত মানুষকে টেনে আনলেন সাহিত্যের চরিত্ররূপে। অবশ্য প্রগাঢ় সমাজ সচেতনতা সত্ত্বেও অপরিসীম ভাবাবেগ প্রাধান্য রোমান্টিক আবিলতার দরুণ মধ্যবিত্ত জীবনের সেন্টিসেন্টালিজম, রহস্যময় হৃদয়ঘটিত সমস্যা ইত্যাদি অসংখ্য সীমাবদ্ধতায় তিনি সমাজের অচলায়তনে বৃত্তাবদ্ধ।[৪] সুতরাং লক্ষণীয়, প্রথম রোমান্স উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) পর্যন্ত মোটামুটি পয়ষট্টি বয়ঃসীমায় বাংলা কথাসাহিত্যের ও বাঙালির জীবনাগ্রহের তিন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৌরবময় সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রধান পটভূমি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ। রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্যের মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার পট অতিক্রম করে পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃতজীবন ও স্থানিক পটভূমিকেন্দ্রিক (Landscape) শিল্পচর্যায় প্রাগ্রসর দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক জীবন রূপায়নে অগ্রণী লেখক। অবশ্য স্মর্তব্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃত সমাজজীবনচর্চায় অন্যতম পথিকৃৎ-এর দাবিদার হচ্ছেন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ। মূলত তাঁদেরই উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন। তবে কথাসাহিত্যে নির্দিষ্ট জনপদের ব্যবহার বরাবরই লক্ষ করা যায়। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যে জনপদের ব্যবহার হয়েছে, তবে তা স্পষ্ট মাত্রা অর্জন করতে পারে নি। যেমনটি সঠিক অর্থে ল্যাণ্ডস্কেপ ব্যবহৃত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সতীনাথ ভাদুড়ী, মনোজ বসু, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ কথাশিল্পীর সাহিত্যে। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে গণজীবনের ছবি নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায়। আর গণজীবনের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে আমাদের কথাশিল্পীরা অবলম্বন করেছেন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জনপদকেন্দ্রিক সমাজ জীবন।

দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও এই প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে কথাসাহিত্যের জন্ম এবং পুঁজিবাদী সমাজ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত; তা হচ্ছে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। তাই সামাজিক মানুষের মানসিক গঠনে এই দুই মৌলিক সূত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কথাসাহিত্য।[৫] দেশ বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের সমাজকাঠামোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব। জাগ্রত হয় জাতীয়তা, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা। বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জনপদ জীবনের আলেখ্য নিয়ে রচিত হয় কথাসাহিত্য। বিশেষত, কল্লোলোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের বস্তুবাদী চেতনা এবং রুশ সাহিত্যের গণজীবনের দীপ্তিতে প্রভাবিত বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে এদেশেরই প্রাকৃতপ্রাঙ্গণ। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাজনে স্বতন্ত্র তিন জনপদ পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সমাজসংলগ্ন ভৌগোলিক স্থানিক বৃত্তিক মানুষের অস্থিসন্ধি নিয়ে আত্মপরিচয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে। বিহারের জনপদ জীবন নিয়ে কথাসাহিত্যের একটি পৃথক উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যে মূর্ত হয়ে ওঠে রাঢ়বঙ্গ, তিস্তা নদীকেন্দ্রিক ডুয়ার্স অঞ্চল মূর্ত হয়ে ওঠে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ কথাশিল্পীর রচনায়, অন্যদিকে বাংলাদেশের এই তিন প্রধান জনপদ জীবনের ঘনিষ্ঠ চিত্রপটের সন্ধান পাওয়া যায় এদেশের কথাশিল্পীদের রচনায়। তন্মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয় পটভূমি নিয়ে গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুনীর চৌধুরী, আবুল ফজল, রিজিয়া রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সেলিনা হোসেন, রাহাত খান প্রমুখ কথাশিল্পী। উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনপদ এবং ভৌগোলিক গঠনের দিক দিয়েও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কাজেই এই জনপদ জীবনের চালচিত্র বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন আলিঙ্গিত প্রাণপ্রবাহ নিয়ে গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক, সুবোধ লাহিড়ী, সত্যেন সেন, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, মঞ্জু সরকার, ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ কথাশিল্পী। বর্তমান অভিসন্দর্ভে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজ ও পটভূমিকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। এই

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনায় সমাজের সামগ্রিকসূত্রের সঙ্গে কথাসাহিত্যের জীবনবাদী প্রবণতাকে অন্বেষণ করা হবে। ফলে, এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জনপদের আর্থসামাজিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বস্তুত, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতার বিবিধ অনুষঙ্গ নিয়ে ইতোপূর্বে একাধিক গবেষক আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে ড. রফিকউল্লাহ খানের 'বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ', ড. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলীর 'আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনাঃ বিভাগোত্তর কাল', মুহম্মদ রেজাউল হকের 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস', ড. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলীর 'বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী' ড. শাহীদা আখতারের 'পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস', ড. ফরিদা সুলতানার 'বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উক্ত গবেষণা গ্রন্থগুলোতে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের নির্দিষ্ট ল্যাণ্ডস্কেপ বা পটভূমিকেন্দ্রিক সমাজজীবন নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকলেও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। বরং রঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা', বারিদবরণ চক্রবর্তীর 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন', অরূপ কুমার ভট্টাচার্যের 'আঞ্চলিকতাঃ বাংলা উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থে বৃহৎ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজসত্তা ও ভাষাসত্তার নিবিড় পাঠপর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কথাসাহিত্য নিয়ে এধরনের দৃষ্টিপ্রক্ষেপ ইতোপূর্বে করা হয়নি, বা স্বতন্ত্র কোন গবেষণাগ্রন্থ প্রণীত হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে পৃথক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা'-র স্বরূপ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত অন্যান্য অঞ্চলের সমাজজীবন নিয়ে পরবর্তী গবেষকগণের অনুসন্ধিৎসার অবকাশ সৃষ্টি হবে। বর্তমান গবেষণায় উত্তরবঙ্গের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। সমাজের নানামুখী দ্বন্দ্ব, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যসহ এই দেশের প্রতি ক্রোশে আলাদা হয়ে যাওয়া ভাষা ছাঁদটিও আলোচনায় স্পষ্ট করা হবে।

বস্তুত, বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য কথাসাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পাঠপর্যবেক্ষণ। উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা অবয়বটির স্বরূপই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সমাজ সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে পরস্পরের আন্তঃসম্পর্কের সূত্রগুলো এই অভিসন্দর্ভে বিশ্লেষিত হবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির (Sociological Point of View) আলোকে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪।

২. র‍্যালফ ফকস্, 'নভেল এ্যান্ড দ্য পিপল', (অনুবাদঃ সর্বজিৎ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষ) পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা ১৯৮০, পৃ. ২৭।

৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতাঃ জগদীশ গুপ্ত', বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৯।

৪. লিলি দত্ত, 'কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', দে'জ বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৪।

৫. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, 'বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কথাসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ঃ স্থানিক সমাজ ও ভাষা

১.০১ ভূমিকা ঃ

সমাজ ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক চিরন্তন। সাহিত্য যে সব মৌল উপাদান দ্বারা নির্মিত তা হচ্ছে দেশ–কাল–সমাজ পরিবেশ প্রতিবেশ বিধৃত মানব জীবন এবং জীবনকেন্দ্রিক ভাষা। কোন লেখকের সমাজ জীবন সম্পর্কিত চেতনা–ই তাঁর শিল্পসাহিত্য চেতনার মর্মমূলে ক্রিয়াশীল। যেহেতু লেখক নিজেও কোন না কোন নির্দিষ্ট স্থান–কালের ব্যক্তি এবং এই ব্যক্তিমানসের বক্তব্যকেন্দ্রিক জীবনবিন্যাসগত চেতনা সাহিত্যের শিল্পরূপ নির্মাণে প্রণোদিত করে; সেই কারণেই সেই সমাজের স্বরূপ ও গতিধারার সঙ্গে ব্যক্তিলেখকের শিল্পচেতনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে, বিশেষকালে বিশেষ দেশের আর্থসামাজিক এবং বৃত্তিকজীবনভাবনাকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যে সেই সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ঘনিষ্ঠ সংশ্রয় হয়ে ওঠে। এই বিবেচনায় লেখক মাত্রই তাঁর সমাজের অভিজ্ঞ পাঠক। এই সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যায়ঃ "Since every writer is a member of society, he can be studied as a social being. Though his biography is the main source, such a study can easily widen into one of the whole milieu from which he came and in which he lived."[১] লেখকের জীবনচিন্তন, সামাজিক অবস্থান ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর মানসদৃষ্টি কতটুকু বিষয় অনুবর্তী এবং জীবন প্রতিবেশের পারস্পরিক ঘাত–প্রতিঘাতে লেখকের দ্রোহ ও দায় কতটুকু ক্রিয়াশীল– এইসব বহুমাত্রিক জীবনবোধের দ্বারাও লেখকের স্বরূপ চিনে নেয়া যায়।

বস্তুত, লেখক তাঁর সমাজাভিজ্ঞানপ্রসূত ধারণা বা অর্জিত সত্যকেই শিল্পের নান্দনিক রূপায়ন কৌশলে এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিপ্রক্ষেপের দ্বারাই ব্যক্ত করেন মানব অভিজ্ঞতার ঘাত–প্রতিঘাত। সুতরাং যখন আমরা কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য পাঠ করি, তখন মূলত সেই লেখকেরই দেশকালের সমাজভাবনার মধ্য দিয়ে মানবসত্যের সন্ধান পাই। যদিও লেখকের সামজচেতনা তাঁর নিজস্ব শ্রেণী ও সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ– তবু মানবদর্শনের আলোকে সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে থাকে। এখানেই লেখকের মহত্ত্ব এবং সাফল্যের কারণ নিহিত।

অন্যদিকে, সমাজভাবনার চিন্তাসূত্রগুলো প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করাও সাহিত্যিকের কাজ। সমালোচকের মতে, "Literature is practical activity in any adequate sense of the phrase. Far from being a concern only of the specialist and the academician, it has been in all healthy socioties, a real part of life of the people."[২] সুতরাং লেখকের শিল্পচেতনার সূত্র সমাজনিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং জীবন ও সমাজের বিশেষ প্রকাশ বিন্দুতেই তাঁর সক্রিয় অবস্থান। দায়বদ্ধ লেখক সত্যিকার অর্থেই তাঁর সমাজপ্রতিনিধি এবং চিন্তানায়ক। 'সমাজের মানুষের কাছে বিরাজমান ঘটনাসমূহের গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করা, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটি, এর প্রয়োজনীয়তা ও এর নিয়মগুলো সহজবোধ্যতায় তাদের নিকট তুলে ধরা, মানুষ, প্রকৃতি এবং মানুষ ও সমাজের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের জালটি উন্মোচন করা শিল্পীর কাজ হয়ে দাঁড়ায়।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের সামাজিকবোধ বা চেতনার বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন দৃষ্টি প্রক্ষেপে দেখা সম্ভব। লেখকের সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান এবং সমাজের সঙ্গে শ্রেণীদ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর মানসপ্রবণতাগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সাহিত্যের বা সাহিত্যিকের সমাজচেতনা পুরোপুরিভাবে কোন মতাদর্শের অন্তর্গত নয়। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের তত্ত্বদ্বন্দ্ব থেকে সাহিত্যেও বহু মতবাদের প্রভাব পড়েছে। ফলে, সাহিত্যেরও শ্রেণীচরিত্র গড়ে উঠেছে। সাহিত্য ও শিল্পকে মার্কসবাদে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ''শিল্পী ও সাহিত্যিকের সমাজচেতনার বিষয়টি মানব ইতিহাসে মার্কসবাদীদের আবিষ্কার নয়। এর ইতিহাস শিল্পসাহিত্যের আদি ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রত্যেকটির মধ্যেই শিল্পী সাহিত্যিকের সমাজচেতনার বিষয়টি নানাভাবে দেখা দিয়েছে।''[৪]

বলা বাহুল্য, উপন্যাস এবং ছোটগল্প জীবন ও সমাজবাস্তবতার অভিমুখী শিল্পরূপ। আরো স্পষ্ট অর্থে গল্পউপন্যাস বা কথাসাহিত্য আধুনিক জীবন ও সমাজ বাস্তবতার ঘনিষ্ঠসংশ্রব থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলা কথাসাহিত্য বাঙালির জীবনপোলব্ধিরই এক নতুন পরিসর। বর্তমান আলোচনায় বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প বলতে কথাসাহিত্য অভিধাটি গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে Fiction বা Prose fiction বলা হয় তাকেই কথাসাহিত্য রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও ইংরেজি পরিভাষার পূর্ণ অভিব্যক্তি কথাসাহিত্য অভিধায় প্রতিফলিত হয় না। ইংরেজি Fiction-এর স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ '

'Fiction is a narrative literature created from the authors imagination rather than the fact. The Novel and short story are commonly called fiction. But narrative poetry and drama (Including opera librettos) are also forms of it. In addition, other types of literature such as epic poetry, fables and myths, are mainly fictional. Fictional elements also may be introduced into types of writing that are generally closed as nonfictional such as biography (fictional biography) and history (historical fiction).''[৫]

বস্তুত,ইংরেজি 'Prose fiction' বা কাহিনীমূলক গদ্যরচনাকেই আমরা কথাসাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারি। অপরাপর দেশের মতই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যও শিল্পের অন্যান্য শাখার চেয়ে আধুনিক যুগেরই সৃষ্টিশীল শিল্পমাধ্যম। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক সমাজ অভিজ্ঞতার নানান ঘাত-প্রতিঘাত ধারণ করে চলেছে কথাসাহিত্য। বিশেষ করে, কথাসাহিত্যের প্রধান শাখা উপন্যাস হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের গদ্যমহাকাব্য এবং ধারণ করেছে ঐতিহাসিক সমাজ অনুষঙ্গ। অর্থাৎ কোন কল্পিত সমাজ নয়, উপন্যাস ধারণ করে ব্যক্তির রাজনীতি সচেতন সমাজ। 'কারণ উপন্যাসের জন্ম হয়েছে মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও বোধ জাগার পর।'[৬] ফলে উপন্যাসে একদিকে যেমন যুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা, তেমনি যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান। সম্ভবত এ কারণেই বলা হয়, 'উপন্যাস হলো এই সভ্যতার সবচাইতে আকর্ষণীয় অভিযান, মানুষকে আবিষ্কার।'[৭]

বলা যায়, উপন্যাসের বহুমাত্রিক দায়ের মধ্যে একমাত্র অন্বিষ্ট হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের জীবনের কেন্দ্রমূল অনুসন্ধান। সমাজ ও সমকালের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েও ঔপন্যাসিক এই দুইয়ের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সজ্ঞাতি আবিস্কারের প্রতি বেশি সচেষ্ট। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় যথার্থই বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

''উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ সময় আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বরাবরই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।''[৮]

অন্যদিকে, কথাসাহিত্যের অর্বাচীন শাখা ছোটগল্প উৎসলগ্ন থেকেই সমাজ সচেতন শিল্পকর্ম। উপন্যাসের মত ছোটগল্পেরও অন্বিষ্ট হচ্ছে সমাজ ও মানুষ। মানবজীবনকেন্দ্রিক গভীর অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে গল্পকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারপাশের জনজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, অব্যবহিত সামাজিক বিবর্তন এবং ব্যক্তিমানসের সন্ধানী সংবেদনায় গল্পকারের তীর্যক দৃষ্টি প্রসারিত। তবে উপন্যাসের মতো জীবন ও সমাজের সামগ্রিকভাবে ছবি ছোটগল্পে পাওয়া যায় না। উপন্যাসে জীবনের অখণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। ছোটগল্পে পাওয়া যায় খণ্ডতার ব্যবহার। যদিও উপন্যাসের মতই ছোটগল্পেও কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, সময়, ঘটনাস্থল বা স্থানিক সমাজ পরিবেশ থাকে তবুও জীবনের বিস্তৃত ক্যানভাস এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা উদ্বোধিত হয় না। কারণ, ''ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (Impression) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা পরিবেশ বা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।''[৯] উপন্যাসে মানবজীবনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতির সামগ্রিক বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু ছোটগল্পে পাওয়া যায় খণ্ডিত জীবনের অভিব্যক্তি। অবশ্য উভয় শাখার লক্ষ মানব অভিজ্ঞান। সমালোচকের ভাষায়, ''ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে জীবন এবং জীবনের খণ্ডরূপ। অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বা একখানি গোটা জীবন ছোটগল্পে স্থান পেতে পারে না, কিন্তু একটি অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দিতে পারে।''[১০]

সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, গল্পউপন্যাস নিয়ে আমাদের যে কথাসাহিত্যের ডিসকোর্স নির্মিত হয়, তার অন্তদর্পণে মূলত প্রতিবিম্বিত হয় সামাজিক জীবনের প্রতিচিত্র। শুধু তাই নয়, গল্পউপন্যাস উভয়ই শব্দ বা ভাষাশ্রয়ী শিল্পকর্ম। কিংবা বলা যেতে পারে, কথাসাহিত্য হচ্ছে মানবজীবনের ভাষাগত স্তরের শৈলীগত বিন্যাস। র‍্যালফ্ ফক্স বলেন, উপন্যাস হচ্ছে সমগ্র মানবজীবনেরই গদ্যভাষ্য। তাঁর ভাষায়ঃ The novel is not merely fictional prose; it is the prose of man's life, the first art to attempt take the whole man and give him Expression.[১১] সুতরাং যে দেশ-কাল সমাজ প্রতিবেশে সাহিত্য রচিত হয় তার সামাজিক আদর্শের অনুষঙ্গী একটি ভাষাদর্শও লেখক উপস্থাপন করে থাকেন। ''সে কারণেই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রয়োজন সমাজতাত্ত্বিক স্টাইলিসটিকস্ বা শৈলীতত্ত্বের। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সামাজিক dialogism-এর উন্মোচনে ঐ ডিসকোর্সের সামাজিক পটপ্রসঙ্গের উদঘাটন দরকার।''[১২] যে লেখক যত বেশি তাঁর সামাজিক সংবিদ অর্জন করেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগে সফল হন- সে ক্ষেত্রে তাঁর অনেকার্থ দ্যোতনা বা শক্তির উৎস প্রমাণিত হয়। লেখক তাঁর সংস্কৃতিগত জগতের অভিজ্ঞান প্রকাশের লক্ষ্যে সমাজের ভাবাদর্শ ও ভাষাদর্শ দুইই গ্রহণ করেন। ফলে ব্যক্তির ভাষা হয়ে ওঠে সামাজিক ভাষা এবং উপন্যাসে সেই ভাষার বহুস্বর বা পলিফনি ধরা পড়ে। বস্তুত 'উপন্যাসের 'উপন্যাসত্ত্ব' অর্থাৎ তার মৌল নির্যাস নির্ভর করে সামাজিক সংবিদ, সাংস্কৃতিক আয়তন ও ভাষাব্যবহারের দ্বিবাচনিকতায়। সাহিত্যের পাঠকৃতি মূলত সামাজিক উচ্চারণ হওয়াতে তাকে নির্দিষ্ট সময় ও পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।'[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট বোঝা যায়, কথাসাহিত্যের এই দেশ-কাল-সমাজ পরিবেশ ও ভাষা সংবিদ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার নতুন পরিসর নির্মাণ করে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ সংবিদ ও ভাষার সমাজতাত্ত্বিক স্বরূপ অন্বেষণই বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। তবে তার পূর্বে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের আলোকেই উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষার নিজস্ব বর্ণিমা এবং বহুস্বরের বৈচিত্র্যগুলো সনাক্ত করার প্রয়াস পাওয়া যাবে।

১.০২ কথাসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ঃ

কথাসাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতার (Social mobility) সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে লেখকের সমকাল ও সামাজিক প্রেরণা ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজগতির সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক, অবস্থান ও জীবনজীবিকার স্বরূপ, সর্বোপরি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। এই বিষয়ে কতকগুলো উপাদান লক্ষ করা যায়ঃ "First there is the sociology of the writer and the profession and institutions of literature, the whole question of the economic basis of literary production, the social provenance and status of the writer, his social ideology, which may find expression in extra-literary pronouncements and activities."[১৪] সুতরাং লেখকের সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীস্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবন ও জীবিকার প্যাটার্ণ-সমূহ বিশেষকালের সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজ ও সমকালের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারাটিও লেখক সাহিত্যে গ্রহণ করেন অন্তরগরজে। সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট উল্লিখিত কারণেই সাহিত্যের সামাজিক মূল্য অর্থবহ হয়ে ওঠে। ফলে সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of literature) ধারণার উদ্ভব হয়। সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "Literary criticism focusing on the social and economical condition surrounding the production of a literary work the social and economic status and ideology of the author and of his or her audience."[১৫] কথাসাহিত্য জীবন ও সমাজের সামগ্রিক সত্যকে বহুবিচিত্রভাবে ধারণ করে বলেই ঔপন্যাসিকের কাছে আমরা সমাজ ও সভ্যতার কালপরম্পরা দ্বন্দ্ব, বিকাশ, বৈচিত্র্য ও ধারাবাহিক রূপায়ন প্রত্যাশা করি। এ কারণেই সামাজিক উপন্যাস অভিধাটিও গড়ে ওঠে। আমরা সাধারণত বুঝি উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল প্রচলিত সমাজ, যেখানে চরিত্র বা ঘটনা সমাজের উপকরণমাত্র, মানবজীবনের বিশ্বস্ত চিত্রণ যেখানে শিল্পমণ্ডিত, তাই-ই সামাজিক উপন্যাস। সেই অর্থে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কিংবা 'আঞ্চলিক উপন্যাস', রাজনৈতিক উপন্যাস যা-ই বলি না কেন তার মধ্যে সমাজ রূপান্তরের ইতিহাস লক্ষ করা যাবে। কারণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, আঞ্চলিক জীবনবিন্যাস ও তার ইতিহাস সবই সমাজপ্রকরণে নিহিত। কাজেই কথাসাহিত্য সমাজবিবিক্ত শিল্পকর্ম তো নয়ই, বরং কথাশিল্পীর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনসৃষ্টি করা। সামাজিক উপন্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে M. H. Abrams লিখেছেনঃ 'The social of novel emphasizes the influence of social and economic conditions of an on shaping characraters and determining events; often it also embodies an implicit or explicit thesis recommending political and social reform."[১৬] পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচকদের নিকট সামাজিক উপন্যাস 'Thesis Novel'

Dhaka University Institutional Repository

নামেও অভিহিত হয়েছে। মূলত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম ও অর্থনৈতিক সত্তার সাত্তিক বিকাশের অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে ওঠে উপন্যাস। এই অর্থেই উপন্যাসও এক ধরনের সামাজিক গবেষণার ফল। এই প্রসঙ্গে J. A. Cuddon লিখেছেনঃ "One which treats of social political or religious problems with didactive and perhaps, radical purpose. It lertainly sets out to call people's attention to the short comings of society."[১৭]

সামাজিক উপন্যাস বা 'Thesis Novel' সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট গুরুত্ববহ বিষয়। 'Thesis Novel'–এর মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানী অন্বেষণ করতে পারেন সাহিত্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ইতিহাস, মানুষের নিরন্তর সমাজবিবর্তনের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনসমূহ। সুতরাং যে লেখক সামাজিক অভিজ্ঞান ও উপাদান গ্রহণ করেন না, সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট সেই সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণরূপে বিবেচিত। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর মন্তব্যঃ 'সত্যিকারের সাহিত্য সৃজন করতে হলে সাহিত্যিককে সমাজ সচেতন হতে হবে। সমাজ সচেতনতার অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যিক কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তাঁর সাহিত্যে পরিবেশন করবেন। যেমন বলা হয়েছে যে, এত বড় মহাসমর, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ সংগঠিত হল, কিন্তু অনেক নামজাদা বনেদী সাহিত্যিক তাঁদের কলম এ সব ঘটার আগে যে ভাবে চালাতেন সে ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের লেখায় তাই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কোন ছাপ নাই এবং ছাপ নাই বলেই তাঁদের লেখা বাস্তবতা বর্জিত; তাই তাঁদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারবে না। কতক ''আধুনিক'' সাহিত্যিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু লিখে কতক মহলের বাহবা পেলেন। আবার আজকাল সাহিত্যিক মহলে রেওয়াজ চলছে, সত্যিকারের সাহিত্যিক মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র না এঁকে নিম্নশ্রেণীর চিত্র আঁকতে হবে– তা হলেই সাহিত্যিক সমাজ সচেতন হলেন। তা মোটেই নয়। সমাজ সচেতনতার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে জীবনজিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হ'ল প্রকৃত সাহিত্য''।[১৮]

লেখক কি ধরনের সাহিত্য রচনা করবেন তাও নির্ধারণ করে দেয় লেখকের সমাজবাস্তবতা। সমাজের বহির্বাস্তবতার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সার্বজনীন মানবচেতনা রূপে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সত্যিকার অর্থে লেখক মাত্রই তাঁর সমাজের আয়না। সমাজবিজ্ঞানী সেই আয়নায় সমাজের ছবি খোঁজেন। খুঁজে পান সমাজের মৌলকাঠামো (Basic structure) এবং উপরিকাঠামো (Super structure) উভয়ই। দেখা যায়, সমাজ অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত এবং সমাজ পরিবর্তনের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যেও নতুন নতুন আঙ্গিক ও মতবাদের জন্ম নেয়।[১৯] 'বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে গদ্য ও উপন্যাসের সম্ভাবনা– তাদের পূর্বসূরী সামন্তরা স্বস্তিবোধ করত পদ্যে ও রোমান্সে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী বনেদী শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি নিয়ে অসংখ্য প্রহসন রচনা করেছে। ইংরেজের সঙ্গে নতুন শ্রেণীর মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কালে আমরা পেয়েছি দেশপ্রেমমূলক কাব্য, নাটক ও উপন্যাস।'[২০] পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর রাজনৈতিক বক্তব্য ও চেতনা ধারণ করেছে এদেশের সাহিত্য। কাজেই সমাজের মৌলকাঠামো ও উপরিকাঠামোর বাস্তবতাকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা বা ব্যাখ্যা করা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের কাজ। সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে একজন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেনঃ "Sociology of literature is a specialized area of study

Dhaka University Institutional Repository

which focuses upon the relation between a work of art, its public and the social structure in which it is produced and recived. It seeks to explain the emergence of a particular at work in a particular forms of society and the ways in which the creative imagination of the writer is shaped by cultural traditions and social arrangements. The attempt here is to use the work of literature for an understanding of society, rather than to influence to the society in which it arose."[২১]

লেখকের কাজ তাৎক্ষণিক আনন্দ দান নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধন। অর্থাৎ তিনি সমাজের তথ্যকে সাহিত্যের ভাষায় অনুবাদ করবেন এবং সমালোচক সেই তথ্যকেই বাস্তবতার ভাষায় অনুবাদ করে উভয়ের দায় ও দায়িত্ব পালন করবেন।[২২] সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত একজন লেখকের সজ্ঞান রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলনই মুখ্য বিষয়। সাহিত্যের নান্দনিক বিষয়টি তাদের কাছে গৌণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকের নিকট সমাজতাত্ত্বিক এবং নান্দনিক উভয় দিকই গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে তা তাত্ত্বিক নির্মিতির পর্যায়ে অনেক সময়ে সাহিত্য সমালোচনা এবং দর্শনের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। দুটি বা তিনটি পর্যায়ের সম্পৃক্ততা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী যদি নান্দনিক আদর্শ বা মান স্থির করতে যান তা হলে যে জটিল জ্ঞান তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তা থেকে বেরিয়ে আসা অনেক সময় সম্ভব হয় না। একাধিক ভূমিকার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।'[২৩] তিনি আরো বলেন, 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে সাহিত্য এবং নান্দনিকতার সমাজতত্ত্বের মধ্যে সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের ফলে সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। সাহিত্য কি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ বা কাঠামোগতভাবে বা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত তা সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। সমাজবিজ্ঞানীর জন্য সাহিত্য বিশেষ ধরনের বার্তাপ্রবাহ বা সাহিত্য কি না, অথবা তার নান্দনিক মূল্য কি তা নির্ধারণ করেন সমালোচকগোষ্ঠী– যারা হচ্ছেন এই বার্তা প্রবাহের তন্নিষ্ঠ গ্রাহক। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সমাজবিজ্ঞানী দুটি ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু স্বচ্ছতার প্রয়োজনে সমালোচকের ভূমিকাকে আলাদা করার প্রয়োজন রয়েছে।'[২৪] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব কি নান্দনিকতা বিযুক্ত? কারণ, সাহিত্যের যথার্থ মূল্য তার নান্দনিকতাকেও বাদ দিয়ে নয়। কাজেই সাহিত্যের নান্দনিক ও সমাজতাত্ত্বিক উভয় পাঠই প্রয়োজন আছে। সমাজতত্ত্ববিদগণ অবশ্য সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে নান্দনিক বিবেচনা থেকে মুক্ত রাখারই পক্ষপাতি। কিন্তু টেরি ঈগলটন বলেছেনঃ "It is as though the aesthetic must still be granted mysteriously Privileged Status, but how in embarrassedly obligae style."[২৫]

বস্তুত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বিক বিচার দুটো পৃথক ধারাকেই নির্দেশ করে। সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট শাখা হিসেবে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন স্বীকৃতি লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু তারও পূর্বে ফরাসি বিপ্লবের পর পরই সাহিত্যের 'রোমান্টিসিজম' এবং 'রিয়ালিজম' দ্বন্দ্ব সাহিত্যিকদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। বলাই বাহুল্য, দার্শনিক জগতে যখন ভাববাদ অত্যন্ত প্রবল, সাহিত্যে তখন ভাবরসপুস্ট রচনারই প্রাধান্য; অত্যন্ত স্থূল অর্থে তাকে বলা

Dhaka University Institutional Repository

চলে রোমান্টিক সাহিত্য। দার্শনিক পরিমন্ডলে বাস্তবতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন– একদল চিন্তাশীল সাহিত্যস্রষ্টাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ ও চিন্তার জগতে যখন মূল্যবোধের পরিবর্তন অতি দ্রুত– তখন সাহিত্যে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সাহিত্যের প্রাণসৃষ্টির কারণে তাঁদের চিন্তার জগত আলোচিত হতে থাকে। ক্রমে সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে ওঠে।'[২৬] গুস্তাব ফ্লবেয়র, স্তাদাল, বালজাক, এমিল জোলা, জর্জ এলিয়ট, টমাস হার্ডি, আর্নল্ট বেনেট, জেমস জয়েস, ডি. এইচ. লরেন্স, তুর্গেনেভ প্রমুখ কথাশিল্পীগণ বাস্তবতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রচারী লেখকের স্বাক্ষর রেখে যান।

লক্ষণীয়, ফরাসি বিপ্লবের পর শিল্পসাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের যে ধারা সূচিত হয়েছিল; অক্টোবর বিপ্লবের পর তা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের আলোকে নতুন চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অথচ 'বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্য এবং নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে অনেকের পরিচয় ছিল না। সে বিষয়ে তাঁদের যে মৌলিক ভাবনা আছে তা–ও অধিকাংশের অজ্ঞাত ছিল। ইউরোপের সর্ববৃহৎ বামপন্থী সংগঠন জার্মনির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (১৮৭৩) দুই প্রধান তাত্ত্বিক কার্ল কাউটাস্কি (১৮৫৪–১৯৩৮) ও এডুয়ার্ড বার্ণস্টেইন (১৮৫০–১৯৩২) মনে করতেন যে, শিল্পকলার ওপর অর্থনীতির প্রভাবের ব্যাখ্যার মধ্যে নন্দনতত্ত্বে মার্কসবাদের একমাত্র অবদান নিহিত। অপব্যাখ্যার কারণে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কারো উৎসাহ জাগ্রত হয়নি এবং ধারণা জন্মেছিল যে সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁদের অভিমত একান্তভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত, যার কোন গভীর তাৎপর্য নেই।'[২৭]

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস–এর পলিটিক্যাল ইকনমি এবং এই বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন লেখার সূত্র ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পোল লাফার্গ, ফ্রানজ মেহরিঙ, প্লেখানভ প্রমুখ মার্কসীয় নন্দনশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে ট্রটসিক, লুনাচারস্কি, র‍্যালফ ফকস্, কডওয়েল, আর্নস্ট ফিশার, টেরি ঈগলটন, গোল্ডম্যান, ইউলিয়ামস্ রেমণ্ড, জা. পল সার্ত্রে, লুইম, এ. রোজার এবং সাম্প্রতিক সময়ে খুব প্রভাবপ্রসূত সাহিত্য সমালোচক মিখাইল বাখতিন মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন– তার ফলে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়টির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, শিল্পকলা সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলস যা বলেছেন তা অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে। সাহিত্যের বিষয়গত দিকটি তাঁদের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে, আঙ্গিক সম্পর্কে নয়। বলাই বাহুল্য যে, মার্কস এঙ্গেলসের বিক্ষিপ্ত মন্তব্য দিয়ে কিছুতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে তোলা যায় না। আরো লক্ষণীয় বিষয়, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ যে সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন, তা পরস্পর বিরোধী তো বটেই তা প্রায়শই বিতর্কিত।

ঐতিহাসিকবস্তুবাদ (Historical Materialism) মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মূল ভিত্তি। এই তত্ত্বে ইতিহাসকে দেখা হয়েছে বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে। এ জন্যে তাঁদের সাহিত্যতত্ত্বও মূলত বস্তুবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক। সুতরাং মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান বিষয় হলো সাহিত্যের সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক নিরূপণ, সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতার স্বরূপ নিরূপণ এবং সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ক অতিরঞ্জন কিভাবে প্রভাবিত করে এই তিনটি বিষয় পর্যবেক্ষণ। সোভিয়েত সমাজ নন্দনতাত্ত্বিক আনাতোলি ইয়েগোরোভ মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপে সনাক্ত করেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

ক. মার্কসবাদ নন্দনতত্ত্বের জগৎকে অতীন্দ্রিয়তা ও ভাববাদ থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানসম্মত এক অখণ্ড তাৎপর্য দান করেছে।

খ. শিল্প-সাহিত্যকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মানবমনে ও জীবনে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক ও সক্রিয় প্রভাব অন্বেষণ করা হয়েছে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে।

গ. সামাজিক অবস্থা গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিকে অভিন্নসূত্রে পর্যালোচনা করাই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঘ. ইতিহাসে অনিবার্য কার্যকারণসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ভবিষ্যতের রূপাঙ্কণ এবং মার্কসবাদী সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশই হবে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব-চিন্তার মূল কথা।[২৮]

শ্রমিক শ্রেণীই ইতিহাসের চালিকাশক্তি-কার্ল মার্কসের এই বিশ্বাসই তাঁর সাহিত্যচিন্তার মূল আধার। শ্রেণীসজ্ঞাত সামাজিক মূল্যবোধ এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে; সাহিত্যে সেই জীবনের মূল্যবোধসমূহ জারিত হয়। বস্তুত শ্রেণীসত্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত এই মূল্যবোধ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফ্রানিজ মেহবিত (১৮৪৬-১৯১৭) একটি তাত্ত্বিক ধারণায় উপনীত হন। তিনি তাঁর তত্ত্বে অর্থনীতির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু সাহিত্যে অর্থনীতি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং সাহিত্যের আঙ্গিক কিভাবে নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট নয়। অপরদিকে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সাহিত্যের সম্পর্ক ভিত্তিক আলোচনা দীর্ঘদিন মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজ ও সাহিত্যের কাঠামো-উপরিকাঠামো এই যান্ত্রিক ধারণা মার্কসবাদী সমালোচকদের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অন্যতম মার্কসবাদী সমালোচক গিয়ার্গি লূকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) বিশ্লেষণে এগিয়ে এলেন– বাস্তবতা কিভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত তার কার্যকারণসূত্র আবিষ্কারে। বস্তুত তিনি দেখালেন যে, সমাজের যে সব কাহিনী মানুষ ও মানুষের জীবনসমগ্রতা সবই সাহিত্যে আসে। লুকাচ সমাজবাস্তবতার প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই যে সাহিত্যতত্ত্বের ধারণা প্রদান করলেন, তা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু সাহিত্য যে শুধুমাত্র সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার ও বাস্তবতার প্রতিফলন নয় সে কথা মার্কস এঙ্গেলস বার বার বলেছেন। সাহিত্যের নিজস্ব তত্ত্ববিশ্ব (Theory of univers) আছে, তার মধ্যে আছে নিজস্ব সমাজকেন্দ্রিক ভাষাগত উপাদান এবং ভাষার গতিপ্রবাহ। এছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অনুযায়ী মানুষের চিমর্জির ধরন এই সব বিষয়ে মার্কস যে সব ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী মার্কসবাদীরা বিভিন্ন তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফ্রাঙ্কফার্ট স্কুল। ফ্রাঙ্কফার্ট ঘরানার তাত্ত্বিকদের মধ্যে আছেন থিওডোর অ্যাডোর্না, এরিক ফ্রম, হার্বাট মার্কুস, ওয়াল্টার বেনজামিন প্রমুখ। তাঁরা সবাই একই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। যে মৌলিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ঐক্য লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে– এই ঘরানার তাত্ত্বিকদের লেখায় স্বয়ংশাসিত সাহিত্যবিশ্বের ধারণা যত প্রাধান্য পেয়েছে, সমাজের শ্রেণীচেতনা ততো মনোযোগ পায়নি। বস্তুত ফ্রাঙ্কফার্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা সাহিত্যের বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে ওঠার কারণ, মানবিক স্বকীয়তার বিলোপ, সাহিত্যের জীবনদর্শনের চেয়ে বাণিজ্যিক হয়ে ওঠার বিষয়সমূহ তাঁরা গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছেন। এছাড়াও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় কিভাবে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যকে রাষ্ট্র কিভাবে ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যা তাঁরা দিলেও সাহিত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধের ব্যাপারগুলো তাঁদের লেখায় চিহ্নিত হয়নি। স্ট্রাকচারালিস্ট তাত্ত্বিক লুসিয়েন গোল্ডম্যান মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নতুন ধারণার উদ্ভাবক। তাঁর মতে, সমাজের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো আছে, এই কাঠামোগুলো পরস্পরের ওপর প্রভাব ফেলে। সাহিত্য সৃষ্টি এবং সাহিত্যপাঠ উভয়ই সেই সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন প্রভাবেরই যুগ্মফল। সুতরাং কেবলমাত্র অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম, পুরাণ এই সব বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। এই সবকিছুরই সমবেত শক্তি গঠন করে সাহিত্য। সাহিত্যিককে শুধুমাত্র বিশেষ শ্রেণী বা গোত্রভুক্ত রূপে না দেখে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে গোল্ডম্যান দেখার পক্ষপাতি। এঁদের উত্তরসূরীরা ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব দর্শনের ব্যবহার করে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন– কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত মার্কসীয় শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূলসূত্র থেকে সরে এসেছেন বলে মনে হয়।[২৯]

মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তায় ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মোটামুটিভাবে কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রায়ই একমত। তাঁদের চিন্তার অভিন্ন সূত্রগুলো হচ্ছে সমাজবাস্তবতার ব্যাপক কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা। তাঁরা মনে করেন, ইতিহাস, সমাজ থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হলে সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে অসম্পূর্ণতা রয়ে যায়। অন্ততঃ মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব আমাদের এ কথাই জানান দেয় যে, সাহিত্য যেখান থেকে উদ্ভূত হয় বা যার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে থাকে সেই সমাজ বাস্তবতা কোন অস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত নয়। এর একটি নির্দিষ্ট ধরণ বা রূপ আছে। এই ধরণটি দেখা যায় ইতিহাসে এবং দ্বন্দ্বমান সামাজিক শ্রেণীসমূহে।[৩০] শিল্পসাহিত্যে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বের সঙ্কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেভাবে মার্কসের নিজের চিন্তারও বিকাশ ঘটেছিল হেগেল, রিকার্ডো, প্রুধো প্রমুখের চিন্তা পর্যালোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বগুলো মার্কসীয় চিন্তার পাশাপাশি অমার্কসীয় বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের সমালোচনা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে– এসব তত্ত্বে ভিন্নধর্মী চিন্তার প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন হেগেলের সঙ্গে লুকাচের প্রকরণবাদের সঙ্গে বাখতিন চিন্তা ধারার, ফরাশি সাংগঠনিক তত্ত্বের সঙ্গে ম্যাশরে এবং ক্রিসতেভার চিন্তার ক্ষেত্র বিশেষে অভিন্নতা রয়েছে।'[৩১]

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ক্রমাগ্রসরমান চেতনায় ব্যাপক প্রভাবপ্রসূত চিন্তাবিদ হচ্ছেন রুশ দার্শনিক মিখাইল বাখতিন। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক বাখতিনতত্ত্ব বর্তমান সাহিত্য সমালোচনায় ব্যাপক আলোচিত প্রসঙ্গ। মিখাইল বাখতিন, হেগেল ও লুকাচের মতোই মানবিক চেতনার ইতিহাস হিসেবে সামাজিক ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছিলেন। হাঙ্গেরীয়ান তাত্ত্বিক গেওর্গ লুকাচ মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোকে রচনা করেছিলেন 'উপন্যাসের তত্ত্ব' (১৯২০), 'ইতিহাস ও শ্রেণী চেতনা' (১৯২৩), 'ইউরোপীয় বাস্তববাদিতা নিয়ে অধ্যয়ন' (১৯৫০), 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৯৬২) এবং 'সাম্প্রতিক বাস্তববাদিতার তাৎপর্য' (১৯৬৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মানবদর্শনে আত্মচৈতন্যের উত্থান সম্পর্কিত হেগেলীয় চিন্তাসূত্র দ্বারা প্রভাবিত লুকাচ তাঁর 'Theory of Novel' গ্রন্থে মানবচৈতন্যের স্তর– স্তরান্তরের ক্রমশ সূচনা থেকে সমাপ্তির দিক নির্দেশ করেছিলেন। বাখতিন দেখালেন যে, সাহিত্যের ইতিহাসও মূলত মানবচৈতন্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি হেগেলীয় আত্মচৈতন্যের সূত্রগুলো অনুসরণ করলেন। মোটকথা, ''হেগেল–লুকাচ বাখতিন; এই তিন চিন্তাবিদই সামাজিক ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন চেতনার ইতিহাস হিসেবে। ইতিহাস যেন এক ধরনের বিলডুঙ্গাস্‌রোমান যেখানে জন্ম থেকে পরিণতি পর্যন্ত ব্যষ্টিসত্তার নিজস্ব অস্তিত্ব ও বর্গগত ক্রমবিকাশকে একটি সুনির্দিষ্ট বিপুল পরিধি জুড়ে সমষ্টিসত্তার অনুবর্তন।''[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

মিখাইল বাখতিন উপন্যাসকে দেখেছেন চেতনার পটভূমি হিসেবে। মানবদর্শনের বহুত্ববাদী চেতনা এই শিল্প মাধ্যমের ভেতর বস্তুত আত্মবীক্ষণ ও আত্মআবিষ্কারের দিকই নির্দেশ করে না, সেই সঙ্গে সত্তার আবিষ্কারে বিচিত্র প্রনোদনায় উপন্যাসের মৌল আধেয়। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণঃ 'আসলে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় তাত্ত্বিকতাকে বাখতিন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বাখতিনের মতে, প্রতিটি তাৎপর্যই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। এই সংঘর্ষে ব্যক্তি কখনো কখনো সামাজিক ইতিহাসের প্রতিপক্ষ। আধিপত্যবাদী বর্গের ভাবাদর্শ যখন ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে বিড়ম্বিত করে; এই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে ব্যবহারিক ও নান্দনিক ক্ষেত্রে। উপন্যাসের প্রতিবেদন এই সংঘর্ষের বহুমুখী দ্বিবাচনিকতায় ঋদ্ধ হয়ে থাকে। এইভাবে বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব (Theory univerce) ধ্রুপদী মার্কসীয় ভাবনার পরিমন্ডল থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিমেরুবিষয়ে কোন দূরত্বে যেতে পারে না।'[৩৩] উপন্যাসের ভাষাকেও বাখতিন দেখেছেন সামাজিক কর্মকান্ডেরই অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে। ফলে বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বে ভাষাধারণাও অভিনব মাত্রা অর্জন করেছে। বস্তুত তাঁর তত্ত্বের কার্যকারিতাকে তিনটি ক্ষেত্রে নির্দেশ করা যেতে পারে। সমালোচক বলেন, 'এ তত্ত্বের মূল কার্যকারিতা তিনটি ক্ষেত্রে– সাহিত্যকর্মের তত্ত্ব হিসাবে, রচনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে, এবং সাহিত্যের প্রযুক্তি তত্ত্ব হিসাবে। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ধারায় যে সব তত্ত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত তার মধ্যে এইটি শেষ তত্ত্ব।'[৩৪]

মিখাইল বাখতিন তাঁর 'The Dialogic Imagination: Four Essays' (১৯৮১) গ্রন্থে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের সূত্র প্রদান করেন। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো হচ্ছে 'Discrouse in the Novel' (১৯৩৪–৩৫), 'Forms of time and of the chronotope in the Novel' (১৯৩৭–৩৮), 'From the Prehistoric Novelistic discourse', (১৯৪০) এবং 'Epic and Novel: toward a methodology of the study of the Novel' (১৯৪১)। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু 'The Dialogic Imagination: Four Essays' গ্রন্থে তিনি উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার সূত্রে ডস্টভয়স্কির উপন্যাস ও গ্রীক মহাকাব্যগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তন্মধ্যে বাখতিন তাঁর 'Forms of time and of the chronotope in the Novel' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে উপন্যাসের দেশকাল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের অঙ্গীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া বিষয়ক বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি প্রথমেই ক্রনোটপের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

বাখতিন উপন্যাসের 'ক্রনোটোপ ভ্যালুজ' বলতে সাহিত্যে প্রকাশিত কালিক ও দেশিক সহজাত অন্তর্মুখী সংযোগকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "Time as it were, takes on flesh, becomes artistically visioble, likewise, space becomes charged and responsive to the movements of time plot and history."[৩৫] উপন্যাসের দেশিক ও কালিক পটভূমি বিমূর্তভাবে দেখা গেলেও শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকায় একে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। সামগ্রিকভাবেই ঔপন্যাসিক তাঁর সময় ও সমাজের প্রতিটি মোটিফ এবং বিচ্ছিন্ন মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ফলে, লেখকের মূল্যবোধের সঙ্গে দেশ–কালের নানান দ্বন্দ্ব একীভূত হয়। মূলত 'একজন লেখকের সমগ্র কাজে, এমন কি উপন্যাসও বিভিন্ন জটিল ক্রোনোটপ থাকতে পারে, তাদের মধ্যে নানামাত্রিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, এর মধ্যে একটি হয়তো অপেক্ষাকৃত প্রধান হয়ে ওঠে। এই দেশকালের সংযোগগুলো পরস্পর লগ্ন,

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক বুননে আবদ্ধ একটির জায়গায় আরেকটি আসে।'[৩৬] তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, উপন্যাসে লেখক যে জগত উপস্থাপন করেন তার সঙ্গে বাস্তবজগতকে গুলিয়ে ফেলার অবকাশ নেই। কারণ প্রতিটি পাঠকই উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করেন নিজের সাধ্যমত টেক্সটি তৈরি করে নিয়েই; ঐ টেক্সটি বাইরের বাস্তবের সঙ্গে একাত্ম নয়। লেখকের উপস্থাপিত সমাজের সঙ্গে প্রকৃত সমাজের একীভূত হওয়ার মাঝে শিল্পের স্পষ্ট বিভাজনও চিহ্নিত হয়। তবুও অব্যাহত ভাবেই শিল্প ও সমাজের মাঝে পারস্পরিক দেয়া নেয়ার প্রক্রিয়াটি সচল থাকে। বস্তুত লেখক সেই সামাজিক ঘটনাকেই উপস্থাপন করেন যার মধ্যে তিনি নিজেও লক্ষ করেন সমাধানহীন এবং বিবর্তিত সমকালীনতা। ঔপন্যাসিক এই প্রেক্ষিতে স্পর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তাই উপন্যাসের চূড়ান্ত সমাপ্তি বলে কিছু নেই। জীবন সমাজের ও ইতিহাসের অনন্ত ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস অনবরত ধারণ করে। তবে উপন্যাসের প্রতিবেদন নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের সব বিভঙ্গকে জারিত করেই জগতের সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য তাৎপর্যগুলোই শিল্প অভিধায় চিহ্নিত করাই ঔপন্যাসিকের প্রয়াস। শৃঙ্খলাহীন এবং পরিমিতিহীন জগতকে উপন্যাস যেন বাধতে চায় শিল্পের আঙ্গিক ও কৌশলে।

বাখতিন তাঁর বিখ্যাত 'Discourse in the Novel' নামক প্রবন্ধে উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, '...a diversity of social speech types (sometimes even diversity of language) and diversity of individual voice, artistically organised.'[৩৭] তিনি আরো মনে করেন, উপন্যাস হচ্ছে বহুমাত্রিক ভাষা ও ব্যক্তির ঐক্যের সমষ্টি। ফলে উপন্যাস নানান ভাষাগত ও শৈলীগত এককের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ স্মরণীয়ঃ 'ভাষার ঐক্য ও ব্যক্তি বিশেষের ঐক্য মিলে শৈলীর ঐক্য দেখা দেয়। ভর্বল আইডিয়লজিক্যাল জীবনের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রতিটি সামাজিক স্তরে প্রতিটি প্রজন্মের নিজের ভাষা থাকে। আর বিভিন্ন যুগের ভাষা ও সামাজিক আইডিয়লজিক্যাল জীবনের নানা সময় একে অন্যের সঙ্গে বাস করে। অর্থাৎ উপন্যাসের ভাষায় অতীত– অতীতের বিভিন্ন যুগের বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক ভাবাদর্শগত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ববিরোধ প্রতিফলিত হয়। সে কারণেই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রয়োজন সমাজতাত্ত্বিক স্টাইলিস্টিকস বা শৈলীতত্ত্বের। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সামাজিক dialogism–এর উন্মোচনে ঐ ডিসকোর্সের সামাজিক পটপ্রসঙ্গের উদঘাটন দরকার: বাখতিনের ভাষায় dialogic essence–এর গভীর হওয়ার মধ্যে উপন্যাসের বিকাশের কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সবকিছুকেই একটি বৃহত্তর সমগ্রের অংশ হিসাবে দেখতে হয় এ এক বৃহত্তর সংলাপ।'[৩৮]

সুতরাং বাখতিনের তত্ত্বে উপন্যাসের ইতিহাস সাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাসেরও বাইরে নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যের 'ডায়ালজি' থেকে 'পলিফনি'র বহুমাত্রিকতাকে তিনি নির্দেশ করতে গিয়ে উপন্যাসকে নতুনভাবে পাঠ করান।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সাহিত্য হচ্ছে সমাজেরই মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ। জগত ও জীবনকে আমরা যেভাবে জানি; সাহিত্যে সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটে। জীবন ও শিল্প কখনই সমাজ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সর্বোপরি দেশকাল সমাজ অনুষঙ্গ নিরপেক্ষ সাহিত্য জীবনবাদী সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। এ কারণেই সমাজ সচেতন লেখকের রচনায় মূলত তাঁর সমাজের অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব তাই সমাজবিজ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান্স ও ভাববাদ থেকে সাহিত্য যতই বাস্তবতার অনুষঙ্গী হয়ে উঠেছে সমাজ অবয়ব ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, কথাসাহিত্যে ও শিল্পের অন্যান্য শাখাতেও স্থানিক সমাজ এবং ভাষা বিশেষমাত্রা অর্জন করেছে। আমাদের সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক পাঠকৃতিতে এই প্রেক্ষিতটি আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন সমাজবাদী কথাশিল্পীরা। একারণেই সাহিত্যের স্থানিক সমাজ কাঠামো ও ভাষা অনুষঙ্গ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১.০৩ কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ ও ভাষা ঃ

জীবন ও সমাজকেন্দ্রিক নানামুখী অনুষঙ্গ নিয়েই গল্পউপন্যাস রচিত হয়। মানব জীবনের পরিপার্শ্ব, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জনপদ, বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদী, অরণ্য, পর্বত, প্রান্তর কথাসাহিত্যের পটভূমি হয়ে উঠতে পারে। জীবনবৃত্তিক কথাসাহিত্যে আর্থসামাজিক প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়সহ মানবজীবনের বিশিষ্ট দিকগুলো লেখক উপস্থাপন করেন। সমালোচকের ভাষায়ঃ ''অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৃত্তিকা-সেখানকার অধিবাসীদের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন ভাষার উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, আশা-বিশ্বাস সংস্কার, বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম-সমাজে ঐ প্রভাব যতখানি আত্মিক হয়, সেই অঞ্চলে বসবাসকারী শিষ্টজনের মধ্যে ততখানি অন্তরঙ্গ হয় না। ঐ অঞ্চল যদি পর্বতসংকুল নদীপ্রধান, শুষ্ক-রুক্ষ-অনুর্বর হয়, তাহলে সেখানকার মানুষের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রম-দক্ষতা এবং দুঃসাহস অধিকমাত্রায় দেখা যায়। একই অঞ্চলের শিষ্টজনেরা সভ্যমানুষের সংস্পর্শে কিংবা নিজ নিজ পারিবারিক সুসংস্কৃত ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আনুগত্যে, পুরোপুরি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁদের ঐ সর্বাত্মক প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত রাখে। তাই নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠিচেতনামুখ্য মানব-সমাজেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়।''[৩৯] অবশ্য এর সাফল্য নির্ভর করে লেখকের প্রতিভার উপর। আঞ্চলিক বা স্থানিক পরিবেশ কথাসাহিত্যের ফ্রেম হিসেবে কাজ করলেও তার শিল্পসফলতা নির্ভর করে পরিবেশ প্রতিবেশের প্রভাবজাত মানুষের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠার ওপর। ফলে সাহিত্য স্থানিক হয়েও রসাবেদনে বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। কাজেই কথাসাহিত্যে স্থানিক বর্ণিমা (local colour) এক ধরনের অলংকরণ। Regional Novel-এর Local colour প্রসঙ্গে সমালোচক বলেনঃ "Generally 'Local Colour' is a mildly pejorative term describing works that however pleasant, have little value other than the portrayal of life in a given area. 'Regional' usually implies a wider interest and is occasionally used even for writer's such Hardy or Faulkner whose works tends to be centered in a particular geographical area but which also has a more general interest. But movement were influenced by and contributed to realism and its demand for literal colour."[৪০] কোন জনগোষ্ঠীর জীবনবিন্যাস, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অস্তিত্বসাধনার স্বরূপসমূহ যখন লেখকের সচেতন শিল্পাভিজ্ঞানে রূপায়িত হয়, তখনই সাহিত্যে আঞ্চলিক বর্ণনা ফুটে ওঠে। স্থানিক

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনার পরিচয় দিয়ে J. A. Cuddon লিখেছেনঃ "The use of detail peculiar to a particular region and environment to add interest and authenticity to a narrative. This will include some description of the local, dress, customs, music, etc. It is for the most part of the work than it is more properly called regionalism."[৪১] তবে গভীরতর তাৎপর্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র স্থানিক বর্ণিমা আঞ্চলিক উপন্যাসের একমাত্র শর্ত নয়। কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ বা আঞ্চলিকতার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেই দেশাঞ্চলের ভাষারীতি, সমাজরীতি, সংস্কার বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি অর্থাৎ লৌকিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকে একাত্মভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস হচ্ছে– "The regional novel emphasizes the setting speech and customs of a particular locality, not merely as a local color, but as improtant conditions affecting the temporament of the characters and their ways to thinking, feeling and interacting."[৪২] অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার জন্যে লেখকের নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ জীবনাভিজ্ঞতা থাকা দরকার। অপরদিকে, আঞ্চলিক জীবন চিত্রিত হলেও চিরন্তন মানবিক প্রত্যয় আঞ্চলিক উপন্যাসে উপেক্ষিত হতে পারে না। এ জন্যে স্থানিক সমাজ প্রতিবেশের উপাদান ধারণ করেও সার্বজনীন মানবিক আবেদন সৃষ্টির গৌরবে স্থানিক সাহিত্যও বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বজনীন রসাবেদন সৃষ্টিও আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্যতম গুণ। স্থানিক জনজীবনকেন্দ্রিক আঞ্চলিক সাহিত্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নরূপ সূত্রাকারে চিহ্নিত করা হয় ঃ

১. এই উপন্যাস বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভূখণ্ডকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করবে।
২. এই ভূখণ্ড ঐ অঞ্চলের বিশেষ একটি সম্প্রদায় বা জনজীবনে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে তার বৈশিষ্ট্য ও রঙে তাদের অনুরঞ্জিত করবে।
৩. এই ভূখণ্ড ঐ জনজীবনের সঙ্গে আত্মিক যোগে যুক্ত হয়েও একটি স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে দেখা দেবে।
৪. ঐ জনসমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষা-বর্জিত, সরল, নানারূপ অপ্রাকৃত সংস্কারে বিশ্বাসী ও নিম্নশ্রেণীর হবে।
৫. ঐ অঞ্চল উপন্যাস থেকে বর্জিত হলে এর আঞ্চলিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হবে।
৬. এখানকার জনসমাজের সকল ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা, আশা-বিশ্বাসের মধ্যেও অঞ্চল বিশেষের নিগূঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকবে।
৭. এরা বাংলা ভাষাভাষী হলেও ঐ ভূপ্রকৃতির জলবায়ুর প্রভাবে এদের বাকযন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করায় এদের ভাষায় এবং শব্দের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য থাকবে।
৮. আঞ্চলিকতার সমস্ত লক্ষণ বহন করেও এবং অঞ্চল বিশেষের অভিনব স্টাইল পরিবেশন করেও এই উপন্যাস একটি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করবে।[৪৩]

কোন লেখক যখন বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন, তখন তিনি ঐ অঞ্চলের মানুষের ব্যবহারিক ভাষাও প্রয়োগ করেন। যেহেতু একই ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে উপভাষার বৈচিত্র্য, সামাজিক শ্রেণীভেদ, ধর্মীয় পেশাগত এবং লিঙ্গভিত্তিক ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে, সে জন্যে লেখককে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের শ্রেণী অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হতে হয়। সুতরাং আঞ্চলিক সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও অন্যতম শর্তরূপে গুরুত্ব পায়। এই প্রসঙ্গে Lee. T. Lemon বলেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

"Regional and local colour literature both are concerned with an accurate decition of the manner's morals, dialects and seenery of a particular geographical area."[৪৪] ব্যাপক অর্থে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির সাহিত্যই আঞ্চলিক। প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ড ভাষা ও জীবন বিশ্বাসের ছবি ফুটে ওঠে নিজ নিজ সাহিত্যে। ''এক দেশ বা অঞ্চলের ভাষা যখন অপর দেশ বা অঞ্চলের পক্ষে বোধগম্য নয়, তখন এক দেশের সাহিত্যে অপর দেশের কাছে আঞ্চলিক সাহিত্য নয় কি? এইভাবে দেখলে সব সাহিত্যই আঞ্চলিক সাহিত্য; এমন কি একই ভাষার উপভাষায় লিখিত সাহিত্য সে উপভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য অপর অঞ্চলে আঞ্চলিক সাহিত্য বলে ধার্য হতে পারে।[৪৫] অর্থাৎ নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপ এবং ঐ ল্যান্ডস্কেপে ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের স্থানিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতি নিয়েই সৃষ্টি হয় আঞ্চলিক সাহিত্য। লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে স্থানিক ও সামাজিক শ্রেণীস্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকও তার অঙ্গাঅঙ্গি সম্পৃক্ততার দিকে দৃষ্টি দেন। দ্বিতীয়ত, স্থানিক ভাষা ব্যবহারের প্রতিও লেখক যথাযথভাবে অনুগত থাকার চেষ্টা করেন। কারণ ভাষা বা সংলাপই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাণসত্তা। লেখক ভাষা-সংলাপে স্থানীয় প্রবাদ প্রবচন, লোকবিশ্বাস এমন কি উচ্চারণভঙ্গি সাধ্যমত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবার আঞ্চলিক সাহিত্যের ধারা, বিকাশ ও বাংলা কথাসাহিত্যে-এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে J. A. Coddon জানিয়েছেনঃ "Among the erliest of reagional novelists was Maria Edgeworth (1767-1849), an Anglo Irish woman who was one of the first to perceive to possibilities of relating characters to a particular environment."[৪৬] বস্তুত, ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ঔপন্যাসিকগণের প্রধানতম উপাদান ছিল মানুষ ও সমাজ। তবুও মানুষ ও সমাজের এই শিল্প প্রতীতিকে এজওয়ার্থই যেন প্রথম নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপে তাঁর সমাজ ইতিহসের ধারায় উপন্যাসে সফলভাবে রূপায়িত করেছিলেন। তিনি এ্যাংলো-আইরিশ বলেই হয়তো ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেও আইরিশ জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যই রচনা করে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর 'Castle Rackrent' (1800), 'Belinda' (1801), এবং 'The Absentee' (1812) প্রভৃতি উপন্যাসে আঠারো শতকের আইরিশ ইতিহাস-সমাজ জীবনের বেশ প্রভাব পড়েছে। তিনি সেই সমাজের রীতিনীতি, সমাজাচারণ এবং চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৪৭] বলা হয়ে থাকে, 'তিনিই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সার্থকতার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, ওয়েসেক্স প্রভৃতি অঞ্চলকে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসহ তাঁর উপন্যাসসমূহে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করেছেন।'[৪৮] এছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্কটিশ ঔপন্যাসিক জন গ্লাট (১৭৭৯-১৮৩৯), স্যার ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় প্রায় পাইওনিয়ারের ভূমিকা রেখে যান। স্কটল্যান্ডের ইতিহাস ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্যিক প্রেরণার প্রধান উৎস। তিনি তাঁর যুগবিশেষের রীতিনীতিতে ছিলেন সচেতন। ফলে তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও ভালভাবে অনুভাবন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অবস্থাকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করে চরিত্রাঙ্কনে সচেষ্ট হয়েছেন।[৪৯] তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো যুগ সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে এমনভাবেই ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত যে তাদের স্কটের সমাজচিন্তণ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে ঔপন্যাসিকের আঞ্চলিক প্রীতির অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো অভিজাত, সাধারণ নিম্নশ্রেণী এবং অদ্ভুত রহস্যময়-তিনটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে স্কট সাধারণ নরনারীর চরিত্রচিত্রণে বেশি সফল হয়েছেন। তাদের পরিবেশ ও সংলাপ একাত্ম হয়ে ওঠে। যদিও আঞ্চলিক উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্যের দাবি তাঁর উপন্যাস পূরণ করে না, তবু এই ধারার পূর্বতম প্রয়াস বলে ওল্টার স্কটের উপন্যাসগুলো আমাদের কাছে স্মরণীয়। অনুরূপ লক্ষণীয়, পার্ল বাকের 'Good Earth' উপন্যাসেও বিধৃত হয়েছে চীনা কৃষক জীবনের অন্তরঙ্গ পটভূমি। আমেরিকান ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনারের (১৮৯৭-১৯৬২) Sancturary' -তে দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর মানুষের আঞ্চলিক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। ফকনার আঞ্চলিক নিম্নশ্রেণীর মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের নিখুঁত ছবি আঁকেন। অক্সফোর্ডের চাষী, নিগ্রো শ্রমিক, জেলে আর বেকার মানুষদের জীবন কাহিনীই ফকনারের অন্বিষ্ট। ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০)-এর 'Sons and lover's উপন্যাসে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার নটিংহামসায়ার ও ডার্বিসায়ার অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনচিত্র। এছাড়াও তিনি 'Lady chatterley's Lover' উপন্যাসে আঞ্চলিক ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করেছেন।

বস্তুত আঞ্চলিক উপন্যাসের সফল রূপকার হচ্ছেন টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮)। বলা হয়, ''ওয়েসেক্স এবং হার্ডি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ওয়েসেক্সকে বাদ দিলে যেমন হার্ডি নেই, তেমনি ওয়েসেক্স বাদ দিলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে। হার্ডি আঞ্চলিকতার মধ্যে আবদ্ধ। তবু সেই সীমার মধ্যে মানবিকতার মৃত্তিকায় গড়ে ওঠা অপরিচিত মানুষগুলি ভূতলের ছোট ছোট স্বর্গ খন্ডগুলির মত হয়ে বিরাজ করছে।''[৫০] তাঁর 'The Return of the native' (১৮৭৮) এবং 'The woodlanders' (১৮৮৭) সফল আঞ্চলিক উপন্যাস। লণ্ডনের ওয়েসেক্স অঞ্চলের বর্ণিল জীবনচিত্রই তাঁর উপন্যাসের মুখ্য উপাদান। ওয়েসেক্স এর এগডনহীথের প্রান্তর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল মানবচরিত্র গেব্রিয়েল ক্লাইম, ইয়োব্রাইট, মারি সাউথ প্রভৃতি মানবমানবী নতুন তাৎপর্যে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর আবাল্য পরিচিত ইল্ল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় ডরচেস্টারের প্রকৃতি, মানুষ ও লৌকিকভাষা, লোকশিল্প, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সঙ্গে ছিল নিবিড় পরিচয়। তাই তিনি ঐ জনপদের আত্মার পরিচয় জানতেন। সমালোচকের ভাষায়ঃ "As a boy Thomas Hardy was sufficiently at home with local hearts and heads to absorb the unspoken assumptions of the traditional Dorset Culture."[৫১] শুধু তাই নয়, পল্লীর চিরপরিচিত মানুষগুলোকে তিনি অপরিসীম মমত্বে এঁকেছেন। লক্ষ করা যায়, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৭৫-১৬৫০) তাঁর নাটকে অশিক্ষিত গ্রামীণ চরিত্রগুলোকে স্থূল হাস্যকৌতূকের চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু টমাস হার্ডি এই গ্রামীণ সরল নিরাভরণ মানুষদের নিয়ে স্থূল হাসি তামাসা করেন নি। বরং হার্ডির মানুষ প্রাকৃত মানব। ওয়েসেক্স-এর উপত্যকা, পাহাড়-প্রান্তর, ডরচেস্টারের অরণ্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগুলো সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায়ঃ "Hardy live in isolated life in his native district, Dorsetshire and the surrounding region, the 'wessex' of his novels and his work is, therefore, devoted to provincial and still more to rural life. His concern is for the bonds which unite men with the country side in which they live and their present lives with the distant past. The setting poetry of its own; the land itself, with its woods and field, heath and downs, is a character in Hardy's novels."[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এই ধারায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহারে উপন্যাস রচিত হয়েছে। স্ক্যান্ডেনেভিয় ঔপন্যাসিক ন্যুট হামসুন নরওয়ের কৃষিভিত্তিক আরণ্যক জীবন, পাহাড়, সমুদ্রবেষ্টিত ভৌগোলিক জনপদের পটভূমিতে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Growth of the soil, আর্নল্ড বেনেটের (১৮৬৭-১৯৩১) 'The five towns' নগর বা শিল্পাঞ্চলকেন্দ্রিক সফল আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। তবে একথা স্বীকৃত যে, উল্লিখিত ঔপন্যাসিকগণ প্রত্যেকেই স্থানিক পটভূমি ব্যবহার করলেও তাঁদের সাহিত্য দেশকালের সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছে। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেনঃ ''ডিকেন্স আর লন্ডন এক হয়ে গেছেন; আলফাঁস দোদের কথা মনে হলেই রৌদ্রোজ্জ্বল বর্ণবিচিত্র 'প্রভাঁস' আমাদের চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে; Sancturary-র স্রষ্টা উইলিয়াম ফকনার এই অর্থেই আঞ্চলিক; কিউবার জালিক জীবন ও সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে হেমিংওয়ের একাত্মতা তাঁর 'Harry Morgan' এবং 'The old man and the sea'-তে প্রকটিত; এরস্কিন কলডওয়েলের 'God's little Acre', Tragic Ground বা 'Tobacco Road' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেইনবেকের 'The long valley' তাঁর প্রধান সাহিত্যভূমি। জেমস জয়েসের Ulysses একান্তভাবেই Dubliner- আর টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স লভেলস' তো স্বনামধন্য।''[৫৩] বস্তুত, এইসব ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে নির্দিষ্ট ভূখন্ড জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়সহ ভৌগোলিক সীমার সুসংহত রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে সার্বজনীন আবেদন। অনুরূপ, রাশিয়ান কথাসাহিত্যের স্থানিক পটভূমি বা ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার লক্ষযোগ্য। বিশেষ করে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল (১৮০৯-১৮৫২)-এর 'তারাস বুলবা' উপন্যাসটির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিকোলাই গোগল এই উপন্যাসে সপ্তদশ শতকের ইউক্রেনের ভূমিদাসদের কৃষক বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ রাশিয়ার নীপার নদীর তীরাঞ্চল থেকে এই আন্দোলন সমগ্র ইউক্রেনে ছড়িয়ে পড়েছিল; গোগল তারই এপিক উপাখ্যান রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থে কেবলমাত্র ভূমিদাসদের আন্দোলনের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করেননি, তিনি সেই সঙ্গে কসাকদের লোকগীতি, রূপকথা ও উপকাহিনীরও বর্ণনা করেছেন। কাজাখস্তানের ঔপন্যাসিক রসুল গামজাতভ ককেশীয় পর্বতমালার একপ্রান্তে কাস্পিয়ান সাগর তীরের পর্বতাঞ্চলের দানেস্তান এবং ছোটছোট উপজাতিদের নিয়ে লিখেছেন 'দানেস্তান' বা 'আমার জন্মভূমি' উপন্যাস। রাশিয়ার ভূমিদাস কৃষকদের জীবনচিত্রপটে লেভ টলস্টয় রচনা করেছেন 'কসাক' উপন্যাস। 'কসাক' উপন্যাসেও ফুটে ওঠে ভৌগোলিক ব্যাপকতা। বস্তুত রাশিয়ান কথাসাহিত্যে গোগল থেকে গোর্কি পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় অন্বেষণ করলে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্রপটের পরিচয় পাওয়া যাবে। সামগ্রিক মূল্যয়ন করে সমালোচক বলেছেনঃ 'ইংরেজ ঔপন্যাসিকরা যদি চান মানুষের বহিরঙ্গ চেহারাটিকে ধরে রাখবেন, ফরাসী ঔপন্যাসিকেরা তাহলে চাইবেন- ধরবেন তাঁরা চরিত্রের প্রতিনিধিত্বমূল্যকে, আর রুশ ঔপন্যাসিকদের চেষ্টা হবে চরিত্রটির আত্মাকে আনবেন সামনে। আত্মার ঐ উন্মোচনেই শুধু নয়, সমাজচিত্রের সামগ্রিকতাতেও রুশ উপন্যাস অনন্য। রুশ উপন্যাসের যে ঔপন্যাসিক ব্যাপকতা সে যেন রুশ দেশের ভৌগোলিক ব্যাপকতারই প্রতিচ্ছায়া।'[৫৪] এমন কি, সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজও তাঁর উপন্যাসে জন্মভূমি কলম্বিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ অঞ্চলকে অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'Houndred year's of solitude'. এবং 'Love in the time of Cholera' প্রভৃতি উপন্যাসে কলোম্বিয়ার আরাকাতাকার মাকোণ্ডা গ্রামের জীবনপটে রচনা করেছেন অতিপ্রাকৃত জীবনের গল্প।

উল্লিখিত আলোচনার সূত্রে এবার বাংলা কথাসাহিত্যের স্থানিক পটভূমির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীক সামাজিক অভিঘাতের প্রাতিস্বিক চেতনা এবং আধুনিকমনস্ক শিল্পাভিজ্ঞান থেকেই বাঙালির গল্পউপন্যাস চর্চার সূচনা। যদিও রোমান্স ও সৌন্দর্যবোধ পরিপুষ্ট আদিপর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভাস আমাদের মুখ্য অর্জন। কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য আধুনিক রাজনীতিসচেতন এবং বস্তুবাদী কথাসাহিত্যিকদের হাতে সমকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চারিত্র্য বিশেষ ভৌগোলিক পটভূমিতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টরূপ লাভ করে। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময়জ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারৎসার।'[৫৫] নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আর্থসামাজিক কাঠামোর সামগ্রিক প্রতিনিধি হিসেবে উপন্যাসের মানব মানবীকে চিত্রিত করতে গিয়ে বাংলা উপন্যাসেও স্থানিক ছবি ফুটে ওঠে। এছাড়া গ্রামীণ বাস্তবতাকেও আমাদের কথাশিল্পীরা অন্বিষ্ট করে নেন। গ্রামবাহী জীবনকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্যের এই ধারায় যদিও সফল আঞ্চলি উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশী নয়, তবুও কিছুটা শিথিলভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, যথার্থ আঞ্চলিক বর্ণিমাদীপ্ত উপন্যাস এবং আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস অপ্রতুলও নয়।

দেশবিভাগপূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১–১৯৭৬)কে আঞ্চলিক উপন্যাসের উদ্যোক্তা পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, ''স্থান–কাল–ভাষা পরিবেশের সৌন্দর্য, যাহাকে ইংরেজিতে বলে 'লোকাল কালার' তাহা শৈলজানন্দের গল্পে দেখা দিল পরিপূর্ণভাবে।''[৫৬] তাঁর 'ষোল আনা' (১৩৩২), 'কয়লাকুঠি' ১৯২৯, 'সাঁওতালী' (১৯৩১), 'দিনমজুর' (১৯৩২) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে এবং 'কয়লাকুঠির দেশ', প্রভৃতি উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনচিত্র এসেছে। তিনি কয়লাখনির শ্রমিক সাঁওতালদের জীবনবৈচিত্র্য ও ভাষা সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। 'ষোল আনা' উপন্যাসে বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর কাহিনীর আবর্তন। তবুও তাঁকে আঞ্চলিকতার সফল রূপকার বলা যায় না। সমালোচক বলেন, 'বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ এই ধারাটির সূচনা করলেও তাঁর 'কয়লাকুঠির দেশ' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতি এখানে প্রেক্ষাপট থেকে চরিত্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।''[৫৭] তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, 'শৈলজানন্দের আঞ্চলিকতা চিহ্নিত গল্পে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যসন্ধানী মনোভাব আছে, আছে অপরিচিতকে পরিচিত করানোর আগ্রহ।''[৫৮] তিনি রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের অমার্জিত মানবমানবীর অন্ধকার যৌনজীবনের ছবি এঁকেছেন। খনির অন্ধকার গহ্বরে সাঁওতাল যুবক যুবতীর অমার্জিত জৈবিকতার মধ্যে লেখক আদিম মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে সরোজ রায় চৌধুরীকেও (১৯০৩–১৯৭২) এই ধারার লেখক বলে গণ্য করা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য 'ময়ূরাক্ষী, 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা', প্রায় ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬)–এর 'পদ্মানদীর মাঝি, (১৯৩৬), সমরেশ বসুর (১৯২৪–১৯৮৮), 'গঙ্গা' (১৯৫৭),

Dhaka University Institutional Repository

সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০), 'শতকীয়া' (১৯৫৮), প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী' (১৯৫৭) ও কেয়াপাতার নৌকা' (দুইখন্ড) প্রভৃতি ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক চিত্রপট প্রধান উপন্যাসের দাবি করতে পারে। এই উপন্যাসদ্বয়ে যথাক্রমে নাগাভূমি ও পূর্ববঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের মানবজীবনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তবে সত্যিকার অর্থে বাংলা কথাসাহিত্যে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের রূপকার হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৩৫৪) একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। রাঢ়বঙ্গের বাঁশবাদী গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী, লৌকিকসংস্কার, সমাজনীতি ও জৈবিকপ্রবৃত্তিসহ হাঁসুলিবাঁকের ভৌগোলিক পরিবেশ স্থানিক পটভূমি এবং গোষ্ঠিজীবনের সংস্কার ও ভাষার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। অনুরূপ তাঁর 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসেও লক্ষ করা যায় রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন পেশার মানুষের কাহিনী। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অবক্ষয় এবং নাগরিক শিল্পোন্নয়নের অভিঘাত সব মিলিয়ে সমাজনীতির ভাষ্য হয়ে উঠেছে। রাঢ় বাংলার 'ঘেটুগান', 'ইতুপূজা' লৌকিক দেব দেবীর মহিমা কীর্তনের গান ও লোকবিশ্বাসের সমন্বয়ে ঔপন্যাসিক স্থানিক পটভূমি এবং উপভাষা ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তাঁর 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৬২), 'চাপাডাঙ্গার বৌ' (১৩৬১), 'অরণ্যবহ্নি' (১৩৭২) প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলার বিশেষ বিশেষ পরিবেশ পটভূমি ও উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতাল, বেদে, কাহার, নিম্নবিত্ত কৃষকদের গোষ্ঠিজীবন এবং লৌকিক ভাষাকেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানিক পটভূমিতে চিত্রিত করলেও সার্বজনীন মানবিক আবেদন সৃষ্টিতে শিল্পসফল রূপ লাভ করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ ও ভাষার সফল রূপকার হচ্ছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস রূপে সমধিক পরিচিত। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর এই উপন্যাস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে বিহারের সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে দেখান হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মানুষের রাজনীতিকে সম্পৃক্তি এবং কারাবরণের এক নির্মম অভিজ্ঞতার কথা এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন লেখক। কাজেই 'জাগরী' রাজনৈতিক উপন্যাস তো বটেই, তবু এখানে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যগুলোও উপেক্ষিত হয়নি। বরং একে বলা যেতে পারে আঞ্চলিকতার মোড়কে রাজনৈতিক উপন্যাস। সমালোচকের ভাষায়ঃ ''৪২-এর আন্দোলন যদিও সর্বভারতীয় ব্যাপার, কোন অঞ্চল বিশেষের নয় কিন্তু 'জাগরী' উপন্যাসে লেখক সেই সময়কার সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি জেলার মধ্যে সংস্থাপিত করেছিলেন। লেখক নিজেই বলেছেন, স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।' আলোচ্য গ্রন্থে স্থানীয় বর্ণবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিচয় দানই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হত, তাহলে তিনি স্থানীয় বর্ণবৈচিত্র্য ফুটিয়ে উপন্যাসটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করতেন না। এই কারণে 'জাগরী' উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের সকল গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষণীয় নয়।''[৫৯] শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিচয়ই নয়, এই উপন্যাসে স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস, গ্রাম্য ঠাকুর দেবতা, লৌকিক দেবদেবী, লোকগীতি ইত্যাদির বর্ণনা 'জাগরী'কে আঞ্চলিক উপন্যাসের গুণে গুণান্বিত করেছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

Dhaka University Institutional Repository

সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনীতিমনস্ক বস্তুবাদী লেখক বলেই আমরা তাঁর উপন্যাসে একই সঙ্গে রাজনৈতিক দায়বোধ এবং আঞ্চলিক পরিমন্ডলের দেখা পাই। অনুরূপ 'ঢোড়াই চরিত মানস' (১৯৫১) তাঁর একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। এর কাহিনীও বিহারের অন্ত্যজ ধাঙড় তাৎমাদের নিয়ে রচিত। অঞ্চলের লোকবিশ্বাস এবং তাৎমাটুলির অশিক্ষা সরল গ্রামজীবনের ছবি এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাসগুলো হচ্ছে– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮–১৯৭০) 'উপনিবেশ' (১৯৪৪), 'লালমাটি' (১৩৫৮)। এই উপন্যাস দুটিতে ডুয়ার্স অঞ্চলের চিত্রপট ও ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বাজিগর সম্প্রদায়ের আত্মসংগ্রামের ইতিহাস। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) উপন্যাসে পাওয়া যায় তিস্তানদী তীরবর্তী কৃষিজীবী জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭) অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮–২০০১) 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১) প্রভৃতি উপন্যাসে আরণ্যক জীবনের রূঢ়বাস্তবতার চিত্র ফুটে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কথাসাহিত্যে জনপদ বা স্থানিক ভৌগোলিক পটভূমি একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। ল্যাটিন আমেরিকার ইংরেজি ও রুশ উপন্যাসের মতো বাংলা উপন্যাসেও স্থানিক জনপদের চিত্রপ্রধান বর্ণনা অত্যন্ত গূঢ় তাৎপর্যে আমাদের ঔপন্যাসিকগণ চিহ্নিত করেছেন। সফলভাবে স্থানিক সমাজ ও মানুষের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে কথাশিল্পীরা লৌকিক সংস্কার সংস্কৃতি ও লোকভাষারও ব্যবহার করেছেন। কারণ, উপভাষা হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাণ। লেখক আঞ্চলিক জনপদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলে তবেই আঞ্চলিক উপন্যাস লিখতে সমর্থ হন। তাছাড়া 'উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞানের অপর নিদর্শন।''[৬০] পট ও পরিবেশের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই বিষয়ে স্থানিক সমাজ বা পটভূমিকেন্দ্রিক বর্ণনায় আঞ্চলিক ভাষার সংলাপের উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর 'লেডি চ্যার্টালিজ লাভার' উপন্যাসে ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক চিত্রপট ও ভাষার ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে চরিত্রের সংলাপে তিনি উপভাষার প্রয়োগ করেছেন। যেমনঃ "Then he said in dialect : 'Ay may be I do, may be I do! well then I'll say nowt an ha done wi't. But tha mun dress thysen, an go back to thy stately homes of England, how beautiful they stand."[৬১] আবার টমাস হার্ডির উপন্যাসে লক্ষণীয় প্রকৃতি ও মানুষ একই সূত্রে বাঁধা। ওয়েসেক্স–এর প্রকৃতি ও মানুষের মানবিক আচরণ এবং ভাষাকেও হার্ডি রূপ দিয়েছেন অভিন্ন অনুষঙ্গে। যেমন– "On older trees still than these huge lobes of fungi grew like lungs. Here as every where, the unfufilled intention which meaks life what it is, was as obvious as it could be among the depraved growds of a city slum. The leaf was deformed, the curve was crippled. The taper was interrupted: the lichen at the vigour of the stalk and Ivy slowly strangled to death the promising sapling."[৬২] অনুরূপ স্থানিক পরিবেশ ও পটভূমির পরিচয় পাওয়া যায় তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। কাহার সম্প্রদায়ের আটপৌরে খিস্তিখেউড়ের ভাষার নিরাভরণ শব্দরূপ প্রয়োগ করেছেন এই উপন্যাসে।

Dhaka University Institutional Repository

শালো, কানার মত চলছ বড়? কানার মত চলছে সে? পায়ে পায়ে টক্কর দিলি যে বড়? আমাদের আর চোখে দেখতে পাও না, লয়? শালা! সোনার পয়সার মত চকচকে 'লালবন্ন'। শালো, যাওনা কেনে, সেইখানে যাও না।[৬৩]

মূলত আধুনিক কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার একটি বলিষ্ঠ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক লেখকই নির্দিষ্ট জনজীবনের বিশ্বস্ত রূপকার হয়ে ওঠার প্রয়াসে সবচেয়ে বড় উপাদানরূপে সেই অঞ্চলের উপভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। নিম্নে প্রধান প্রধান লেখকদের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামি ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি... পুরুষের পরাণ পোড়ে কয়দিন। গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইল আমারে। ছাড়, মানুষ আহে। [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি', 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস', অবসর ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৬]

২. শালা কুত্তার বাচ্চা, আমের মাগের গতরে তুমি ঢেঁকির পাড় দেবে? ... আজ দুটোকেই খুন করব, অক্ত একখানে আর মাস একখানে করব। মেয়েমানুষের অত বড় সাহস, অক্তাঅক্তি করে? ভাতার ইস্তক ভয় পায়, অ্যাঁ? [সমরেশ বসু, 'আম মাহাতো', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ২০]

৩. মেজবিবি বলল, 'নুরীক কনু পা দাবাবার।'
'এদিকেও আনাজ কোটা খায়।'
'মানষির তো ব্যথাবিষ হবার পায়।'
'সে বিষ তোমার।'
'অত্ত দেমাক না-দেখাইয়ো। নছিব। ত্যাও যদি খ্যামতা থাকিল হয়।'
'খ্যামতা'?
'না তো কি? কমরুনক লাগে কেনে? মুই আর বড়বিবি নাই তো পতিত থাকলং। তুই পতিত কেনে পতিত, সোহাগী'? [অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'মহিষকুড়ার উপকথা', অন্বেষা কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৭২]

৪. 'আরে তোমরালা তো মোকই একখান আধিয়ার বানাবার ধঁইচেন। মুই আর কাক আধিয়ারি দিম? খাড়াও কেনে। ঘরেতে চলো। হাতমুখ ধোও। তার বাদে এইঠে আসি মিটিং দাও। আসিন্দিরক ডাকি, ডটভটিখান নি আসুক।' [দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১০]

৫. 'দা দিয়ে কাঠ কাটি। খস্তা দিয়ে তুজ্যা আলু খুঁড়ে তুলি। এছাড়াও কাঁটাআলু, চুনআলু, পানআলু, চুরকাআলু, যখন যা পাই। বাঁউলা আনব, ঘরে ঘরে বেচব। কেঁদ, ভুররু, ভুঁইকুমড়া, বেঁহচি, কুল, সেঁয়াকুল, বদাকুল, পিয়াল, আমলকী, যখন যা ফল পাব তা আনব।' [মহাশ্বেতা দেবী, ''কুড়োনির বেটা'' (গল্প), 'পঞ্চাশটি গল্প' প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪১৪]

লক্ষণীয়, লেখকগণের এক একটি রচনায় এক এক অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ভাষিক প্রভাব ঘটেছে। গ্রামবাহী জীবনচেতনা, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যসহ বৃহৎবঙ্গদেশেরই স্থানিক কাঠামোটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবয়ব মেলে ধরেছে বাংলা কথাসাহিত্যে। আর তা সম্ভব হয়েছে কথাশিল্পীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই। আধুনিক কথাশিল্পীরা বিশ্বাস করেন, সাহিত্য মানুষের জন্য। সংবেদনশীল জীবনানুভূতি দিয়ে তাঁরা সমাজের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে, আঁতে ও অজ্ঞানে বিচরণ করে, দেশ সমাজ ও সংসারে নিজের আত্মীয় মনে করে– সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই আধুনিক সাহিত্যে দেশ সমাজ ও মানুষ কোন গৌণ প্রসঙ্গ নয়। জীবন ও শিল্পের মৌলসূত্রে একাকার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. Rene Wellek and Austen Warren, 'Theory of Literature', Penguin Books, Reprinted by Penguin Books, 1985, P. 96.

২. David Daiches, 'Literature And Society', Victor Gollanoz Ltd. London, 1938, P. 12.

৩. আর্নস্ট ফিশার, 'দি নেসেসিটি অব আর্ট', (শফিকুল ইসলাম অনূদিত) সংঘ প্রকাশ ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮।

৪. বদরুদ্দীন উমর, ''শিল্পী সাহিত্যিকের সমাজচেতনা ও সৃজনশীল শিল্পসাহিত্য'' (প্রবন্ধ), 'মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৭২।

৫. 'The Encyclopedia Americana', International edn. Vol. II (n.d), P. 159.

৬. কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২।

৭. র‍্যাল্‌ফ্ ফকস্, 'নভেল এ্যাণ্ড দি পিপল' (সর্বজিৎ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষ অনূদিত), পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৯।

৮. দেবেশ রায়, 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৯।

৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৪, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

১০. শুভঙ্কর ঘোষ, 'সাহিত্যের রূপভেদ', সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯

১১. Ralph Fox, The Novel And the People', Progress Publishers Moscow, 1954, P. 32.

১২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১২।

১৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ', পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫১।

১৪. Rene Wellek and Austen Warren, 'Theory of literature', Penguin Books, Reprinted by Penguin Books, 1985 P. 95.

১৫. Ibid, P. 103.

১৬. M. H. Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', Harcourt Asia Ptv Ltd. India, 7th ed. 2002, P. 193.

১৭. J. A. Guddon. Dictionary of literary Terms And Literary Theory'. Penguin Books. Third Edition, 1992, P. 969.

১৮. এ. কে. নাজমুল করিম, 'সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান', 'এ. কে. নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদকঃ মুহম্মদ আফসার উদ্দীন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ. ২৬।

১৯. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯।

২০. সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও অনুবাদ) 'মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা', একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭।

২১. Lewis A. Coser (ed.) 'Sociology through Literature'. Prentic Hall, London, 1963, P. 4.

২২. টেরি ঈগলটন, 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা', (ভাষান্তরঃ) নিরঞ্জন গোস্বামী, দীপায়ন, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ৬২।

২৩. আমিন ইসলাম, ''সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রাথমিক ভাবনা'' (প্রবন্ধ) 'সমাজ সংস্কৃতি এবং সাহিত্য' সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আমিন ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।
২৫. Terry Eagleton, 'Cretisism and Ideology; London; Verso, 1982, P. 84.
২৬. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতাঃ জগদীশ গুপ্ত' বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৪।
২৭. সাঈদ-উর-রহমান, 'মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা', একাডেমিক পাবলিশার্স ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮।
২৮. সুহাস চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ৪৬।
২৯. সুধীর চক্রবর্তী, (সম্পাদক), 'ধ্রুবপদ', বার্ষিক সংকলন-৪, ২০০০ কলকাতা, পৃ. ২১১-২১৩ দ্রষ্টব্য।
৩০. আফজালুল বাসার (অনূদিত) 'বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৭২।
৩১. তদেব, পৃ. ১৭১।
৩২. তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
৩৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
৩৪. আফজালুল বাসার (অনূদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।
৩৫. M. M. Bakhtin. The Dialogic Imagination : Four Essays' (1981), University of Texas Press; উদ্ধৃতঃ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব' র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯।
৩৬. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।
৩৭. M. M. Bakhtin, 'Discourse in the Novel', The Dialogic Imagination: Four Essays'. ed. Michael Holquist, (Univesity of Texas Press, 1981). উদ্ধৃতঃ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৩৮. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।
৩৯. অলোক রায় (সম্পাদিত), 'সাহিত্যকোষঃ কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩ পৃ. ২-৩।
৪০. L. T. Lemon, 'A Glossary for the Study of English', Reprinted, Delhi, 1981, P. 11.
৪১. J. A. Cuddon, 'Dictionary of the literary Terms and Literary Theory.' Penguin Books, Third Edition, Lodnon 1991, P. 509.
৪২. M. H. Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', A Prism widian Edition, Prism Books Pvt Ltd. Bangalore, India, 1933 P. 134.
৪৩. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'আঞ্চলিক উপন্যাস', অলোক রায় (সম্পাদিত), 'সাহিত্যকোষ': কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩ পৃ. ৩-৪।
৪৪. Lee. T. Lemon, 'A Glossary for the study of English. P. 32.
৪৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬৮, পৃ. ১১৩।
৪৬. J. A. Coddon, 'Dictionary of literary Terms And literary Theory.' Penguin Books, London, Third Edition, 1992, P. 782.
৪৭. J. A. Coddon, Ibid, P. 782.
৪৮. গৌরমোহন রায়, 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা', সাহিত্যশ্রী' কলকাতা ১৯৯৪, পৃ. ১৬৯।
৪৯. বিমলকৃষ্ণ সরকার, 'ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন', প্রকাশভবন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৬, পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. শীতল ঘোষ, 'ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস', বর্ণালী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩০।

৫১. Irving Howe, 'Masters of world literature- Thomas Hardy', Macmillan Press Ltd. London, 1985 P. 2.

৫২. Emile Legouis, 'A short History of English literature', Oxford University Press, London 1971, P. 366.

৫৩. নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্প বিচিত্রা', প্রকাশভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৮, পৃ. ৬৯।

৫৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "তল্‌স্তোয় ও তাঁর কৃষক" (প্রবন্ধ), সম্পাদনাঃ হায়াৎ মামুদ, 'লেভ তল্‌স্তোয়' বাংলাদেশ অস্ট্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়ন, মুক্তধারা ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ১০১।

৫৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৩৫।

৫৬. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থখন্ড, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৩৪২।

৫৭. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'আঞ্চলিক উপন্যাস', 'অলোক রায় (সম্পাদিত), 'সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৫।

৫৮. রবিন পাল, 'কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ', শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৭৮।

৫৯. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, 'আঞ্চলিকতা: বাংলা উপন্যাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯১।

৬০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

৬১. D. H. Lawrence, 'Lady chatterleys lover', Penguin Books, London 1961, P. 238.

৬২. Thomas Hardy, 'The Return of the Native' Penguin Books, London 1978, P. 231.

৬৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যঃ স্থানিক সমাজ ও ভাষা

২.০১ ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কথাসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব স্থানিক সমাজ ও ভাষার আন্তঃসম্পর্ক এবং প্রত্যয়গত কাঠামোর প্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের স্থানিক সমাজ, ভাষার স্বরূপ ও প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট সঙ্গ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। অনুসন্ধান করা হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানিক পটভূমিকেন্দ্রিক সমাজ ও ভাষা অনুষঙ্গী কথাসাহিত্যের স্বরূপ। দ্বিতীয়ত দৃষ্টি দেওয়া হবে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক জনপদ ও জীবনযাত্রা প্রভাবিত কথাসাহিত্যের স্থানিক চিত্রপট এবং আঞ্চলিক ভাষাকাঠামোর দিকেও। ফলে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত বাংলাদেশের লৌকিক জীবনার্ন্তগত সমাজসত্তা ও ভাষা পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে কথাসাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক পাঠ-পর্যবেক্ষণের পূর্বে আমরা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের দেশ-কাল ও সমাজ পটভূমির দিকে দৃষ্টি দেবো। কারণ, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির স্তর এবং পর্যায়পরম্পরা বিভাজনে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের দেশকালগত সমাজ প্রেক্ষাপটও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেশকালগত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক পাঠের গুরুত্ব নিহিত।

২.০২ ঃ বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ঃ দেশ-কাল পটভূমি

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ পূর্ববাংলার মানুষের জীবন ও আর্থসামাজিক স্তরবিন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। যদিও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল পূর্ববাংলার বাঙালির জীবনের নির্মম বাস্তবতা। ধর্মাশ্রিত চেতনার সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতারোহন এবং শোষণপ্রক্রিয়ার এক অব্যাহত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালির সশস্ত্র যুদ্ধ ১৯৭১ সালে সফল হয়। পূর্ব বাংলার বাঙালি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৌরবময় নাগরিকত্ব অর্জন করে। তবুও স্বাধীনতাত্তোর গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে গত তিন দশক ধরেই জাতিকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। সুতরাং ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ববাংলার মানুষের স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সাহিত্যকেই বাংলাদেশের সাহিত্য অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। যদিও সামগ্রিক বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য শতবর্ষের বুনিয়াদি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্যেও স্মরণীয় যে, বর্তমানের যোগসূত্র অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

কথাসাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ঊনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির নবজাগরণ এবং মধ্যবিত্তের বিকাশের কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। অনুরূপ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সঙ্গেও সম্পৃক্ত আছে বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের পটভূমি। কারণ, কথাসাহিত্য আধুনিক যুগে আধুনিক মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যম। তাই আধুনিকতার পরিশ্রুত চেতনা থেকেই দেশ-কাল জাতি ও সমাজ আপন অবয়ব মেলে ধরে শিল্পসাহিত্যের ভেতর। সমাজসভ্যতার প্রবহমান দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিটোল বাস্তবতায় গ্রথিত হয়ে ওঠে গল্পউপন্যাসে। লক্ষণীয়, অখন্ড বাংলার সামগ্রিক কথাসাহিত্যে বাঙালির সামাজিক অভিঘাতের নানা চিত্রই উঠে আসে। বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রকাঠামোর জটিলতম বিকাশে বাংলাদেশের মানুষকে তীব্র দ্বন্দ্বসংকুল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়। অপরদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ভৌগোলিক স্থানিক কালিক পার্থক্যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনেও অর্জিত হয় ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ফলে, পদ্মা মেঘনা যমুনা ইত্যাদি নদনদী অধ্যুষিত জনপদ এবং অরণ্যপার্বত্য ভূমির প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণেই সূচিত হয় স্বতন্ত্র চেতনার শিল্পসাহিত্য। বলা যায়, জীবনে ও শিল্পে আধুনিকতার প্রাতিস্বিক চেতনা থেকেই আমাদের কথাসাহিত্যিকগণ পারিপার্শ্বিক সামাজিক অভিঘাত, পরিবেশ ও সমাজ পরিস্থিতির ওপর তীর্যক আলোকসম্পাত করেন। বলাই বাহুল্য, এই অর্থে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। এই পটভূমি যতটুকু আঞ্চলিক তার চেয়ে বেশি কালগত। স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ের পূর্বাপর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসকেই আমাদের কথাসাহিত্যের আলোচনার পটভূমিরূপে বিবেচনা করতে হয়। পটভূমি একাধারে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক।[১] আরো স্পষ্ট অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত কথাসাহিত্যের ইতিহাস। লক্ষণীয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবোত্তর আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। তাঁরা নিজশ্রেণীর জীবনাগ্রহকে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত দেখতে চেয়েছিলেন। সেই থেকে ইংল্যান্ডের উপন্যাসের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়ে ওঠে এই ভদ্রশ্রেণীর ঘরেবাইরে আত্মবিস্তৃতির যুগে।[২] একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষেও উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসিত বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের ফলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) কারণে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব-বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। তার সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের বিকাশ ও কথাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৩] তবে ভাষাসংস্কৃতির সূক্ষ্ম ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে একটি নিয়ামক ঐতিহাসিক সত্যের যোগসূত্র নিহিত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠার ফলে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়নি। দেশের পর দেশে, মহাদেশের পর মহাদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে মাতৃভাষা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাদের মাতৃভাষার পূর্বতন ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক পুনরুদ্ধার আর কখনই সম্ভব নয়।'[৪] কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির নাগরিক জীবনের বিকাশের সূচনায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ক্রমশ পালাবদলের মাধ্যমে ভাষাসাহিত্যের নতুন যাত্রাপথ নির্মিত হয়েছে। বিকশিত হয়েছে বাংলা আধুনিক গদ্যভাষা ও সাহিত্য। এই সময় বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের অনুরাগ, মেধা ও শ্রম দিয়ে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। ব্রিটিশ শাসিত কলোনীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রজাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের আদিপর্ব। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানগণও সেই সাম্রাজ্যবাদী ভাষাশক্তির ও রাজনৈতিক শক্তির আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করেন। অবাঙালি মুসলমান পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিকতাবাদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে বাঙালি মুসলমানগণ সক্ষম হন। আর সেই ঐতিহাসিক সাফল্যেই বর্তমান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এবং বাঙালির রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার সমান্তরাল পথপরিক্রমা ঋদ্ধ ও ক্রমপ্রসারিত হয়ে চলেছে। অবশ্য একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলকাতা ও ঢাকার রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা কেন্দ্রবলয়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাসও এক নয়। রাজধানী কলকাতা ও রাজধানী ঢাকার নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের বিকাশের ধারাও পৃথক। কলকাতার চেয়ে ঢাকার নাগরিক ঐতিহ্য প্রাচীন। কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এবং মধ্যযুগে মোঘল শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকার আর্থসামাজিক রাষ্ট্রিক এবং সাংস্কৃতিক ভিন্ন প্রেক্ষিতের ফলে প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ঈশা খাঁ-র নেতৃত্বে ঢাকার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ সূচিত হয়। বলাই বাহুল্য, মোঘল শাসনামলে ঢাকা ছিল একটি সমৃদ্ধ রাজধানী শহর।[৫] অন্যদিকে গ্রামই বাংলার প্রাণ। বাংলার অর্থনীতির চালিকাশক্তিও ছিল গ্রামীণ কৃষিজ উৎপাদন। তবে তৎকালে গ্রামীণ কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মানও ছিল ভিন্ন। লক্ষ করা যাবে, মোঘল শাসনামলে বাংলাদেশের কৃষিতে কোন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ছিল না।[৬] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি ও কৃষি অর্থনীতিতে মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মোঘল ও ব্রিটিশ কৃষি অর্থনীতির পূর্বাপর প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে সামালোচকের ভাষ্য ঃ

> মোঘল সাম্রাজ্যশক্তি তাদের শাসনব্যবস্থার অনুকূলে বাংলার কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজকাঠামোকে সামন্তসমাজে রূপান্তরিত করে। মোঘল আমলে সৃষ্ট বঙ্গীয় সামন্তসমাজের বিরোধী মৃৎমুদ্দী বাণিজ্য পুঁজিপতিদের সহায়তায় ব্রিটিশ বাণিজ্য পুঁজিপতি শক্তি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে দখল করে নেয় বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা। ফলে, সুলতানী আমলের 'বাঙ্গালা' আকবরের 'সুবা বাংলা' ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত বাংলার রাজধানী ঢাকার (জাহাঙ্গীরনগর) পরিবর্তে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বাণিজ্য পুঁজিপতিদের সহায়তায় ব্রিটিশ বাণিজ্য পুঁজিপতি শক্তি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে দখল করে নেয় বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা। ফলে, সুলতানী আমলের 'বাঙ্গালা' আকবরের 'সুবা বাংলা' ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত বাংলার রাজধানী ঢাকার (জাহাঙ্গীরনগর) পরিবর্তে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম রাজধানী। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর পুঁজিপতি (Marchantile Capitalism) এবং শিল্পপুঁজি (Industrial Capitalism) কেন্দ্রিক মানসপ্রক্রিয়া নব্যসৃষ্ট কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজগঠন ও জীবনবিন্যাসের বস্তুগত ও ভাবগত রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে। এর ফলে ব্রিটিশ পুঁজির সহযোগী হয়ে গড়ে উঠতে থাকে ভারতীয় পুঁজি এবং উভয় পুঁজির পক্ষপুটে লালিত, বর্ধিত হয়ে গড়ে ওঠে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী'।[৭]

বস্তুত, মধ্যযুগীয় বাংলার রাজধানী ঢাকা মুর্শিদাবাদ ক্রশম উপেক্ষিত হয়ে ওঠে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট। ফলে, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি নগরের অর্থবাণিজ্য কেন্দ্রিভূত হয় আধুনিক নগর কলকাতাতেই। এজন্যে ব্যাপক সংখ্যক লোক ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় আবাস গড়ে তোলে। তাছাড়া রোগব্যাধি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঢাকা শহরে বৃদ্ধি পায়। দেখা যায়, অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকার লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক R. P. Dutt এই প্রসঙ্গে তৎকালীন এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ঃ

> "The population of the town Dacca has fallen from 150,000 to 30,000 or 40,000, declared Sir Charles Trevelyan to the parliamentary enquiry in 1840, and the Jungle and malaria are fast encroching upon the town... Dacca, which was the Manchester of India has fallen off from a very flourishing town to a very poor and small one."[৮]

বস্তুত, ঢাকা-কলকাতার লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির বহুমাত্রিক কারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। এই সময় পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের ধারার আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববঙ্গীয় ভূমির অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা।[৯] এছাড়াও শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্য ও পেশাজীবী শ্রেণীর মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা। ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০১),

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটতে থাকে। পাশাপাশি নবলব্ধ আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়ে ওঠে। যার চূড়ান্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক গতিশীলতা দান করে হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল দল। বস্তুত উনিশ শতকের কলকাতা কেন্দ্রিক বহুল ঘটনাক্রমের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উনিশ শতকের এই কলকাতাই ছিল বাণিজ্যিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তীর্থভূমি। এই প্রসঙ্গে বি. বি. মিশ্র-র উক্তি স্মরণ করিঃ "Culcutta naturally monopolized the benifits of tade and commerce as well. The middle classes first arose here and then spread gradually."[১০] ক্রমবর্ধিষ্ণু কলকাতাই হলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। গৌড় নদীয়া পূর্বযুগে বাংলা সাহিত্য সত্যি কতটুকু বিকশিত হয়েছিল সন্দেহ আছে। মোটামুটিভাবে এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল পল্লীসমাজের বুকের জিনিস। তাই পল্লীসমাজ ভাঙলে বাংলার সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির সবকিছুর বাসাবদল হল- এ শহর কলকাতায়।[১১] পক্ষান্তরে, ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেসরকারী উদ্যোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহ হচ্ছে- ঢাকা কলেজ (১৮৪১), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৮৬), ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), এম.সি. কলেজ (১৮৯১), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) ইত্যাদি। সর্বোপরি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতম ঘটনা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ভূ-খন্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় কাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতের সমন্বয়ে ক্রমবিকশিত হতে থাকে ঢাকা কেন্দ্রিক মধবিত্ত শ্রেণী।[১২] আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতার 'কল্লোল' গোষ্ঠী এবং ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'শিখা' গোষ্ঠী সাহিত্য ও জীবনে যোগ করে এক নবতরঙ্গ। বস্তুত, বিগত শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নব্য শিক্ষিতের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে এ কথাও সত্য ''সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী য়ুরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদকে অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। বস্তুত এরাই ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ইয়ং বেঙ্গল'।[১৩] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উনিশ শতকের কলকাতায় সমাজসংস্কৃতির প্রগতিশীল পথপরিক্রমায় বুদ্ধির দিশারীরূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮) এবং ডিরোজও-র নেতৃত্বে ইয়ংবেঙ্গল দল অসাম্প্রদায়িক আধুনিকমনস্ক জীবনচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুরূপ, মুসলিম সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়। সৈয়দ আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৮৩), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), কবি আবদুল কাদির

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০৬-১৯৮৪), অধ্যাপক শামসুল হুদা,, মোখতার হোসেন সিদ্দিকী, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখের নেতৃত্বে যুগযুগান্তরের অশিক্ষায় আড়ষ্ঠ পূর্ববঙ্গের বাঙালি সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'বুদ্ধির মুক্তি' বা 'Emancipation of intellect'-এর মন্ত্রে তাঁরা দীক্ষিত হয়েছিলেন কামাল আতার্তুক, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোমা রোঁলার কাছ থেকে, পারসি কবি শেখ সাদির কাছ থেকে, আর হযরত মোহাম্মদের কাছ থেকে।'[১৪] ফলে, বিশ শতকের শিখা গোষ্ঠীর লেখকগণই বাঙালি মুসলমানের জীবনে ও মননে রেনেসাঁসের বীজমন্ত্র বপন করেছিলেন।

পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, শিক্ষা ও সাহিত্যে যুগোপযোগী আধুনিক জীবনচেতনা অর্জিত হলেও বাঙালির রাজনৈতিক বিকাশ বিলম্বিত হয় আরও কয়েক দশক। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার, আধুনিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব ও বাংলাদেশের সাহিত্যের আদিপর্বের বুনিয়াদ নির্মিত হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার চিত্রপট রয়ে যায় প্রায় অপরিবর্তিত। বরং ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনগুলোর প্রেক্ষিতই পুনঃপুন দানা বেঁধে উঠেছিল আঞ্চলিক জনপদে অনুষ্ঠিত কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। আমাদের স্মরণীয় ইতিহাসে জানা যায়, ব্রিটিশশাসিত বাংলায় প্রথম বিদ্রোহই ছিল মীর নিসার আলী তীতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি। দীর্ঘদিন যাবৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে কৃষক শোষণের প্রক্রিয়া চলে আসছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণীয়, বিশ শতকের প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এই খণ্ড খণ্ড আঞ্চলিক বিদ্রোহের পারম্পর্যের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে, বাংলাদেশের এইসব বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের একটি সমন্বিত রূপ দেবার প্রথম সাংগঠনিক উদ্যোগ মেলে ১৮৭২-৭৩ সালে অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় জানিয়েছেনঃ

> ''১৮৭২-৭৩ খৃস্টাব্দের সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের সময় পাবনা জেলার সর্বত্র যে কৃষক সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা কোনক্রমেই আকস্মিক ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ হইতে সঞ্চামী কৃষক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তাহারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়াছিল কৃষকের নিজস্ব সংগঠন। বৃটিশ শাসন ও জমিদার এবং মহাজন শ্রেণীর সংঘবদ্ধ শক্তিই সঞ্চামী কৃষককে তাহাদের নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল ও নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধীয় এই চেতনাই বিংশ শতাব্দীতে কৃষকের সঞ্চামী শক্তি বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের সময় গঠিত এই কৃষক সমিতিকে ১৯৩৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় কৃষকসভার অগ্রদূত বলা চলে।''[১৫]

ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণে জানা যায়, বাংলাদেশে ১৮০২ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৫৩ বছরে প্রায় ১৩টি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কিন্তু রেলপথ স্থাপিত হবার পর (১৮৬০-১৮৭৯) ২০ বছরে ১৬টি দুর্ভিক্ষ হয় এবং দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ৪ লক্ষ।[১৬] স্মরণাতীতকালের ভয়াবহতম মন্বন্তর হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এই মন্বন্তরের জন্যে দুইটি কারণ ছিল মুখ্য। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের মজুত কৌশলের জন্যও খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়।[১৭] সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। বেসরকারী হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় চাল বিক্রি করে চোরাকারবারীরা ও ব্যাপারীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করেছিল ১৫০ কোটি টাকা।[১৮] দুর্ভিক্ষোত্তর পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে ভবানী সেন লিখেছেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

> ''দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে ৩৫ লক্ষ লোক। যারা বেঁচে আছে তারাই আজকের দিনের সমস্যা। বিধ্বস্ত এলাকার শতকরা ১০ জন লোক আজও দুস্থ। ইহাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ১২ লক্ষ লোক দুস্থ ভিক্ষুক। একেবারে রিক্ত ৬০ লক্ষ। ২৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর, ১৫ লক্ষ গরীব কৃষক, ১৫ লক্ষ গ্রাম্য শিল্পজীবী এবং ২৫০০০ স্কুল শিক্ষক।''[১৯]

আরো উল্লেখ্য যে, সারা বাংলাদেশের মধ্যে উত্তরবাংলাতেই জমিদারদের অত্যাচার ছিল বেশি। এই অঞ্চলের কোন কোন জমিদার হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক এবং প্রায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন কৃষক ভূমিহীন কৃষিমজুর অথবা আধিয়ার। এই ভূমিহীনরা জোতদারদের করুণার উপরই নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতো।[২০]

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের উনিশটি জেলায় তেভাগা ও টঙ্ক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট জমিদার জোতদারদের শোষণ– এই ছিল বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থিক জীবন ও সমাজচিত্র।[২১] অপরদিকে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে বৃহৎবাংলায় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় বা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করলেও বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে, হিন্দুমুসলমান জমিদার শ্রেণীর মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় নি। বিশেষ করে উত্তরবাংলায় রংপুরের হিন্দুমুসলমান জমিদারগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও পরস্পর সম্প্রীতি বজায় রেখে কৃষকদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল।[২২] বাংলাদেশের এই আভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রেক্ষিত, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ধীরে ধীরে শাসনদণ্ড খর্ব ও স্থবির হতে থাকে। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আগস্ট ১৯৪৭ সালে বাঙালিরা যে স্বাধীনতা অর্জন করে, তার মূল শর্তে এক অবিভক্ত বৃহৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে নি। স্বাধীনতার মাধ্যমে অর্জিত খন্ডিত বাংলাদেশ। বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান যেমন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা, তেমনি বাংলাদেশের দ্বিখন্ডিত হওয়া সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তার কার্যকারণ প্রাসঙ্গিক প্রভাবও পড়েছে আমাদের কথাসাহিত্যে। লক্ষণীয়, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের তারতম্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতর বিকাশের প্রেক্ষিতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে কথাসাহিত্যের লেখকগণও পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের আপন আপন ভূখন্ডের ভূ–প্রকৃতিকেই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। একইভাবে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য থেকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যও স্বাতন্ত্র্য রূপ পেয়েছে।[২৩]

এই পর্বে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের লেখকমানস গঠনে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। লেখকগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সমাজসত্যের অন্তরঙ্গ অবলোকনে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যের চাঞ্চল্যকর ভাবধারার অভিঘাত কথাসাহিত্যিকদের ওপর কার্যকর প্রভাববিস্তার করেছিল। বিষয়ানুগত প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে এখানে মূলত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের দেশ–কালগত সমাজপটভূমির স্বরূপ সন্ধানে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

দেশবিভাগের পূর্বাপর পরিস্থিতিতে শহরে ও গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক সমাজের উন্মুক্ত উল্লাস, ব্যাভিচারের বিষবাষ্পে ফেনিল হয়ে উঠেছিল জীবন।এই প্রেক্ষিতে দেশবিভাগোত্তর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানুষের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই আমাদের সাহিত্যের বিষয়গৌরব হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে আত্মরক্ষা করে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গের গ্রামে শহরে ছিটকে পড়ে। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে ও গ্রামে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রেক্ষিতেই সমাজজীবন এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারায় গভীরতর সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে পূর্ববাংলার মানুষের স্বাধীনতার মোহভঙ্গ হয়। পাকিস্তানি শাসনশোষণের ফলে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন সংগ্রামের অনিবার্য চূড়ান্ত পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি, ১৯৬১ সালে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন ও ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূত্রপাত, ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের অবসান, ১৯৬৩-তে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অডিন্যান্স জারি, ১৯৬৪ সালে কাশ্মির দিবসে দাঙ্গার সূত্রপাত এবং পূর্ববাংলায় দাঙ্গা বিরোধী কমিটি গঠন, ১৯৬৫-তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং আইউব খান জয়ী হওয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ১৪ দফা দাবী পেশ, ১৯৬৫তে পাকভারত যুদ্ধের প্রভাব, ১৯৬৬-তে ৬ দফা দাবী পেশ, ১৯৬৭-তে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৮-তে বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার কমিটি গঠন, ১৯৬৯-এ ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি উথাপন, ১৯৬৯-এ আইউব খানের সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারি, ১৯৭০ সালে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী, ১৯৭০-এ সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় লাভ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা, অতপর ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, ষাটের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আন্দোলনরত কৃষকরাই ছিল পাকিস্তানী সামরিক জান্তার প্রধান শত্রু। ব্রিটিশ বিরোধী স্থানীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। ফলে "উত্তরবঙ্গের ভাগচাষীদের তেভাগা আন্দোলন এবং ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের টংক আন্দোলন সারা বাংলাদেশের কৃষক সমাজের উপর এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই প্রভাব এই অঞ্চলের কৃষকদের উপর বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এখানকার দুর্গত কৃষক সমাজ বাঁচবার জন্য পথ খুঁজে মরছিল। এবার তারা নতুন পথের সন্ধান পেল। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের দৃষ্টান্তে এই অঞ্চলের চিরশোষিত ভাগ-চাষীরা এক নতুন সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এই সংগ্রামে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, সকল সম্প্রদায়ের কৃষকরাই অংশগ্রহণ করেছিল। তবে নির্ভিক সাঁওতাল কৃষকরাই ছিল তাদের অগ্রবাহিনী। এই সংগ্রামে সবচেয়ে আঘাত তারাই বুক পেতে নিয়েছে।"[২৪] ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের আন্দোলন (১৯৩৮-৩৯), নাচোলের তেভাগা আন্দোলন (১৯৫০), দিনাজপুরে হাজী দানেশের নেতৃত্বে সাঁওতাল কৃষক আন্দোলন (১৯৪৪), রংপুরের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৫), খাপুরের তেভাগা আন্দোলন (১৯৫৬), নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭), সিলেটের জাওয়ায় কৃষক আন্দোলন (১৯৪৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্তুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, পাকিস্তানী আগ্রাসন ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। যদিও দীর্ঘদিনের শোষণে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে দিয়েছিল ভেঙে, তবু অনমনীয় সংগ্রামী সত্তা নিয়ে এই দেশের গণমানুষ প্রজন্ম পরম্পরা সমাজ ইতিহাসকে বহন করে

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে। আর এমন সামজ বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে উঠেছে রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মোল্লাতন্ত্র, পীরতন্ত্র, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, অসৎ আমলা, বক্তৃতাবাগীশ বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর সহযোগী হয়ে পক্ষেবিপক্ষে নিজ নিজ সুবিধাজনক আসনে রয়েছেন। তবে প্রাক স্বাধীনতাপর্বের পটভূমিতে লক্ষণীয় নব-উদ্ভূত শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথাকথিত মোল্লা, পীর, অসৎ আমলা, দুর্নীতিপরায়ন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে চিরাচরিত শোষণের প্রভাব নষ্ট করে একটি আধুনিক সমাজ গঠনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নিজস্ব ইতিহাস সাহিত্য ও কলা সম্পর্কে পূর্ববাংলাবাসীরা ছিলেন গর্বিত।[২৫] আর একথাটি অনস্বীকার্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশবিভক্তি থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধোত্তর পর্বে স্বদেশীয় সমাজ ও রাজনীতি মানুষের জন্য যে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, সমবায় আন্দোলন, শিল্পের প্রসার, শ্রমিক ও শিল্পের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসহ কৃষিপরিকল্পনা ও জনতন্ত্রের ওপর রাষ্ট্রীয় শাসন প্রশাসনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার সফলতা ও বিফলতার প্রভাবকে আমাদের কথাসাহিত্যিকগণ অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং এইসব সামাজিক ভাঙন, অবক্ষয়, ক্ষোভ দ্রোহ ও দায়কেই অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কালপরিসরে বাংলাদেশের মানুষের সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্বপ্রবাহ ও জীবনসংঘাতকে শিল্পরূপ দিতে আমাদের কথাসাহিত্য কতটুকু সত্যসন্ধ, তাও বিচার্য বিষয়।[২৬]

সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যায়ন থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছে। যাকে সহজেই পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং জীবনবিন্যাসগত ধারা থেকে পৃথক করা যাবে। সুতরাং বাংলাদেশের কথাসাহিত্য তার স্বদেশীয় সমাজদেহ ও আত্মার সঙ্গে লীন হয়ে আছে। কিংবা বলা যেতে পারে, সামাজিক বিকাশের অন্তর্নিহিত ভাঙাগড়ার সঙ্গে সামিল হয়ে আছে বাংলাদেশের জীবনবাদী লেখকমানস। এই লেখকমানস তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্বসংকূল সামাজিক গতিশীলতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। সমাজবাদী লেখকও বিশ্বাস করেন– ''বাংলাদেশের সাহিত্য যদি অন্য বঙ্গে একই ভাষায় রচিত সাহিত্য থেকে ভাষায়, রূপে, বিষয়বস্তুতে ভিন্নতা কিছু অর্জন করে থাকে– তাহলে তার মূল লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাধারার মধ্যে, মানচিত্রের বিভাজনরেখার মধ্যে নয়।''[২৭] পূর্ববাংলার আর্থসাামজিক বিকাশের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বদেশের সমাজকাঠামোর অভিজ্ঞতাকেই লালন করেন লেখকমানস। তাই নিঃসংশয়ে বলা চলে, বাংলাদেশের বেদনার খনি এবং সম্ভাবনার প্রত্যাশা থেকেই আমাদের সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। দীর্ঘদিনের অভ্যেস রপ্ত করা রুচির রেশমী মসৃণতা এই সাহিত্যে অনুপস্থিত বললেই চলে। এ সাহিত্যে হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষ আসর জমিয়েছে। তাই বলে কোলকাতার কোন রকম অনুকরণও একে বলা চলে না। কিন্তু এ তো আবহমানকালের বাংলার সংস্কৃতির স্তন্যরসে পুষ্ট।[২৮] তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, প্রবল জীবন অভীপ্সা ও বাস্তবতার কেন্দ্রসন্ধানী যোগসূত্রে কল্লোলীয় কথাসাহিত্যের ধারা এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) থেকে ষাটের দশকে মার্কসবাদী গণজীবনমুখী সাহিত্যের জীবনপ্রবণতার সঙ্গে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের নিবিড় যোগসূত্রও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র (১৯২২-১৯৭১) মত শক্তিশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য লেখকদেরও আলোড়িত করেছে। উনিশ শ সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় গ্রামীণ গণজীবনেরই ছবি অঙ্কিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিত এবং যুদ্ধোত্তর সমাজকেন্দ্রিক বাস্তবতায় রচিত সাহিত্যেও উচ্চকিত হয়েছে গণজীবনের দাবি। তবে একথাও আমরা স্মরণ করবো যে, ১৯৪২ সালে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী লেখক আন্দোলন এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলোর চেতনায় সাহিত্যসংস্কৃতিতে সাধারণ মানুষের মৌলিক দাবিগুলোই উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মাশ্রিত শাসনের সহযোগী পীরতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, সামরিক স্বৈরতন্ত্রের লাগামহীন শোষণে কৃষক, শ্রমিক, মাঝি, জাহাজের সারেং, ছাত্র ও আমজনতার জীবনে নানাসংকট প্রকটিত হয়ে ওঠে। এমন কি স্বাধীনতার পর দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, শোষণে বঞ্চনায় প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ উন্মূল উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও নাগরিক অর্থনীতিতেও সূচিত হয় ব্যাপক পার্থক্য। চোরাকালান, সন্ত্রাস আর নানা অশুভ তৎপরতায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে মুষ্ঠিমেয় মানুষ। স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমিসংলগ্ন মানুষই ভূমির নায্য বন্টন থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্র কৃষকদের ভূমি দিতে পারে নি। রাষ্ট্রীয় দেহের এই বেদনাকেই বাংলাদেশের জীবনবাদী শিল্পীরা আপন শরীরের বেদনার মত উপলব্ধি করেছেন। ফলে গ্রামীণ জীবন প্রধান সাধারণ মানুষেরই দৈনন্দিন আশা–হতাশা আর লড়াই সংগ্রামের কথা তাঁরা লিখেছেন। কারণ, হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্যের ধারায় বর্তমানেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ''সাধারণ মানুষই বাঙালি, আসলে খাঁটি বাঙালি। বাংলা তাদেরই ভাষা। যারা ধনী ও শিক্ষিত, অর্থাৎ অসাধারণ, তারা বাঙালি থাকতে চায় না। কেউ বিদেশে যায়, যারা যায় না তারা দেশে বসেই বিদেশী হয়ে থাকে। বিদেশী পণ্য ব্যবহার করে না শুধু, ভাষাও ব্যবহার করে। তাদের আদর্শ দেশ নয়, বিদেশ।''[২৯] শুধু তাই নয়, অসম অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে শিল্পসাহিত্যে দুটো ধারা গড়ে উঠেছে। একদিকে গণজীবনবাদী সাহিত্য, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জীবনের হৃদয়াবেগ বহন এবং ভোগবাদী সেন্টিমেন্টপুষ্ট সৌখিন সাহিত্য লেখকদের অবস্থানকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। লক্ষ করা যায়, দেশবিভাগোত্তর কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২–১৯৭১), শওকত ওসমান (১৯১৭–১৯৯৮), আলাউদ্দীন আল আজাদ (জ. ১৯৩২), সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭–১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬–২০০৩), হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯), আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪), শওকত আলী (জ. ১৯৩৬), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জ. ১৯৩৯), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩–১৯৯৭), সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭), মঞ্জু সরকার (জ. ১৩৬০), বিপ্রদাশ বড়ুয়া (জ. ১৯৪২) প্রমুখের লেখায় জীবনবাদী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে। তবে ষাটের দশকে নাগরিক জীবনের ভাষ্যে সাহিত্যের পটভূমি হয়েছে নগরপীঠ। ফলে অনেকের লেখায় নগর ও গ্রামজীবন সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্রপট ধরা দিলেও কেউ কেউ নাগরিক জীবনের নস্টালজিয়ার ছায়াচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে সমাজ দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক বলেছেনঃ

> ''তাদের যে একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে গ্রামের সঙ্গে বাস্তবভাবে যোগাযোগ কেটে গেলেও সচেতনতাকে বাড়াতে হবে শতগুণে, দৃষ্টিতে আনাতে হবে মর্মভেদী তীব্রতা। কয়েকজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক ছাড়া এই সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই উদ্যোগ আয়োজন বিশেষ দেখা গেল না। একদিকে যেমন সবকটি জীবন্ত শিকড় গ্রাম সমাজের বাস্তব'তার রস না পেয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে বহুরকমের শোষণের পেষণে গ্রামসমাজের গঠন একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে যায়। সেই মারাত্মক রুগ্ন কঠিন বাস্তবতার চেহারাটা অধিকাংশ লেখকের বোধের বাইরে থেকে গেলো।''[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেশ–কালগত উপর্যুক্ত পটভূমির আলোচনা থেকে একথা নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য গ্রামীণ জীবন। গ্রামীণ স্থানিক মানুষ, পরিবেশ প্রকৃতি ও লৌকিক সমাজসংস্কৃতি ভাষা নিয়ে আমাদের সাহিত্যের বিষয় পরিসর। বাঙালির মানসিক ও সামাজিক রীতি বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করেছেন আমাদের কথাকারগণ। যদিও কেউ কেউ উচ্চবিত্ত শহুরে সমাজজীবন এবং ফ্যান্টাসি জাতীয় চরিত্রের ঘটনা প্রধান কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তবুও একটা বড় পরিসর জুড়েই চিহ্নিত হয়েছে গ্রামীণ ভৌগোলিক লৌকিক জীবন। লৌকিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে আমাদের কথাশিল্পীগণ স্থানিক পটভূমিসহ তাঁদের জীবনার্ন্তগত সংঘাত সংকট উত্তরণের প্রেক্ষাপটসহ সমাজসত্তা ও ভাষাসত্তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ফলে লক্ষ করা যাবে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্রপট ও লৌকিক জীবনের নানা জঙ্গামতাকে আমাদের কথাশিল্পীরা নতুন মাত্রা দিতে পেরেছেন। এই পর্বে এই অনুষঙ্গেরই অন্তরঙ্গ অবলোকনে প্রয়াস পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের সাহিত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে শিল্পীরা বেছে নিয়েছেন একান্ত নিজস্ব অনুভবে শিল্পসৃষ্টির স্বতন্ত্র অঞ্চল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রেক্ষাপট আঞ্চলিক হলেও সাহিত্যের মূল্যবোধ সর্বমানবীয় এবং আন্তর্জাতিক। লেখকের ব্যক্তিমানস স্বকাল স্বদেশ ও স্বসমাজের ভূমিতে প্রোথিত, কিন্তু চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত।

২.০৩ঃ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্থানিক সমাজ ও ভাষাঃ পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের পটভূমি

রাষ্ট্রিক কার্যকারণসম্পর্ক সমেত সমাজের নানা প্রবণতা কথাসাহিত্যে উঠে আসে। যেহেতু সমাজ কোন অবস্থাইে নির্দ্বন্ধ থাকে না; সে জন্যে দ্বন্দ্ব ও শোষণমূলক অসম সমাজ থেকে একটি সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্যে লেখকগণ লালন করেন অমলিন আকাঙ্ক্ষা। ফলে দেখা যাবে, লেখকের সঞ্চারিত অনুভূতির প্রকাশে তিনি বিচরণ করেন তাঁরই পারিপার্শ্বিক সমাজের ও স্বদেশের আঁতে এবং অজ্ঞানে। বাংলাদেশের কথাশিল্পীগণও এদেশের গ্রামীণ, নাগরিক পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ, মানুষের বোধ বিশ্বাস, চেতনা, ক্ষোভ, সংস্কার, সংস্কৃতি, ভাষাবৈচিত্র্যসহ আর্থসামাজিক পরিস্থিতি থেকে অর্জন করেন প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা। আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতারই রূপায়ন ঘটান তাঁদের সৃষ্ট কথাসাহিত্যে। সুতরাং বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এই সমাজতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে সমাজবিন্যাসের বাস্তবতার নিরিখেই অবলোকন করা আবশ্যক। বর্তমানে এই প্রাসঙ্গিকতার দিকেই দৃষ্টি দেয়া হবে।

আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় ঐক্য এবং সংহতি বরাবরই লক্ষ করা যায়। জাতীয়বোধ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতার মারাত্মক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসম গতিপ্রবাহের কারণেই সামাজিক স্তরভেদের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, ''সমাজকাঠামোর অসম ঐক্য সংস্কৃতির প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে থেকে গেছে। সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যবধান ও অঞ্চলের দূরত্ব প্রকট বলে গ্রামীণ বাংলার সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তিকতা বাংলা ভাষার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে।''[৩১]

সংস্কৃতির এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের এবং বৈচিত্র্যের কারণেই সাধারণভাবে ভৌগোলিক, আঞ্চলিক সমাজ কাঠামোকে আমরা তিনটি মোটাদাগের বিভাজনরেখায় অঙ্কন করে নিতে পারি। লক্ষ করা যাবে, জীবন

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ প্রতিবেশের প্রেক্ষিত এই বিভাজন বা বৈচিত্র্য, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেরও অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যেহেতু কথাসাহিত্যের মূল প্রবণতা সামাজিক মানুষের জীবনাচরণ, ভৌগোলিক পরিমন্ডল ও বৃত্তিক ভাষিক স্বরূপ অন্বেষণ; এ জন্যে দেখা যাবে সমাজজীবনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে এদেশের কথাশিল্পীরা বিভিন্ন স্থানিক পটভূমির প্রেক্ষিতে অঙ্কন করেছেন। বস্তুত এই পর্বে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এই আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কাঠামোসহ জীবনপ্রবণতাগুলো চিহ্নিত করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জীবনযাত্রার ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেরও তিনটি স্বতন্ত্র ভূপরিমন্ডল এবং আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতটিকে নিম্নরূপ তিনটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়। যেমন ঃ

১. পূর্ববঙ্গীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জীবনযাত্রা,

২. দক্ষিণবঙ্গীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জীবনযাত্রা, এবং

৩. উত্তরবঙ্গীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জীবনযাত্রা।

উল্লিখিত আঞ্চলিক চিত্রপটে ভাষা পরিবেশ পরিস্থিতি, জীবন ও সংস্কৃতি দ্বারা কথাসাহিত্যের শিল্প অভীক্ষা যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি পার্শ্ববর্তী ভিন্নদেশীয় ভূখন্ডের আঞ্চলিক ভাষা ও লৌকিক সংস্কার থেকেও প্রভাবিত হয়েছে। কারণ, ভাষার প্রান্তীয় পরিস্থিতিতে দেশের 'সীমান্তবর্তী ভাষায় কেন্দ্রীয় মানের হ্রাস ঘটে ও বহিঃসীমার বিভিন্ন আঞ্চলিক ও তাৎক্ষণিক কার্যোপযোগী ভাষার গুণধর্ম প্রবেশ করে।'[৩২] বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লক্ষ করা যাবে উপভাষাগুলোতে আসামি, উড়িয়া, কামরূপী, বিহারী ও অন্যান্য উপভাষা ঝাড়খন্ডী, রাঢ়ি প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের কথাশিল্পীগণ আদর্শ বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্যে কথাসাহিত্যের সাধারণ বর্ণনা দিয়ে থাকলেও চরিত্রের সার্বিক বিকাশ, জীবনানুভূতি ও সামগ্রিক তাৎপর্যকে তুলে ধরার জন্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা সাহিত্যের চরিত্রকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে ও বিকশিত হতে সহায়তা করে। অন্যকথায়, আঞ্চলিক ভাষায় লোকজ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। কাজেই কথাশিল্পীরা সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ জীবনাদর্শকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে সমাজভাষার আশ্রয় নেন। কারণ, চরিত্রকে সঠিক মাত্রায় গড়ে তোলার জন্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিকল্প নেই। লক্ষ করা যায়– বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাজনের উপরোক্ত স্তরগুলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে আলাদাভাবে সনাক্ত করে এবং কথাশিল্পীরা তা ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের লক্ষ্যে পৌছান।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন বাংলাদেশের তিনটি অঞ্চলের জীবনযাত্রা পরিবেশ প্রতিবেশ বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক ভাষা–কাঠামোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা–কাঠামোর অন্তর্বয়নে কথাসাহিত্যের সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সুতরাং মূল প্রসঙ্গের সুস্পষ্টতার প্রয়োজনে এই পর্বে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের পটভূমি কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের সমাজ ও ভাষার স্বরূপ পর্যবেক্ষণে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করা হবে। ফলে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা আমাদের মূল আলোচনার একটি সম্পূরক পাঠ পর্যবেক্ষণে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করবে এবং গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তুও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে মূলত বর্তমান পর্বে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয় ভৌগোলিক সমাজ ও ভাষাকাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য এবং কথাসাহিত্যে প্রয়োগগত অন্তরঙ্গ প্রেক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে।

পূর্ববঙ্গীয় এবং দক্ষিণবঙ্গীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য জীবনযাত্রা ও আঞ্চলিক ভাষা পরিস্থিতিঃ

পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ সামগ্রিক বাংলা ভাষা মানচিত্রের দুইটি অংশ। এর স্থানিক ভূ–প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার পূর্বে সমগ্র বাংলা ভাষা মানচিত্রের স্বরূপটিও অবলোকন করা প্রয়োজন। সমগ্র বাংলা ভাষা মানচিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে গ্রিয়ারসন লিখেছেনঃ 'The lower ranges of the Himalayas form the northern boundary of Bengali. They are inhabited by wild tribes speaking various Tibeto-Burman languages. The live runs the north of the Tarai in the districts of Darjeeling till it meets the eastern boundary in the north of the district of Goalpara in Assam. Both in regard to its measure of cultivation and to the number of people who speak it, Bengali is the most improtant of the four languages. Assamese, Bengali, Oriya and Behari which form the Eastern Group of the Indo-Aryan family'[৩৩]

তাঁর মতে, বাংলা ভাষার দুটো রূপ পাওয়া যায়। একটি শিক্ষিত লোকের ব্যবহৃত শিষ্ট সাহিত্যিক বাংলা, অন্যটি অশিক্ষিত লোকের কথ্য বা আঞ্চলিক বাংলা। শিষ্ট বাংলা ব্যাকরণশাসিত, কিন্তু কথ্য আঞ্চলিক বাংলা সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত এবং বাক্যের গঠনবিন্যাসে সাহিত্যিক রূপ নেই, এর গঠন সংক্ষিপ্ত। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ভাষা গোটা বাংলাদেশে অভিন্ন হলেও কথ্য ভাষা এক এক অঞ্চলে ভিন্নরূপ।[৩৪] ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করে লিখেছেন ঃ 'The delta tract cannot be said to have any special dialect of its own, unlike the other part of Bengali... The speech of upper classes in the western part of the Delta and in Eastern Ra-dh-a gave the literary language of Bengali.'[৩৫] অর্থাৎ বদ্বীপ বাংলার নিজস্ব কোন উপভাষা নেই। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাগুলো পারস্পরিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষিত লোকের কথ্যভাষাই বাংলা সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের এই উপভাষার বিকাশের মূলে নিহিত আছে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ। ফলে নানা উপভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতিও গড়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায় ঃ 'Political and social reasons have brought about the present unity of speech in Bengali, dispite the fact dialects. It was in obejct lesson in social and communal unity for the other sections of the people.'[৩৬]

বস্তুত, সামগ্রিক বাংলা ভাষার শিষ্টরূপের বা সাহিত্যিক ভাষার ঐক্য থাকা সত্ত্বেও উপভাষাগুলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার পূর্বদিকের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল স্পর্শ করে প্রবহমান এই সীমারেখা ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথে এগিয়ে রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান থেকে জলপাইগুড়ির পশ্চিমাঞ্চল বরাবর হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছেছে। অপরদিকে, কলকাতাকে কেন্দ্র করে

Dhaka University Institutional Repository

হুগলী, নদীয়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা এবং বিহারের প্রান্ত পর্যন্ত রাঢ়ী শাখা বিস্তৃত। কিন্তু ঢাকা জেলাকেই পূর্ববঙ্গীয় কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয়। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চলে পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে কথাবার্তা শোনা যায় না। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় বাংলার সাধুরূপ প্রচলিত। ঢাকা থেকে উত্তর পশ্চিমে নদী পর হলেই উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর ও অন্যান্য জেলাসমূহে রাজবংশী, বরেন্দ্রী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত আছে। রাজবংশীয় 'বাহে' নামে অপর একটি উপ-আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। এই উপ-আঞ্চলিক ভাষাটি দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা ও কলকাতার মধ্যবর্তী যশোর-খুলনা থেকে অবিমিশ্র প্রাচ্য বাংলার (Eastern Bengali) সূচনা। এখান থেকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের পূর্বাংশে প্রাচ্যবাংলার বিস্তৃতি। বস্তুত এই প্রাচ্য বাংলা উত্তরপূর্ব দিকে মেঘনা ও অন্যান্য শাখা নদীবাহিত অঞ্চলে ত্রিপুরা (নোয়াখালী), ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং কাছাড়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ি অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও সামাজিক বিকাশের কারণে এই উপভাষার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। সমগ্র সুরমা উপত্যকা জুড়ে এবং ময়মনসিংহের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বাংলা ও ভোট-বর্মী এর মিশ্রণে 'হাজং' নামে উপ-আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন লক্ষণীয়। এই ভাষা-বৈচিত্র্যে-ফরিদপুর, খুলনা, যশোর প্রভৃতি ব-দ্বীপীয় অঞ্চলেও পার্থক্য বা পরিবর্তন দেখা যায়। আবার বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগে অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্র উপভাষা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে 'চাকমা' উপভাষা ব্যবহৃত হয়।[৩৭] গ্রিয়ারসনের উপরোক্ত ভাষা জরিপ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেনঃ "গ্রিয়ার্সন সাহেব এই সমস্ত বিভাগ, শাখা ও প্রশাখার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে।"[৩৮] তিনি বাংলাদেশের উপভাষাগুলোর শ্রেণীকরণে নিম্নরূপ একটি ছক এঁকেছেন।

সারণি- ১ : বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিভাজন

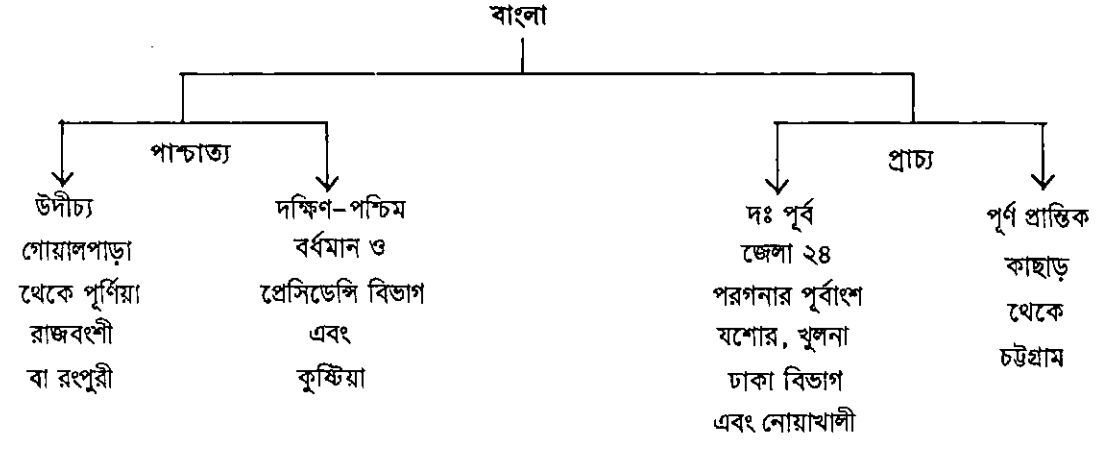

বাংলা উপভাষার উল্লিখিত সীমাঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় শাখার উপভাষাসমূহ প্রচলিত। প্রাচীন বাংলার ভূগঠনের ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গালী, কামরূপী এবং ঝাড়খণ্ডী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশের উপভাষাগুলোকে বর্তমান আলোচনায় তিনটি ভূখন্ডের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ২ : উপভাষার অবস্থান

উপভাষা	উপভাষার অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী– বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাকুড়া)।
	পূর্ব রাঢ়ী– (কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তরবঙ্গ– মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।
বাঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ–পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম)।
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
কামরুপী বা রাজবংশী	উত্তর–পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিচার, উত্তর দিনাজপুর, কাহাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

সূত্র ঃ ড. রামেশ্বর শ. (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ১৩৯৯, পৃ. ৬৫২)।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তিনটি অঞ্চল সুনির্দিষ্ট। বস্তুত দেশের এই ভূ–অবয়বকে প্রাকৃতিক কারণে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করলে মোটামুটিভাবে বৃত্তিক সামাজিক জীবনের পাশাপাশি বাচনিক ও স্থানিক চিত্রপট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ভৌগোলিকভাবে বৃত্তিক জীবন ও আঞ্চলিক ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের উপভাষাগুলো শ্রেণীকরণে অগ্রজ ভাষাতাত্ত্বিকগণ দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ভূসীমানাকে পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ বলতে বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ, সিলেট বিভাগ এবং বর্তমান বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহ নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদকে বোঝায়। এমন কি উপভাষিক শ্রেণীকরণে যশোর ও খুলনার উপভাষাকেও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় সনাক্ত করা হয়। এখানে বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশ একভাষী রাষ্ট্র হলেও এবং এর কোন প্রাদেশিক ভাষা না থাকলেও উপভাষিক বৈচিত্র্য ব্যাপক। অসংখ্য নদনদী অরণ্য পর্বত বিল হাওড় দ্বারা জনপদগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ভূসীমানাগত নির্দিষ্ট স্থানিক ভাষাগুলো এক একটি ভৌগোলিক পটভূমি ও মানুষের বৃত্তিক সামাজিক জীবনযাত্রার কেন্দ্রমূলে গড়ে উঠেছে। আবার আর্থসামাজিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিন্যাসের ভেতর একই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও ভিন্নতর বৈচিত্র্য রূপ লাভ করেছে। কাজেই পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক সীমাগত অঞ্চলে একাধিক উপভাষার রূপ গড়ে উঠেছে এবং সেগুলো রক্ষিত হয়ে আসছে। লক্ষণীয়, ভূ–প্রাকৃতিক গঠনের দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের সিলেট, ময়মনসিংহের গারো, পার্বত্য অঞ্চল; অন্যদিকে ঢাকা, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ প্রভৃতি সমতল নিম্নাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল ও খুলনা বিভাগের নদী অরণ্য প্রধান নিম্নভূমি অঞ্চলগুলোর মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য আছে জীবনযাত্রা ও ভাষাগত দিক দিয়েও। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো পূর্ববঙ্গীয় বিভিন্ন জনপদে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গের কোথাও নিম্নসমতল ভূমি, কোথাও পার্বত্য–আরণ্যক অঞ্চল, আবার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বাংলার উত্তরাঞ্চলের চেয়ে ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রাক্ স্বাধীন বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গীয় পটভূমি 'চট্টগ্রাম–ত্রিপুরা, শ্রীহট্টের পূর্বাংশে, কাছাড়–এর উত্তরাংশ, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়াল গড়– গৈরিক প্রাচীন পুরাভূমির দ্বারা গঠিত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ঢাকা এলাকা থেকে একটি স্থলপথ কামরূপ হয়ে আসামের পার্বত্য এলাকার পাদদেশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পুন্ড্র অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'[৩৯] প্রাচীন বঙ্গদেশ মূলত রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও সমতট নামে কয়েকটি ভৌগোলিক জনপদে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে বঙ্গ ও পুন্ড্রদেশ বা উত্তরবঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত।[৪০] এই

Dhaka University Institutional Repository

জনপদ বা ভৌগোলিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই বাংলা উপভাষাগুলোর শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। অনুরূপ, বাংলাদেশেরও তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে জীবনযাত্রা ও ভাষাকাঠামোর ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। যদিও সার্বিক অর্থেই বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পারম্পর্যে বিকশিত। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিভিত্তিক প্রাচীন সমাজের সঙ্গে এইসব জনপদের যোগসূত্র নিবিড়। তবুও কৃষিভিত্তিক সমাজের পাশাপাশি লক্ষ করা যাবে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে নদীসমুদ্র প্রভাবিত জীবনে অন্যান্য বৃত্তিক বা পেশার বিকাশ ঘটেছে। তন্মধ্যে মাঝি, জেলে বা মৎস্যজীবী, জাহাজের সারেং, খালাসি, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি। বন্দরনগর চট্টগ্রাম, শিল্পপ্রধান রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিলেটে চা বাগানকে কেন্দ্র করে বিচিত্র পেশাজীবী জনবিন্যাস ঘটেছে। এছাড়াও উপত্যকা অঞ্চলে মৎস্যজীবী রাখাইন সম্প্রদায়, পাহাড়ি বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় গারো, খাসিয়া, খুমী, চামকা, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষসহ পূর্ববঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক ও ভাষিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পার্বত্য অরণ্যসংকুল দুর্গমপথ, সামুদ্রিক দ্বীপাঞ্চলের কারণেও জনপদের দূরত্ব ও ভাষার দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা ভাষা মানচিত্রের আন্তআঞ্চলিক যোগাযোগের মাপকাঠিতে বিচার করলে বোঝা যাবে উপভাসাসমূহের 'সহজবোধ্যতা' দুর্বোধ্যতা এবং 'প্রায় অবোধ্যতা' রয়েছে।[৪১] সমগ্র বাংলা ভাষামানচিত্রে ভাষাতাত্ত্বিক উপভাষার দূরবর্তী উপলব্ধির যে চিত্রটি দিয়েছেন তা বাংলাদেশের উপভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, বাংলাদেশের বর্তমান মানচিত্রে আলোচ্য তিন অঞ্চলের বিভাজন রেখা রাজনৈতিকভাবে একদা ত্রিপুরা (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ) রাঢ় (খুলনা বিভাগ) এবং গৌড় (উত্তর পূর্ববঙ্গ) বিভিন্ন সময় নানা রাজনৈতিক বিভাগের ফলে অন্তর্ভুক্ত এবং বিযুক্ত হয়েছিল। যা আঞ্চলিক ভাষাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি বা সিলেটের ভাষা প্রায় অবোধ্য কিংবা দুর্বোধ্য বলা চলে। সুতরাং বাংলাদেশের উপভাষা উপলব্ধিগত পরিস্থিতি[৪২] নিম্নরূপ চিত্রে দেখানো যায়।

চিত্র ১ ঃ চিত্রে বাংলাদেশের উপভাষা পরিস্থিতি

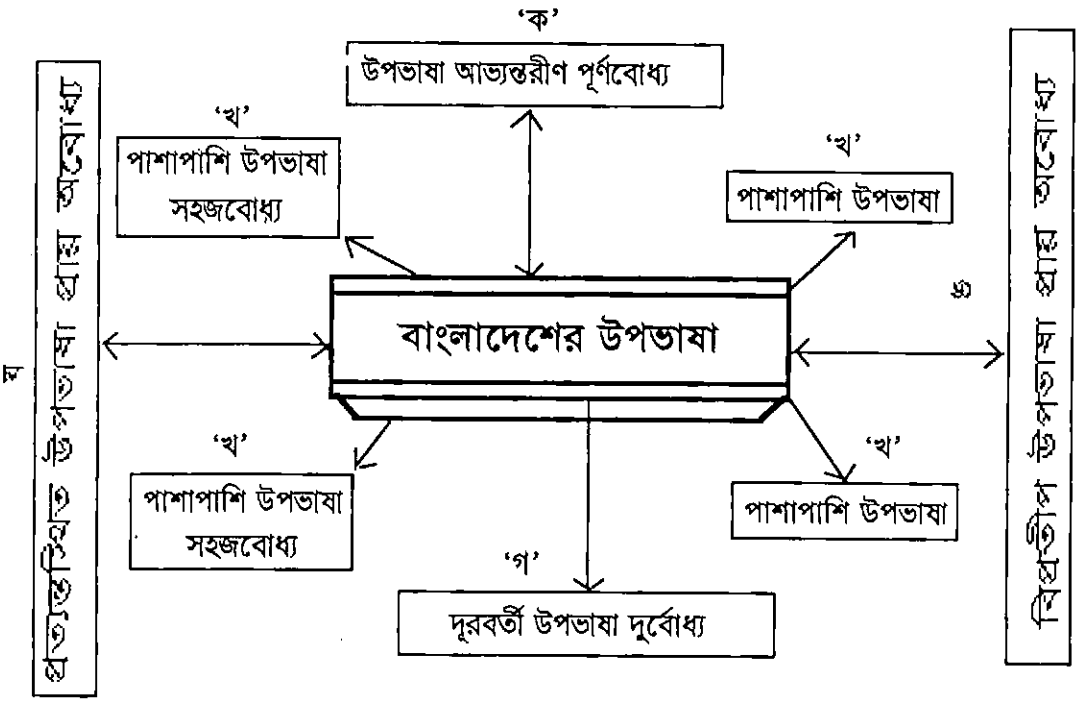

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত ভাষিক কাঠামোর ধারায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের কারণে উপভাষাগুলোকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

উত্তরবঙ্গীয় ঃ দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা

রাজবংশী ঃ রংপুর

পূর্ববঙ্গীয় ঃ ১. ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, (ত্রিপুরা)
২. ফরিদপুর, যশোর, খুলনা;

দক্ষিণবঙ্গীয় ঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, চাকমা।[৪৩]

এখানে পূর্ববঙ্গীয় ও দক্ষিণবঙ্গীয় প্রধান প্রধান উপভাষাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হবে। এইসব বৈশিষ্ট্যের আলোকেই কথাসাহিত্যের সমাজভাষার প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা হবে।

ঢাকাই উপভাষা ঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই ঢাকাই উপভাষাগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অভাবে এই অঞ্চলের সব উপভাষার মৌলবৈশিষ্ট্য নির্দেশ সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। বৃহত্তর ঢাকা জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যে সব উপভাষা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রায় অস্পষ্ট। তবুও এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ঢাকাই উপভাষাগুলো সম্পর্কে যে সব তথ্য দিয়েছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন তারই আলোকে প্রধান প্রধান উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। ঢাকাই উপভাষার পরিচয় প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেনঃ

> ঢাকা শহরে বাংলা ভাষার প্রধানতঃ তিনটি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড কলোকুয়াল বা চলিত কথ্যভাষা। ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা এবং ঢাকা এবং ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা।... ঢাকা জেলার এবং ঢাকা শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও পদ-গঠনের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। এ অঞ্চলের উপভাষাটি ধ্বনি গঠনগত দিক থেকে চলিত উপভাষার খুব নিকটবর্তী হলেও এর পার্থক্যটুকুই একে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিয়েছে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও মৈমনসিংহের নিতান্ত আঞ্চলিক রূপের খুঁটিনাটি বাদ দিলে বাংলার ঢাকাই উপভাষার রূপটিকে পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।''[৪৪]

বর্তমান ঢাকা মহানগরের সীমানা বা প্রশাসনিক পরিচয়ে এর আয়তন ১৫৫ বর্গমাইল। দক্ষিণে নারায়নগঞ্জ, উত্তরে টঙ্গি, পশ্চিমে-মোহাম্মদপুর, পূর্বে রামপুরা বাড্ডা, অদূর ভষ্যিতে (২০২৫) ঢাকার সীমানা উত্তরে কালিয়াকৈর কাপাসিয়া, দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ, পূর্বে নরসিংদী-সোনার গাঁ এবং পশ্চিমে কেরানীগঞ্জ-সাভার পর্যন্ত প্রসারিত হবে। লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটির মত। ভাষা-পরিস্থিতির দিক দিয়ে রাজধানী ঢাকায় আদর্শ কথ্য বাংলাসহ সব উপভাষা কমবেশী ব্যবহৃত হয়।[৪৫] ঢাকাই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ[৪৬]

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. কথ্য বাংলার মূল স্বরধ্বনি বা Phoneme-এর সঙ্গে ঢাকাই উপভাষার স্বরধ্বনি প্রায় অভিন্ন। মূল স্বরধ্বনি /ই/, /এ/, /এ্যা/, /আ/, /অ/, /ও/, /উ/, ঢাকাই উপভাষাতেও আছে।

২. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষার মত ঢাকাই উপভাষাতে অপিনিহিত /ই/ স্বরধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– কইরছে, মাইরছে, রইসলো, কইরলো, খাইছিল, বইলছিল, খাইতো, লাইগ্যা, শুইবার, ছাইলা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. চলিত বাংলায় মূল স্বরধ্বনির সব কটিরই স্বতন্ত্র আনুনাসিক রূপ আছে, কাচা > কাঁচা কিন্তু ঢাকাই উপভাষায় স্বতন্ত্র আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার নেই।

৪. ঢাকাই উপভাষায় স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় না, তবে শব্দের বিবর্তনে পূর্ববর্তী স্তরের নাসিক্য ধ্বনিটি রক্ষিত হয়। যেমন– চলিত বাংলায়– ক্রন্দন > কাঁদা > উ. ভা. কান্দা, কানদন চন্দ্র > চান্দ > চাদ চাঁন ইত্যাদি।

৫. ঢাকাই উপভাষায় স্বরধ্বনির অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে
/ই/	/ইটা/	/যাইস/	/কবি/
/এ/	/এই/	(বেডি) স্ত্রীলোক অর্থে	ব্যবহার নেই
/এ্যা/ /আ/	/এ্যাক/	/দ্যাহা/	/খেলা/, /খ্যালা/
/আ/	/আমি/	/দান/	/মা/
/অ/	/অহনে/ 'এখন' অর্থে /অগা/ বোকা অর্থে	/অহনে/	/হ/ 'হাঁ' অর্থে /বা/ 'বসো' অর্থে
/ও/	/ওযা/	/মোক/ 'মুখ' অর্থে /বোক/ 'ক্ষুধা' অর্থে	ব্যবহার নেই
/উ/	/উডি/ /উনে/	/মুনি/ /বুরি/	/মামু/

৬. /ই/, /উ/, /এ/, /ও/ এই চারটি অর্ধস্বরধ্বনিই ঢাকাই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। স্বরধ্বনিগুলো উপভাষা নির্বিশেষে দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphthong)-র শেষ উপাদান হিসাবে শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। ঢাকাই উপভাষায় দ্বৈত স্বরধ্বনিগুলোর ব্যবহার নিম্নরূপঃ এই ঃ /দেই/ অও ঃ /বও/ অয় ঃ /যর/, /নয়/ আওঃ /নাও/ ওই ঃ /বই/ এউ ঃ /দেউরি/এ্যাও ঃ /দ্যাও/ আউ ঃ /যাউ/ এ্যায় ঃ / দ্যায় ইত্যাদি।

৭. ঢাকাই উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই উপভাষায় মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্টধ্বনি ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ–এর ব্যবহার নেই। কোথাও কোথাও অঞ্চল বিশেষে সামান্যতম মহাপ্রাণতাগুণসহ বিপরীত স্পর্শ (Implosiv) জাতীয় /গ/, /জ/, /দ/, /ব/ ধরনের এক রকম ধ্বনি শোনা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে মহাপ্রাণতালুপ্ত বিপরীত ঘোষ স্পর্শধ্বনিগুলো তাদের স্বল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনায় নতুন অর্থবোধক স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে। যেমন– /বাত'/= 'ভাত' তুলনীয় অর্থে 'বাত' এক জাতীয় রোগের নাম। /দান/ = 'ধান' তুলনীয় অর্থে 'দান' সাহায্য অর্থে।

৮. শ স ষ–এর 'হ' রূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন ঃ সাপ > হাপ, সকল > হকল, শিয়াল > হিয়াল।

৯. ট, ঠ এর 'ড' ধ্বনিতে পরিবর্তন। যেমনঃ হাটে > হাডে, মাঠে > মাডে, কঠিন > কডিন, পটল > পডল, চিঠি > চিডি, পিঠা > পিডা ইত্যাদি।

১০. 'ড়', 'ঢ' ধ্বনির 'র' ধ্বনিতে পরিবর্তন। যেমন ঃ বাড়ি > বারি, বিড়াল > বিরাল, আষাঢ় > আহাড়।

১১. তালব্যবর্ণ ঘৃষ্টধ্বনি উষ্মধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ চ > ৎস, ছ > স।

১২. পদস্থ 'হ' ধ্বনি–অ রূপে উচ্চারণ রীতি প্রচলিত। যেমন ঃ হইবে > অইবে; হয় > অয়।

১৩. শব্দ মধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝে এবং শব্দের শেষে 'খ' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন ঃ যখন > যহন, এখন > এ্যাহন, লেখা > ল্যাহা, মাখন > মাহন ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আন্তঃস্বরীয় 'প' ধ্বনি ঘর্ষণজাত ওষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ টুপি > টুফি, দুপুর > দোফর, পাপ > পাফ, পেপার > ফেফার।

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. প্রাণীবাচক সর্বনামের প্রথম পুরুষে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের রূপভেদ লক্ষ করা যায়। স্ত্রীলিঙ্গবাচক একবচন ও বহুবচনের রূপগুলো– তায়, তায়রা, হাতায়, হাতায়রা ইত্যাদি নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ সমাজে ব্যবহৃত হয়– সাধারণ ও বহুল ব্যবহার নেই।

২. সকল প্রকার ক্রিয়ার কর্তাতে 'য়' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– বাবায় কইছে, দাদায় আইছে।

৩. সম্প্রদান কারক ও গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তির ব্যবহার। যেমনঃ 'ল্যাংড়াডারে ভিক্ষা দ্যাও'। 'আমারে কও'।

৪. অপাদানে 'থে', 'থন', 'থিক্যা', 'অতি' প্রভৃতি অনুসর্গ বা অনুসর্গীয় বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমনঃ হ্যাতে থিক্যা, এগোতে (তোদের থেকে), 'তাঙ্গোত্তে' (তাঁদের থেকে) ইত্যাদি।

৫. ক্রিয়াপদের গঠন প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যত অর্থে নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োগ। যেমন– 'হে যাইত না (সে যাবে না)।

৬. তুমর্থে (Inflnitve) 'অন' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন– করন, খাওন, দেহন ইত্যাদি।

৭. কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারক ও সম্বন্ধ পদে বহুবচনে স্বরান্তিক শব্দে 'গো' এবং ব্যঞ্জনান্তিক শব্দে 'এগো' ব্যবহৃত হয়। যেমন– 'মোগো' (আমাদের), পোলাগো (ছেলেদের) 'সায়েবগো' (সাহেবদের)।

৮. সম্বন্ধ পদে প্রথম পুরুষ সর্বনামে 'তাহার' স্থলে 'হের' হয় এবং সে (he) হ্যা রূপে উচ্চারিত হওয়ায় শব্দটি হ্যার (তার) হয়ে যায়। সম্ভ্রমে 'তাহার' স্থলে 'তাহান' এবং উচ্চারণকালে 'হ' উহ্য থাকে।

৯. উত্তমপুরুষের ভবিষ্যতকালে ক্রিয়ার শেষে চলিত বাংলার 'ব' এবং সাধু ভাষার 'ইব' ঢাকাই উপভাষায় 'মু' হয়। যেমন– যাইব > যামু, করব > করমু।

১০. অসমাপিকা ক্রিয়ার 'ইয়া' প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র syllable- রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– মারিয়া > মারইয়া, শুনিয়া > হুনঃইয়া।

১১. কর্তৃকারকের অন্তে 'টা', 'টি'–এর পরিবর্তে 'ডা' 'ডি' রূপ হয়। যেমন– ছেলেটি > পুলাডা, বুড়োটি > বুড়াডা, বোনটি > বোনডি ইত্যাদি।

ঢাকাই উপভাষার অঞ্চলটি মোটামুটিভাবে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জসহ পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলার অঞ্চল বিশেষের উপভাষাসমূহ নিয়ে মোটাদাগে বিভাজিত। মুহম্মদ আবদুল হাই স্বীকার করেছেন যে, চট্টগ্রাম, সিলেট নোয়াখালি এবং ময়মনসিংহের আঞ্চলিক রূপের খুঁটিনাটি বাদ দিলে ঢাকাই উপভাষার রূপটিই পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষার ভিত্তি রূপে গণ্য করা চলে।[৪৭] অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলার উপভাষার সঙ্গে ঢাকাই উপভাষার সাদৃশ্য আছে। তবুও উল্লেখ্য যে, ঢাকার নারায়নগঞ্জ এবং নরসিংদি জেলার আদিয়াবাদ অঞ্চলে স্বতন্ত্র উপভাষারূপ লক্ষ করা যায়।[৪৮] এই উপভাষা অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে মনিরুজ্জামান–এর মন্তব্যঃ

> ''আদিয়াবাদের ভাষা বলতে রায়পুরার সমগ্র দক্ষিণ–পশ্চিম ও দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের ভাষা বোঝাতে চাই; এক্ষেত্রে রায়পুরার ২৪টি ইউনিয়নের ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে এ ভাষা স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। বাকী ১৪টি ইউনিয়ন কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৈমনসিংহের সীমান্তবর্তী হওয়ায় সেগুলি ত্রিধাবিভক্ত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভাওয়ালের ভাষাও আছে, সুতরাং আদিয়াবাদ অঞ্চলকে স্বচ্ছন্দে একটি স্বতন্ত্র এলাকা হিসাবে ভাবলে সত্যের অপলাপ হবে মনে করি না।''[৪৯]

প্রান্তীয় উপভাষা পরিস্থিতিতে যদিও ভিন্নতা অসম্ভব নয়, কিন্তু তা নিতান্তই ভাষার ভঙ্গীগত ভিন্নতা। লক্ষ করা যাবে উপভাষাগুলো তার স্থানিক বৈশিষ্ট্যকেই রূপদান ও গ্রহণ করে এবং তাদের পারস্পরিক

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সূচিত করে। ভাষাতাত্ত্বিক বলেনঃ "The geographical difference can be recorded and when enough of them accumulate, we are justified in speaking of seperate dialects."[৫০] শুধুমাত্র ভৌগোলিক ব্যবধানেই উপভাষার স্বকীয়তা রক্ষিত হয় না। এর মূলে থাকে ধ্বনির অবস্থানগত, উচ্চারণগত প্রভেদ এবং শব্দকোষের ভিন্নতার মধ্যেও। ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ মনে করেন, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষা অঞ্চলে ভিন্নতর সামাজিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ব্যবহৃত হলেও রূপমূলগত ঋণ, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যে উপভাষার রূপমূল খানিকটা ভিন্নতর রূপে দেখা দেয়।[৫১] সুতরাং উপভাষার উচ্চারণগত বৈষম্য থাকলেও এর স্বকীয়তা হচ্ছে রূপমূলকেন্দ্রিক। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ঢাকার আদিয়াবাদের উপভাষা অঞ্চলকে সমরূপমূলীয় অঞ্চলরূপে (Isogloss) চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। নিম্নে ঢাকাই উপভাষা ও আদিয়াবাদ অঞ্চলের উপভাষার কয়েকটি রূপমূলের স্বকীয় রূপ দেখানো হলো।

আদর্শ চলিত বাংলা রূপ	ঢাকাই উপভাষা রূপ	আদিয়াবাদের উপভাষার রূপ
আমাদের	আমাগো	আঙ্গা
তোমাদের	তোমাগো	তোঙ্গা
এসো	আইয়ো	আহ/আয়েন
পাথর	পাতর	পাতঃর
ঘোড়া	গোরা	গোঃরা
ধুলা	দুলা	দুঃলা

অর্থাৎ দুই উপভাষায় স্বরসঙ্গতি এবং উঠতি স্বরের ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়াও আদিয়াবাদের উপভাষার অপিনিহিতি শব্দগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বরপূর্বিতা এবং অপিনিহিত সকল শব্দে আগমস্বর দ্বৈতস্বর বৈচিত্র্যে উচ্চারিত। ঢাকাই উপভাষা ও আদিয়াবাদ অঞ্চলের উপভাষার বহুমাত্রিক স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করে ভাষাতাত্ত্বিক মনিরুজ্জমান জানিয়েছেনঃ ''ঢাকাই উপভাষা' শব্দটির ঢালাও অর্থ ঢাকা জেলার সকল অঞ্চলের কথ্যভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিভিন্ন রূপ এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড নাগরিকরূপও গড়ে উঠেছে খুব দ্রুত; এভাবেই নারায়নগঞ্জ ও ঢাকার ভাষার সাম্য বা ঐক্য নারায়ণগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া দুষ্কর। ভাষার বিবৃতিমূলক পরীক্ষা অনুযায়ী আদিয়াবাদ অঞ্চলের উপভাষাকে একটি স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমূলক আন্তঃশাখা বা উপশাখা বলা যায়।''[৫২]

অপরদিকে, মূল ঢাকা শহরের ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ঢাকাই উপভাষার পাশাপাশি পুরোনো ঢাকার অধিবাসীদের কয়েকটি স্বতন্ত্র ভাষারূপও লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাজীব হুমায়ুন জানিয়েছেনঃ ''পুরোনো ঢাকার অধিকাংশ ব্যক্তিই দাবি করেন, তাদের মাতৃভাষা উর্দু। পুরোনো ঢাকার ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছে পুরোনো ঢাকার অধিবাসীদের ভাষা আসলে বাংলা, ঢাকাইয়া বাংলা। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পুরোনো ঢাকায় উর্দুর একটি উপ-ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহু পরিবার এখনো বাসায় উর্দুতে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করেন।''[৫৩] পুরোনো ঢাকা বলতে গুলিস্তান, আজিমপুর, চানখারপুল, হাটখোলা, বাসাবো, যাত্রাবাড়ীসহ দক্ষিণ পূর্বের দোলাইখাল এলাকাগুলোকে বোঝায়। এইসব এলাকায় কুট্টি এবং সুখবাসীদের বসবাস। সুখবাসীদের ভাষা ঢাকাইয়া উর্দু এবং কুট্টিরা মিশ্র বাংলায় কথা বলেন। তবে কুট্টিয়া ঢাকাইয়া উর্দু বোঝেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

বলতেও পারেন। জানা যায়, ঢাকাইয়া কুট্টিদের বসতি হয়েছে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময়। এই সময় নাসিরাবাদ, কুমিল্লা, সুধারাম, জালালপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দরিদ্র লোকেরা ঢাকায় এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং তারা বসতি স্থাপন করে। ঢাকা শহরের আমীর-কবীরগণ খাজনার পরিবর্তে প্রজাদের নিকট থেকে যে ধান আদায় করতেন, এসব লোকেরা ঢেঁকিতে সে ধান ভানতো এবং এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা ধানকোটার কাজ করতো বলে তাদের কুট্টি বলা হতো।[৫৪] কুট্টিদের ভাষায় মোঘল যুগ থেকেই উর্দুর মিশ্রণের ফলে বর্তমান রূপ লাভ করেছে বলে ডঃ রাজীব হুমায়ুন উল্লেখ করেছেন। তার মতে, 'দীর্ঘকাল বাংলা এবং উর্দু পাশাপাশি অবস্থানের ফলে ভাষা-ভাষীদের অজান্তে পুরোনো ঢাকায় ভাষা-সমন্বয় প্রক্রিয়া চলছে। উর্দু মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বাংলা বন্ধমূল যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে অনেক শব্দ।[৫৫] যেমন- 'সোচলাম', 'লোট আইছে', 'বাতলে দিলো' ইত্যাদি। এছাড়াও পুরোনো ঢাকার উপভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রচুর আঞ্চলিক উর্দু শব্দ এবং বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- থোরাসা, জরুরত, লাড়কী, তুরন্দ, এতনা, খত, মাগর, এক জেরেসী, শালা কা বাচ্চা, যাইবার ভী পারে, কান খোলকে শোন, পেয়ারের মাল, দশা বাজে এক একটি দানাভী গিলে নাইক্যা, সুবেরে সুবেরে ইত্যাদি।

ময়মনসিংহের উপভাষা ঃ

ঢাকাই উপভাষার সঙ্গে ময়মনসিংহের উপভাষার নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। গ্রিয়ারসনের ভাষায় "The dialect of Mymensingsh closely resembles that of Dacca."[৫৬] তবে মনমনসিংহের উপভাষায় আরবি ফারসি শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী সিলেটী উপভাষা এবং অসমিয়া ভাষার দ্বারাও এই উপভাষা আংশিক প্রভাবিত হয়েছে।[৫৭] ময়মনসিংহ জেলায় অশিক্ষিত মুসলিম জাতি এবং আঞ্চলিক বাংলা ভাষাভাষীর উপভাষা ছাড়াও 'হাজং' নামে অপর একটি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। নিম্নবর্গীয় এইসব 'হাজং' উপ-আঞ্চলিক ভাষীরা (sub dialect) তিব্বতি বর্মিজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে ময়মনসিংহের বাংলা উপভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. ময়মনসিংহের উপভাষার সাধারণত পাঁচটি স্বরবর্ণের ব্যবহার হয়। যথা- অ, আ, ই, উ, এ।

২. এই উপভাষার উ এবং ঋ ধ্বনির ব্যবহার নেই। এ-কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহ্য। পদমধ্যস্থ স্থানে উহ্য থাকে।

৩. ও-কার সব সময় 'উ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- দোষ < দুষ, চোর < চুর, ঘোড়া < গুরা ইত্যাদি।

৪. ঐ ধ্বনির স্থলে 'অই' এবং ঔ স্থলে অউ ধ্বনি রূপ হয়। যেমন- কৈবর্ত < কইবর্ত, ঔষধ < অউষধ ইত্যাদি।

৫. ঋ ধ্বনির স্থানে 'ইর' রূপ হয়। যেমন- ঘৃত < ঘিরত্, গিরৃত।

৬. বর্ণের পরবর্তী 'ই', 'উ' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ যিনি < যাইন, তিনি < তাইন, ঠাকুরাণী < ঠাউক্‌রাইন ইত্যাদি।

৭. শব্দান্তে 'ক' সব সময় 'গ' হয়। যেমনঃ ঠক < ঠগ, বক্ < বগ্, শাক > শাগ, হাগ ইত্যাদি।

৮. 'ঘ' ধ্বনি 'গ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ ঘাম < গাম, ঘোড়া < গুরা। স্বরবর্ণ 'ঘ' এর পর থাকলে পূর্বস্বরে চাপ পড়ে। যেমন- বাঘ < বাগ ইত্যাদি।

৯. শব্দান্তে ট, ঠ ধ্বনি যথাক্রমে 'ড' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ বেটা < বেডা, পিঠা < পিডা, চিঠি < চিডি।

Dhaka University Institutional Repository

১০. শব্দের আদিতে 'ঢ' ধ্বনি 'ড' রূপে উচ্চারিত। যেমনঃ ঢাক < ডাক, ঢোল < ডোল, ঢাকা < ডাগা ইত্যাদি।

১১. ড়, ঢ ধ্বনি 'র'-রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ পড়া < পরা, আষাঢ় < আষার ইত্যাদি।

১২. 'ধ'-এর উচ্চারণ প্রায় 'দ' তুল্য। যেমনঃ ধান < দান, ধর < দর ইত্যাদি।

১৩. 'প'-এর উচ্চারণ 'ফ' হয়। যেমনঃ পানি < ফানি, সাফ < হাপ ইত্যাদি।

১৪. 'ভ' ধ্বনি 'ব' ধ্বনিতে পরিণত হয়। ভাত < বাত, ভয় < বয়।

১৫. ম-ফলার উচ্চারণ নেই। অনুস্বর তুল্য চন্দ্রবিন্দু লোপ হয়। কিন্তু 'ন' স্থানে চন্দ্রবিন্দু না হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই 'ন' ই থাকে। যেমনঃ জন্ম < জনম, চাঁদ < চান, বাঁদর < বান্দর, আঁধার < আন্ধার, কাঁদা < কান্দা, ইঁদুর < ইন্দুর, ইঁদারা < ইন্দারা ইত্যাদি।

১৬. শ, ষ, স-এর স্থলে 'হ' হয়। যেমনঃ সকল < হগল, ষাঁড় < হাঁড়, বসো < বহ, বও, শুয়ার < হুয়ার ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্য অসমীয়া ভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়।

১৭. আবার 'হ' ধ্বনি কখনো কখনো 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ হরিণ < অরিণ, হাত < আত ইত্যাদি।

১৮. আ-কারের অন্তঃস্থিত 'ই' কারান্ত 'ত', 'থ' দ্বিত্ব হয়। যেমনঃ হাতি < আত্তি, লাথি < লাত্তি ইত্যাদি।[৫৮]

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বিভক্তি অনুযায়ী সর্বনাম পদের বহুবচনে বিভিন্ন রূপ হয়। যেমন– ১মা বিভক্তিতে আমরা, তুমরা, তরা, আপনেরা, তারা, তানারা। ২য়া বিভক্তিতে আমরারে, আপনেরারে, তানারারে, তুমরারে। ৩য়া বিভক্তিতে আমরারে দিয়া, তোমরারে দিয়া ইত্যাদি। ৫মী বিভক্তিতে আমরার থাইক্কা, তুমরার থাইক্কা ইত্যাদি। ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে আমরার, তুমরার, আপনেরার ইত্যাদি। ৭মী বিভক্তিতে আমরারে, আমরার মদ্যে ইত্যাদি।

২. বহুবচনে প্রাণী ও বস্তুবাচক শব্দে 'গুলাইন' (গুলিন), 'গুলাক' প্রত্যয় হয়। যেমন– গরুগুলাইন, গাছগুলিন, কাপড়গুলাক ইত্যাদি।

৩. কখনো কখনো বহুবচনে 'গুলিন' এবং 'গুলাইন' শব্দ সংক্ষিপ্ত রূপে 'আইন' হয়। যেমন– ছেঁড়া (ছোকরা) গুলিন > ছেঁরাগুলাইন > ছেঁরাইন, বেডা (বেটা) গুলিন > বেডাগুলাইন > বেডাইন ইত্যাদি।

৪. ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষণ পদের নিজস্ব রূপ লক্ষণীয়। যেমন– ঠাণ্ডা < ডাঁইয়া, হঠাৎ < আৎকা, কালা, বধির < হাটকা, কুশ্রী, অসুন্দর < আছাব্বা, লোভী < ছাবরা, নোংরা < খোডাস ইত্যাদি।

৫. এই উপভাষায় ক্রিয়াপদের আঞ্চলিক রূপ লক্ষণীয়। যেমন– হামাগুড়ি দেয়া < আমথুর দেয়া, ছটফট করা < ধোফ্‌রান, চুলকান < খাজুয়ান, লাফ দেওয়া < ফালপারা, জিজ্ঞাসা করা < জিংগান, অনুসন্ধান করা < বিদরান, দোলা দেয়া < জইল্যান, শয়ন করা < হুতব ইত্যাদি।

সিলেটী উপভাষা ঃ

সিলেট জেলার উপভাষাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমনঃ (১) উত্তর শ্রীহট্ট, দক্ষিণ শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ এবং (২) সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ভৌগোলিক সীমার দিক থেকে উত্তরে খামীয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড়, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা জেলা এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুত সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহ জেলা পরস্পর সন্নিহিত হওয়ায় এই অঞ্চলের উপভাষাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উচ্চারণগত সাদৃশ্য রয়েছে।[৫৯] সিলেটী উপভাষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. সিলেটী উপভাষায় ই এ এ্যা অ আ ও উ স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়।

২. দুই ও ততোধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষের 'অ' ধ্বনি প্রায় 'আ'-তে পরিণত হয়। যেমনঃ
কাল > ক'লা, ইঁট > ইঁটা, পৌষ > পু'য়া, গেল > গেলা, অণ্ড > আণ্ডা, অগ্র > আগা, পুত্র > পু'য়া, আইল > আইলা, যাইত > জ'াইতা, খাইক > খাউকা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষর 'অ' কখনো কখনো 'আ' স্বরে পরিণত হয়। যেমন– ক্রন্দন > কান্দন, অকর্ম > আক'াম ইত্যাদি।

৪. কখনো শব্দের 'অ' ধ্বনি 'অই' এবং 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ কন্যা > ক'ইন্যা, সত্য > সইত্য, লন > ল'ইন, বক্র > বেঁকা, খড় > খে'র ইত্যাদি।

৫. সিলেটী উপভাষায় শব্দের 'আ' ধ্বনি কখনো কখনো লুপ্ত হয়। যেমনঃ নিদ্রা > নিন্দ, তোমাদের > তোমরার, আমাদের > আমরার, খেলা > খে'ইল ইত্যাদি।

৬. সিলেটী বাংলায় 'আ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে আই, আও, অ্যা, ই, এ, ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন ঃ আ > আই ঃ কাত > কা'ইত, মা > মাই, খান > খা'ইন, যান > জ'াইন; আ > আও ঃ ছা > ছাও, না > নাও, রা > রাও; আ > অ্যা ঃ ভাসিতেছে > ব্য'াসত্যোছে; আ > ই ঃ ছাতা > ছ'াতি, পাছে > পি'ছে; আ > ও ঃ কাঁটাল > কা'টল।

৭. শব্দের আদিতে 'অ্যা' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ জ্যাঠা > জে'ট।

৮. সিলেটী উপভাষায় শব্দস্থ 'ই' ধ্বনি যথাক্রমে 'আ', 'অ্যা', 'আই', 'ইই', 'উ', 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ই > আ ঃ ঢিল > ড'াল; ই > অ্যাঃ ঢিল > ড'্যাল; ই > আইঃ তিনি > তাইন; ই > ই ইঃ বিবাহ> বিয়া > বিইয়া; দিয়া > দিইয়া; ই > উঃ বালি > বালু; ই > এ ঃ আপনি > আপনে, যিনি > জে'ইন, জীবিত > জে'তা, ইনি > এ'ইন ইত্যাদি।

৯. শব্দ মধ্যস্থ 'ঈ' ধ্বনি সিলেটী উপভাষায় 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ মালী > মালীএ > মাল্যে।

১০. শব্দ মধ্যস্থ 'উ' ধ্বনি সিলেটী উপভাষায় লুপ্ত হয়। যেমনঃ আলুনি > আল্‌নি, রাঁধুনী > রা'দনী।

১১. সিলেটী বাংলায় 'উ', 'ঊ' ধ্বনি 'অই', 'আ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ঊ > অই : শিমুল > শিমইল্‌। উ > আ : শুধু > হুদা উ > অই : চালুনী > চ'ালইন, কুড়ুল > কু'র'ইল।

১২. 'ঋ' ধ্বনি 'ই', 'ইর', 'অ', ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন ঃঋ > ই : পৃষ্ঠ > পিঠ > পি'ট, শৃগাল > হিয়াল; ঋ > ইর : ঘৃত > গিরত্‌', গি; ঋ > অ : মৃগেল > ময়াল, দৃঢ় > দর ইত্যাদি।

১৩. বাংলা ভাষার 'এ' ধ্বনি সিলেটী উপভাষায় 'অ', 'অউ', 'আ', 'অই', 'আই' 'এই', 'অ্যা', 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ এ > অ : তলের > তলর্‌ পরের > পরর্‌, আক্কেল > আক্ক'ল।এ > অউ : মেসো > মউয়া। এ > আ : বেটে > বাট্টি, গেঁয়ো > গাইয়্যা ইত্যাদি। এ > অই : রহিয়াছেন > রইছ'ইন, লইয়াছেন > লইছ'ইন, এ > আই : হইলেন > অইলেন, হইবেন > অইবাইন, এ > ই : যেখান > হিখান, ঘেরা > গিরা, এ > এই : খেলা > খেল > খে'ইল (magic), এ > অ্যা : এক > অ্যাক্‌, এমন > অ্যামুন, এ > ও : সেই > হোউ, ওউ।

১৪. বাংলায় ব্যবহৃত 'ও' ধ্বনি সিলেটী উপভাষায় 'উ' অ্যা এবং ঔ ধ্বনি 'অ', অই', 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ও > উ : ঘোড়া > গু'রা, সোনা > সুনা, ও > অ্যা : গেঁয়ো > গাইয়্যা। ঔ > অ : ঔষধ > অষুদ, ঔ > অই : চৌধুরী > চৈ'দরী, ও > উ : পৌষ > পু'য়া ইত্যাদি।

১৫. সিলেটী উপভাষায় বিনা কারণে স্বরাগম ঘটে। যেমনঃ 'ই' আগম : কাত > কা'ইত, মার > মা'ইর, খেলা > খে'ইল, উ আগম : ভাজ > বা'উজ, মাগ > মাউগ্‌।

১৬. অন্ত্য ও মধ্যস্বরের লোপ ঘটে। যেমনঃ হইতেছিল > 'অইত, খাইতেছিল > খা'ইত, নিদ্রা > নিন্দ (গুনু)।

১৭. সিলেটী উপভাষায় 'ক' বর্ণের উচ্চারণ 'খ' বর্ণের মতো। যেমনঃ করিম > খ'রিম, কবি > খ'বি ইত্যাদি।

১৮. 'ঘ' বর্ণের উচ্চারণ 'গ'–এর মতো। যেমনঃ ঘাস > গাস্‌, ঘর > গ'র, বাঘ > বাগ ইত্যাদি।

১৯. সিলেটী উপভাষায় 'ঠ' > 'ট', 'ট' > 'ড' এবং ট > ত–রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ লাঠি > লাটি, পিঠ > পি'ট্‌, এইটা > এইডা, এটা > এডা, এটা > ইতা, কোনটা > কুন্‌তা।

Dhaka University Institutional Repository

২০. চ বর্ণ 'ড' এবং 'থ' বর্ণ 'ত' তে পরিণত হয়। যেমনঃ চ > ড : ঢোল > ডু'ল, ঢাক > ড'াক, থ > ত : মাথা > মা'তা, থালা > ত'ালা ইত্যাদি।

২১. 'শ' 'ষ' 'স' তিনটি বর্ণের উচ্চারণ প্রায়ই 'হ' হয়। যেমনঃ সাপ > হাব, সাত > হাত্, সারা > হারা ইত্যাদি।

২২. কখনো কখনো 'হ' লুপ্ত হয়ে 'অ' হয়। যেমনঃ হইত > 'অইত, হইল > 'অইল ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. সিলেটী বাংলায় যে সব বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো প্রায়ই বাংলার অনুরূপ। শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রে কিছু রূপান্তর ঘটেছে। যেমনঃ রামে জা' ক'ইল তা টি'ক না (রামে যাহা বলিল তা ঠিক নয়) ইত্যাদি।

২. বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্য শব্দের বিশেষ রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ বইন > বোন, বাগিনী < ভাগিনী, অরিণ < হরিণ, দামান্দ < জামাই ইত্যাদি।

৩. বাংলায় প্রচলিত সর্বনাম পদগুলো সিলেটী বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমনঃ অখ'নকু' < এখন, অমুলা < তেমন, এইন্ < ইনি, এব্যালাকু < এ বেলা, জে'সাকে < যাকে ইত্যাদি।

৪. বিশেষণ পদের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। যেমনঃ আউয়া < বোকা, আচ'াটা < অভদ্র, নাটা < নষ্ট, হত্তর < সত্তর, হাতাত্তর্ < সাতাত্তর, লক্ক' < লক্ষ ইত্যাদি।

৫. সিলেটী উপভাষায় অব্যয় পদ এবং ক্রিয়া বিশেষণের নিজস্ব রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ ইন্ত'নে < এখান থেকে, ত'নে < থনে < হতে, সুর'ায় মুর'ায় < ঘুরে ঘুরে, লগে < সঙ্গে, হুদা < শুধু ইত্যাদি।

৬. শিষ্ট বাংলায় এবং সিলেটী উপভাষায় বিভিন্ন লিঙ্গের শব্দরূপ প্রায় অভিন্ন। শুধুমাত্র উচ্চারণগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ ব'াই < ভাই, বইন্ < বোন, বুরা < বুড়া, বুরী < বুড়ী, বাগ < বাঘ, বাগি'নী < বাঘিনী।

৭. 'ইতে', 'ইলে' এবং 'ইয়অ' বিভক্তি যোগে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। সিলেটী উপভাষাতেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন– 'ইতে', 'ইলে' এবং 'ইয়া' বিভক্তি হলে কোথাও কোথাও 'ই' কারের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হয়।

৮. সিলেটী বাংলায় ধাতুর সঙ্গে 'উরা' বা 'রা' প্রত্যয় যোগে কতকগুলো বিশেষণ পদ উৎপন্ন হয়। যেমনঃ √খ'া + উর'া = খা'উরা (খাদক), √পি'র' + উর'া = প'উরা (পড়ুয়া), √হুন্ + রা = হুন্‌রা শ্রোতা ইত্যাদি।[৬০]

ফরিদপুর ও বরিশালের উপভাষা ঃ

ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬১] বর্তমানে জেলা বিভাজনে পৃথক হলেও আদিকাল থেকেই এই জনপদের ভাষাভাষীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র ছিল বলে ধারণা করা যায়। পূর্ব–কেন্দ্রীয় শাখার উপভাষারূপে এইসব জেলার কথ্য ভাষায় মিল রয়েছে প্রচুর। গ্রিয়ারসন বলেন, "The dialects of the districts of Faridpur, Jessore and Khulna form a Connecting link between the standard language of central Bengali, and the extreme Eastern type which we find in Dacca and Backergonge."[৬২] তবে সূক্ষ্ম বিচারে লক্ষণীয়, এইসব জেলার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একই রকম ধ্বনিগত উচ্চারণ প্রচলিত নয় বলে অঞ্চল বিশেষের কথ্যভাষায় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুরের কথ্যভাষা রাঢ়ী ও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার সেন্ট্রাল স্টেজে এবং বরিশালের কথ্যভাষা ঢাকার কেন্দ্রীয় পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার নিকটবর্তী বলে

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি দুই অঞ্চল ফরিদপুর ও বরিশালের ভাষায় কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত পার্থক্য আছে। নিম্নে এই দুই অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

ফরিদপুরের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. আলোচ্য কথ্য ভাষায় বিভিন্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়ঃ ও > অ – কোরবো > ক্রব্, বোলবো > বল্‌ব ইত্যাদি। অ > উ – দিব > দিবু, সন্ধ্যা > সুইন্দে', এ > এ্যা – একা > এ্যাকা, কেন > ক্যান; এ, ই > ও পেঁপে > পেঁপো, তেলি > তেলো ইত্যাদি।

২. বহুবচনে 'গোর' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন– আমাগোর, তোমাগোর, চাকরগোর ইত্যাদি।

৩. প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের বিভক্তি রূপে শিষ্ট বাঙ্গার মত ফরিদপুরের কোন কোন অঞ্চলে 'বো'– ব্যবহৃত হলেও গোয়ালন্দ অঞ্চলে 'মু' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– যাবো > যামু, খাব > খামু ইত্যাদি।

৪. এই উপভাষায় 'ক' এবং 'খ'–এর মধ্যস্বর 'হ'–তে পরিণত হয়। যেমনঃ বকরী > বহরী, শুকুর > শুহুর, মাখন > মাহন ইত্যাদি।

৫. কখনো কখনো 'ক' ধ্বনি 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– সকলে > সগলে ইত্যাদি।

৬. 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– রবিবার > লবিবার।

৭. 'র' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– রাঙা > নাঙা, রহিম > নহিম ইত্যাদি।

৮. 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– লবন > নবন, লাল > নাল ইত্যাদি।

৯. পূর্ববঙ্গীয় অন্যান্য উপভাষার মতো ফরিদপুরের উপভাষাতেও 'শ', 'স' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– সাপ > হাপ, সবুজ > হবুজ, 'শোনা' > হুনা ইত্যাদি।[৬৩]

বরিশালের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বরিশালের উপভাষায় স্বরধ্বনির ই, এ, এ্যা, আ, অ ও উ বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়। এ > আ এসো > আইস, এ > এ্যা – বেটা > ব্যাডা, অ্যা > এ্যা – দাও > দ্যাও, ও > ঔ – রয়েছে > রৈসে, উ > ই উঁচু > উচি'য়া।

২. ট, ঠ > ড – বেটা > ব্যাডা, মিঠা > মিডা, চিঠি > চিডি;

৩. ঘ, ছ, ঝ, হ, থ, ধ, ফ মহাপ্রাণ ধ্বনি গ, চ, জ, ড, ত, দ, ন ইত্যাদি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– ঘর > গর, ধান > দান, ভাত > বাত, পড়ি > পরি, পাড়ি > পারি ইত্যাদি।

৪. শব্দের আদিতে 'হ' ধ্বনি 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– হয়েছে > অইচে, হাওলাদার > আওলাদার।

৫. কর্তৃকারক 'এ' বিভক্তি হয়। যেমন– হে মোরে মারছে।

৬. ক্রিয়াবাচক আসা, খাওয়া, খাওয়া প্রভৃতি শব্দ আবা, খানা, খাবা রূপ পায়।[৬৪]

যশোর জেলার উপভাষা ঃ

বাংলা উপভাষা মানচিত্রে যশোরের অবস্থান সন্ধি–অঞ্চলে। ভৌগোলিক বিভাজনে বাংলা উপভাষার দুই প্রধান স্থানের মাঝে যশোরের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। 'প্রকৃত প্রস্তাবে যশুরে ভাষা রাঢ়ী ও পূর্ববঙ্গীয় (বাঙ্গালি) ভাষার মধ্যবর্তী অবস্থান বা সেতু।[৬৫] গ্রিয়ারসন বাংলা উপভাষার 'সেন্ট্রাল' উপভাষার পূর্বাংশের এই ভাষা অঞ্চলকে ''ট্রানজিসন স্টেজ'' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "In the centre of the delta, in the Districts of Khulna, Jessore and Faridpur, the language is in a transition stage."[৬৬] অর্থাৎ পূর্বভঙ্গীয় উপভাষার দ্বিতীয় শাখায় যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের উপভাষার অবস্থান। একদিকে পশ্চিবঙ্গীয় রাঢ়ী উপভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক উপভাষা, অন্যদিকে পূববঙ্গীয় ভাষার প্রান্তিক অঞ্চলের কয়েকটি উপভাষার সংযোগস্থলে যশুরে উপভাষার অবস্থান। এ জন্যে যশোরের সব অঞ্চলেই একইরূপ উপভাষা প্রচলিত নেই। গবেষকের মন্তব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

> যশোহরের সর্বত্র ভাষার একই রূপ প্রচলিত নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষা সন্নিহিত জিলার ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নড়াইল যশোহরের পূর্ব প্রান্ত পার্শ্ববর্তী জিলা ফরিদপুরের অতি নিকটে অবস্থিত, সে জন্যে নড়াইলের ভাষায় পূর্ববঙ্গের প্রভাব বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। আবার বনগাঁ (বনগ্রাম) যশোরের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। সে জন্য এ অঞ্চলের কথার সঙ্গে সন্নিকটবর্তী জিলা চব্বিশ পরগণার কথার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আবার যশোহরের দক্ষিণে খুলনা জিলা অবস্থিত। সে জন্যে দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষা আবার খুলনার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত।[৬৭]

সুতরাং যশোরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত উপভাষার বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে। যশোরের উপভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য চিহ্নিত করতে গিয়ে গবেষক কতকগুলো বিভাষার প্রভাবের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে পশ্চিমাংশে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভাষাপুষ্ট রূপ, বশিরহাট ও সাতক্ষীরার বিভাষা প্রভাবিত রূপ, অন্যদিকে পূর্ব–দক্ষিণাংশে নড়াইল, মাগুরা, ফরিদপুর, খুলনা জেলার কথ্য ভাষার প্রভাব ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিবাসনকৃত (Migration) জনগণের ভাষার মিশ্ররূপ, অবাঙালিদের কথ্য ভাষার রূপ, পেশা–ধর্ম–লিঙ্গাভিত্তিক ভাষারূপের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।[৬৮] নিম্নে যশোরের উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. যশোরের উপভাষায় 'অ', 'আ', 'ই', 'এ', 'এ্যা' 'উ' ও মূল স্বরধ্বনি ছাড়াও 'ও' এবং 'অ' স্বরধ্বনির মাঝামাঝি 'অও' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমনঃ গত্তোর < গর্তের, কইরতো < করতো ইত্যাদি।

২. 'এ্যা' 'অ' ছাড়া অন্যান্য স্বরধ্বনি শব্দের আদি মধ্য ও অন্তে উচ্চারিত হয়।

৩. 'এ্যা' ধ্বনি শব্দান্তে উচ্চারিত হয় না। আদি ও মধ্যে উচ্চারিত হয়।

৪. 'এ' স্বরধ্বনি শব্দের আদিতে কম উচ্চারিত হয়। এই ক্ষেত্রে 'এ' স্থলে প্রায় 'এ্যা' উচ্চারিত হয়।

৫. দ্বিস্বর ধ্বনির ব্যবহার বৈচিত্র্য ব্যাপক। যেমন ঃ হই – গিচি (গিয়েছি), ইত্র – নিয়ের (শিশির), এ এ – এয়েলো (এসেছিল), ছেলে (দিলো), এও – ছেলো (দিল), উই – যুই (রাখি), অএ – অরে (কবে), উয়া – উয়া (খোয়া)।

৬. একাক্ষরে, স্বরসাম্যে, সন্ধিতে নিম্নতর ধ্বনির (এ, ও) উন্নয়ন বা উর্ধায়ন (raising) হয়। যেমনঃ কইতে > কতি, খাইতে > খাতি, দেই > দি, নেই > নি, শুকিয়ে > শুয়োয়ে, নিয়েছে > নেছে ইত্যাদি।

৭. সম্মুখ ধ্বনির ক্ষেত্রেও এই রীতি প্রযোজ্য। যেমনঃ বোন > বুন, তোতার > তুতার ইত্যাদি।

৮. শিষ্ট বাংলার মতো যশোরের উপভাষায় শব্দের আদিতে 'ঙ', 'ং' 'ণ', 'ড়' ধ্বনির উচ্চারিত হয় না।

৯. যশোরের উপভাষায় 'চ' ধ্বনি কোথাও ব্যবহৃত হয় না। 'ঢ়' ধ্বনি এই উপভাষায় 'ড়' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

১০. শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। 'র' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিকে পরিণত হয়।

১১. মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ শব্দের মধ্যেও অন্তে মহাপ্রাণতা হারিয়ে অন্যান্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ

(ক) 'খ' ধ্বনি 'ক' অথবা 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। (খ) 'ঘ' ধ্বনি 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

(গ) 'ছ' ধ্বনি 'চ'–এর মতো উচ্চারিত হয়। (ঘ) 'ঠ' ধ্বনি মধ্য ও অন্তে 'ড' ধ্বনিতে পরিণত হয়। (ঙ) 'ধ' ধ্বনি 'দ' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। (চ) 'ফ' ধ্বনি 'প' রূপে উচ্চারিত। (ছ) 'ভ' ধ্বনি 'ব' এবং 'ট' ধ্বনি 'ড' রূপে উচ্চারিত হয়।

১২. দুই ব্যঞ্জন কখনো কখনো এক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যেমনঃ ধরতে> ধত্তি, মরতে > মত্তি, করলাম> কল্লাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আনুনাসিক স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়ে নাসিক্য ধ্বনির আগম ঘটে। যেমনঃ কাঁধ > কান্দ, চাঁদ > চান্দ ইত্যাদি।

১৪. পদমধ্যস্থিত অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ দিকে > দিগে, ছোট > ছোড, শাক > শাগ, বক > বগ ইত্যাদি।

১৫. 'ল' স্থানে 'ন' আবার কোথাও কোথাও 'ন' স্থানে 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমনঃ লাল > নাল, নীল > লীল।

১৬. পদ মধ্যস্থিত 'খ' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ পুকুর > পুহুর, দেখাচ্ছে > দ্যাহাচ্ছে ইত্যাদি।[৬৯]

১৭. সামান্য অতীত উত্তম পুরুষে 'লাম' বিভক্তির প্রয়োগ হয। যেমনঃ আমি দ্যাকলাম।

১৮. তুমর্থে 'তে' এর পরিবর্তে 'তি' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমনঃ যেতো > জাতি, শুতে > শুতি, খেতে > খাতি।[৭০]

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. যশোরের উপভাষার কারক বিভক্তি নিম্নরূপ ঃ
   ১মা : শূন্য, এ, তি (ছাওয়ালে, গরুতি)
   ২য়া : রে, গে, গের (আমারে দিতি হবে, তারগে দে)
   ৩য়া : (রে) + দিয়ে (তোমারে দিয়ে, তোমাদ্দে)
   ৪র্থী : রে > র (ভিখিরির দুডো ভাত দাও)
   ৫মী : তে, থে, (বানেথে, খামেতে)
   ৬ষ্ঠী : র, এর, ইর (বড়র, চোহির)
   ৭মী : এ (য়), এ > ই, তে > তি (ঘরে, লম্পায়, বিলি, নদিতি)।

২. যশোরের উপভাষায় সর্বনাম পদের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নিজস্ব রূপ লক্ষণীয়। যেমন– আমাগে, তুই, তুরা, তুমাগে, তুমাগের, তুমাগেরে, তেনার, আহনে।

৩. অব্যয় পদেরও নিজস্ব রূপ আছে। যেমনঃ আপতোকে পরোত্ত–নিজিরগে (নিজিগের); ইস্তিক, এ্যালো ইত্যাদি।

৪. ডা. ডি. ডে, ডো খোন, খানি ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমনঃ দশডা, ভাইডি, ঘটিডে, দুখোন, চাড্ডিখানি ইত্যাদি।

৫. যশোরের উপভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদসমূহে বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়, ইতে ক্রিয়াপদে 'তি', 'আতে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদে 'ওতি', 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ায় 'এ' বা 'য়ে' বা 'ওয়ে' এবং 'ইয়ে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের শেষে 'আয়' বা 'এ' (য়ে) যুক্ত হয়।

৬. 'লে' বা 'ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে 'লে' বা ইলের পরিবর্তে 'ল' যুক্ত হয়।

৭. বর্তমানকালের ক্রিয়াপদের রূপ হচ্ছেঃ দি, দিস, দ্যাত্ত, দিতিচি, দিচ্ছি, দিতিচ, দিতিচি, দেচ্ছে, দিতিচেন, দিছি, দেদো, দিছিস ছেদে, দেহেন ইত্যাদি।

৮. অতীতকালের ক্রিয়াপদের রূপঃ দিছিলাম, দিছিলে, দিছিলি, দেছোলো, দেলো, দিতিচিলাম, দিতিচ্চিলে, দেচ্চেলো।

৯. ভবিষ্যতকালের ক্রিয়াপদের রূপঃ দেবো, দিবা, দিবি, দেবেন, দেবো, দিবেন, দিতি থাকপানে, দেবেন, দেবেন্নে, দিতি থাকপেন ইত্যাদি।

১০. অন্যান্য ক্রিয়ারূপ ঃ ইলে > লি (আলি, নিলি, কল্লি)। ইয়া > 'য়ে, এ, ই (আঁটে– যায়ে হককায়ে উঠোয়ে, দে' বসি– ঝুলি), ইতে > তি, ওতি (কতি, লিখতি, শিখতি, বুলোতি, গুছোতি)।[৭১]

খুলনার উপভাষা ঃ

বস্তুত,যশোরের খুলনার প্রান্ত অঞ্চল থেকে অবিমিশ্র প্রাচ্য বাংলা উপভাষার সূচনা। গ্রিয়ারসন বলেছেন, "Eastern Bengali Proper Commences in the district of Khulna and Jessore and

Dhaka University Institutional Repository

covers the whole of the eastern half of the genetic delta."[৭২] সুতরাং যশোর, খুলনা এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাসমূহের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য আছে; তবে এগুলোর প্রত্যেককে এক একটি উপভাষা বলা যাবে না। বরং এগুলোকে আমরা উপআঞ্চলিক ভাষা বা বিভাষা বলতে পারি। লক্ষণীয় খুলনার পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ সাতক্ষীরার বিভাষায় রাঢ়ী উপভাষার প্রান্তিক অঞ্চলের (২৪ পরগনা, কলকাতা) ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার খুলনার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বাগেরহাট বাদাবন অঞ্চলের বিভাষার সঙ্গে ফরিদপুরের দক্ষিণ পশ্চিঞ্চালের উপভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। সামগ্রিকভাবে খুলনার উপভাষাকে ও উপ–আঞ্চলিক শাখায় ভাগ করা সম্ভব। এখানে সামগ্রিকভাবে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করা হবে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বাংলা ভাষার মূলস্বরধ্বনি– অ, আ, ই, উ, এ, ও অ্যা খুলনার উপভাষাতেও বজায় আছে। তবে উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে আঞ্চলিক রূপের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।[৭৩]

২. নিম্নমধ্যও পশ্চাত স্বরধ্বনি 'অ'–এর উচ্চারণে ভিন্নতা নিম্নরূপ ঃ অ > ও – পচা > পোচা, ধরা > ধোরা, অ > উ – দিব > দিবু, কাপড় > কাপুড়, অ > এ – গর্ভিনী > গেরনা, জহর > জেওর ইত্যাদি।

৩. শব্দস্থিত 'আ' ধ্বনিও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমনঃ আ > অ – কাঁচা > কঁচা, ধাক্কা > ধক্কা, আ > এ – আক্কেল > এক্কেল, থাকিল > থেক্‌লো, আ > ই – থালা > থালি, লেখাপড়া > নেকাপড়ি, পদান্ত 'আ' লুপ্ত – বেলা > বেল্, সাড়া > সাড়্, আ > অ্যা – ডাঙা > ড্যাঙা, ডাঙর > ড্যাঙর।

৪. 'ই' ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ ই > এ – চিকন > চেকন, হিন্দু > হেন্দু, ই > উ – বালি > বালু, বালিশ > বালুশ, ই > অ্যা – ছিল > ছ্যালো, দিল > দ্যাল, পদান্ত 'ই' স্বরের লোপ– রীতি > রীত, ফাঁশি > ফাঁশ। মদ মধ্যস্থিত 'ই' স্বরের লোপ– খাইতাম > যাতাম, যাইতাম > যাতাম ইত্যাদি।

৫. খুলনার উপভাষায় 'উ' ধ্বনির পরিবর্তন সামান্য। যেমন– উ > অ – উঠি > অওঠি, চিরুনী > চেরুন ইত্যাদি।

৬. 'এ' ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ এ > অ – এসনি > অমনি, এই > অউ; এ > অ্যা – সে > স্যা, এখন > অ্যাকান; এ > ই – এখানে > ইকিনে, এ সময় > ই সময়; পদান্ত এ লুপ্ত – হয়েছে > হয়েছ, তোরে > তোর্।

৭. 'ও' ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ ও > অ – খোরাক > খরাক, গোবর > গবর, ও > উ – লোক > নুক, গোলাম > গুলাম, ও > ঐ – গোয়াল > গৈল, জোয়াল > জৈল।

৮. 'ঐ' ধ্বনির পরিবর্তন ঃ ঐ > উ – বৈঁচি > বুঁটি, ঐ > ও – জ্যৈষ্ঠ > জ্যোষ্টি, চৈত্র > চোত্।

৯. 'ঔ' ধ্বনির পরিবর্তন ঃ ঔ > ও > উ – পৌষ > পোষ > পুষ্, ঔ > ও – ঔষধ > ওষুদ, ঔ > ঐ – নৌকা > নৈকো, চৌকি > চৈকি ইত্যাদি।

১০. ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার শিষ্ট বাংলার উচ্চারণের মত; তবে উচ্চারণ প্রকৃতি ও ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। যেমনঃ ক > খ – ক্রীড়ক > খেড়ি, খ > ক – চোখ > চোক, শাখা > শাকা, আঁখ > আঁক, ঘ > গ – বাঘ > বাগ, মাঘ > মাগ, ছ > চ – গাছ > গাচ, মাছ > মাচ, জ (য), চ – কাগজ > কাগচ, কাজ > কাচ, ঝ > জ – মাঝ > মাজ, সাঁঝ > সাঁজ, ঠ > ট – মাঠ > মাঠ, কাঠ > কাট, থ > ত – কথা > কোতা (অ'কারের উচ্চারণ ও'কার হয়), ধ > দ – শোধ > সোদ, কাঁধ > কাঁদ, গাধা > গাদা; ফ > প – মাফ > মাপ, লাফ > লাপ; ব > প – আসবো > আসপো, থাকবো > থাকপো; ভ > ব – লাভ > নাব, সভা > সোবা; র > ন – রাম > নাম, রক্ত > নক্ত, রাত > নাত; ল > ন – লাল > নাল, লতা > নোতা, লোহা > ন'; হ > য় – শহীদ > শয়ীদ।[৭৪] শ > ক – শ্বশুর > শকুর, শাশুড়ি > শাক্‌ড়ি, ল > র – আঁচল > আঁচরা, ছাগল > ছাগের ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়া ধাতুরূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই উপভাষায় রক্ষিত। যেমন–
এস্‌চেত, এসলো, আসপে, এসতেচেন, এয়লে, আসপ্যান ইত্যাদি।

২. খুলনার কথ্য ভাষায় বিভক্তি ও কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গের নানা বৈচিত্র্য রক্ষিত আছে। 'এ', 'কে', 'রে', 'তে', 'কর', 'কের' ইত্যাদি বিভক্তি এবং কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গের 'দে', 'দি', 'ঠি', 'ঠিন', 'তে', 'থে', 'লেগে', 'তুন', 'তেন' ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৩. খুলনার কথ্য ভাষায় তদ্ভব শব্দের উপাদান প্রচুর। আঞ্চলিক ভাষায় এগুলো পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত। যেমন– গৈল < গোয়াল, নেরোল < নারকেল, পেতি < পোয়াতি, তিত < তেতো ইত্যাদি।

৪. তুমর্থে 'তে' এর পরিবর্তে 'তি' প্রত্যয় হয়। যেমন– যাতি < যাইতে, শুতি < শুইতে ইত্যাদি।

নোয়াখালির উপভাষা ঃ

বাংলা উপভাষার দক্ষিণ পূর্ব শাখার মধ্যে নোয়াখালির উপভাষা অভিনব এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যাবে শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি দিলে। যেহেতু নোয়াখালি উপভাষা কেন্দ্রীয় বাংলা তথা কলকাতা থেকে দূরবর্তী তাই এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিমন্ডল, দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত ভিন্ন; সেই জন্যে আদর্শ চালিত বাংলা থেকে নোয়াখালির উপভাষা অনেকাংশেই দূরবর্তী। প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এই প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "Noakhali differs considerably from the central region of Bengal around Calcutta, with respect to topography, plant and amimal life and economic conditions and also in its social structure. The dialects of this area developed quite separately from SCB, mainly due to existing differences in cultural and environmental background."[৭৫] বৃহত্তর নোয়াখালি জেলা বর্তমানে ফেনী নোয়াখালি এবং লক্ষীপুর এই তিন জেলায় বিভক্ত। এই ভাষাঞ্চলের উত্তরে কুমিল্লা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে মেঘনা এবং পশ্চিমে পার্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম। নোয়াখালি অখণ্ড ভূমি নয়, হাতিয়া, সাহবাজপুর, বার্মা প্রভৃতি দ্বীপ–বদ্বীপ এবং চরভূমি নিয়ে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। একদা সন্দ্বীপ ও নোয়াখালির অধীন ছিল।[৭৬] মূলত ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণেই এই উপভাষা অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বহুবিভাষী রূপে ঋদ্ধ। এখানে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. এই উপভাষায় ই এ এ্যঁ আ অ ও উ এই সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন–
ই : ইঁয়া, এ : এউ, এ্যঁ : এ্যঁয়ানে, আ : আই, অ : অয়, ও : ও আ, উ : উয়ে।[৭৭]

২. এই উপভাষায় বাইশটি দ্বিস্বর ধ্বনি শৃঙ্খলা রয়েছে। যেমনঃ ই + (এ, আ, অ, ও, উ); এ + (ই, আ, উ); আ + (ই, এ, ও, উ); অ + (এ, ও); ও + (ই, এ, আ, উ); উ + (ই, এ, আ, অ)।

৩. অনাদিযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি সংখ্যা বাইশটি। যেমনঃ ক + (তে, ল), গ + (জ), শ + (ত), ত + (র), চ + (স, চ, ল), ফ + (র), র + (গ, ত, থ, দ), ঙ + (ক) গ, ষ + (ট), ণ + (ড), ম + (ক + ন), ণ + (জ, দ), ট + ক।[৭৮]

৪. 'চ' ধ্বনি 'স'– তে পরিণত হয়। যেমন– চাকর > সাত্তর, খরচ > খরস ইত্যাদি।

৫. ট, ধ্বনি 'ড' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– ওটা > উডা, ছোটা > ছোডা, বৈঠক > বৈড্‌গ।

৬. প ধ্বনি 'ফ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– পারি > ফারি, পানি > ফানি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বহুবচনে রা, গুলা, গর, গো, গুনের প্রভৃতি রূপ হয়।
২. ক্রিয়ার কালে ই, আস, উস, উম প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার।
৩. ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ– 'আঁই'/ আমরা, তুই / তরা, তোমরা, আমনে . আমনেরা/ হে / হেতে, হেতেনরা ইত্যাদি।
৪. প্রত্যয় বিভক্তির রূপ– আমি (ছাগলাম),– আনি (যালানি/ জ্বালানি)–ই (সুরি/ চুরি), লা (কমলা)–উআ (বাউয়া, যে বাঁ হাতে কাজ করে)।
৫. বিদেশী প্রত্যয়ের রূপ– ভান (দারভান/ দারোয়ান),– আরি (বুখারি/ বাবুগিরি), গর (যাদুগর/ যাদুঘর)।[৭৯]

চট্টগ্রামের উপভাষা ঃ

চট্টগ্রামের উপভাষা প্রত্যন্তস্থিত ও বিপ্রতীপ অবোধ্য ভাষা। মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, ''চট্টগ্রামী বাঙ্গালা বহুবৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা সাধু বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম সন্তান হইলেও ইহাতে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে, যাহা বাঙ্গালা দেশের অপরাপর অংশের প্রচলিত বাঙ্গালায় বড় বেশি চোখে পড়ে না। প্রধানতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যেই চট্টগ্রামের প্রচলিত বাঙ্গালা, বাঙ্গালা দেশের সাধারণ চলিত ভাষা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।''[৮০] সুতরাং 'চট্টগ্রামের ভাষা সাধারণ বাঙালির জন্যে একটি দূরবর্তী (অন্ত্য–প্রান্তিক্য ভাষা। ধ্বনি উচ্চারণের নিয়ম, শব্দসৃষ্টি ও কৃতঋণ শব্দের ব্যবহার এবং বাক্যগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অনুসরণ সাধারণ বাঙালির পক্ষে আজ দুঃসাধ্য।'[৮১] নিম্নে এই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. এই উপভাষায় ই, এ, আ, অ, ও, উ– মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও এঁ, আঁ, আঁ, ওঁ, উঁ আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– ইঃ হিআন (সেখানে) এঃ লেচু (লিচু) আঃ লাম্বা (লম্বা), অঃ খরাপ (খারাপ) ওঃ মোশা (মশা), উঃ চুরা (চিড়ে), এঁঃ জেঁওতা (জীবন), আঁঃ হাঁচা (সত্যি) ইত্যাদি।
২. চট্টগ্রামী উপভাষায় পঁচিশটি দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– ই+আঃ মআল (মৃগাল), আ+উঃ আগাউ (অগ্রিম), ও+উঃ হোউন (শকুন) ইত্যাদি।
৩. এই উপভাষার অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভেদ নির্দেশ করা প্রায় জটিল মনে হয়। অল্প প্রাণ ধ্বনিগুলো প্রায় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। 'ক', 'গ', 'চ', 'জ', 'ট', 'ড', 'ত', 'দ', 'প', 'ব' প্রভৃতি অল্প প্রাণ বর্ণের উচ্চারণ– 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', 'ফ', 'ভ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ হয়। অনুরূপ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো অল্পপ্রাণ হয়। যেমন– পাখী > পাইক, বাঘ > বাগ, মাছ > মাচ প্রভৃতি।
৪. বর্গীয় ধ্বনির প্রতিটি আদিস্বর 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প' এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ বিকল্প রূপ নেয় এবং সেটা আদর্শ বাংলার কাছে সহজ ও স্পষ্ট নয়। যেমন– 'কইল্যা' ও 'কালিয়া' প্রায় সমুচ্চারিত দুটি শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্নতা শুধু ধ্বনিস্বরের ওপরই নয়; 'ক' ধ্বনির বিচিত্র ব্যবহারের ওপরেই (implosive) লক্ষণীয়।
৫. এই উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটানা বাকরীতি। ফলে প্রথম ধ্বনিগুচ্ছ ও শেষ ধ্বনিগুচ্ছ ধরেই প্রায় এদের বাক্য সম্পন্ন হয়। এদের মধ্যের সকল ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারিত হয় না। যেমন– 'হিতারে কইলাম একখানা যাইবার লাই, যাইবো ফালনার ঠিক বুঝিৎ ন পারিব।'
৬. এই উপভাষায় ধ্বনির বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন– গদ্য > গইদ্য, ধ্বনি > দনি, গাছ > গাস ইত্যাদি।[৮২]
৭. চট্টগ্রামী বাংলার ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদসমূহ নিম্নরূপ: আঁই (আমি), আরা (আমরা), তুঁই (তুমি, তুই), তোঁঅরা (তেমারা), তে/ হিতে (সে), হিতারা (তারা), আমনে (আপনি), তাঁই (তিনি), তানারা (তাঁরা) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রচলিত আঞ্চলিক বা কথ্য বাংলার সঙ্গে আদর্শ বাংলার পার্থক্য রয়েছে। আমাদের কথাশিল্পীগণ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক জনপদের জীবন বিন্যাসে নিজ নিজ গল্প উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের কথ্যরীতির সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এই পর্বে আমরা পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গীয় কথ্যরীতির বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই দৃষ্টি দেবো আঞ্চলিক পটভূমিকেন্দ্রিক ভৌগোলিক জীবন প্রবণতার দিকে। কোন্ কোন্ উপন্যাস ও গল্পে কোন্ কোন্ অঞ্চলের জীবন ও সমাজ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া যেতে পারে। নিম্নে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয় বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ও ভাষাকেন্দ্রিক কথ্যসাহিত্যের পরিচয় দেয়া হলো।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই দৃষ্টি দেবো ঢাকাই জনপদ ও আঞ্চলিক ভাষাকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের দিকে। এই জনপদ কেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেসে আসে আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' (১৯৫৫) উপন্যাসটির কথা। এখানে পূর্ববঙ্গীয় ঢাকাই উপভাষা ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাসের পটভূমিও দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম। কাহিনীর বিন্যাসে মুখ্যচরিত্র জয়গুনের প্রাধান্যই বেশি। এছাড়াও করিম বকস্, হাসু, গেদু প্রধান, মসজিদের ইমাম প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক আঞ্চলিক ও বৃত্তিক উভয় প্রকার সংলাপই ব্যবহার করেছেন। ইমাম সাহেবের সংলাপে আরবি-ফারসি মিশ্রিত মোল্লা বুলির প্রয়োগ বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। যেমন- হাসু হাঁসের ডিম নিয়ে ইমাম সাহেবকে দিতে গেলে ইমাম বলে- 'ফিরাইয়া দ্যাও অখুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি. ছি. ছি।'[৮৩]

ইমাম ছাড়া অন্যান্য চরিত্র এবং উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র জয়গুন সংলাপে লেখক ঢাকাই উপভাষা ব্যবহার করেছেন। তার চরিত্রে আবেগ আশঙ্কা ও বেদনার আর্তি ফুটে ওঠে তারই সংলাপে। ফকিরের সঙ্গে তার একটি দৃশ্যের বর্ণনায় উভয় চরিত্রের সংলাপে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমনঃ

> 'দেহিনা বেয়ান! বলতে বলতে সে এগোয়- দেহি না তোমার নরম আতখানে কি লেখা আছে।'
> জয়গুন পিছিয়ে যায়। বেড়ার সাথে গিয়ে ঠেকে।
> দেহি না আতখানি। নওল মুরগীর মতন পালাও ক্যান?
> দিদি। .... জয়গুন চেঁচিয়ে বলে, কুত্তার পয়দা! বাইর অ, বাইর অ ঘরতন।'[৮৪]

ঢাকাই উপভাষা ব্যবহারে বিশেষ সাফল্য লক্ষ করা যায় রাবেয়া খাতুনের (জ. ১৯৩৫) বায়ান্নোগলির এক গলি (১৯৮৪) উপন্যাসেও। এই উপন্যাসে পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের কথ্যভাষা প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনীর অন্যতম দুই চরিত্র সর্দার ও রুস্তমের সংলাপে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

> 'ব্যাজার মুখে বল্লো, ছর্দার ছাব, কুনু কিছিমেই লুফী বাডারের অর কেওর খুললো না।
> খুললো না কেলা? তুই ব্যাটা আবার ছর্দারী ফলাইবার যাছ নাই তো?
> তোওবা! তোওবা! আমি হইলাম গিয়া আপনের এম.পি. লাঠিয়াল। আমার কি ঐ হগল ছোবা পায়?
> আমার কথা কইছিলি?
> বহুত সর। হালার পুতে গো কানেই গ্যালো না।
> তুই ব্যাটা এক্কেরে বেহুদা। কুনু কামের না। চল দেহি।'[৮৫]

শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩) উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু পরিবেশ পটভূমি ও চরিত্রের সংলাপে ঢাকার আঞ্চলিক আবহ ফুটে ওঠে। মখদুম মৃধা ও মনার সংলাপে লক্ষণীয়-

> মনা।
> জী।

Dhaka University Institutional Repository

অহন লোকে কী কয়?
কিসের খবর হুজুর?
আমারে নিয়া কিছু কয় না?
আমি কাম নিয়া থাকি। কিছু হুনি নাই।'[৮৬]

এছাড়াও শওকত ওসমানের 'ক্ষমাবতী', 'শেষ আগে শুরু হয়', 'দ্বিতীয় অভিসার' প্রভৃতি গল্পে ঢাকার আঞ্চলিক সমাজপটভূমি ও আঞ্চলিক জীবনসংশ্লিষ্ট উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ করা যায়, বাংলা ছোটগল্পে বিভিন্ন লেখকই ঢাকাই উপভাষা ব্যবহার করেছেন। মূলত সমাজ-সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক জীবন বৈচিত্র্যের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গরূপেই আমাদের কথাশিল্পীরা চরিত্রের সংলাপে ঢাকাই উপভাষা গ্রহণ করেছেন। কারণ গল্প ও উপন্যাসে মূলত চরিত্র ঘটনা এবং পরিবেশের উপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার কেন্দ্রীয় জনপদ এই ঢাকাই অঞ্চলকেন্দ্রিক সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লেখকগণ তাদের ভাষাবৈচিত্র্যকে রূপায়িত করেছেন। তন্মধ্যে শাহেদ আলী-র 'জিব্রাইলের ডানা', 'মা', 'ছবি', 'নীল ময়না', শহীদে কারবালা', 'কবিতা', 'বরকতুল্লাহ' প্রভৃতি গল্প' বশীর আল হেলাল (১৯৩৬)-এর 'প্রাণগঙ্গা'; 'বিষের হাসি' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'পরাজয়' আবু জাফর শামসুদ্দীন-এর 'একা', 'গোশত', 'একমুঠো ভাত', 'উস্টানি', 'ল্যাংড়ী', রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫)-এর 'সাকিন কেল্লা 'লালবাগ', হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯) এর 'গুনিন', 'পাবলিক সার্ভেন্ট', সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫)-এর 'কালামাঝির চড়নদার', আবুবকর সিদ্দিকের (১৯৩৪) 'গণসুন্দরী', আল মাহমুদ (১৯৩৬)-এর 'মীরবাড়ির কুরসীনামা', রাহাত খান (১৯৪০)-এর 'অন্তহীন যাত্রা', 'এই বাংলায়' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)-এর 'উৎসব', 'যোগাযোগ', 'ফেরারী', 'খোঁয়ারি', 'তারাবিবির মরদপোলা', খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৯)-র 'দহন ও মৃত্যু', খাচার ভেতর অচিন পাখি', 'ফেরা', আবুল হাসনাত (১৯৩৬)-এর 'তৃষ্ণা' প্রভৃতি গল্পে আঞ্চলিক পটভূমিরও আবহের বর্ণনায় এবং মানবপ্রবৃত্তির দিকসহ সমাজজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় রূপ দিতে গিয়ে আমাদের কথাশিল্পীগণ চরিত্রের সংলাপে ঢাকাই উপভাষা ব্যবহার করেছেন। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে লেখক প্রমিত বাক্যেও লোকজ শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন পরিবেশ পটভূমির বাস্তবতার প্রয়োজনেও। আলোচনার বাহুল্য না বাড়িয়েও বিষয়টির স্পষ্টতার জন্যেই প্রধান প্রধান গল্পকারদের কয়েকটি গল্পের সংলাপে ঢাকাই আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ থেকে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

১. রাইত অত্তনের আগে ফিরা আত্তন যাইবনি? ... আরে হ! হ! দেড় দুই মাইল রাস্তা অইব। যাওনের লাইগা যাইমু নাহি। যা কিরপিন হেই বাড়ীর মানুষ। দেশের মাইনষে নাম রাখছে কারু বাড়ী। এক ডুলা মাছ দিমু আর আইমু। বাবার কয়, এত এত মাছ কেডা কাইব, কতডি মাছ তোর বুয়েরে দিয়া আয় গিয়া।'[৮৭]

২. 'পাখিরা কি ভাবে কাইল কী খাইব? ভাবে না। আমিও ভাবি না।
পাখি তো রোজই বাইর অয় খাওনের খোঁজে।
আমার ঘরেরও হগলেই তো বাইর অয়। এই কইরাই চইলা যাইতাছে দিন। দিন বইয়া থাকে না। দিনের পর রাইত আইসে, রাইতের পর দিন। এই ভাবেই তো মাস বছর গঁইয়া যায় মাইনষের। আমি আর ভাবি না। মরা-গরুর গাঙ দীঘালে হাঁতার।''[৮৮]

৩. 'চুপ মাগি, গলা টিইপ্যা শ্যাষ কইরা দিমু, সতীপনা রাইখ্যা দে।'[৮৯]

৪. 'শুওরের বাচ্চাগো কারবারটা দ্যাহেন। হালায় বেশরম বেলাহাজ মানুষ, কি কই এ্যাগো, কন? মহল্লার মইদ্যে কতো শরীফ আদমী আছে, ঘরে বিবি বাল বাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়? দ্যাখছেন?''[৯০]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন, আখতারুজামান ইলিয়াসের গল্পে পুরনো ঢাকার কুট্টিদের ভাষা এবং ঢাকার অপরাধ জগতের ভাষা অত্যন্ত বাস্তবানুগভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'তারা বিবির মরদ পোলা' 'ফেরারী' 'খোঁয়ারি' প্রভৃতি গল্প এই প্রসঙ্গে ব্যাপক মূল্যায়নের দাবি রাখে। এছাড়াও তরুন লেখক আমীরুল ইসলামের 'নসরুল্লাহর পুরানা প্যাঁচাল' গল্পগ্রন্থে ঢাকাই উপভাষা বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৬১) এবং 'সমুদ্র বাসর' (১৯৮৬) উভয় উপন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় বরিশাল অঞ্চলের সমাজ ও ভাষা অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, এই দুই উপন্যাসেই লেখক আঞ্চলিক সমাজভাষার পাশাপাশি লোকসংগীতের উদ্ধৃতি দিয়ে চরিত্রগুলো বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। তবে লেখক সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক রীতিকে পরিবর্তন করেছেন কোথাও কোথাও। যেমন– 'আরে খাঁড়াও না করিয়াল! তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়া তো একটা ঘটনা। দেহাতীদের একজন সমাদর দেখাইল, আইজকাল তোমার যে আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।'[৯১]

এখানে লক্ষণীয়, বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় ট, ঠ এর উচ্চারণ 'ড' হয়। কিন্তু লেখক 'একটা ঘটনা' প্রমিতভাবেই লিখেছেন। অথচ, বরিশালের আঞ্চলিক উচ্চারণে 'একডা খডনা' হয়ে থাকে। তাঁর 'সমুদ্র বাসর' (১৯৮৬) উপন্যাসেও একই ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন– ঠিকই কইছেন সোনা বৌ, আমার ঘরের ঐগুলানরেও কেমন কেবল বাজচিলের চৌখের আড়ালে রাখতে হয়, মোরগের ছানা-পোনার মতন। ... এক্কেবারে খোপে ভরিয়া রাখতে হয় শিয়ালের ডরে।[৯২]

ঔপন্যাসিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম এই উপন্যাসে সমুদ্র তীরবর্তী জনজীবনের বিবর্তনেরই আলেখ্য রচনা করেছেন। এতে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রোমান্সেরই প্রাধান্য পেয়েছে। তবু 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম নৃতাত্ত্বিক আবেগ ও ভৌগোলিক সীমাসংহতিকে শিল্প অভিপ্রায়ের কেন্দ্রে উপস্থাপন করেছেন। প্রাকৃতিক স্থানিক বৈশিষ্ট্য ও অনেকটা সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।'[৯৩] এছাড়াও বরিশালের আঞ্চলিক জনপদের পটভূমিতে রচিত হয়েছে আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪)-এর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' (১৯৫২) উপন্যাস। এই অঞ্চলের স্থানিক পরিচয় দিতে গিয়ে লেখকের বর্ণনাঃ 'চারিদিকে বঙ্গোপসাগরের জলকল্লোল, আকাশে অনিয়ম প্রকৃতির নির্মম বিধাতার মত রাজত্ব, আর নীচে জমিদারের বংশগত, চিরাচরিত শাসন ও শোষণ, চন্দ্রদ্বীপের মানুষ একেই পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবন বলে জানে।'[৯৪] মূলত সামন্ততন্ত্র ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সমাজের চালচিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের সমাজধারার বিকাশকেই এই উপন্যাসে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের আবহ নির্মিত হয়েছে জনগোষ্ঠীর জীবন ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে। ফলে সমাজ ভাষা ও জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ পরিচয় নিয়ে যে সমষ্টিগত বিন্যাস গড়ে ওঠার কথা, লেখক সেই দিকে ততোটা মনোযোগী হননি। জমিদার সমাজে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর বহুবিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে সেলিনা হোসেনের 'জলোচ্ছ্বাস' (১৩৭৯) উপন্যাসে। বরিশাল পটুয়াখালী বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন সংকটের চালচিত্রে নির্মিত এই উপন্যাসের ক্যানভাস। জনপদের বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেনঃ ''মেঘনা, তেতুলিয়া, আগুনমুখা, রাবনাবাদ, বুড়ো গৌরাঙ্গ, কাজল নদীর কূলে কূলে আর বঙ্গোপসাগরের দুধর্ষ ছায়ায় স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধে ফসল ফলায় আর জীবন নির্মাণ করে। দারিদ্র্যের কঠিন আলিঙ্গনে ওরা বিধ্বস্ত দুর্যোগের কালোরাত চারিদিকে অমানিশার অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে। তবুও হৃদয়ের দৈন্য ওদেরকে আশাবাদী জীবনের সঙ্গীত হতে বিচ্যুত করেনি। ওরা ঘা খেয়ে খেয়ে বয়স্ক হয়, অভিজ্ঞতার জারক রসে

Dhaka University Institutional Repository

নিষিক্ত হয়ে আপন পৃথিবী গড়ে তোলে। জীবনের সে যোগ নদীর সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য তৈরী করে নেয়। মেঘনা, তেতুলিয়া আগুনমুখা কখনও খুশি হয়ে উপচে পড়ে কখনও বিরূপ হয়ে বিধ্বংসী হয়। তবুও নদী ওদের চাই। দক্ষিণ বাঙলার মানুষগুলো নদীর মানুষ।''[৯৫] এখানে প্রকৃতি, অন্যদিকে সামাজিক অপশক্তি উভয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে টিকে থাকে রাঙ্গাবালী চরের সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাও হয়ে ওঠে কাহিনী ও চরিত্রের বাস্তব অনুষঙ্গ। যেমনঃ

– 'ক্যান আপনের শরীল খারাব?

– না আমার ডাহিন চউকটা ফরকে। দিন বালা না।

– সার যেমুন কতা। হগল কামে ন্যাত পেত্যয় করলে আর কাম আগাইব না।'[৯৬]

বরিশালের আঞ্চলিক জনজীবন নিয়ে সেলিনা হোসেনের আর একটি বিখ্যাত গল্প 'খোয়াই নদীর বাঁকবদল'। এই গল্পেও লেখক ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষক মনুমিয়ার জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে অবিকৃতভাবে আঞ্চলিক সংলাপ রচনার পাশাপাশি প্রমিত বাক্যে লোকজ শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ লেখকের বর্ণনায় দেখা যায়– ফোকড়া-ফোকড়া মাঠের আল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনুমিয়ার মগজের চৌচালাকি তিড়িং বিড়িং করে। কিংবা, 'দুপ দুইপ্‌পা বৃষ্টি পড়ছে ইত্যাদি। অনুরূপ চরিত্রের সংলাপ রচনায় লেখক হুবহু আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেনঃ

'আমার কাম আছে। জমিনে থাইতাম অইব।

আমি অনকু–

আফনি অনকু যাউকা গিয়া।

আমার কতাকান রাখলানা?

অয়, রাখতাম পারলাম না।

পুড়িটার ভবিষ্যৎ–

পুড়ি আফনার না আমার? আমিওই দেখমু।'[৯৭]

বরিশালের পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর জেলার পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলের জেলে জীবন নিয়ে রচিত কথাশিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষ-এর 'চরকাশেম' (১৯৪৯) উপন্যাস। জেলে জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে লেখক বৃত্তিকভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষ উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপেও মাঝে মাঝে প্রমিত শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, ফলে তাদের মুখের ভাষা একেবারে হুবহু আঞ্চলিকতার মাত্রা অর্জন করে না। যেমন–

'একদিন কাশেমের হঠাৎ মনে পড়ে, জিজ্ঞেস করে, 'শুটকি মাছ?' 'তাও এখনও আছে?' ফুলমন জবাব দেয়, মিঞার চেতন নাই।'

হইছে কি?

লুটপাট কইরা নিয়া গেছে। ....

কেডা নেছে?

সকডি মিইলা। নেবে না খাইবে কি?

খাইবে কি? ... খাইবে আমার মাথাডা। আমি কি কেউরে সাইধা আনছি এইখানে?

সাইধা তো আনো নাই– সকলডি আইছে বুঝি গায়ের জ্বালায়? এখন একেবারে ভাল মানুষ সাজতে চাও– বলি, দায় ঠেকলে অমন অনেকেই কয়।''[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাকের (জ. ১৯২৬) 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমিও ফরিদপুরের চরাঞ্চল। এই 'উপন্যাসে চর দখলের লড়াই ছাড়াও এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে নরনারীর হৃদয়ের গভীর আবেগ। এর পটভূমি ও ঘটনাবলীর বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ সবই জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তবতার উষ্ণস্পর্শমন্ডিত। লেখক যে জীবনের ছবি এঁকেছেন, তা তিনি ভালো করে জেনে নিয়েছেন, যে সব আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুপ্রযুক্ত, রচনাটিকে তাএক ঋজু বলিষ্ঠতা দান করেছেন।'[৯৯] এই জনপদের ইতিহাস যেন এই পদ্মা নদীর সঙ্গে জন্মসূত্রে গাঁথা। সেই সঙ্গে ভাষাও হয়েছে তারই অনুষঙ্গী। ফজল ও মতির সংলাপে লক্ষণীয়–

> মতি বলে, 'জানো ফজল আগে এখানে নদী ছিল না। এখানে ছিল একটা খাল। লোকে বলতো ওটাকে রথখোলার খাল। চাঁদ রায় কেদার রায়দের রথটানা হতো ওখান দিয়ে। আগের দিনে পদ্মা ফরিদপুরের মাঝ দিয়ে বরিশালের কন্দর্পপুরের কাছে মেঘনায় মিশে ছিল। এখন যেটা আড়িয়াল খাঁ সেটাই ছিল তখন আসল পদ্মা।'
>
> ''আইচ্ছা! আমরা তা হইলে চরুয়া ছিলাম না, আসুলি ছিলাম।' 'হয়তো ছিলে। আগে বাঙলার মাটিতে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ছিল একসাথে। ব্রহ্মপুত্র গতি বদলে পশ্চিম দিকে গিয়ে যমুনার সাথে মিশে যায়। চাঁদ রায়, কেদার রায়ের কীর্তি, রাজা রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস করে। তাই পদ্মার আর একনাম কীর্তিনাশা।'
>
> 'ভালো একটা ইতিহাসের কথা শুনাইলেন মতি ভাই। আমরা তো কিছুই জানি না। জানলে কি আসুলীরা আমাগো নিন্দা করতে পারে? কথায় কথায় চরুয়া ভূত কইয়া ঠেশ দিতে পারে?'[১০০]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা কথাসাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামই (১৮৯৯–১৯৭৬) প্রথম তাঁর 'জীনের বাদশা' গল্পে ফরিদপুরের আঞ্চলিক ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকের প্রখ্যাত কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পে এই অঞ্চলের পরিবেশ, পটভূমির বর্ণনা ও চরিত্রের কথ্য ভাষা উপস্থাপন করেছিলেন।

জানা মতে, বাংলা কথাসাহিত্যে যশোর অঞ্চলের উপভাষা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০)। তাঁর 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'রূপো বাঙাল', 'বারিক অপেরাপাটি', 'কাঠবিক্রি বুড়ো' প্রভৃতি ছোটগল্পে এবং 'ইছামতি' (১৯৫০) উপন্যাসের পরিবেশ, পটভূমি এবং চরিত্রের সংলাপে এই জনপদেরই জীবনেতিহাস ফুটে ওঠে। এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার প্রাণসঞ্চারের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে প্রবাদ প্রবচন ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় নরনারীর মুখের ভাষায় প্রবাদ–প্রবচনের ব্যবহারের মাধ্যমে কথাশিল্প হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত ও ব্যঞ্জনাময়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকেও যশোরের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক।

১. 'আর বাবু আলো! কেরাচিন তেল কনে পাবো? কেরোচিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্ছে রোজ রোজ।'[১০১]

২. 'কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।'[১০২]

৩. 'মুই কিছু বলতি পারিনে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।'[১০৩]

৪. '– 'কেন, গয়ামেম তোমাকে খুব মানে!

–বাদ দ্যাও। যার চরিত্তির নেই, তার কিছুই নেই। ওর আবার মানামানি। কিছু যে বলবার জো নেই, নইলে রাজারাম রায়কে আর শেখাতি হবে না কাকে কি করে জব্দ করতি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

-তোমাকে কি ছোটসায়েব বকেচে নাকি?

-আমাদের কি বকবে? আমি না হলি নীলের চাষ বন্ধ। ছুঠিতি হাওয়া খেলবে– ভোঁ ভোঁ। আমি আর প্রসন্ন চাকত্তি আমিন না হাকলি এক কাঠা জমিতেও নীলির দাস মারতি হবে না কারো।'[১০৪]

পরবর্তীকালে হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবন ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। বস্তুত, হাসান আজিজুল হকের গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি তিনটি। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে পাওয়া যায় রাঢ়বঙ্গীয় সমাজ জীবনের ছবি ও ভাষা।[১০৫] 'গল্পের জায়গা জমি' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেনঃ

আমার লেখার এই হলো জায়গা জমি মানুষ। ... তবে এই হচ্ছে ভিত্তি। এটা জানা থাকলে দেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবনের কাঠামো জানা হয়ে যায়।[১০৬]

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি পূর্ববঙ্গীয় যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল এবং ঢাকাই আঞ্চলিক জনজীবন কেন্দ্রিক ছোটগল্প রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর গল্পের ভিন্নতর সমাজ পটভূমি রূপে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ পটভূমি ও ভাষা অনুষঙ্গের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তারশঙ্করের মতো তিনি যেমন রাঢ়ের ছবি এঁকেছেন; তেমনি বিভূতিভূষণের মতো এঁকেছেন নদীয়া ও যশোর অঞ্চলের ছবি। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ পটভূমি এবং ভূমিলগ্ন মানুষের নিজের কথা লেখকের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গী হয়ে উঠেছে। 'খনন', 'মারী', 'ভূষণের একদিন', 'আমৃত্যু আজীবন' প্রভৃতি গল্পে তিনি যশোরের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর গল্পে যশুরে ভাষার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো–

১. 'রাঁধতিছ? চাল দিল কেডা? মতলেব জিজ্ঞেস করে। সরকার থেকে দেছে? মধ্যবয়স্ক লোকটা জবাব দেয়।
সরকার চাল দেছে? কহন দেছে?
সকালে দেছে হুজুর– ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় লোকটা।
নফর বলে বুঝিছ?
বোঝপো না ক্যানো?
তাহলি?
তাহলি আর কি করবা? মতলবের কথা হতাশায় ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে, দয়া এ্যারতিছে এ্যাহন। দুদিন লোকগুলোরে খাতি না দিয়ে এ্যাহন দয়া এ্যারাতছে।[১০৭]

২. তা কি আর করা যাচ্ছে কও? গরু তো আর বাঁচাতি পারতিছ না!
– কি করে পারতিছি আর? করমালি কথা বলে।
তা এ্যাহন কি করবি? গরু কি কিনতিছিস?
আমারে বেচলিও গরুর এ্যাট্টা ঠ্যাং কিনতি পারবানানে।
তাহলি? ঠ্যাং কিনলিও তো আর কাজ হচ্ছে না।
করমালি কাজেই আবার শোনে।
আমি তো আর জোতদার নই কি কস্ করমালি?
দক্ষিণি জমিও নেই ছডাক। বছর শেষ ধানকডা পালি সোংসারডা চলে। তা তুমি তো আর আবাদ করতি পারতিছ না এবার। তাহলি আমার জমিগুলোর কি হচ্ছে ক।'[১০৮]

৩. আমি দেব কনে থে– বউ বললো।
মুখে মুখে জবাব করিস নি দিনি– যা কলাম, পারলি করিস।'[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'কি সুখটা জেবনে পাইছো আমারে এট্টু কওতো? প্যাট ভরে খাতি পাইছো কোনদিন, পরের বাড়ি খেটেখেয়ে জেবন গেল। পোলাপানদের কোনোদিন দুটো ভালো জিনিস দিতি পারিছ– এট্টু ভালো জামাকাপড় দিতি পারিছ কও?'[১১০]

এই জনপদ কেন্দ্রিক লৌকিক সমাজজীবনও নিবিড় বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়েছে হাসনাত আবদুল হাই-এর গল্পউপন্যাসে। তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় 'ভয়' (১৯৮৬) উপন্যাসে। কৃষক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আত্মসংগ্রামের পটভূমিতে তাঁর এই উপন্যাসে যশোরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

'কালু স্পষ্ট শোনে বাপের জড়ানো কণ্ঠস্বর, 'কালুরে বড় কষ্ট হতিছে। এই জমিন বড় কষ্ট দিতিছে। ছাড়বার পারলাম না। কত কলাম, খায়-খালাসি কইরে নও, আমার কি সাদ্যি আছে হাজার টাকা একসাথে দি খালাস করে নি। শোনলো না, শুধু হাসে, আর কয়, মুন্‌শী এ জমিন ত তোরই, তুই-ই চাষ করতিছিস, ফসল ঘাড়ে করে এইনে গোলায় তুলতিছিস। তোর দুঃখ কিসের শুনি। খাতি পারতি অসুবিধে নেই, ছাওয়াল পাওয়াল নে ভালই ত আছিস। জমি ফেরত পালি পরেই রাখতি পারবি? পারবিনে, আবার হয় বেচপি নয় বন্ধকী রাখপি।'[১১১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পেও যশোরের কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সব প্রয়াসের তুল্যমূল্য বিচারে বলা যায়, অভিজ্ঞতার ব্যাপকতায় এবং জীবনবাদী শিল্পের অঙ্গীকারে হাসান আজিজুল হকই এই জনপদের শ্রেষ্ঠ রূপকার। শুধু তাই নয়, পূর্ব দক্ষিণবঙ্গীয় বিশাল প্রেক্ষাপটই তাঁর গল্পে সমুজ্জ্বল। লক্ষণীয়, যশোরের লোকভাষা হাসান আজিজুল হকের গল্পে এসেছে স্থানিক পটভূমি এবং জীবনগত বাস্তবতার প্রয়োজনেই। অনুরূপ, সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলের স্থানিক পটভূমি ও চরিত্রের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গরূপে তিনি 'ফেরা', 'সরল হিংসা', 'মধ্যরাতের কাব্যি', 'অচিন পাখি', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'কেউ আসেনি', 'মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে', 'ঘের', 'মা-মেয়ের সংসার' প্রভৃতি গল্পে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। আবার কোন কোন গল্পে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছেন একাধিক অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন, 'সরল হিংসা' একটি নিষিদ্ধ জগতের গল্প। নিষিদ্ধ পল্লীর নারী জয়তুন, পুষ্প তাদের সংলাপে ব্যবহার করে সাতক্ষীরার কথ্যভাষা; অন্যদিকে টেপি, তসিরণ ব্যহবার করে পূর্ববঙ্গীয় ঢাকাই উপভাষা। ফলে, ভাষার মাধ্যমেই ফুটে ওঠে নারীর স্থানিক পরিচয়। যেমন–

জয়তুন বলে, 'এই যে সায়েব, দ্যাখেন, দয়া করেন, আমি তিনদিন কিছুই খাইনি, আমি সাতক্ষীরে থে আইছি। আমি তো আপনার থে টাকা চাইনে।'

পুষ্প আগের মতোই ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যায়, 'দয়া হবে না বাবু, আমার বাচ্চা নেই, সোয়ামি মরতিছে, আমার সঙ্গে চলেন বাবু, সোয়ামি মরতিছে দেখাতি না পারলি আমি বাপভাতারি।'

তসিরুণ বলে, 'র, আজ রাত্রকালে তর পাতি জোটায়ে দিমু। সায়েব, এই মাইয়াটা খুবই ভালো, কোনো পুরুষ হ্যারে আজও ধরে নাই, মোরে এট্টা ট্যাহা দিয়া হ্যাক আজ বিয়া করেন, দোহাই আপনের।'

মোর পোলাডা রাইখ্যা আই। মুইও দ্যাখামু– টেপি ফুটপাতের কাছে গিয়ে একটা কালো নোংরা মানুষের ছানা রেখে ফিরে এলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাকের মতো একটা ইঁ-ইঁ-ইঁ শব্দ হতে থাকে।'[১১২]

উল্লিখিত সংলাপগুলোতে লক্ষণীয়, হাসান আজিজুল হক অত্যন্ত সচেতনভাবে সমাজ ভাষার ধর্মভিত্তিক পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জয়তুন ও তসিরুনের সম্বোধনসূচক শব্দে 'সায়েব' এবং পুষন– 'বাবু' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ফলে শুধু নামের ক্ষেত্রে নয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মভিত্তিক পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

ফুটে ওঠে। তবে এখানে কোন বৃত্তিক ভাষা প্রাধান্য পায় নি। ফলে সংলাপ দিয়ে চরিত্রের বৃত্তিক পরিচয় পরিস্ফুটিত হয় না, যতোটা স্পষ্ট হয় তাদের স্থানিক পরিচয়। অনুরূপ, খুলনার উপভাষা ব্যবহারেও তিনি রাষ্ট্রীয় আর্থসামাজিক বৃত্তের ভেতর সামাজিক ও স্থানিক প্রেক্ষাপটটিই আমাদের সামনে তুলে ধরেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর গল্পে খুলনার লোকভাষার উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

১. বলবানে, বলবানে, নিশ্চয়ই বলবানে। বলবার জন্যিই তো আইছি। আপনি খুলনের লোক আমি জানি। এত বড়ো একডা ব্যক্তি কোয়ান থে আসবে? আমাদের খুলনে ছাড়া।'[১১৩]

২. 'বাঘে নিলি নেবে, তুই অমন করিস কেন মা?
আমার তুই আছিস, তুই মরালে আমি আছি।
আমরা আমরা দুজনে মরলি আমাদের কেউ নেই।
আমাদের আল্লাও নেই।
কেউ না থাকলি আল্লা থাকপে কোয়ান থে।
আমাদের দোজখও নেই, ব্যাহেস্তও নেই।
থাকলিও আমাদের নেছে কেডা, আমাদের তো আল্লা নেই।
যাগো আছে তাগো নেবে।
তবে আমারে আটকাস ক্যানো, বাঘের পেটে গেলি যাবো, মাঝে কাটলি কাটবে, আটকাস ক্যানো মা।'[১১৪]

খুলনা-বাগেরহাটের স্থানিক জীবনরূপায়নে আরো একজন সিদ্ধহস্ত কথাশিল্পী আববুকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪)। বিশেষ করে সুন্দরবন বাদাবন অঞ্চলের জীবনপটে রচিত তাঁর 'জলরাক্ষস' (১৯৮৫) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, ''দক্ষিণবঙ্গের খুলনা বাগেরহাটের নিম্নভূমির জীবনবৃত্তে 'জলরাক্ষস' উপন্যাসের ঘটনাংশ বলয়িত। প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের পটভূমিতে নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও পাশব প্রশাসনের বিরুদ্ধে গণজোয়ালি তার স্ত্রী জরিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের এক আবহমান সত্য প্রতীকায়িত হয়েছে।'[১১৫]

উপন্যাসের পরিবেশ পটভূমি ও বিচিত্র কাহিনীর গতিপ্রবাহের মূলে ঔপন্যাসিক যোগ করেছেন ব্যক্তির সামাজিক রাষ্ট্রীক সংকট এবং সমাজভাষিক পরিচয়। একটি দৃশ্যের সংলাপে লক্ষণীয়–

'ও সাধুর বেটা!
হুঃ!
চেতন আছেন নি?
ক শুনতিছি।
এ্যাহন করবানিডা কী? ওষোদ পালান না পত্যি পালাম না। সব তো গ্যালো। ও কোদার বাপ–
নির্লিপ্ত গলায় গোনজোরালি জবাব দ্যায়, গ্যালো তো গ্যালো। জরিন আঁৎকে ওঠে, ক'লেনডা কী! আপনে ঠ্যাক না দিলি তারপর?
ঠ্যাহাবো কী দিয়ে? আমার আছেডা কী? কিছুক্ষণ থিতু মেরে থাকে গোনজোরালি। তারপর ফিশ ফিশ করে বলে,
এ জরি!
কন ক্যান?
... তুই বরং ক্যাম্পে যা। অরগো ওষোদ আছে পত্যি আছে ডাক্তার আছে। যা তাই যা।'[১১৬]

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা, বাগেরহাট সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানিক সমাজভাষা ও পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে আবুবকর সিদ্দিকের 'নোনামাংশের স্বাদ', আল মাহমুদের 'পশর নদীর শঙ্খচিল', প্রশান্ত মৃধার বিভিন্ন গল্প রচিত।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যবহুল সামাজিক পরিবেশঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের চিত্রপট লক্ষ করা যায়- উপন্যাসে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) এর 'জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫) উপন্যাসে এবং শাহেদ আলী, রাহাত খান প্রমুখের রচনায়। শাহেদ আলীর গল্পে রূপায়িত হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ জনপদের নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য এবং সামাজিক শোষণ আর ষড়যন্ত্র সংগ্রামের কাহিনী। ইতিবাচক জীবনবোধের প্রেরণায় তিনি নির্মাণ করেন গল্পের চরিত্র এবং তার সমাজ প্রতিবেশ। অর্থাৎ তাঁর গল্পের চরিত্রকে আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপনের সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনজীবন ও লোকভাষা হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ। এখানে তাঁর গল্প থেকে উদাহরণ দেয়া যায়।

১. হু, ফালাইয়া দিবাম! গাল ফুলিয়ে বাঁ চোখের নিচেটা কুঞ্চিত করে বলে ওঠে দশ বছরের মেয়ে কানু- আর তুমি যে খাইয়া ফেলবা, হে বুঝি জানি না।
কিছু বুঝতে না পেরে পঙ্খি আবার অবাক হয়- খাইয়া ফেলবাম কিরে?
ধান বুঝি মানুষ খায়!
আরে বুঝলা না তুমি? হো হো করে হেসে ওঠে বজলু- তুমি যে মানুষ না পঙ্খি! পঙ্খি তো ধান খায়- কাজেই মুঠটা বানুরেই দিতে হয়, আমারে দিয়া এৎবার নাই।'[১১৭]

২. -টাকা পাবাম কই?
-আমি মোগার কইরা দিবাম, আগেরই মতোই সহজস্বরে সে বলে র।
-তুমি টাকা জোগার করবা?[১১৮]

বিশিষ্ট গল্পকার রাহাত খান (জ. ১৯৩৯)-এর গল্পেও এই অঞ্চলের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের ছবি ফুটে ওঠে। বস্তুত তিনি গ্রাম ও শহর উভয় জীবনকেই তাঁর গল্পের উপজীব্য করে তুলেছেন। 'দুঃখিনী কমলা' ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের একটি করুণ কাহিনী। অন্যদিকে, 'ইমান আলীর মৃত্যু' গল্পেও ফুটে ওঠে কৃষক পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতার চালচিত্র। স্বাধীনতাত্তোর ভূমিসংলগ্ন কৃষিজীবী পরিবারের বিপর্যয়েরই ছবি এঁকেছেন তিনি এই দুই গল্পে। বলা বাহুল্য, এই দুই গল্পে ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবন ও ভাষা রূপায়নে লেখকের সচেতন প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। গল্প দুটোতে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়।

১. চৈতী বলে, কেডা গো?
ঃ তোর বাপের চৌদ্দ পুরুষ। দরজাডা খোল। এই ডেমনি হুনছস?
ঃ জ্বে? কইতাছিস ভাল চাস তো দরজাডা খোল।[১১৯]

২. আবুচান একদিন বলল, 'বাজান লও আমরাও যাইগ্যা।
ইমান আলী বলেঃ কুনহানো যাইতা পুত?
ঃ কেশরগঞ্জই। হেই জায়গায় লঙ্গরখানা খুলছে। দুইবেলা চাইট্টা কইরা লোডি আর গুড় দিতাছে। ভাতও দেয়।
ঃ ভাতও দেয়?
জিজ্ঞেস করে ফকীর চান। বলেঃ দূর। আমি হুনছি ভাত দেয় না।[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের পাহাড় অরণ্য এবং সুনামগঞ্জ কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের হাওড় জলাভূমির পরিবেশ পটভূমি কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের ছবিও অংকন করেছেন এই দুই গল্পকার। সিলেটের স্থানিক পটভূমিতে রচিত শাহেদ আলীর 'পোড়ামাটির গন্ধ' এই ধারার একটি অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল গল্প। কাহিনীর বিন্যাসে জানা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্র হাতেমের পূর্বপুরুষ ছিল ময়মনসিংহ গারো অঞ্চলের বাসিন্দা। জমিদারের অত্যাচারে তার বাবা তাকে নিয়ে চলে আসে এই সিলেট অঞ্চলে। তখন তার বয়স মাত্র বারো বছর। এখন সে ট্যাংগুয়ার হাওড়ের বাসিন্দা। হাওড়ের বর্ণনায় লেখক বলেন, ''আদ্যিকালের কোন্ সাগর বুড়োর নাতি সাগরের পুত্র সায়র, তার পুত্র ট্যাংগুয়ার হাওর বলাবলি করে লোকে। হাজার হাজার বছর আগে এই অঞ্চলটা সমুদ্রের নীচে ছিল, বিশাল ট্যাংগুয়া নাকি তার জলজ্যান্ত সাক্ষী।''[১২১] এই ভাবেই জনপদের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা দেন লেখক। লোকভাষা ব্যবহারেও তার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। নিঃস্ব কৃষক হাতেম ও হাজেরা চরিত্রের সল্লাপঃ

এ্যাই কই গেলে? হাতেম ভেতর থেকে ডাকে– মিনতির সুর বেদনায় আর্দ্র।

হাজেরা পাশে গিয়ে বসে। রুক্ষস্বরে জিগ্‌গেস করে– 'কী অইলো ফিরা?

– একটু বইতে পারোম না? ডাইন চোখটা যে মেলতে পারি না।

– হু, বইয়া থাকি– আমার কাজ নাই– পেটে দুইডা দেওন লাগবো না? ... তোমার বেথাডা কমলো?[১২২]

অন্যদিকে, হাওড়ের মৎস্য শিকারী মানুষের ছবি পাওয়া যায় 'কপাল' গল্পে। এই গল্পেও লেখক সিলেট সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের পটভূমি অবলম্বন করেছেন। ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক লোকভাষা।

'হাওড়ের কিনারে কিনারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা আলো আসিয়া পৌঁছে খোদা নেওয়াজের নাও–এর কাছে। নাও এ তিনজন লোক। মাঝখানে বসা লোকটি জিগায়– কে গো?

গলার আওয়াজে খোদা নেওয়াজ চিনিতে পারিলো, পাশের গাঁয়ের মিয়াকুবদের নাও–ও মনুওর নাকি? খোদা নেওয়াজ বলে, আমি খোদা নেওয়াজ।

– চাচা! মনুওর বলে, এলাই না লগে কেউ আছে?

– না বাজান, খোদা নেওয়াজ মারিফতি ঢঙ্গো বলে, আইছি একলাই, একলাই আছি, একলাই যাইবাম।

মনুওরদের নও–এর সবাই একসাথে হাসিয়া ওঠে। ততক্ষণে ওদের নাও আসিয়া ভিড়িয়া পড়ে খোদা নেওয়াজের নও–এর লগে।

– তুমার কল্কিটা তাজা আছে তো? মনুওর বলিল।

– কেন তুমরা তামুক আনো নাই? ...

– মাছে পানি ছিটাইয়া টিক্কা অক্কেবারে ভিজাইয়া দিছে!

– বড় মাছ পাইছো নাকি!

– হ একটা মাশুল পাইছি, এবার জবাব দেয় শিকারী শরাফত।[১২৩]

বাংলাদেশের উপভাষিক বিন্যাসে নোয়াখালি একটি অন্যতম অঞ্চল। এই অঞ্চলের সমাজ ও ভাষা আমাদের সাহিত্যে বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। আমরা লক্ষ করি স্থানিক সমাজপটভূমি এবং অবহের দিক থেকে 'লালসালু' (১৩৫৫) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। এই উপন্যাসের জীবনবৃত্ত গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপরেখায় রূপায়িত। লেখক এই উপন্যাসে নোয়াখালি জেলার বিশেষ অঞ্চলের আবহ রচনা করলেও 'লালসালু' উপন্যাসে বৃত্তিক ভাষা (idolect) এবং ঔপভাষিক (dialect) সংলাপ রচনা করেছেন চরিত্রের বাস্তবানুগ প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনেই। বিশেষ করে প্রধান চরিত্র মজিদের বৃত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলোর উপভাষিক সংলাপ ছাড়াও ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় উপভাষার প্রমিতকরণরীতি এই উপন্যাসের ভাষারীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। সুতরাং 'লালসালু' উপন্যাসের ভাষারীতির দিকটিও বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ সমালোচকের অভিমতঃ ''লালসালু উপন্যাসের ঔপভাষিক উপকরণের ব্যবহারের ধাঁচটা বিশেষ আঞ্চলিক (special dialectal) নয়, মিশ্র ঔপভাষিক বা Pan dialectal অর্থাৎ 'লালসালু'র সংলাপে একাধিক উপভাষার সমন্বয় আছে। কোন কোন ঔপভাষিক উপকরণকে ওয়ালীউল্লাহ প্রমিতকরণও করে নিয়েছেন।''[১২৪]

লক্ষণীয়, মজিদ বৃত্তিকবুলি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় মোল্লা মৌলভীদের ভাষা ব্যবহার করেছে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের বৃত্তিক বুলির ব্যবহার আরো লক্ষ করা যায়, আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮–১৯৭৯) হুজুর কেবলা', 'ইসরাফিলের বেটা' প্রভৃতি গল্পে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' উপন্যাসে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিঃপীর' নাটকেও। লক্ষণীয় বিষয়, এই ধরনের চরিত্রগুলো অধিকাংশই অভিবাসনকারী। তাই এক উপভাষা অঞ্চল থেকে অন্য উপভাষা অঞ্চলে এসে তারা ভাষিক পরিবর্তন ঘটায়। মজিদ ও আওয়ালপুরের পীর তার ব্যতিক্রম নয়। মজিদ এই উপন্যাসে মূলত তার আধিপত্য বিস্তার করেছে ভাষা দিয়েই। গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারী, আধুনিক শিক্ষিত যুবক আক্কাস, রহীমা, জমিলা, তাহেরের বাপসহ সাধারণ কৃষকমন্ডলের ওপর তার প্রভাব ও আধিপত্য সম্ভব হয়েছে চারিত্রিক কারিশমা আর ভাষা চাতুর্যের মাধ্যমেই। মজিদের কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১. 'খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা।'[১২৫]

২. 'নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াককাল রাখো।'[১২৬]

৩. 'কলমা জান মিঞা'।[১২৭]

৪. 'জাহেল বে এলম আনপড়াহ'।[১২৮]

৫. যতসব শয়তানী বে'দাতী কাজ কারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা।[১২৯]

উপর্যুক্ত সংলাপে আরবি–ফারসি ও বাংলা মিশ্র ভাষা মজিদের বৃত্তিক পরিচয়কে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে, তেমনি তার ব্যক্তিমানসের পরিচয় পাওয়া যায় তারই ভাষাদর্পণে। লক্ষণীয়, খালেক ব্যাপারী ও রহীমার সঙ্গে মজিদ কথোপখথনের সময় একেবারে অবিমিশ্র আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। সেখানে দেখা যায়, কর্তৃত্ববাদী মজিদের অস্তিত্বে ফেলেছে অসহায়ত্বের ছায়া।

১. কথাডা কইতাম কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি? ... হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা– মাইয়াও ভুইলা গেছে। কিন্তু ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

... কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মত মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইলো এই পাক দিল আর গুণাগার দিল যদি এক সুতায় বাধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায়, তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।[১৩০]

২. বিবি কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলা নি? কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।[১৩১]

এইসব সংলাপে মজিদের কর্তৃত্বপবণ মেজাজের পরিবর্তে বেদনামথিত হৃদয়ার্তি প্রকাশ পায়। ফলে তার সংলাপে তখন উচ্চারিত হয আরবি–ফারসি ভাষার কৃত্রিমতামুক্ত বিশুদ্ধ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি গল্পে নোয়াখালি অঞ্চলের জনজীবনের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। ছোটগল্পে স্বল্প পরিসরে কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিতে নোয়াখালির আঞ্চলিক জীবন প্রদীপ্ত করে তুলেছেন মুনীর চৌধুরী (১৯২৫–১৯৭১) সমালোচনাকের ভাষায়, 'মনে হয় তাঁর এক কালের সমাজ–সংলগ্নতা ও অখ্যাত অপাংক্তেয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থেকেই তাঁর গল্পগুলোর বিষয় ও চরিত্র গড়ে উঠেছে। সামাজিক অসঙ্গতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু গল্পের পাত্রপাত্রীরা লেখকের সর্বব্যাপী সহানুভূতি থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি এবং তাদের অমার্জিত ভাষা, অসংস্কৃত আঞ্চলিকতা, অশ্লীল জীবনাচরণ আর অপাংক্তেয় সামাজিকতার মধ্য দিয়েই তারা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সমাজ বিষয়ক অভিজ্ঞতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সত্ত্বেও গল্পকার মুনীর চৌধুরীর সাফল্যের অন্যতম কারণ।'[১৩২]

নোয়াখালির গ্রামীণ সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই 'খড়ম', 'মানুষের জন্য', 'একটি তালাকের কাহিনী' প্রভৃতি গল্পে আঞ্চলিক সংলাপ সংযোজিত হয়েছে। মূলত তিনি তাঁর গল্পের লোকচরিত্রের মুখের ভাষায় সাবলীল প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রগুলোকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। নোয়াখালির আঞ্চলিক অবিকৃত সংলাপ মনে হয় মুনীর চৌধুরী ছাড়া অন্য কেউ প্রয়োগ করতে পারেন নি। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

১. ঃ আহ করস কি? এ মুটে সরি আয়। কাফনের উপর হুচ্ছাত ক্যা? এমুট কাইত্যই অয়।..

ঃ কাফনের কাপড় হি হি হি হি– বাঃ হেমুই যে আবার তর ছাইলের বস্তা। আই ইয়ানোই হুইতুম– ছাইলের বস্তার লেগে ঠেস দিলে আর ডর কইও না– হি–হি–হি–হি–।' [১৩৩]

২. ঃ বিছানাত হুতি আছিল কে?

ঃ আঁই, শান্ত স্বরে জবাব দেয় ফাতেমা। ....

ঃ এই দরজা খুলি বাইর অই গেল কে?

ঃ আঁই একবার উঠছিলাম। হোত্তনের ওক্তে লাগানোর কথা মোনো আছিল না আঁর।

ঃ আরে আর ভারাইচ্ছারে হারামজাদী? তোর গা উদাম করল কে হেইলে, তোর গার কাপড়ের প্যাঁচ হস করাইল কে?

চীৎকারে ব্যঙ্গো কর্কশ হয়ে এল ফাতেমার গলাও।

ঃ আঁই কি নটি নি। আঁই কি নটিনি। সোয়ামীর গরে হুইতুম না গা উদাম করে। ছালার ছট দি নিজেকে মুড়ি রাইখুম নি?[১৩৪]

আমাদের কথাসাহিত্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য অত্যন্ত অভিনব মাত্রা লাভ করেছে। বস্তুত এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবন প্রণালী সম্পর্কে লেখকগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে অনেক গল্পউপন্যাসে একই পটভূমি ও অঞ্চলের রূপ বারবার ফুটে ওঠে। এছাড়াও চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনসাধারণ, সামুদ্রিক মৎস্যজীবী মানুষ, বন্দরের শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, পকেটমার, মাতাল, ব্যবসায়ী বিচিত্র পেশাজীবী জীবনের ছবি আমাদের কথাসাহিত্যে অঙ্কিত হয়েছে। আর স্থানিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখকগণ ব্যবহার করেছেন স্থানিক কথ্যভাষাও। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখে আসে কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ–এর 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাসের কথা। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেনঃ 'চরিত্রকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় আমি এ বইয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিনি। চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন; তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি মাত্র; কর্ণফুলীর

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এই ভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্যরূপে গণ্য হয়েছে।[১৩৫]

কর্ণফুলী নদী তীরের জীবনধারায় তিনি যে সব চরিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন, তা হয়তো সামগ্রিক অবয়বকে প্রতিচিত্রিত করে না, তবু ঔপন্যাসিকের প্রয়াস শিল্পসিদ্ধ হয়েছে। এই উপন্যাসে 'রাঙামিলা, তার বাবা লালন এবং প্রণয়ী নীলমনিকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক জীবনের একটি অস্পষ্ট রেখাচিত্র মাত্র 'কর্ণফুলী'–তে ফুটে উঠেছে। তারা কর্ণফুলী তীরের চাকমা উপজাতির প্রতিনিধি স্থানীয় ওঠেনি। চাকমা সমাজ থেকেও এরা অনেক দূরে, ব্যতিক্রম হিসেবেই চিত্রিত। ... চাকমা উপজাতির জীবনের সঙ্গে সাময়িক কর্মসূত্রে জড়িত অথচ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রজমান ইসমাইল জলি উপন্যাসে প্রাধান্য পাওয়ায় আঞ্চলিক ও সম্প্রদায় জীবন–চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি বলেই আমাদের ধারণা।'[১৩৬] তবে চরিত্র ও পরিবেশ চিত্রণে ঔপন্যাসিক একটি স্থানিক আবহ ও ভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। চরিত্রের সংলাপে লক্ষণীয়–

'ইসমাইল সংক্ষেপে বলল, কাম তো চাই।
তইলে কালিয়া দশ্‌শুয়া বাজে কালুর ঘাটৎ আইস্।
– কিছু টেঁয়া দও। গড়িৎ দেওন পড়িব।
– ন যাবি?
– না থাক।
– কেয়া?
– গম ন লাগের।... টেঁয়া গুণ্ দাও।'[১৩৭]

বস্তুত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে আঞ্চলিক জীবন রূপায়নের দাবিদার হচ্ছেন শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬–১৯৭১)। তাঁর 'সারেং বৌ' (১৯৬২) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি নদী সমুদ্র পরিবেষ্টিত বামনছড়ি গ্রাম। এর পটভূমিও পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে লেখক উপন্যাসের শুরু করেছেন এইভাবে–

> থই থই পানি। নদীর পানি। সাগরের পানি। চারিদিকে পানি। মাঝখানে ডাঙ্গা। তবু একে দ্বীপ বলে না কেউ। বলে গ্রাম। কেননা এটা পানির দেশ। গ্রামটাকে বলে বামনছড়ি। নদীটাকে বলে কয়াল। বামন ছড়ি যেমন গ্রাম হয়েও গ্রাম নয়, জলঘেরা ভূখন্ড, তেমনি কয়ালও মামুলি নদী নয়। কয়াল সমুদ্রের মোহনায় উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। করালের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সমুদ্র...।[১৩৮]

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রাম ও অস্তিত্ব রক্ষার কাহিনীই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। আঞ্চলিক জীবনপটে এই উপন্যাসের ব্যক্তিমানস ও রাষ্ট্রসংকট এবং প্রাকৃতিক সংকটের মধ্যে কিভাবে মরেও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে এবং ধ্বংসস্তূপের উপরও আগামী দিনের নীড় নির্মাণ করে সেই সত্যই বাঙময় হয়ে ওঠে। উপন্যাসের উৎকর্গপত্রে ঔপন্যাসিকের ঘোষণা– 'তালতমালবনরাজিনীলা সাগর মেঘলা বঙ্গভূমির পূর্বউপকূলে যাদের জন্ম পৃথিবী যাদের দেশ, সমুদ্র যাদের অন্ন, তরঙ্গ যাদের খেলার সাথী, কষ্ট যাদের সাগর কল্লোল, ঝড়ও ওদের ঘর ভাঙ্গে, দরিয়ার বান ভাসিয়ে নেয় ওদের সব কিছু, তবু সাগরের ডাকে মন ওদের আনচান, কেননা ধনমীতে ওদের সেই নির্ভীক আদি নাবিকের রক্ত।'[১৩৯] সমুদ্রজীবী এইসব মানুষের জীবনপটে লেখক চরিত্রের গতিসঞ্চারের জন্য নিজের বর্ণনায় এবং চরিত্রের মুখেও ব্যবহার করেন আঞ্চলিক ভাষা ও লোক গান। নিম্নোক্ত উদাহরণে লেখকের এই সপ্রতিভ শিল্পমাত্রার পরিচয় পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সগির মা হাসে মনে মনে। বলে, তা তুই মা খুশী মুন কর নবিতুন। আমার তো দিল পোড়ে তোর লাগি। তোর 'শরীলে' যে ঢল ঢল জোয়ানকির জোয়ার। এ ঢল যে বিরথাই যায় নবিতুন।

আহ্ কুটনী বুড়ি! বের হ। বের হ তুই। মেয়ে খাগী, ছেলেখাগী খসম খগী।[১৪০]

বঙ্গোপসাগরের পটভূমিতে আঞ্চলিক রঙের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায় সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) এবং বিপ্রদাশ বড়ুয়ার 'সমুদ্রচরও বিদ্রোহীরা' (১৯৯৯) উপন্যাসেও। দক্ষিণপূর্ব বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনজীবনের অস্তিত্ব সংগ্রামের জটিল ঘটনাপ্রবাহ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসের উপজীব্য। বলা বাহুল্য, আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় জীবন ও জনপদ নির্বাচন এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি'–এর পটভূমি নিঃসন্দেহে অভিনব। নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় শাহপরি দ্বীপ সেন্টমার্টিন দ্বীপের ধীবর জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত জীবনের স্বপ্ন ও শ্রম সমুদ্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সামুদ্রিক জনপদ আর প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের ভেতর জীবনপ্রবাহ স্বাভাবিক ও নিদ্বর্দ্বভাবেই কেটে যাওয়ার কথা। কিন্তু জীবন ও প্রকৃতি নিদ্বর্দ্ব নয়। এই জীবন ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অধিশ্বর সমাজ এবং রাষ্ট্রের নষ্ট রাজনীতির প্রতিনিধি। তোরাব আলী সেই নিয়ন্ত্রক প্রতিনিধি, অন্যদিকে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি মালেক। মালেক ও তার স্বশ্রেণী শ্রমের হিস্যা এবং অধিকার বঞ্চিত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা সমুদ্রে মাছ, হাঙর শিকার করে, সমুদ্রের গভীর থেকে তুলে আনে ঝিনুক। সঞ্চয় করে মূল্যবান মুক্তো। কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। তোরাব আলী, গনি মিয়ার অর্থশক্তি ও পেশীশক্তির কাছে তারা পরাজিত হয়। শ্রম সময় ও জীবনের আয়ু সব উৎসর্গ করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে। ফলে ধীবরদের অস্তিত্ব রক্ষা একটা সংগ্রামেরই তুল্য। উপন্যাসের নায়ক মালেক ঐ জীবন বলয়ের অংশ হলেও তার স্বপ্নময়তা, সমিতি বা সঙ্ঘচেতনা, অস্তিত্ব সংগ্রামের অভীপ্সা নিস্তরঙ্গ ধীবরপল্লীতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তাদের হতদারিদ্র্য জীবনের নষ্টামি নোংরামি, ক্ষয়–পরাজয়ে পোকামাকড়ের মতো মানবজীবনগুলো মানবিকমূল্যবোধের প্রেরণায় জেগে উঠতে চায় মালেকের নেতৃত্বে। এই সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি যথার্থঃ

> সেলিনা হোসেন একজন মালেকের জীবন ও সংগ্রামের ছকে ধীবর শ্রেণীর স্বপ্ন ও ট্রাজিডির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মালেকের ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার ভাবময়তা ও আদর্শায়ন কখনো কখনো বাস্তবতার সীমাতিরিক্ত মনে হলেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনের রূপ–রূপান্তরের পটভূমিতে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মালেকের আত্মবিস্তারের কার্যকারণ হিসাবে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে আসা চৌধুরী সাহেবের সান্নিধ্যের ভূমিকাও কম নয়। মৃত জুলেখাকে দেখে মালেকের মধ্যে যে জিজ্ঞাসু সৃষ্টি হয় (জলকাদায় পোকার মতো মরে থাকাই যদি নিয়তি হয়, তবে জন্ম কেন?) সেখানেও তার সহজাত আত্মোপলব্ধির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মালেক চরিত্রের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক এক সর্বজনীন জীবনসূত্র নির্দেশ করেছেন। পোকামাকড়ের মতো বিমিশ্র অস্তিত্বসমূহের মুক্তিই তাঁর প্রাগ্রসর চেতনার অন্বিষ্ট। মালেকের মধ্যে জাগ্রত 'বেগুন্যের জন্যে প্রেম (সকলের জন্য প্রেম) মানবপ্রেমের উজ্জ্বলতায় ভাস্কর। এই মানবপ্রেম যুদ্ধ অস্তিত্বের মূল কথা।''[১৪১]

ফলে এই মানবমহিমার কারণেই সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হয়েও কাহিনীর প্রেক্ষাপট ও জীবনবোধে হয়ে ওঠে সর্বমানবিক এবং বিশ্বজনীন। লেখক এই উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ, স্থানিক বর্ণবিভাস, লোকজীবনের আচার ব্যবহার, লোকজভাষা সব কিছুই নিটোল বাস্তবতায় রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে উপন্যাসে পরিবেশ বর্ণনা ও প্রিমিটিভ জীবনযাত্রার

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সাজুয্যময় স্বাভাবিক মাতৃভাষার আঞ্চলিক রূপ ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. মা ও সন্তানের সল্লাপ ঃ

'তুই ভালো হই গিয় মা?
হ বাবা, শরীল পাতল লাগে।
আশেক কড়ে গ্যাল? তারে ন রাখি গেলাম তোঁয়ার কাছে?
পোয়া মানুষ কতক্ষণ আর বই থাকিত পারে।'[১৪২]

২. গালিগালাজের ভাষা ঃ

'হালা দিয়ম পোন্দে লাথি। হুদা ত্যালানি।
মেহের অপ্রস্তুত হয়ে যায়। অনর যে কুঁত্তে কী হয় ন বুঝি। চুপ হালা।'[১৪৩]

৩. নারী ও পুরুষের প্রেম সল্লাপ ঃ

তইলে পরুয়া ভাসিবা?
হ।
যওনের আগে ন আইবা?
বহুত দরদ দেইর।
ফায়ার লাইতো দরদ আছে। ন আছিল কঁত্তে।'[১৪৪]

বস্তুত,প্রতিভার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার যোগ না হলে শিল্প ও জীবনের নাড়ীর স্পন্দন অভিন্ন মাত্রা পায় না। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এমনই প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার নিবিড় সংযোগ ঘটেছে অঙুলিমেয় কথাশিল্পীর মধ্যেই। যে সব বিরল প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে এই শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে তাঁদের মধ্যে বিপ্রদাশ বড়ুয়া অন্যতম। তাঁর 'সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা' বাংলা কথাসাহিত্যে একটি এপিকধর্মী আঞ্চলিক উপন্যাস। বার্মা, চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়া, উরির চর, সন্দ্বীপের পটভূমি নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে আমাদের কথাসাহিত্যে নবতর অভিজ্ঞতার সংযোজন ঘটেছে। লবনচাষী, ভাগচাষী, করাত শ্রমিক, মাছের ডিম শিকারী ইত্যাদি বিচিত্র পেশায় নিয়োজিত মানুষের জীবনালেখ্য নিয়ে নির্মিত এই উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাস। বিপ্রদাশ বড়ুয়া বঙ্গোপসাগরের বিশাল ক্যানভাসে বহুবিচিত্র পেশার মানুষ, বিভিন্ন এলাকা, সময় ও আঞ্চলিক জীবনের আচার সংস্কারের রূপায়ন ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে। তবে কাহিনীর প্রধান চরিত্র মোবাশ্বেরের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। মোবাশ্বেবের মাধ্যমেই লেখক নানামাত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত মোবাশ্বেরের বংশানুক্রমিক তিন প্রজন্মের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসের পরিসর তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে চরকেন্দ্রিক মানুষ, জোতদার, চরদখলকারী, ব্যবসায়ী বিচিত্র পেশার চরিত্র এখানে পরিস্ফূটিত হয়েছে। লেখক জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি চরিত্র এঁকেছেন বাস্তবানুগভাবেই। ফলে জীবন ও ধর্মীয় বৃত্তিক পরিমন্ডলে এবং আঞ্চলিক জীবনের প্রতিটি নিবিড় অংশ তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় জীবন, জীবন সংগ্রাম প্রতিটি সমাজ সংলগ্ন পরিবেশ প্রতিবেশ বিধৃত হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং বর্মী রাখাইনদের জীবনালেখ্য তুলে এনেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। সংখ্যার দিক দিয়ে এই উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রই বেশি। মোবাশ্বের ও তার পরিবার, প্রথমা স্ত্রী শুকতারা মা দরিয়া, চাচা আমির আলী, উমেদ আলী প্রত্যেকের জীবনের গল্প বিবৃত করেছেন লেখক। এই সব এপিসোড পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কাহিনীর বিস্তার এবং ঐক্য গড়ে ওঠে। তবে উপন্যাসের পটিভূমিতে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে কবি উমেদ আলী, সফি কবি এবং রমেশ শীলের গান।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকার অর্থে আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনায় ঔপন্যাসিক অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি সংলাপ ও গানের উদাহরণ দেয়া হলো।

১. মোবাশ্বের বলে, আঁরা সমবায় সমিতি গরি সরকারের কাছে দরখাস্ত দিতাম চাই। তুঁই আঁরারে পথ বাতলাই দেঁঅ।

হালিমরে পাইলে হইত। হালিম কডে আছে জান?

অসিম বলল, আরে হইব হইব। আগে খাই-দাই লঅ।

নিজাম বলে, বীজ ধান কিনতাম আসনি দে আঁরা।[১৪৫]

২. মরিয়ম কোনো মতে বলল, 'তুঁই আঁরে মাফ করি দেঅ।

মোবাশ্বের অনেক্ষণ পর বলল, তুই চুপ কর। ঘরত্ ঘা।

ঃ আঁই কি মানুষ নয়।

ঃ তোর ভিতরে বেয়াক খের, ছাল আর ভূষি।

ঃ আঁই পাঁটি সোনা হই যাইয়ম, তুঁই আঁরে বিয়া করত..।[১৪৬]

৩. সফি কবির গান ঃ

আগেতে ন জাইনতাম দরিয়া তুই ত সর্বনাশা

জাইনলে কি আর তোর কূলত বাঁধিতাম বাসা।

পাহাড়ত যাই বাঁইধ্তাম ঘর

যদিও থাকে বাঘের ডর।

তোর মতন সে বেয়াক্কুন ন নিত

কাড়িয়া বাঘে তোর মত।[১৪৭]

এছাড়াও চট্টগ্রামের মগ উপজাতির জীবনযাত্রার এবং আঞ্চলিক পটভূমির ছবি অঙ্কিত হয়েছে বদরুদ্দীন আহমদ-এর 'অরণ্য মিথুন' (১৯৬৩) উপন্যাসে। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও এই অঞ্চলের জীবনচিত্র ও ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের প্রবীণ গল্পকারদের মধ্যে এই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে আবুল ফজলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। আঞ্চলিক জীবন ও পটভূমিসহ উপভাষার ব্যবহার তাঁর গল্পে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। তাঁর 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' থেকে উদাহরণ দেয়া হলো।

– গরদোষ অইলে খি খইখ অইব বাবু।

– খনঅ ভাল জ্যোতিষীরে দিয়েরে স্বস্ত্যয়ন খরাইতে অইব।

– শস্তন কি বাবু।

– দুষ্ট গ্রহকে শান্ত খরি দোষ খাড়ানোরে খয় স্বস্ত্যয়ন। তুই একদিন আঁর খাচে আইস্ব আই ভাল জ্যোতিষী দে'খাই দিয়ম।'[১৪৮]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'জাহাজী' গল্পেও চরিত্র ও সংলাপে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক চিত্র ফুটে ওঠে। কয়েকটি সংলাপে আঞ্চলিক রীতি লক্ষণীয়–

১. ছাত্তারগারে ফাডাই দিয়ো তো।

২. অডা. খানি লাথি এনা খাইয়ছ দে–

৩. বারিৎ কম আছে তোর?

৪. যা. এ'নে ডাক্যিলাম দে।[১৪৯]

এছাড়াও আলাউদ্দিন আল আজাদের 'বৃষ্টি', 'জীবনজমিন' এবং 'আল মাহমুদের 'কালো নৌকা' প্রভৃতি গল্পে চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবনের কাহিনী ও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত,পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয় সমাজজীবন এবং সমাজভাষা আমাদের কথাসাহিত্যে শরীরী সত্তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামসর্বস্ব বাংলাদেশের নরম মাটি মানুষ ও প্রকৃতি এবং তাদের মুখের ভাষা নিয়েই রচিত সাহিত্য সামগ্রিক ভাবেই হয়ে ওঠে স্বদেশের সাংস্কৃতিক অবয়ব। স্থানিক চিত্রপটে জীবনের সরব উপস্থিতি এবং নানামাত্রিক সংকট ও উত্তরণেরই ছবি প্রকাশ পেয়েছে আমাদের সাহিত্যে। ভৌগোলিক প্রাকৃতিক এবং বৃত্তিক জীবনবৈচিত্র্যের তিনটি আদল স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়েই আমাদের কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের প্রধান দুই জনপদে (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের) রচিত সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই অভিসন্দর্ভের প্রধান অনুসন্ধান ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলাদেশের সাহিত্যের সঙ্গপ্রসঙ্গ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যাবে, সমাজ ও ভাষাগত ভিন্নতায় উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপ বাংলাদেশের সাহিত্যকে দান করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। সামগ্রিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে স্থানিক প্রকৃতি সামজ, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং জীবনানুষঙ্গী ভাষা। বলাই বাহুল্য, কথাশিল্পীগণ সমাজ ও জীবনসত্যকে ধারণ করার সযত্ন প্রচেষ্টা থেকেই নির্ধারণ করে নিয়েছেন বিশেষ বিশেষ স্থানকেন্দ্রিক জীবনচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪৪।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৬।

৩. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপনাস বিষয় ও শিল্পরূপ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩।

৪. দেবেশ রায়, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫।

৫. Kamruddin Ahmed, 'A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh', Inside Library, Dhaka, 4th Edition, 1975. P. XXIV-XXIX.

৬. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদাস ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১।

৭. রফিকউল্লাহ খান, ''বাঙলা সংস্কৃতির শর্তবর্ষ ঃ উপন্যাস'' (প্রবন্ধ) করুণাময় গোস্বামী (সম্পাদিত), 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ (১৩০১-১৪০০), সুধীজন পাঠাগার, নারায়নগঞ্জ, ১লা মাঘ ১৪০০, পৃ. ১১৫-১১৬।

৮. R. P. Dutt, 'India Today', Manisha, Calcutta, reprint, 1992, P. 120.

৯. বদরুদ্দীন উমর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশর কৃষক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

১০. B. B. Misra, 'The Indian Middle' Classes', Bombay, 1961, P. 75.

১১. গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দ্বিতীয় খন্ড), অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৪, পৃ. ২৮।

১২. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ' বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬-১৭।

১৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩।

১৪. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৩৬৩, পৃ. ১৮৪।

১৫. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সগ্রাম', (১ম খণ্ড), ১৯৬৬, পৃ. ১১।

১৬. বদরুদ্দীন উমর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক' পৃ. ৫৮।

১৭. বিনতা রায় চৌধুরী, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩।

১৮. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৯. ভবানী সেন, 'ভাঙ্গানের মুখে বাংলা', ন্যাশনাল বুকস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃ. ২-৩।

২০. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

২১. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

২২. সত্যেন সেন, 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা ২য় সং, ১৩৯৩, পৃ. ৩।

২৩. বীরেন দত্ত, 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫।

২৪. সত্যেন সেন, 'বাংলাদেশের কৃষকের সগ্রাম', কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশ- উল্লেখ নেই, পৃ. ৯১-৯২।

২৫. কামরুদ্দীন আহমদ, 'পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি', স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্সস, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ৯৬।

২৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, ''বাংলাদেশের উপন্যাসঃ চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ'', (প্রবন্ধ), বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ২৮।

২৭. হাসান আজিজুল হক, 'একভাষার দুই সাহিত্য' (প্রবন্ধ) 'অতলের আঁধি' জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ৪৪।

২৮. আহমদ ছফা, 'জাগ্রত বাংলাদেশ', মুক্তধারা ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৯০ পৃ. ৫২।

২৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বাঙালিকে কে বাঁচাবে', আহমদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৯।

৩০. হাসান আজিজুল হক, 'অপ্রকাশের ভার', ইউ.পি.এল. ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৪।

৩১. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'স্বদেশ ও সাহিত্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষাচর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২০।

৩৩. G. A. Grierson, 'Linguistic survey of India', Vol. V. Part- 1. office of the superintendent, Government Printing, Calcutta, India, 1903, P. 13.

৩৪. G. A. Grierson, 'Linguistic survey of India', Vol. V. P. 1. P.

৩৫. Sunitikumar Chaterji, 'The origin and Development of the Bengali Language'. Part- 1. Culcutta University Press, 1962, P. 139.

৩৬. Ibid, P. 146.

৩৭. G. A. Grierson, 'Linguistic Survey of India', Vol- V. P. 17-19.

৩৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত) 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (ভূমিকা) বাংলা একাডেমী ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৩।

৩৯. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ' (প্রবন্ধ), সম্পাদকঃ মনসুর মুসা 'বাঙলাদেশ', বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক নওরোজ কিতাবস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৪।

৪০. অজয় রায়, 'আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০১।

৪১. মনসুর মুসা, 'বাংলাদেশের ভাষাপরিস্থিতি', (প্রবন্ধ) নিসর্গ ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা, সম্পাদক, মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি, চট্টগ্রাম, ১৩৮০, সংকলন-২, পৃ. ৭৬।

৪২. মনসুর মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

৪৩. Abul Kalam Manzur Morshed, 'A study of Standard Bengali and the Noakhali Dialect;, Bangla Academy; Dhaka, 1985, P. 6.

৪৪. মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা' (প্রবন্ধ), হুমায়ুন আজাদ (প্রধান সম্পাদক) 'বাঙলা ভাষা', ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৩০২।

৪৫. রাজীব হুমায়ন, 'পুরোনো ঢাকার ভাষা', (প্রবন্ধ), 'নিবন্ধমালা' ৮ম খন্ড, ১৯৯৪, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৪।

৪৬. মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২-৩১২।

৪৭. মুহম্মদ আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২।

৪৮. দ্রষ্টব্য ঃ ক. অনিমেষ পাল, 'ঢাকা জেলার একটি উপভাষায় মহাপ্রাণতা এবং স্বর' নিসর্গ (পত্রিকা) ভাষাতত্ত্বসংখ্যা, ১৩৮০, সংকলন ২, সম্পাদকঃ মনিরুজ্জামান পৃ. ৫৮-৭০।
খ. মনিরুজ্জামান, 'ঢাকাই উপভাষাঃ আদিয়াবাদ প্রত্যঞ্চল (প্রবন্ধ), হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) 'বাঙলা ভাষা' দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৩১৩-৩৩৫।

৪৯. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬।

৫০. Mario Pei, 'Language for Everybody', C. G. edition London, 1958. p. 107-108.

৫১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', নয়াউদ্যোগ কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫২।

৫২. মনিরুজ্জামান, 'ঢাকাই উপভাষাঃ আদিয়াবাদ প্রত্যঞ্চল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪।

৫৩. রাজীব হুমায়ুন, 'পুরোনো ঢাকার ভাষা' (প্রবন্ধ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৫৪. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, 'হাকিম হাবিবুর রহমান', ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ৪২।

৫৫. রাজীব হুমায়ুন, 'পুরোনো ঢাকার ভাষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

৫৬. G. A. Gerieson, 'Linguistics Survey of India', Vol- V. Part- 1. Calcutta, 1903, p. 209.

৫৭. Ibid, P. 209.

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. মজহারুদ্দীন ভুঁইয়া, 'ময়মনসিংহ জিলার ভাষা' (প্রবন্ধ) 'মাসিক মোহাম্মদী' সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পঞ্চদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৪৮, পৃ. ২৭৮–২৭৯।

৫৯. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮ পৃ. ১৩।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১–৬৭।

৬১. অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া, 'বরিশাল জেলার কথ্যভাষা', 'দৈনিক আজাদ', ৬ জানুয়ারি ১৯৫৭।

৬২. G. A. Grierson, Ibid, P. 279.

৬৩. District Gazetter, Faridpur, 1981, P. 33.

৬৪. অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া, পূর্বোক্ত।

৬৫. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২০৯।

৬৬. G. A. Grierson, 'Linguistic Survey of India' Vol. V. Part 1. Calcutta, 1903 P. 19.

৬৭. অজিত কুমার ঘোষ, 'যশোহরের ভাষা' (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, জুলাই, ১৯৮৩ কলিকাতা, পৃ. ৪৯।

৬৮. সেলীমা বেগম, 'যশোরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (প্রবন্ধ), 'সাহিত্যিকী' বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টাবিংশ খন্ড, চৈত্র, ১৩৯৯, পৃ. ২৮।

৬৯. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১–২১২।

৭০. সেলীমা বেগম, 'যশোরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (প্রবন্ধ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১–৩৭।

৭১. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮–২২২।

৭২. G. A. Grierson, Ibid, p. 18.

৭৩. ডঃ দিলীপ কুমার নাহা, 'প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা' সাহিত্য শ্রী পাবলিশার্স কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৪–৪৮।

৭৪. বাবর আলী, 'সাতক্ষীরার উপভাষা' (প্রবন্ধ) 'সওগাত', সম্পাদক, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ– ১৩৭৩, পৃ. ৫২২–৫২৪।

৭৫. Abul Kalam Manzur Morshed, 'A study of Standard Bengali and the Noakhali dialect; Bangla Academy' Dhaka, 1985, p. 9.

৭৬. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৯৬।

৭৭. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' পূর্বোক্ত পৃ. ১৮৩–১৮৪।

৭৮. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯–৩০০।

৭৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।

৮০. মুহম্মদ এনামুল হক, 'চট্টগ্রাম বাঙ্গালা' (প্রবন্ধ) 'বাঙলা ভাষা', দ্বিতীয় খন্ড, হুমায়ুন আজাদ (প্রধান সম্পাদক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮০.

৮১. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা', পূর্বোক্ত পৃ. ৩২৩।

৮২. মনিরুজ্জামান, 'চট্টগ্রামের উপভাষা প্রসঙ্গে' (প্রবন্ধ), 'ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা–১৯৬৯, পৃ. ২৩–২৬।

৮৩. আবু ইসহাক, 'সূর্য দীঘল বাড়ী', পৃ. ১৬।

৮৪. আবু ইসহাক, সূর্যদীঘল বাড়ী' পৃ. ৩২।

৮৫. রাবেয়া খাতুন, 'বায়ান্নো গলির এক গলি', ইমপ্রেস লাইবেরী, ১৯৭৮, ঢাকা, পৃ. ৩১।

৮৬. শওকত ওসমান, 'দুই সৈনিক', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০২, পৃ. ১৫।

৮৭. আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'ল্যাণ্ড়ী', ইউ. পি. এল. ঢাকা, ১৯৮৪ পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. শাহেদ আলী, 'শহীদে কারবালা' স্বনির্বাচিত গল্প, গতিধারা ঢাকা, প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ১৬৮।
৮৯. হাসান আজিজুল হক, 'পাবলিক সার্ভেন্ট', রচনাসংগ্রহ- ২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৪৯।
৯০. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ''উৎসব'', 'রচনাসমগ্র'-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ৩০।
৯১. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'কাশবনের কন্যা', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬১।
৯২. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'সমুদ্র বাসর', মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬ পৃ. ২৩৪।
৯৩. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৩৪২।
৯৪. আবদুল গাফফার চৌধুরী, 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', প্রকাশ তারিখ নেই, ঢাকা, কথাবিতান, পৃ. ২২।
৯৫. সেলিনা হোসেন, 'জলোচ্ছ্বাস', মুক্তধারা ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৯৫, পৃ. ১।
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।
৯৭. সেলিনা হোসেন, 'খোয়াই নদীর বাঁক বদল', 'খোল করতাল', কাশবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪।
৯৮. অমরেন্দ্র ঘোষ, 'চরকাশেম', পৃ. ১২৮।
৯৯. কবীর চৌধুরী, 'পদ্মার পলি দ্বীপ', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ২৩৮।
১০০. আবু ইসহাক, 'পদ্মার পলি দ্বীপ', পৃ. ১৬৭।
১০১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''বারিক অপেরা পার্টি', শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩।
১০২. ঐ, ''কাঠবিক্রি বুড়ো'', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।
১০৩. ঐ, 'ফকির', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
১০৪. ঐ, 'ইছামতি' 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস', অবসর, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬০।
১০৫. হাসান আজিজুল হকের 'শকুন', তৃষ্ণা, 'পরবাসী', 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'মন তার শঙ্খিনী' 'জীবন ঘষে আগুন' প্রভৃতি গল্পে রাঢের ছবি পরিস্ফূটিত হয়েছে।
১০৬. হাসান আজিজুল হক, ''গল্পের জায়গা জমি মানুষ'', 'চালচিত্রের খুটিনাটি' মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১০৬।
১০৭. হাসান আজিজুল হক, 'মারী', 'রচনা সংগ্রহ-১', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৬৬।
১০৮. ঐ ''আমৃত্যু আজীবন'' র. স. ১. পৃ. ১৯৫।
১০৯. ঐ, ''ভূষণের একদিন'', র. স.- ১, পৃ. ২৯৮।
১১০. ঐ, 'ঘরগেরস্থি', র. স.- ১, পৃ. ৩৪৭।
১১১. হাসনাত আবদুল হাই, 'প্রভু', মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ২৩।
১১২. হাসান আজিজুল হক, 'সরল হিংসা' র, স.-২, পৃ. ২২-২৩।
১১৩. ঐ 'মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে', র, স.- ২, পৃ. ২৪৪।
১১৪. ঐ 'মা-মেয়ের সংসার' র.স.-২, পৃ. ২৮০-২৮১।
১১৫. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ' বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৬।
১১৬. আবুবকর সিদ্দিক, 'জলরাক্ষস, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৯৭।
১১৭. শাহেদ আলী, 'ফসল তোলার কাহিনী', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'গতিধারা', ঢাকা ২০০০, পৃ. ৯০।
১১৮. ঐ, পৃ. ৩০৭।
১১৯. রাহাত খান, 'দুঃখিনী কমলা', নির্বাচিত গল্প, দিব্য প্রকাশ ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৩৪।
১২০. ঐ, পৃ. ৭৯।
১২১. শাহেদ আলী, 'পোড়া মাটির গন্ধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।
১২২. ঐ, পৃ. ২৫২।
১২৩. শাহেদ আলী, 'কপাল' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. মনসুর মুসা, ''লালসালু ঃ ভাষারীতি'' 'লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ', মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত), মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৩।
১২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'লালসালু', উপন্যাসসমগ্র', প্রতীক ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৮।
১২৬. ঐ, পৃ. ৬৬।
১২৭. ঐ, পৃ. ৩২।
১২৮. ঐ, পৃ. ৬।
১২৯. ঐ, পৃ. ৪১।
১৩০. ঐ, পৃ. ৪২।
১৩১. ঐ, পৃ. ৫৩।
১৩২. আজহার ইসলাম, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২২৩।
১৩৩. মুনীর চৌধুরী, 'খড়ম', ''মুনীর চৌধুরীর রচনাসমগ্র-১, সম্পাদনা- আনিসুজ্জামান, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫২০।
১৩৪. মুনীর চৌধুরী, 'একটি তালাকের কাহিনী' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩২।
১৩৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কর্ণফুলী', 'লেখকের কথা', মুক্তধারা ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪।
১৩৬. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, 'আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা:বিভাগোত্তর কাল', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮ পৃ. ৩৬।
১৩৭. আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কর্ণফুলী', পূর্বোক্ত পৃ. ১৪।
১৩৮. শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সারেং বৌ', নসাস, ঢাকা দশম মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃ. ৯।
১৩৯. শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সারেং বৌ' উৎসর্গ পত্র, পূর্বোক্ত।
১৪০. শহীদুল্লাহ কায়সার, ঐ, পৃ. ১১।
১৪১. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭ পৃ. ২৫৫-১৫৬।
১৪২. সেলিনা হোসেন, 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৫।
১৪৩. ঐ, পৃ. ৪৯।
১৪৪. ঐ, পৃ. ৫২।
১৪৫. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, 'সমুদ্র চর ও বিদ্রোহীরা', 'জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন', ঢাকা, ১৯৯, পৃঃ ৭৩।
১৪৬. ঐ, পৃ. ১৫০।
১৪৭. ঐ, পৃ. ৩১৩।
১৪৮. আবুল ফজল, ''রহস্যময়ী প্রকৃতি'', 'স্ব-নির্বাচিত গল্প-সংকলন', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ২৪৭।
১৪৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'জাহাজী' গল্পসমগ্র' প্রতীক ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়– জনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব

৩.০১ ভূমিকা ঃ

উত্তরবঙ্গের সমাজ ও উপভাষার সঙ্গে ভৌগোলিক সম্পর্কসূত্র রয়েছে। কারণ, ভাষা দেশকালের আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ভাষার ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য মানবসভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন তাই জরুরী। বলা হয়ে থাকে, 'সভ্যতার ইতিহাস মূলত ভাষারই ইতিহাস।'[১] সুতরাং ভাষার উদ্ভব, প্রবহমান বিস্তার, পরিবর্তন, সমাজগঠনে ও সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনে ভাষার ব্যবহার, শ্রেণীর সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক ইত্যাদি স্বরূপ নিয়ে আলোচনার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তবুও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, ভাষা কোন নির্দিষ্ট সমাজ থেকে জন্মলাভ করে না। ভাষা হচ্ছে নানা যুগের নানা সমাজ সভ্যতার সামগ্রিক সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলোকে ভাষাতাত্ত্বিকরা রূপতাত্ত্বিক, বংশানুক্রমিক ও ভৌগোলিক বিভাজনে শ্রেণীবদ্ধ করতে চান। সেই অর্থে বাস্তবসম্মত পরিস্থিতিতে ভাষার সঙ্গে একটি জাতির ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের যোগসূত্র রয়েছে একথাও সত্য। কাজেই আমাদের মানবাভিজ্ঞান একথাই জানান দেয় যে, কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ব্যতীত কোন জাতির ভাষা–সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে না। এমনও লক্ষ করা যায় যে, ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ভাষাভিত্তিক জাতীয় পরিচয়। সুতরাং জনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের স্বরূপ অন্বেষণ করতে হলে প্রথমেই সমাজইতিহাস ও ভৌগোলিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। কারণ জন ও ভাষার একত্ব গড়ে উঠতে বস্তুতপক্ষে দেশকাল ও জাতির ধারাবাহিক প্রবহমানতার মাধ্যমেই তার বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বলেন, ''দেশের বস্তুগত রূপ বহুল পরিমাণে দেশান্তর্গত মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সাধনা–সংস্কৃতি, আহার–বিহার, বসন–ব্যসন, ধ্যান–ধারনা ইত্যাদি নির্ণয় করে।''[২] বাংলাদেশের সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষার স্বরূপ অন্বেষণের জন্যেও তাই সমাজ ইতিহাসের পরিচয় জানা প্রয়োজন। বর্তমান প্রসঙ্গে এ প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা গবেষণার লক্ষ্য।

৩.০২ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি ও সীমানা নির্দেশ ঃ

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি ও সীমানার মধ্যেই জনতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে। যদিও ভাষা বহুবিধ কারণেই ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে যায়; তবু ভাষার মূল্য ও স্বরূপবৈচিত্র্য চিহ্নিত হয় নির্দিষ্ট সমাজ ও জনপদের স্থানিক পটভূমিতেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পটভূমির ইতিহাস ও তার বিবর্তন লক্ষ করা যাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জনপদ। উত্তরবঙ্গের আদি ইতিহাস অনুসন্ধানেও জানা যায়, পুন্ড্রই ছিল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ।[৩] এই প্রাচীন জনপদ উত্তরবঙ্গের ইতিহাস মূলত বাংলাদেশেরই আদি ইতিহাস। বর্তমান বাংলাদেশের এই জনপদ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মনুষ্য পদচারণায় ধন্য হয়েছে। মানব সভ্যতার প্রাচীন প্রস্তুর যুগ থেকেই পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত এই জনপদে বিভিন্ন মানবজাতি যুগে যুগে জীবনচর্যায় ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে তোলে নতুন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নানা জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনতীর্থ এই ভূখণ্ডে কালক্রমে তাদের আদি পরিচয় হারিয়ে সবশেষে বাঙালি জাতিসত্তা আপন পরিচয়ে ধন্য হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে, 'ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর পূর্বে অর্থাৎ প্যালিওসিন যুগে। বস্তুত প্যালিওসিন যুগের পরে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সূচিত হয়েছিল প্লিস্টোসিন যুগ। এ যুগেই আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল।'[৪]

উল্লিখিত কালপর্ব থেকে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস অস্পষ্ট। অনুরূপ আঞ্চলিক ইতিহাস আরো বেশি অসংগঠিত। পৃথিবীর বহুদেশেরই ইতিহাস শুরু হয়েছে পুরাণ উপাখ্যান দিয়ে। প্রাচীন বঙ্গ তথা বাংলাদেশেরও জন্ম ইতিহাস নিয়ে একাধিক পুরাণ–উপাখ্যান রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গের ঋগ্বেদে বঙ্গের উল্লেখ নেই। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সব প্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও বোধায়ন 'ধর্মসূত্র', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ'এ বঙ্গকে 'গঙ্গাস্রোত হন্তরেষু' বা গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী স্থান রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।[৫] ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে আছে, বলিহারের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অন্ধমুণি দীর্ঘতমার ঔরসে নাকি পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম হয়– অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সূহ্ম। অন্যদিকে, মুসলিম মিথ থেকে জানা যায়, মহাপ্লাবনের নায়ক পয়গম্বর নূহের পুত্র ছিলেন হাম, হামের পুত্র হিন্দ এবং হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম বঙ্গা। বঙ্গা বঙ্গো এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।[৬]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ধারণার কথাও বিবৃত হয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণ এই জনপদে গঙ্গারিদাই জাতির উল্লেখ করেছেন। এই জাতি বঙ্গ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ শাসন করতো। পরে মৌর্যরা উত্তরবঙ্গ দখল করে। বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিতে বর্ণিত পুন্ড্র নগরকে একটি উন্নত নগরীরূপে পাওয়া যায়।[৭]

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীনবঙ্গ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসের একটি মহিমান্বিত অংশও বটে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা যায়, পৃথিবীর বয়স প্রায় পাঁচশত কোটি বছর। সৃষ্টির আদিলগ্নে যে সব শিলা গঠিত হয়েছিল তা বর্তমান পৃথিবীর ঢাল আকারে ভূখণ্ডে পাওয়া যায়। এমনই একটি ভূখন্ড হচ্ছে ভারত উপদ্বীপ। আরও ধারণা করা হয়, এক সময় ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টারন্টিকার সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ গোলার্ধে 'গন্ডোয়ানা ল্যান্ড' নামে একটি বিশাল ভূখন্ড ছিল। উত্তর গোলার্ধেও ছিল অনুরূপ একটি ভূখন্ড। এই দুই ভূখন্ডের মাঝে ছিল টেথিস সাগর। মধ্যযুগীয় মহাযুগের শেষার্ধের দিকে গন্ডোয়ানা ল্যান্ডে ফাটল ধরে এবং মূলভূখন্ডের উল্লিখিত অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাসতে ভাসতে বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষ এভাবেই বিগত দশ কোটি বছরে তিন হাজার মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করে এশিয়া ভূখন্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে এবং ক্রমেই জমাকৃত পলল বা পাললিক শিলা সংকুচিত হয়ে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয়, প্রায় চার কোটি বছর পূর্বে অলিগোসিন যুগে হিমালয়ের উৎপত্তির সঙ্গে বঙ্গেরও সৃষ্টি হয়।[৮] অপর এক মতে জানা যায়, 'প্রায় সাড়ে তেরো কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বত সৃষ্টির পর প্রথম পর্যায়ে সারা বাংলা অঞ্চল ছিল আসাম উপসাগর নামে একটি অগভীর উপসাগরের অংশ। পরবর্তীকালে প্রায় ছয় কোটি বছর আগে বাংলাদেশ দু'টি উপসাগরে বিভক্ত হয়– সিলেট ও বগুড়া উপসাগর।'[৯] হিমালয় থেকে উৎপন্ন অসংখ্য ছোটবড় নদনদী মানবদেহের শিরা–উপশিরার মতো বাংলাদেশের শরীর বেয়ে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। এইসব নদীবাহিত কাঁকর, বালি, পলি দিয়েই গড়ে ওঠে বঙ্গীয় অববাহিকা।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া এলাকা, উত্তরে দিনাজপুর, রংপুর মধ্যবর্তী বরেন্দ্রভূমি (বরিন্দ) মধ্য ঢাকা, ময়মনসিংহ এলাকার মধুপুর গড় এবং কুমিল্লাস্থ লালমাই ময়নামতী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নিম্নসমতল ভূমি। এই সমতল ভূমির গড় উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে গড়ে ১৫–২০ ফুটের বেশি নয়। বাংলাদেশই সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি।[১০]

প্রাচীনবঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশ যেমন রাজনৈতিকভাবে নানা সময়ে বদলেছে, তেমনি ভৌগোলিক কারণেও এই ভূখন্ডের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন ভূমিগঠনের দিক দিয়ে বঙ্গদেশে সিলেট ও বগুড়া উপসাগরীয় ভূভাগ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল ভারতীয় উপমহাদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল জনপদের মর্যাদা লাভ করেছিল। অবশ্য প্রাচীন বঙ্গ ছিল বিভিন্ন নামের খণ্ড খণ্ড জনপদ। বঙ্গাঃ রাঢ়াঃ সুহ্মা, পুন্ড্র–জনপদ দিয়েই বাংলার ইতিহাসের শুরু। তবে প্রাচীন বঙ্গদেশের সবচেয়ে প্রভাবখ্যাত জনপদ ছিল পুন্ড্র বা পৌন্ড্র দেশ। এই পৌন্ড্র দেশই অতীতের উত্তরবঙ্গ। অর্থাৎ পশ্চিমে কুশী (কুশীগঙ্গা) দক্ষিণে গঙ্গানদী ও পূর্বে করোতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছিল।[১১] আরো জানা যায়, আদি বাংলার এই অঞ্চলটি যেমন একদিকে সমুদ্র উপকূলবর্তী, অন্যদিকে সুউচ্চ ভূমির গঠন হওয়ায় এই এলাকার নানা স্থানে জনবসতি গড়ে ওঠে। আনুমানিক দশ লক্ষ বছর পূর্বে প্লেইস্টোসিন যুগে বাংলাদেশে প্রথম মানুষের আগমন ঘটে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়ের নিকট অবস্থিত বরিন্দে। প্রত্নপ্রস্তর যুগে বিহার থেকে আগত মানুষই সম্ভবত উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিল।[১২] এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পন্ডিত ডঃ আহমদ শরীফের অভিমতঃ ''বাংলার রাঢ় বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাংলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় নিগ্রো সাইবেরীয় নর্ডিড মোঙ্গল। এরাই অস্ট্রিক দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুণ, কুশান, গ্রীক, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত।''[১৩]

সুতরাং উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে এই সত্যই প্রামণিত হয় যে, প্রাচীন বঙ্গের এই পলল গঠিত ভূমিতে যুগযুগান্তর ধরে মানবপরম্পরা ধারাক্রমেই বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব। আবার ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়েও করতোয়া, আত্রাই, বহ্মপুত্র নদী অধ্যুষিত এই জনপদটির ভূবিন্যাস যে অতিপ্রাচীন এদ্ববিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। ঐতিহাসিকের মন্তব্য স্মরণ করি ঃ

> উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রাচীন নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থমহিমা বহুখ্যাত। পুরাণে বারবার করতোয়ার মাহাত্ম্যকীর্তিত হইয়াছে। ... খুব প্রাচীনকালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং করতোয়ার মাহাত্ম্য হইতেই প্রমাণিত হয়।[১৪]

রেনেলের ম্যাপেও করতোয়াকে সবচেয়ে বড় নদীরূপে দেখানো হয়েছে। হিন্দু পুরাণেও গঙ্গার সমায়তন বিশিষ্ট একটি নদী বলে করতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫] আর প্রাচীনকালে এই নদীই ছিল উত্তরবঙ্গের বা তৎকালীন পৌন্ড্র জনপদের প্রধানতম নদী। বর্তমানে করতোয়া শীর্ণকায়া হলেও অতীতে এমন ছিল না। কুশীনদী এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগই ছিল প্রাচীন পৌন্ড্র জনপদ, এই ঐতিহ্য আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়ে আসছে। সুতরাং পৌন্ড্রদেশ বা উত্তরবঙ্গ যে অতিপ্রাচীন জনপদ এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই পূরাভূমির সীমায়তন সম্পর্কে ইতিহাসলব্ধ ধারণা হচ্ছেঃ ''পরাভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুরের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ঐ নদীর দুই তীরে বিস্তৃত হইয়া আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করিয়াছে।''[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-১ : বৃহৎবঙ্গের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান

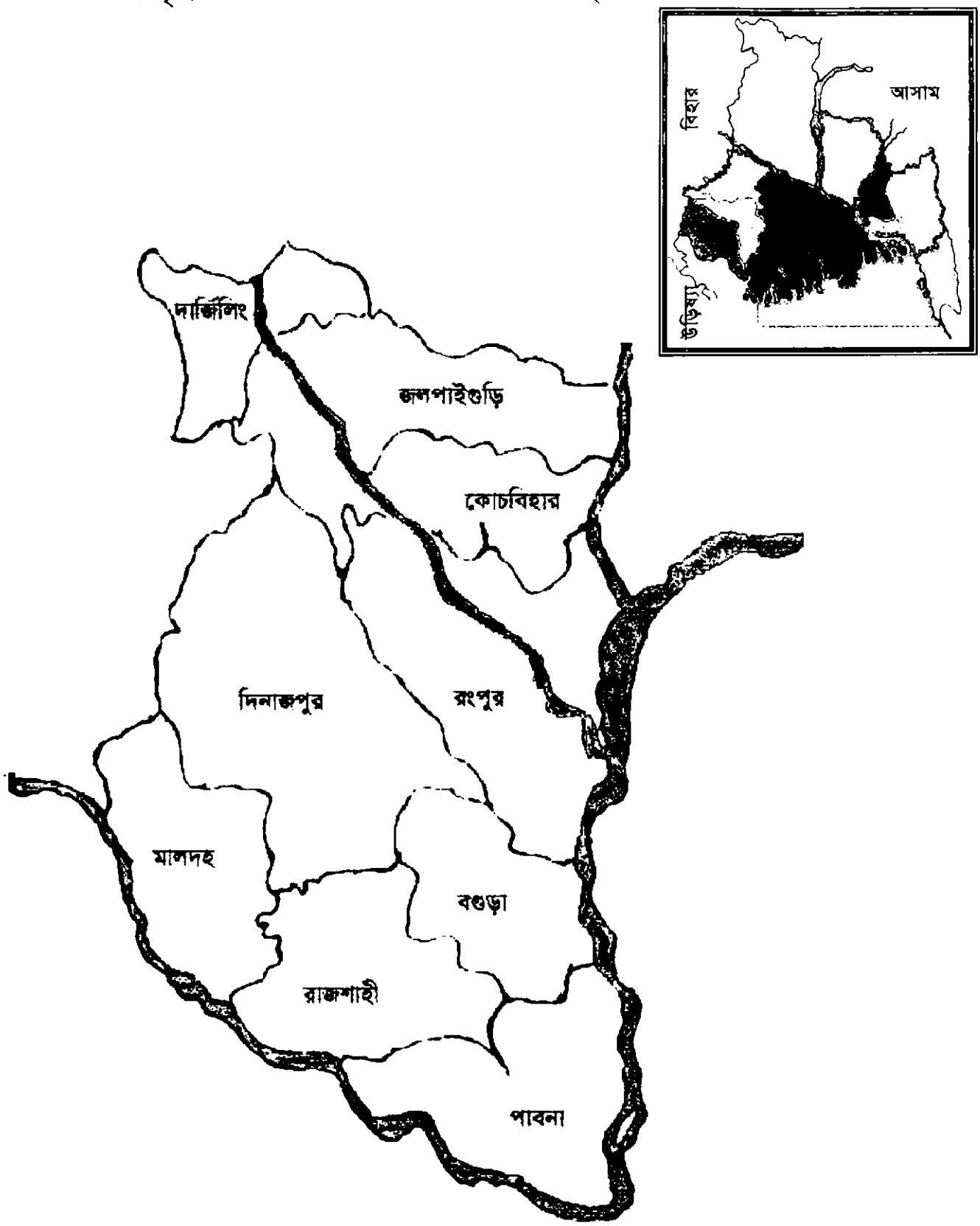

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশেরও প্রাক্‌পটভূমির সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের সীমায়তনগত ঐক্য নেই। এমনকি, বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ নামে কোন এলাকাও চিহ্নিত করা হয় না। সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক দিক দিয়েও উত্তরবঙ্গ ধারণাটি স্বীকৃত নয়। তবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই নামকরণ লোক মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বকাল থেকেই এই জনপদটি উত্তরবঙ্গ অভিধায় পরিচিতি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ নামকরণ ও সীমায়তন রাজনৈতিক এবং জনতত্ত্বের বিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। তাই লক্ষ করা যাবে, ব্রিটিশশাসিত উত্তরবঙ্গ এবং দেশ বিভাগোত্তর উত্তরবঙ্গেরও মানচিত্রগত বা সীমায়তনগত পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্রিটিশ শাসিত উত্তরবঙ্গ বলতে সাধারণত ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বের অবস্থানকে বোঝাবে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা যথাক্রমে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বা জলপাইগুড়ি বিভাগসহ বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহকে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ বোঝাতো। অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগের ষোলটি জেলা এবং জলপাইগুড়ি বিভাগের পাঁচটি জেলা নিয়েই উত্তরবঙ্গ বোঝানো হতো।

আয়তনের দিক দিয়ে জলপাইগুড়ি বিভাগের ২১৬২৫ বর্গকিলোমিটার এবং রাজশাহী বিভাগের ৩৪৯৭১ বর্গবিলোমিটার নিয়ে মোট ৫৬৫৯৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা উত্তরবঙ্গ নামক লৌকিক ধারণায় চিহ্নিত হতো। বলাই বাহুল্য, সমগ্র এই উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঙ্গার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চলসহ সিকিম, ভুটানের পার্বত্য অঞ্চলের কিছু অংশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বস্তুত এইভাবেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সমতল এবং পার্বত্য সমন্বিত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমায়তন চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালেও আবার ইংরেজ সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে অঞ্চলভিত্তিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করেন। 'ফলে কোন কোন এলাকা পার্শ্ববর্তী বঙ্গে এর প্রদেশের (যথা পশ্চিমে বিহার ও পূর্বে আসাম) অন্তর্গত হয়ে সাধারণভাবে বঙ্গীয় এলাকার বহির্ভূত হয়ে পড়েছে।'[১৭] পক্ষান্তরে, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগোত্তর উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সীমানায় ও প্রশাসনিক মানচিত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাক্তন করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গের সীমানাভুক্ত অন্যতম জেলারূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু কিছু অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক জনবিন্যাসের দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে উত্তরবঙ্গ বলতে জলপাইগুড়ি বিভাগের পাঁচটি জেলা নিয়ে এর সীমানা স্থিরীকৃত হয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের ষোলটি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গের সীমানা চিহ্নিত। তিনটি মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের তিনটি অবস্থান নির্দেশ করা হলো। বর্তমান আলোচনা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মূলত দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের মোট ষোলটি জেলার জনপদ ও ভাষিক অঞ্চল নিয়ে রচিত কথাসাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত ভৌগোলিক জনবিন্যাসের ভাষিক পরিস্থিতি ও ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপটিও জানা তাই জরুরী। প্রাসঙ্গিক পরম্পরায়

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-২ : দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান

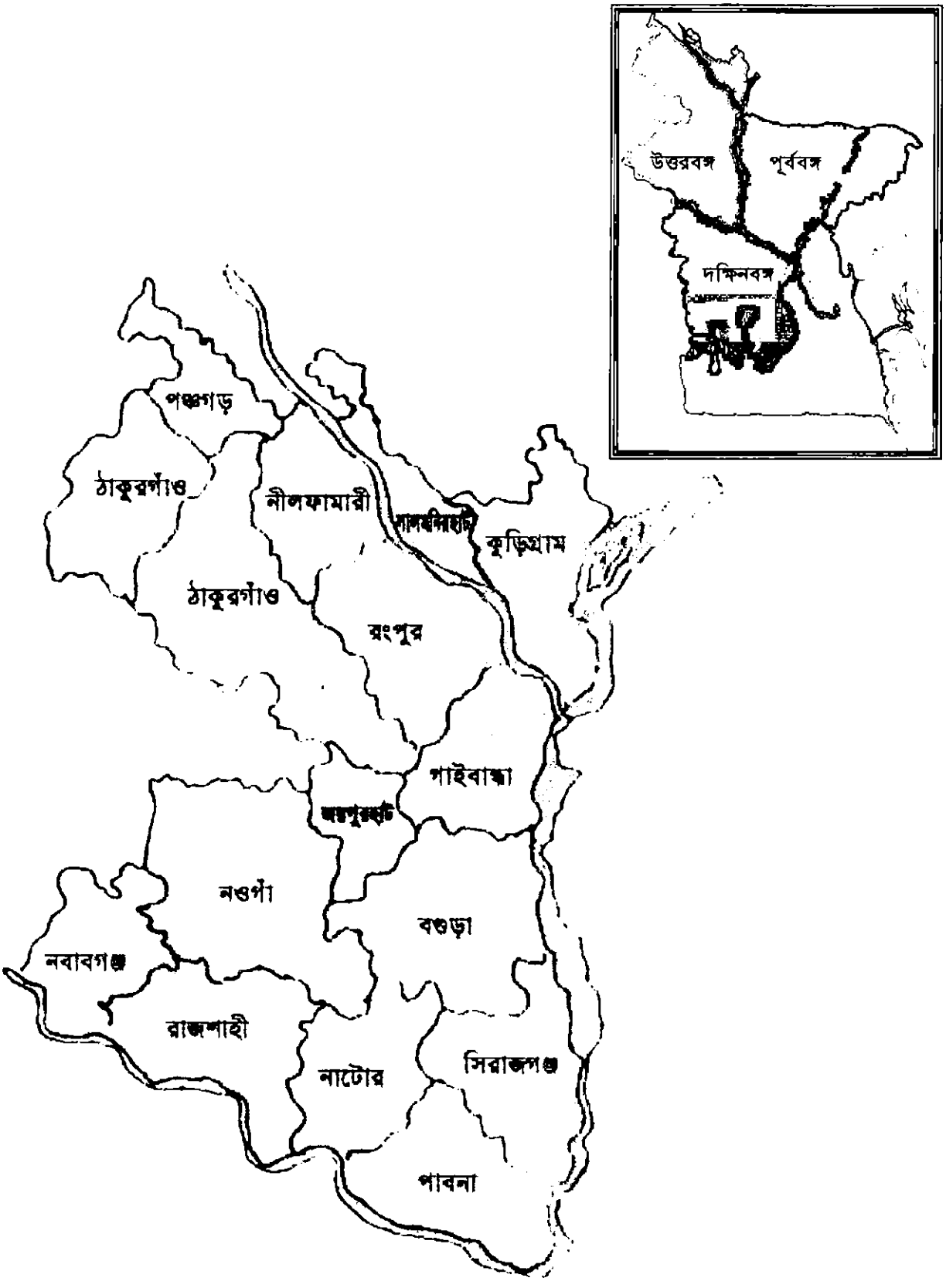

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি বিশ্লেষিত হবে। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের সঙ্গে ভাষাপরিস্থিতির নিবিড় পরিচয়ের সূত্রধরে সাহিত্যের অনুষঙ্গী উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে।

৩.০৩ উত্তরবাংলার জনবিন্যাস ও ভাষা–পরিস্থিতি ঃ

উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ভাষা–সমীক্ষার প্রয়োজনে জনবিন্যাসের ধরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা দরকার। কারণ কোন অঞ্চল তথা দেশের জনবিন্যাসের স্বরূপ না জানলে ভাষিকগোষ্ঠী এবং ভাষা–পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। সাধারণভাবে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ একাভাষী রাষ্ট্র হলেও বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অত্যন্ত ব্যাপক। এই বৈচিত্র্যময় ব্যাপকতার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভৌগোলিক জনবিন্যাস এবং ধর্মীয়, অর্থনৈতিক শ্রেণীস্তরগত অবস্থান। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, ''ভাষার মূল কথা হলো বৈচিত্র্য। একভাষী ভুখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, বিভিন্ন জাত বা বর্ণের মধ্যে বা বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী ভাষীর মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভাষার ভেদ পরিলক্ষিত হয়।''[১৮] বলাই বাহুল্য, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক জনবিন্যাস এবং ধর্মীয় জাতিগত শ্রেণীভেদের ফলে এই জনপদের উপভাষা বৈচিত্র্য বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে। যার ইতিহাস জড়িয়ে আছে সমাজ বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে। বর্তমান অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের ভাষাপরিস্থিতি ও জনবিন্যাসের পারম্পর্যসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের ইতিহাস মূলত সমাজবিন্যাসেরই ইতিহাস। কারণ, 'জন'কে নিয়েই সমাজ ও ভাষার বিকাশ সূচিত হয়। আর 'সমাজবিন্যাসের ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের কথা এবং তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভাষাতত্ত্বের কথা।'[১৯] সুতরাং উত্তরবঙ্গের জনতত্ত্বের পাঠ ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পাঠ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় না।

তবে সমাজে বা দেশে জনবিন্যাসের ইতিহাস হচ্ছে চলিষ্ণু নিরবচ্ছিন্ন ধারা। তাই নির্দিষ্ট সময়পর্বে জনবিন্যাসের ইতিহাস সমাপ্ত হয় না, শেষ হয় না সামাজিক ইতিহাসের ক্রমপরম্পরা ধারা। লক্ষণীয় প্রাচীন যুগ থেকেই উত্তর বাংলার এই বরেন্দ্র জনপদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বসবাসের সূত্রপাত হয়েছিল। আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত। বলা দরকার, সামাজিক বিবর্তনের ধারায় ক্রমবিকাশিত সমাজেই মানুষের বিকাশ সূচিত হয়েছে। কিভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সংশ্লেষণে আর মিশ্রণে সঙ্কর বাঙালির উৎপত্তি হয়েছে তা নিয়ে বহুবিস্তর আলোচনা ইতোপূর্বে অনেক গবেষক করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া হবে, উত্তর বাংলার আদি জনগোষ্ঠী এবং বর্তমান জনবিন্যাস ও ভাষা পরিস্থিতির দিকে।

উত্তর বাংলার জনবিন্যাস ঃ

বলা বাহুল্য, দেব–দেবী আর রাজ–রাজণ্যের কাহিনী দিয়ে বাংলার ইতিহাস লেখা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচিত হয় নি। সুতরাং আদি বরেন্দ্র ভূমিতে যে জনগোষ্ঠী ও বাচকগোষ্ঠী বসবাস করতো তাদের সম্পর্কে বিস্তর তথ্য আমাদের ইতিহাসে মেলে না। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, কাব্য–কাহিনী এবং বিদেশীদের দ্বারা রচিত রাজনৈতিক সামরিক ঘটনাবলীর বিবরণীতে কিছু কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। এছাড়াও প্রাচীন কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের আগমন এবং তাদের বিবরণীতেও কিছু সহায়ক তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-৩ : দেশবিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অবস্থান

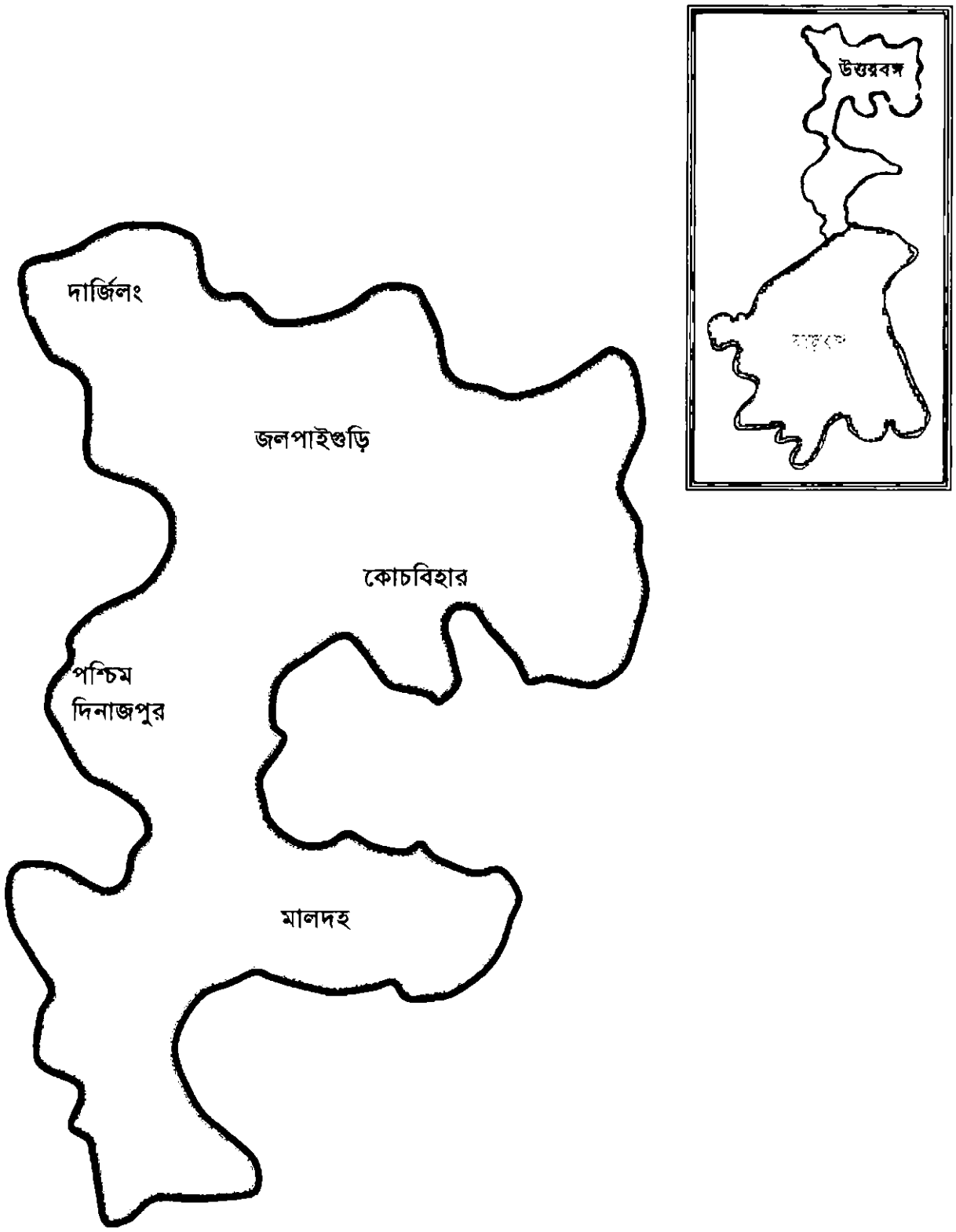

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন ইংরেজ প্রশাসক ও গবেষকের সমাজতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা থেকে এই অঞ্চলের জনতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের পরিচয় মেলে।

এ যাবৎ প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যলব্ধ ধারণা থেকে বলা যায়, আদি বরেন্দ্রভূমিতে পোদ, শবর, কৈবর্ত, কোচ, মেচ, রাজবংশী ইত্যাদি আদিম মানবগোষ্ঠি এবং আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞাত মানবকূল বিচরণ করতো। অরণ্যচারী এইসব যাযাবর শ্রেণীর অনেকে জীবনধারার পরিবর্তনে কৃষিকেন্দ্রিক স্থায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ''বরেন্দ্র অঞ্চলের আজকের অধিবাসীদের একটি বৃহদংশের ধমনিতে সেইসব আদিম মানুষের রক্তস্রোত এখনও প্রবহমান। অধিকাংশই যে তাদের উত্তরপুরুষ সে কথা অনেকখানি সংশয়হীনভাবেই বলা যায়।''[২০] চিরায়ত বরেন্দ্রভূমিতে আদিমানব পোদ, শবর ও অন্যান্য মানব প্রোটো–অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। তবে কৈবর্তদের জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অনেকাংশেই অসনাক্ত। ধারণা করা হয়, ''কেবর্তদের পূর্বপুরুষেরা উত্তরকালে যে কোন কারণেই হোক, গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করে বরেন্দ্র দেশে বা তার আশে পাশে আগমন করে। এখানকার অনুকূল ভূ–প্রকৃতির কারণে অস্ট্রিকসুলভ মৎস্যনির্ভর যাযাবর জলচারী জীবনের দিকে তাদের ঝুঁকে পড়া সহজ ছিল। সে কারণে তারা পরে নৌকার মাঝি, ধীবর, জেলে প্রভৃতি জলাশ্রয়ী পেশায় লিপ্ত হয়।''[২১] পরবর্তীকালে কৈবর্তদের দুটো শ্রেণী একদিকে হালুয়া অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক জীবন যাপনে আকৃষ্ট হয়; অন্যদিকে জালুয়া অর্থাৎ মৎস্যজীবী পেশায় রয়ে যায়।

বৌদ্ধ শাসনামলে পাল রাজা দ্বিতীয় মহিপালের রাজত্বকালে হালুয়া কৈবর্তদের রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটে। রাজা মহিপাল নিহত ও পরাজিত হন এবং কৈবর্তদের বিজয় সূচিত হয়। বস্তুত এটা ছিল কেবলমাত্র কৈবর্তদের বিজয় নয়, এর সঙ্গে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠি ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। কৈবর্ত রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন রাজা ভীম। 'রাজা ভীমের রণদক্ষতা, অসম শারীরিক ক্ষমতা ও যুদ্ধ যাত্রার বিভিন্ন বিষয় এখনো বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নওগাঁ, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, নীলফামারী, ডোমার প্রভৃতি অঞ্চলে উপকথা ও লোককাহিনী হয়ে মুখে মুখে প্রচলিত আছে।'[২২]

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের ধারাক্রমে যুগ যুগ ধরে এইসব কৈবর্তগণ বরেন্দ্র ভূমিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেছেন। ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে দেখানো হয়েছে যে, কেবল রাজশাহী জেলাতেই সেই সময় একষট্টি হাজার কৈবর্ত বসবাস করতেন। এছাড়াও বর্তমানে বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে কৈবর্ত বসতি দেখা যায়। তন্মধ্যে পাঁচবিবির পাথরঘাটা, বিরামপুর, দাউদপুর এবং বগুড়া জেলার মোকামতলা, নাটোরের শংকরভাগ, পাইকের দোল, নওগাঁ রাণীনগরের বাঁশবাড়িয়া, নাগরকান্দি এবং চলনবিলের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের গ্রামগুলোতে এখনও কৈবর্তদের জনবসতি লক্ষণীয়।

আর্য সভ্যতার পূর্বে উত্তরবঙ্গে আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে কোচ, মেচ এবং রাজবংশীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার্বিক অর্থে এইসব জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নানাভাবেই অস্পষ্ট। তবে তারা প্রাচীন জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম। ডঃ হীনারঞ্জন রায় মনে করেন, কোচ, পলিয়া, রাজবংশী সম্প্রদায় হিমালয় অঞ্চল থেকে আগমনকারী মানুষ। তিনি আরো বলেন, 'ভোটান

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি হিমালয়ের সানু দেশের কোন মোঙ্গোলীয়জনের শাখা এবং বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোচ–পলিয়া–রাজবংশীদের পূর্বপুরুষ।'[২৩] অর্থাৎ এরা মূলত বৃহৎ মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর ভোট চীনা শাখার মানুষ।

এছাড়াও বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিকাল থেকেই হাঁড়ি, ডোম, পুলিন্দ, বাউড়ি, নিষাদ প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। বস্তুত, রাজনৈতিক, সামরিক ও ভৌগোলিক কারণে নানা জাতের মানুষের আগমন ঘটেছে এই জনপদে। এইসব বহিরাগত আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো, কোল মাল পাহাড়ি, মাহালি প্রভৃতি অন্যতম। জানা যায়, 'বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসের পূর্বে এরা গভীর অরণ্যঘেরা রাজমহলের পাহাড়ে ছোটনাগপুর, পালামৌ, দামন–ই–কোহ তথা সাঁওতাল পরগণার দুরধিগম্য স্থানে বসবাস করতো। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার এই অঞ্চলসমূহে রেলপথ স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, চা বাগান, হালচাষ প্রভৃতি কাজে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। এছাড়া রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চলের বড় বড় ভূস্বামী জমিদারগণ বনজঙ্গল বিনাশ করে কৃষি জমি উদ্ধারের কাজে শুকনো মৌসুমে তাদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসতেন।'[২৪] বস্তুত এইভাবে সাঁওতাল মুন্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী বরেন্দ্র অঞ্চলের জনতত্ত্বে যুক্ত হতে থাকে। এরা মূলত অস্ট্রো–এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের (Austro-Asiatic Language Family) মানুষ।

উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মানুষ উত্তরবঙ্গের আদিবাসিন্দা হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠী মূলত মুসলমান ও হিন্দু। বিভিন্ন সময় জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। দেশবিভাগের পূর্বে এই পরিবর্তনের হার ছিল উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সংখ্যার বিচারে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। নিম্নে রাজশাহী বিভাগের প্রধান পাঁচটি জেলার হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার দেখানো হলো।[২৫] তবে এই সংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধি ক্রমাগত ঘটছে।

সারণি– ৩ : জনসংখ্যা হ্রাস–বৃদ্ধির ক্রমবিন্যাস

	১৮৭২		১৯৩১		
জেলা	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	মন্তব্য
রাজশাহী	২১.৯%	৭৭.৭%	২২.৮%	৭৫.৮%	
দিনাজপুর	৪৬.৮%	৫২.৮%	৪৫.২%	৫০.০%	
রংপুর	৪২.১%	৫৭.৯%	২৮.৮%	৭০.৮%	
বগুড়া	১৯.০%	৮০.৭%	১৬.৩%	৮৩.৪%	
পাবনা	২৯.৮%	৬৯.৯%	২৩.০%	৭৬.৯%	
উত্তরবঙ্গের গড়	৩১.৯%	৬৭.৮%	২৭.২%	৭১.৫%	
১৮৭২ – ১৯৩১ সময়ে হ্রাস–বৃদ্ধি	–		৪.৭%	+ ৩.৭%	

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, উত্তরবঙ্গ বলতে কেবলমাত্র দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক সীমারেখাকে বোঝানো হয়েছে। এই সীমানার অন্তর্ভুক্ত জনবিন্যাস এখানে দেখানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের একটি বিরাট অংশও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে সেখানে জনবিন্যাসের দিক দিয়ে এবং ভাষাগত দিক দিয়ে আরো বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ডঃ নির্মল দাশ ঐ অঞ্চলের জনবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে বলেছেন, ''তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশে আছে বাঙালি ও অবাঙালি বর্ণহিন্দু ও মুসলমান। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একটা অংশ উত্তরবঙ্গে চা-শিল্পের বিস্তার সূত্রে গত শতকের শেষ থেকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলা এবং মধ্যবঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্টি হতে থাকেন। তুলনামূলকভাবে রাঢ়ীভাষী পশ্চিমবঙ্গ থেকে অভিবাসনের মাত্রা অনেক কম। দেশবিভাগের পর বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকার মত উত্তরবঙ্গেও তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বাঙালি উদ্বাস্তু (এঁদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও তপশিলি জাতি ও উপজাতিরাও বর্তমান) আসতে থাকে, তবে উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙালি উদ্বাস্তুদের মধ্যে সন্নিহিত রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা মৈমনসিংহ, ফরিদপুর এলাকার লোকের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া দেশবিভাগের পর যেসব বাঙালি হিন্দু আসামে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন আসামে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন বাঙালি বিরোধী দাঙ্গার সময়েও তাঁদের অনেকে নিকটবর্তী উত্তরবঙ্গকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন।'[২৬] বস্তুত ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন কারণে দুই দেশের মধ্যে জনঅভিবাসন ঘটেছে। তন্মধ্যে জাতিতত্ত্বের ব্যাপারটি বেশ প্রভাবপ্রসূত ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে যেমন অধিকসংখ্যক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের ঐসব অঞ্চলে অভিবাসন করেছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু বাংলাভাষী মুসলমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে অভিবাসন করেছেন। ফলে, অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও ভাষাগত বৈচিত্র্য রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে লক্ষণীয়, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের জনবিন্যাসে ও ভাষাপরিস্থিতিতে বাংলা, হিন্দি, নেপালি, গোর্খালি, সাঁওতালি, মুন্ডা, বোড়ো, লেপচা, রাজবংশী বা কামতাপুরী, তিব্বতি, অসমিয়া, ভূমিজ, গারো, সিকিম ভুটিয়া, খাসি, মনিপুরী, নাগাসহ প্রায় বাহান্নো প্রকার বাচকগোষ্ঠীর অবস্থান জরিপ করা হয়েছে।[২৭] বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে প্রধান দুই জাতিগোষ্ঠি হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচক ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও উল্লিখিত ভাষাসমূহের মিশ্রণ পরম্পরা প্রভাব ও বৈচিত্র্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের মোট ষোলটি জেলার জনবিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যা ২১৮৯৬৮৬১ জন। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ খৃস্টান, ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ২০০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহের জনবিন্যাস একনজরে দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি–৪ : এক নজরে উত্তরবঙ্গের জেলাওয়ারী জনসংখ্যা বিন্যাস

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ

জেলার নাম	খানা সংখ্যা	নারীপুরুষ (উভয়)	শতকরা হার (%)	পুরুষ	নারী	পুরুষ/নারী অনুপাত	খানার আকার
বগুড়া	৬৮৭২৮৭	২৯৮৮৫৬৭	৯.৯৬	১৫১৯৩৩৩	১৪৬৯২৩৪	১০৩.৪	৪.৩
দিনাজপুর	৫৭৬৪০৩	২৬১৭৯৪২	৮.৭২	১৩৩৮১৬৬	১২৭৯৭৭৬	১০৪.৫	৪.৫
গাইবান্ধা	১৯৩১০১	২১১৭৯৫৯	৭.০৬	১০৬৪৪৪৩	১০৫৩৫১৬	১০১.০	৪.৩
জয়পুরহাট	২০৩২৫৫	৮৪৪৮১৪	২.৮১	৪৩১১৩১	৪১৩৬৮৩	১০৪.২	৪.১
কুড়িগ্রাম	৩৯৭০২১	১৭৮২২৭৭	৫.৯৪	৮৮৪৩২৬	৮৯৭৯৫১	৯৮.৪	৪.৪
লালমনির হাট	২৪১৭১৩	১০৮৮৯১৮	৩.৬৩	৫৫০৬৭৭	৫৩৮২৪১	১০২.৩	৪.৫
নওগাঁ	৫৩৯৮৩৩	২৩৭৭৩১৪	৭.৯২	১২০৪৪২৭	১১৭২৮৮৭	১০২.৬	৪.৪
নাটোর	৩৩৭৪৭৬	১৫২১৩৫৯	৫.০৭	৭৭৩৮৩৩	৭৪৭৫২৬	১০৩.৫	৪.৫
নবাবগঞ্জ	২৭৫১২২	১৪১৯৫৩৬	৪.৭৩	৭১১৪৪২	৭০৮০৯৪	১০০.৪	৫.১
নীলফামারী	৩৩২৬৪৬	১৫৫০৬৮৬	৫.১৭	৭৯১৩৩৪	৭৫৯৩৫২	১০৪.২	৪.৬
পাবনা	৪৪২০৪৯	২১৫৩৯২১	৭.১৮	১১০২২৪৮	১০৫১৬৭৩	১০৪.৮	৪.৮
পঞ্চগড়	১৭৭৯০৫	৮২৯৩৭৪	২.৭৬	৪২১৫৬৮	৪০৭৮০৬	১০৩.৩	৪.৬
রাজশাহী	৪৯৮১৫২	২২৬২৪৮৩	৭.৫৪	১১৫৮২৮১	১১০৪২০২	১০৪.৯	৪.৫
রংপুর	৫৭৯৮১৫	২৫৩৪৩৬৫	৮.৪৪	১২৯০৪৩০	১২৪৩৯৩৫	১০৩.৭	৪.৩
সিরাজগঞ্জ	৫৬৩১৯৫	২৭০৭০১১	৯.০২	১৩৮৪৩৭৪	১৩২২৬৩৭	১০৪.৬	৪.৮
ঠাকুরগাঁ	২৫৬০৩৪	১১৯৬৪২৯	৩.৯৮	৬১০৬৫২	৫৮৫৭৭৭	১০৪.২	৪.৬
মোট	৬৬০১০০৭	২৯৯৯২৯৫৫	১০০%	১৫২৩৬৬৬৫	১৪৭৫৬২৯০	১০৩.২	৪.৫

Source: Rearranged & Analized frond Population Census 2001, Preliminary Report, (BBS 2001, 18).

উপরের জনবিন্যাস সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর্ণভিত্তিক শ্রেণীভেদ ও ভাষাগত ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। উত্তরবঙ্গে বর্ণহিন্দু এবং তপশিলি জাতি উপজাতি ছাড়াও উচ্চবর্ণ হিন্দুর বসবাস রয়েছে। তবে হিন্দু জাতির মধ্যে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের সংখ্যাই বেশি। এই প্রসঙ্গে অজয় রায় দেখিয়েছেন, "রাজশাহী বিভাগে হিন্দু জাতিদের মধ্যে রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা সর্বাধিক (প্রতি হাজারে ১৩৬), এর পরেই রয়েছে মাহিষ্য (১৪), নমশূদ্র (১৩), ব্রাহ্মণ (৯), কায়স্থ (৬)। রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মোট সংখ্যার ৭৬% রাজশাহী বিভাগে ও ৩০% প্রেসিডেন্সী

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -২ : রেখাচিত্রে উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক জনবিন্যাস :

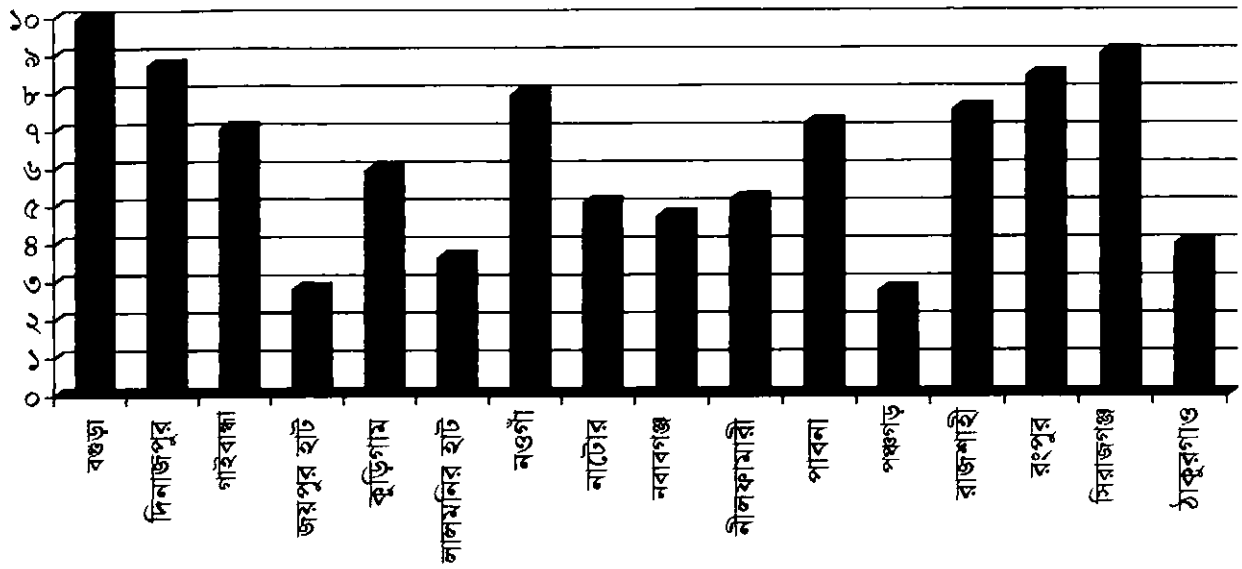

চিত্র -৩ : ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের চিত্র :

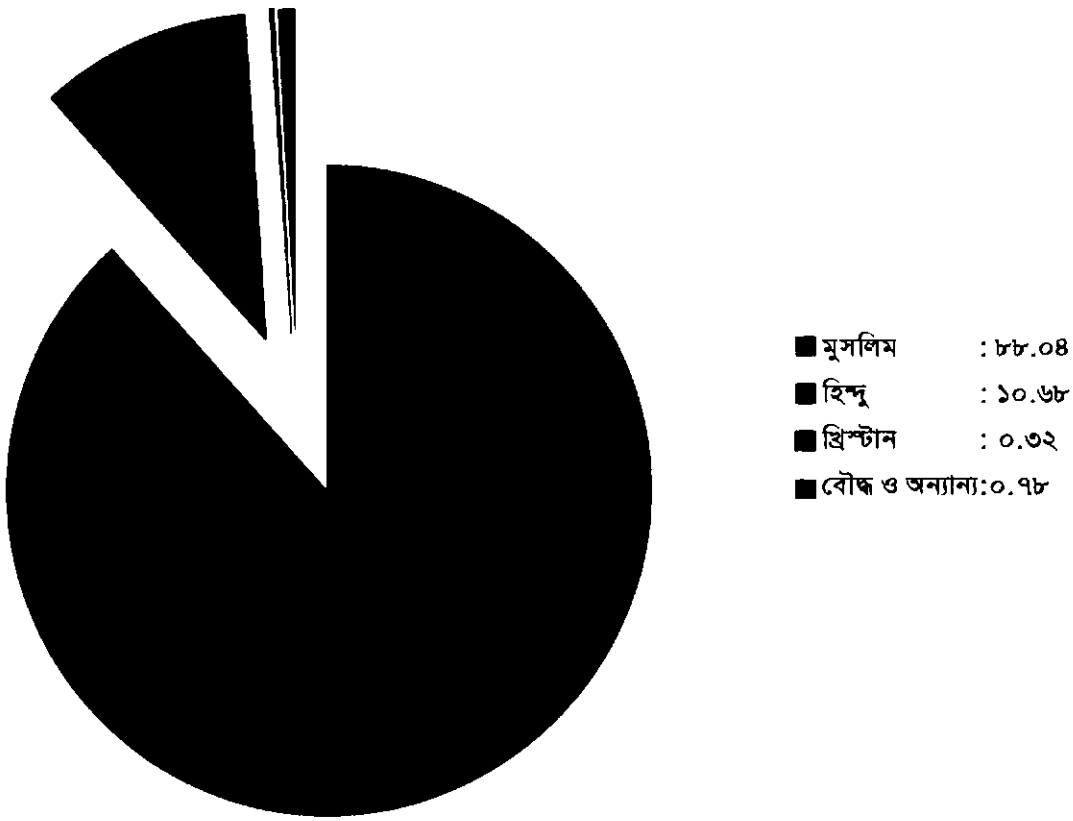

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে বাস করত।''[২৮] রাজবংশী ভাষা ও জাতিগত বিকাশের সীমানা নির্দেশ করে স্যার জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ারসন বলেছিলেন ঃ "It is spoken in following districts Rangpur. Jalpaiguri, the Tari of the Derjeeling district. The native state of Coach Behar. Togethch with the Proptition of Goalpara in Assam..., In the Derjeeling tarai. the dialect influenced by the neighbouring Northern Bengali and has a special name as subdialect. viz Baha."[২৯] অর্থাৎ আসামের গোয়ালপাড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিচার ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল পর্যন্ত রাজবংশী বাচকগোষ্ঠীর বসবাস। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের উপভাষার এই বাচকগোষ্ঠীর একটি প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, বর্ণভেদে কেবল হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলমান সমাজের ওপরও এর প্রভাব পড়েছিল। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও আশরাফ, আতরাফ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এছাড়াও আবজাল নামে একটি নিম্নতম শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। তবে একথা সত্য যে, ধর্মীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমান সমাজের উঁচুতলা ও নিচুতলার মানুষের প্রভেদ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু পেশাভিত্তিক জীবনাচারণ ও গ্রামীণ এবং নগরায়নের প্রভাবে ভাষাগত প্রভেদ, জীবনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে পার্থক্য সূচিত করেছে। স্বাধীনতাত্তোর উত্তরবঙ্গে নতুন নতুন শহরের পত্তন, শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরকেন্দ্রিক জনঅভিবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং জনবিন্যাসের এই দিকসমূহ সমাজভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে তার ভাষিক-বৈচিত্র্য সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে।

উত্তর বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি ঃ

উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের ধরণ দেখে বোঝা যায় যে, ভাষা-পরিস্থিতিও বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা প্রচলিত। ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক ভাষাগত প্রভাবে এবং ধর্মীয় জাতিগত বিভাজনের ফলে এই অঞ্চলে উপভাষা বৈচিত্র্য বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ করে আব্রাহাম গ্রিয়ারসন যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> "The colloquial dialect varies from place to place. This change is gradual. Every two miles some new for a common implement, create some new froms of grammatical expression may be detected by an acute ear. As the natives say the language changes every ten Kos."[৩০]

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ এই অঞ্চলের সংলগ্ন। কাজেই বিভিন্ন উপভাষার প্রান্তিয়তা ও সংযোগের এবং প্রভাবের জন্যেও প্রতিটি প্রান্ত অঞ্চলের উপভাষা আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। উত্তরবঙ্গের উপভাষা পরিস্থিতির রূপরেখা দিতে গিয়ে মনিরুজ্জামান লিখেছেন ঃ

> প্রশাসনিকভাবে উত্তরবঙ্গ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া রাজশাহী ও পাবনা বৃহত্তর জিলায় বিভক্ত। কিন্তু এর ভৌগোলিক বা স্থানবিচিত্রিক সীমা এবং সাংস্কৃতিক (উপ) অঞ্চল ভাগ এরকম সরলরেখায় বিভক্ত নয়। আসাম সীমান্তঘেঁষা, কামরুপী উপভাষা (কুচবিচার, জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স ইঃ) ছিল রংপুর এবং উত্তর দিনাজপুর (ঠাকুরগাঁ ইঃ) স্পর্শী; দক্ষিণ দিনাজপুর, বগুড়া

Dhaka University Institutional Repository

এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জসহ পদ্মাপাড়ের অঞ্চল (রাজশাহী শহর ও তার পশ্চাৎভূমি) এবং আত্রাই এর পশ্চাৎভূমি, তৎসহ ভারতের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ইত্যাদি পৃথক পৃথক উপঅঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও গোটা অঞ্চলটা এক অসম সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে গণ্য ছিল। এর বৃহৎভাগকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চল। পাবনা এবং সিরাজগঞ্জের ভাষা অবশ্য এর থেকে বরাবরই পৃথক।''[৩১]

বরেন্দ্রী উপভাষা অঞ্চলের ভাষিক পার্থক্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে, শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি ব্যাকরণগত নিয়মনীতি এবং বাক্যতাত্ত্বিক ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। শুধু স্থানিক কারণই নয়, উত্তরবঙ্গের উপভাষা বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও সম্প্রদায়গত কারণও। এছাড়াও ভারতবর্ষের ভাষাগুলো যে প্রধান চারটি ভাষাবংশ থেকে উদ্ভূত, তার প্রভাব উত্তরবঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অস্ট্রিক, ভোট–চীনা, দ্রাবিড় এবং ইন্দো আর্য ভাষাবংশের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এই উপভাষাসমূহে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বস্তুত উত্তরবঙ্গের বাচকগোষ্ঠী ও ভাষিক বৈচিত্র্য থেকেই বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে অখণ্ড উপভাষা অঞ্চল গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গ বহুউপভাষা অঞ্চলে বিভক্ত। 'তথাপি বরেন্দ্র ভাষার উপশ্রেণীগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং পদক্রমের প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সে জন্যেই বরেন্দ্রীকে সামগ্রিভাবে একটি উপভাষা রূপেই গণ্য করা হয়েছে। বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় রাঢ়ী উপভাষার এবং উত্তরপূর্ব এলাকার পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব পড়েছে।''[৩২]

উত্তরবঙ্গের উপভাষিক অঞ্চল নির্দেশে ও উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্তকরণের জন্য জেলাভিত্তিক ভূস্থানিক সমাজভাষা কথাসাহিত্যে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। ফলে এই অঞ্চলের উপভাষাবৈচিত্র্য বা ভাষাপরিস্থিতির একটি পরিচিতি পাওয়া যাবে। সেইসূত্রে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার কাঠামো বা রূপরেখা প্রসঙ্গো জানা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা–কাঠামো ঃ

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে বরেন্দ্রী উপভাষারূপে সনাক্ত করা হয়। সামগ্রিকভাবে বরেন্দ্রী উপভাষার আঞ্চলিক কাঠামোর রূপগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে হলে ব্যাপক জরিপ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলার কোন অঞ্চলেই উপভাষার জরিপ সম্পূর্ণ হয়নি। লক্ষণীয় বরেন্দ্রী উপভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপ নিয়ে বিভিন্ন গবেষক আলোচন' করেছেন। ঐসব আলোচনায় আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে বিবৃত করা হলো।

দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

'উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট ভাষারূপ দিনাজপুর অঞ্চলের ভাষা।'[৩৩] তবে দিনাজপুরের উপভাষাকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দুই অঞ্চলে বিভাজন করা হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা কামরূপী শ্রেণীভুক্ত এবং বাংলাদেশ তা দক্ষিণ দিনাজপুরের উপভাষাকে বরেন্দ্রী উপভাষা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।[৩৪] নিম্নে বরেন্দ্রী অঞ্চলের দিনাজপুরের উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. শব্দের আদিতে 'অ' এবং অন্তে 'আ' থাকলে অ > উ–তে পরিণত হয়। যেমনঃ মশা> মুশা, শশা > শুশা।

২. শব্দের আদি এ > আ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ বেগুন > বাগুন, খেজুর > খাজুর।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আদিস্থিত ই > এ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ইঁদুর > এন্দুর, সিঁদুর > সেন্দুর ইত্যাদি।

৪. আদি 'ই' এবং অন্তে 'আ' ধ্বনি থাকলে অন্ত্য 'আ' > 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ মিতা> মিত্যা, ফিতা > ফিত্যা, মিঠা > মিঠ্যা ইত্যাদি।

৫. অনাদি 'খ' > 'ক' হয়। যেমনঃ সখি > সকি, যখন > যকন, তখন > তকন ইত্যাদি। আবার অনাদি ক > গ হয়। যেমনঃ বক > বগ, বগুলা, শাক > শাগ ইত্যাদি।

৬. অনাদি মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ মাঘ > মাগ, বাঘ > বাগ, মাছ > মাচ, লাঠি > লাটি, মাঝি > মাজি, দুধ > দুদ, বুদ্ধি > বুদ্দি, কথা > কতা, মাথা > মাতা, হাভাত > হাবাত ইত্যাদি।

৭. বরেন্দ্রী উপভাষার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার মতো দিনাজপুরের ভাষাতেও 'র' ধ্বনি লোপ পায়। যেমনঃ রমজান > অজমান, রোজা > অজা, রাজা > আজা, রসুন > ওবুন, রাত > আত ইত্যাদি।

৮. দিনাজপুরের উপভাষার 'ন' ধ্বনি 'ল' আবার কোথাও কোথাও 'ল' ধ্বনি 'ন' তে রূপান্তরিত হয়। যেমনঃ ন > ল: নগদ > লগদ, নালিশ > লালিশ, নবাব > লবাব, ইত্যাদি। আবার ল > ন: লাল > নাল, লবণ > নুন, লাঙ্গাল > নাঙ্গাল ইত্যাদি।

৯. আনুনাসিক স্বরধ্বনির যুক্তব্যঞ্জণ রূপ রক্ষিত হয়। যেমনঃ চাঁদ > চান্দ, কাঁদা > কান্দা, রাঁধা > আন্দা, বাঁধা > বান্দা ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বচন অনুযায়ী বিভক্তির বিভিন্ন রূপ হয়। যেমনঃ প্রথমা বিভক্তির একবচনে ০ (শূন্য) বহুবচনে রা, দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির একবচনে কে, ক এবং বহুবচনে 'রঘরক' রূপ পায়। অনুরূপ তৃতীয়াতে একবচনে অকদিয়া বহুবচনে 'রঘরক দিয়া' পঞ্চমীর একবচনে 'অরথাকি' বহুবচনে 'র ঘরের থাকি', ষষ্ঠীর একবচনে 'র' বহুবচনে 'র ঘরের' এবং সপ্তমীর একবচন ও বহুবচনে 'ত' বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়।

২. কারকভেদে সর্বনামপদের বিভিন্নরূপ পায়। যেমনঃ কর্তৃকারকে উত্তমপুরুষের একবচনে মুই, বহুবচনে হামরা, মধ্যমপুরুষের 'তুই', বহুবচনে 'তোরা', প্রথম পুরুষে একবচনে 'অয়' বহুবচনে 'অরা' রূপ পায়। অনুরূপ কর্ম ও সম্প্রদান কারকের উত্তম পুরুষের একবচনে 'মকে' বহুবচনে হামার ঘরক মধ্যমপুরুষে 'তোক' বহুবচনে 'তোমার ঘরক' ইত্যাদি রূপ পায়।

৩. কাল অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপের বিভিন্ন রূপ হয়। যেমনঃ √'কর' ধাতুর সাধারণ বর্তমান কালের উত্তমপুরুষে মুই করুন, মধ্যম পুরুষে 'তুই করলু' এবং প্রথম পুরুষে 'অয় 'করে'। ঘটমান বর্তমান কালে যথাক্রমে করেছি, করেছিস, করোছে এবং পুরাঘটিত বর্তমান কালে করিছু, করিছিস, করিছে রূপ হয়।

৪. সাধারণ অতীতকালের উত্তম পুরুষে 'মুই করনু', মধ্যম পুরুষে 'তুই করলু', প্রথম পুরুষে 'অয় করলো', ঘটমান অতীতকালে 'করিছিনু', 'করেছুলু', 'করছিল' এবং পুরাঘটিত অতীতকালে 'করিছিনু', 'করিছিলু', 'করিছিল' রূপ হয়।

৫. √'কর' ধাতুর সাধারণ ভবিষ্যতকালের উত্তমপুরুষে 'মুই করমু', মধ্যমপুরুষে 'তুই করবু', প্রথমপুরষে 'অঁয় করবে', ঘটমান অতীতকালে 'করতে থাকমু', 'করতে থাকমু', 'করতে থাকবে' এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যতকালে 'করে থাকমু', 'করে থাকবু', 'করে থাকবে' রূপ হয়।[৩৫]

401425

রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

রংপুরের উপভাষাকে গ্রীয়ার্সন ও সুনীতিকুমারের মতানুসারে অনেকেই 'রাজবংশী' উপভাষা নামকরণের পক্ষপাতি। একে কামরূপ বা আংশিক কামরুপী উপভাষা বলে অভিহিত করতে চান।[৩৬] কিন্তু শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী বলেন, "The sub-dialect of Rangpur as a strong member of the main North Bengali dialect deserves more than a mere passing note."[৩৭] সমস্ত অতীত বিতর্কের

Dhaka University Institutional Repository

অবসান ঘটিয়ে ড. নির্মল দাশ যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন, রাজবংশী অভিধাটি গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যবহারে তাদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য নেই। তাদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে হলে রাজবংশী ও কামরূপী ভাষাগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাষার মধ্যে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি (horizontal & vertical) তুলনা করা প্রয়োজন। তাহলে রাজবংশী বিভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবে।[৩৮] নিম্নে এই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

এই উপভাষার স্বরধ্বনির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'অ' ধ্বনির বিশিষ্ট ব্যবহার। ডঃ মনিরুজ্জামান ও ডঃ আবদুর রহীম খোন্দকার এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ড. মনিরুজ্জামানের মতে, ''এ উপভাষার 'অ' ধ্বনির বিশিষ্ট ব্যবহার খুব চোখে পড়ে এবং 'ই', 'এ', 'ও' ধ্বনিগুলিও আদ্য অক্ষরে ভিন্নতা পায়।''[৪০] ড. আবদুর রহীম খোন্দকার অবশ্য এই উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে বরেন্দ্র ভূমির অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য চিহ্নিত করেছেন।[৪১] নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মতো রংপুরের উপভাষাতেও শব্দের আদিতে 'এ' ধ্বনি মাঝে 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ শেষ > শ্যাষ, দেশ > দ্যাশ, বেচা > ব্যাচা ইত্যাদি।

২. শব্দের আদিতে 'ই' স্থানে 'এ্যাঁ' এবং 'এ' হয়। যেমনঃ ইঁদুর > এ্যাঁদুর, ইহাতে > এমাতে, সিঁদুর > স্যাএ্যাঁদুর, ইহার > এমার ইত্যাদি।

৩. অনাদি 'আ' ধ্বনি 'ও' হয়। যেমনঃ মা > মাও, পা > পাও, গা > গাও।

৪. শব্দের আদিতে 'আ' ধ্বনি কখনো কখনো লুপ্ত হয়। পাখি > পখি।

৫. শব্দের মাঝে স্বরাগম হয়। যেমনঃ শোল > শউল, চোখ > চউখ ইত্যাদি।

৬. গৌড়ীয় উপভাষার মত অনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার এই উপভাষাকেও লক্ষণীয়। যেমনঃ কোথায় > কোন্টে, কে > কাঁই, সে > তাঁই ইত্যাদি।

৭. পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মতো এই উপভাষাতেও মাঝে মাঝে পূর্ণাঙ্গ অপিনিহিতি ঘটে। যেমন– আজি > আইজ, কাল > কাইল, চাল > চাইল ইত্যাদি।

৮. শব্দের আদিতে 'ও' ধ্বনি 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ওকে > অক, ওঝা > অঝা।

৯. র > ড় উচ্চারিত হয়। যেমনঃ মোরে (আমাকে) > মুঁড়ে, আমাদের > মুহেঁড়ে ইত্যাদি।

১০. 'র' ধ্বনি কোথাও কোথাও একেবাড়ে লুপ্ত হয়। যেমনঃ রাখাল > আখোয়াল, রোগ > ওগ, রং > অং, রোগা > অগা, রস > অস।

১১. শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনির আগম হয়। যেমনঃ ওঝা > রঝা, ঔষধ > রষুধ।

১২. গৌড়ীয় উপভাষার মতো রংপুরী উপভাষাতেও মহাপ্রাণ ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমনঃ শব্দের আদিতেঃ জন > ঝন, বিবাহ > বিভা, বাসা > ভাসা। শব্দের অন্তেঃ সোজা > সঝা, কদু > কধূ (লাউ)।

১৩. উত্তরবঙ্গের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার মতো রংপুরী উপভাষায় 'ল' > 'ন'–তে পরিণত হয়। যেমনঃ লোক > নোক, লোনা > নুনা, লোম > নোম।

১৪. রেফযুক্ত (র্) ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্তব্যঞ্জনরূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ বর্ষা > বস্‌সা, কর্তা > কত্‌তা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. কর্তৃকারকে এ, এয়, ওক, আক, বহুবচনে 'রা', 'ড়া', খড়ক (ঘরক্) হয়।

২. কর্মকারকে 'অক' বহুবচনে 'অরঘরক'।

৩. করণে অকদিয়্যা, দি, বহুবচনে দি, দিয়া, (বোপর ঘরকদি) ইত্যাদি।

৪. অপাদানে একবচনে হাতে, হাতেয়, হানে, হনে, হানায়, তেহাতে এবং বহুবচনে 'ঘর হাতে' (বাপের ঘর হাতে) ইত্যাদি।

৫. সম্বন্ধ পদে–র এবং বহুবচনে 'র ঘরের' ইত্যাদি।

৬. অধিকরণে 'অৎ' রারপর (বাপর পর) ইত্যাদি। বহুবচনে 'অয় ঘরৎ', 'ঘরপর' ইত্যাদি।

৭. ক্রিয়ার কাল অনুসারে ধাতুর বিভিন্ন রূপ লক্ষণীয়। যেমন– √কর ধাতুর সাধারণ বর্তমানকালের উত্তমপুরুষে মুঁই কড়ো, মধ্যমপুরুষে তুই কড়িস, তুই কড়, তুমড়া কড়েন, প্রথম পুরুষে 'ওঁয় কড়ে', 'তাঁই কড়ে'। ঘটমান বর্তমানকালের উত্তম পুরুষে 'মুই কড়দো', মধ্যমপুরুষে 'তুমড়া করেন', 'তুই কড়িচচোল', এবং পুরাঘটিত বর্তমানকালে যথাক্রমে 'মুই কড়নু', 'তুই কড়লু' ইত্যাদি রূপ হয়।

৮. অতীতকালের সাধারণ রূপ উত্তম পুরুষে 'মুঁই কড়নু', মাধ্যম পুরুষে 'তুই কড়লু', প্রথম পুরুষে 'অঁয় কড়িলন', ঘটমান অতীতকালের পুরুষভেদে 'মুঁই কড়ছো', 'তুই কড়ছুলু', 'অঁয় কড়ছিলো' এবং পুরাঘটিত অতীতকালে 'মুঁই কড়ছু', 'তুই কড়োছিস', 'অঁই কড়োছে' ইত্যাদি।

৯. ভবিষ্যতকালের সাধারণ রূপ উত্তমপুরুষে 'মুঁই কড়িম', মধ্যমপুরুষে 'তুই কড়বু', 'তুমড়া কড়মেন', প্রথম পুরুষে 'অঁয় কড়বে'। ঘটমান ভবিষ্যতের পুরুষভেদে 'মুঁই কড়িতে থাকিম', 'তুই কড়িতে থাকবু', 'অঁয় কড়িতে থাকিবে' এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যতে 'মুই কড়ি থাকিম', 'তুই কড়ি থাকবু' ইত্যাদি।[৪১]

বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

দিনাজপুর ও রংপুরের উপভাষার সঙ্গে বগুড়ার উপভাষার তুলনা করে গ্রীয়ারসন লিখেছেনঃ "It will be seen that it differ's little from that of Dinajpur. ... The dialect spoken immediatly to the north in Rangpur, is Rajbangsi or Rangpuri, and as may be expected, some stray Rajbansi froms are also found."[৪২] অর্থাৎ দিনাজপুরের উপভাষার সঙ্গে বগুড়ার উপভাষার প্রভেদ খুব সামান্য এবং উত্তরসীমার রংপুরের রাজবংশী বা রংপুরী ভাষার প্রভাবও এই অঞ্চলের ভাষায় লক্ষ করা যায়। গ্রীয়ারসনের আলোচনার সূত্র ধরে এই তিনটি উপভাষার হয়তো কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, তবুও বগুড়ার উপভাষার কতকগুলি স্বতন্ত্র রীতি বা গঠন অবয়ব রয়েছে। 'বগুড়ার লোক ভাষা' শীর্ষক আলোচনায় আলমগীর জলীল এই জেলার ভাষাকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। যথা– পশ্চিম বগুড়া, মধ্য বগুড়া ও পূর্ব বগুড়া। পশ্চিম বগুড়ায় নওগাঁর পূর্বপ্রান্ত থেকে জয়পুরহাটের দক্ষিণাঞ্চল; মধ্যবগুড়ায় করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্ব থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব বগুড়ায় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশের ৭/৮ মাইল চরাঞ্চল (জামালপুরের পশ্চিমে) সমূহকে চিহ্নিত করেন।[৪৩] তিনি মধ্য ও পশ্চিম বগুড়ার লোকভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করেছেন এবং ড. আবদুর রহীম খোন্দকার সামগ্রিকভাবে বগুড়া জেলার উপভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উপভাষার মতো বগুড়ার উপভাষাতেও শব্দের আদি 'ই' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। আবার শব্দের আদি 'এ' ধ্বনিও 'ই' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– চিতল > চেতল, পিতল > পেতল। অনুরূপ, চেয়ার > চিয়্যার, ছেঁড়া > ছিঁড়্যা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২. বগুড়ার উপভাষাতেও শব্দের আদিতে 'এ' > 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ মেঘ > ম্যাগ, দেশ > দ্যাশ, শেষ > শ্যাষ, লেজ > ল্যাজ, খেলা > খ্যালা, বেত > ব্যাত, কেন > ক্যান ইত্যাদি।

৩. আদি 'ও' > 'উ' হয়। কখনো 'ও' > 'অ' হয়। যেমনঃ ঘোড়া > ঘুড়া, থোড়া (অল্প) > থুড়া, ছোট > ছুট্, ছুটো, ওর > অর, ওকে > অকে, অক ইত্যাদি।

৪. যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আদিতে 'অ' > 'ও' হয়। যেমনঃ গন্ধ > গোন্দ।

৫. শব্দের আদিতে 'ই' ধ্বনি এবং অন্তে 'আ' ধ্বনি থাকলে 'এ্যা' হয়। যেমনঃ মিতা > মিত্যা, ফিতা > ফিত্যা, মিঠা > মিঠ্যা ইত্যাদি। এটি বরেন্দ্রী উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়।[৪৪]

৬. বগুড়ার উপভাষায় অর্ধঅপিনিহিতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমনঃ এঁড়ে > আ'ড়্যা, কুঁড়ে > কুঁ'ড়্যা ইত্যদি।

৭. কখনো কখনো 'উ' ধ্বনির শেষে 'আ' থাকলে 'এ্যা' হয়। যেমনঃ কুত্তা > কুত্ত্যা, কুমড়া > কুমড়্যা, চুলা > চুল্যা, কুয়া > কুয়্যা ইত্যাদি।

৮. আদিতে এবং অন্তে 'আ' থাকলে আদি 'আ'> এ্যা' তে পরিণত হয়। যেমনঃ টাকা > ট্যাকা, বাঁকা > ব্যাঁকা।

৯. মহাপ্রাণ ধ্বনি লুপ্ত হয়। যেমনঃ মধ্যে > মদ্যে, সাধু > সাদু, রান্ধে > আন্দে, বান্ধা > বান্দা, কাঁঠাল > কাটল, তখন > তকন ইত্যাদি।

১০. কোথাও কোথাও মহাপ্রাণ ধ্বনি আগম ঘটে। যেমনঃ জন > ঝন, ওটা > ওডা, উডা, চারটা > চারডা।

১১. 'র' > 'অ'–তে পরিণত হয়। যেমনঃ রক্ত > অক্ত, রান্ধে > আন্দে, রানী > আনী।

১২. শব্দের অনাদি 'থ' > 'তত্' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ রাথি > লাত্তি, হাথি > হাত্তি ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. কর্তৃকারকে একবচনে পুরুষভেদে 'হামি', 'তুমি', 'তুই', 'উই', বহুবচনে 'হামরা', 'তোরা', 'অরা' হয়।

২. কর্মকারকে পুরুষভেদে হামাকে, হামাক, তোমাক, অক এবং বহুবচনে হামাঘরক, তোরঘরক, হাপনা ঘরক, তয়ঘরক রূপ হয়।

৩. √কর ধাতুর কালভেদ ও পুরুষভেদে বিভিন্ন রূপ হয়। সাধারণ বর্তমানকালে পুরুষভেদে মুই, হামি করো, তুই করো, অয় করে, ঘটমান বর্তমানকালে করিছু, করিছ, ঝরিছে, পুরাঘটিত করিছিনু, করিছো, কর্যাছে ইত্যাদি। অনুরূপ, অতীতকালের সাধারণ ঘটমান ও পুরাঘটিত রূপে পুরুষভেদে মুই করনু, তুই করলু, অয় কল্লো, মুই করিচুনু, তুই করিচুলু, অয় করিলে এবং করিচুনু, করিচুলু, করিচিল ইত্যাদি। ভবিষ্যতকালে– মুই করমু, তুই করবু, অয় করবে এবং করতে থাকবু, করতে থাকবু, করতে থুবে, ও করে থুমু, করে থুবু, ক'রে থুবে।

রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার প্রশাসনিক বিভাজনের পর এখন নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৃথক পৃথক জেলায় উন্নীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অঞ্চল বিশেষের ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্য যেমন রয়েছে তেমন আলাদা বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে। তবে রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চল নওগাঁর অংশ বিশেষ এবং নাটোর জেলার পশ্চিমাংশের ভাষার সঙ্গে প্রায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অভিবাসনকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অঞ্চলের উপভাষা বৈচিত্র্য ব্যাপকতা লাভ করেছে। অপরদিকে, নবাবগঞ্জের উপভাষা বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হলেও একে গৌড়ীয় উপভাষা বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই জন্যে আমরা বৃহত্তর রাজশাহীর উপভাষার মধ্যে নবাবগঞ্জের উপভাষাকে পৃথক রূপে দেখার পক্ষপাতি।

বস্তুত রাজশাহীর নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জে নানা রকম লোকভাষা প্রচলিত। 'এমন কি থানায় থানায় পর্যন্ত লোকভাষার রূপভেদ লক্ষণীয়।'[৪৫] রাজশাহীর লোকভাষাকে তাই চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরপূর্ব অঞ্চল, দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল এবং উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। এখানে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল তথা নবাবগঞ্জের লোকভাষা ব্যতীত অন্য তিন অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. শব্দের আদি 'অ' এবং অন্তে আ কিংবা এ থাকলে অ > উ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ বলে > বুলে, খোলে > খুলে, মশা > মুশা ইত্যাদি।

২. দিনাজপুরের উপভাষার মতো নওগাঁ, নাটোর ও রাজশাহীর উপভাষাতেও শব্দের আদি ও অন্তে 'আ' ধ্বনি থাকলে আ > এ্যা হয়। যেমনঃ টাকা > ট্যাকা, বাঁকা > ব্যাঁকা।

৩. এই উপভাষার অর্ধ অপনিহিতির ব্যবহার অধিক। যেমনঃ ক'র‍্যা, খ'য়্যা, হা'ট্যা ইত্যাদি। আবার অভিশ্রুতির ব্যবহারও বহুল পচলিত। যেমন- আ'জ, কা'ল, ডা'ল, ব'ল (বোয়াল মাছ) শ'ল (শোউল মাছ) খ'ল (কৈল) ইত্যাদি।

৪. নবাবগঞ্জের উপভাষার মত রাজশাহীর উপভাষাতেও ন > ল হয়। যেমন– নৌকা > লৌকা, লিচু > নিচু, লাগাল > নাগাল, লাঙ্গাল > নাঙ্গাল ইত্যাদি।

৫. মহাপ্রাণ ধ্বনি ক্ষেত্র বিশেষে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– সাধু > সাদু, মধু > মদু, দুধ > দুদ, চোখ > চোক, পাঠা > পাটা ইত্যাদি।

৬. দিনাজপুরের উপভাষার মতো রাজশাহীর উপভাষাতেও র > অ হয়। যেমন– রজমান > অজমান, রঘু > অঘু, রাম > আম, রাস্তা > আস্তা ইত্যাদি।

৭. দিনাজপুরের উপভাষার মতো রাজশাহীর উপভাষাতেও কদাচিৎ ক > গ হয়। যেমন– শাক > শাগ, বক > বগ, ইত্যাদি।

৮. অনাদি ছ > চ ধ্বনিতে পরিণত হয়। গাছ > গাচ, পাছা > পাচা ইত্যাদি।

৯. আদি 'এ' > 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– তেল > ত্যাল, বেল > ব্যাল, বেলা > ব্যালা ইত্যাদি।

১০. অনাদি 'খ' > 'ক'–তে পরিণত হয়। যেমন– লেখা > ল্যাকা, দুঃখ > দুক্কু, লাখ > লাক।

১১. রাজশাহীর উপভাষার আদি স্বরাগম একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে আদি স্বরাগম রীতি নির্দেশ করা যায়।[৪৬] যথা– [ব্যব্য] → [স্বব্য – ব্য –]

ক. স্টেশন → ইস্টিশন (স্ট – ইস – টিশন)

খ. স্ত্রী → ইসতিরি (স্ত্র – ইস্ – তিরি)

গ. স্কুল → ইস্কুল (স্ক – ইস্ – কুল)

ঘ. মিস্ত্রি → মিস্তিরি (ম – ইস্ – তিরি)

১২. রাজশাহীর উপভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রটি নিম্নরূপ।

	আ. চ. বা.		রা. উ.
ক.	/# ব্য১ ব্য২ ব্য৩ স্ব–/	=	/# স্ব ব্য১ ব্য২ স্ব–/
খ.	/# ব্য১ ব্য২ স্ব /	=	/# ০ ব্য২ স্ব–/

অর্থাৎ, চলিত শিষ্ট বাংলার প্রথম ব্যঞ্জন রাজশাহীর উপভাষায় লুপ্ত হয়। কিন্তু শিষ্ট বাংলায় ব্যবহৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি রাজশাহীর উপভাষায় রক্ষিত হয়। যেমনঃ

	আ. চ. বা.	রা. উ.
ক.	বৃষ্টি – ব – র	বিরিস্টি ব স্ব র
খ.	দৃষ্টি– দ – র	দিরিস্টি দ স্বর র
গ.	ক্লান্ত– ক – ল	ক্যালান্ত ক স্ব ল
ঘ.	প্রাণ– প – র	পরাণ প স্ব র ইত্যাদি।

১৩. রাজশাহীর উপভাষায় দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের আধিক্য লক্ষণীয়। যেমন– পাখি > পক্কী, যুগের > যুগ্গের, যত > সত্ত, কত > কত্ত ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. রাজশাহীর উপভাষার ব্যবহৃত বিভক্তির পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমার একবচনে 'এ' দ্বিতীয়ার একবচনে 'ক' বহুবচনে 'রক', পঞ্চমীতে 'থিনি', 'হিনি', ষষ্ঠীতে 'র', রা সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

২. কারক ও পুরুষভেদে সর্বনামপদের ভিন্ন রূপ হয়। কর্তৃকারকে পুরুষভেদে একবচনে হামি, আমি, তুমি, তুই, আপনি, উই এবং বহুবচনে হামরা, আমরা, তুমরা, তুরা, আপনারা, তারা, তারা।

৩. কাল অনুযায়ী ক্রিয়ার ধাতুরূপও ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– √কর ধাতুর সাধারণ বর্তমানকালের পুরুষভেদে করি, কর, করেন, করিস, করেন, করে; ঘটমান বর্তমানকালে করিত্তি, করিত্তেন, করুত্ত, করিত্তেন, করিতে এবং পুরাঘটিত বর্তমান কালে করিচি, করিচেন, করুচু, করিচেন, করিচে– রূপ হয়।

৪. √কর ধাতুর অতীতকালের পুরুষ ভেদে করনু, করলেন, করলু, করলেন, করলো, ঘটমান অতীতে করুচ্ছুনু, করিচ্ছিলেন, করুচ্ছুলু, করিচ্ছিলেন, করিচ্ছিলো এবং পুরাঘটিত অতীতকালে করুচুনু, করিচিলেন, করুচুনু, করিচিলেন করিচিল রূপ হয।

৫. √কর ধাতুর অতীতকালের পুরুষভেদে করমু, করবেন, করবে, করবু, করবেন, করবে; ঘটমান অতীতে করতে থাকমু, করতে, থাকলে, করতে থাকপেন, করতে থাকপু, করতে থাকলে এবং পুরাঘটিত অতীতকালে ক'র‍্যা থাকমু, কর‍্যা থাকলে, ক'্যরা থাকপেন, ক'্যরা থাকপু, ক'রা থাকমেন, কর‍্যা থাকপে রূপ হয়।

৬. স্থানবাচক পদ বুঝাতে 'টে' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– অটে < ওখানে, সেটে < সেখানে, কোনটে < কোথায়, সেটে < সেখানে ইত্যাদি।

৭. বিশেষ্যের পদাশ্রিত নির্দেশক রূপে ট্যা, ড্যা, খ্যান-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– মানুষটি > মানুষটা, গরুটি > গরুড্যা, বইটি > বইখ্যান ইত্যাদি।

নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

নবাবগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জেলা। বলা যায়, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে নবাবগঞ্জ জেলার মানচিত্রে বারবার পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত নবাবগঞ্জ বিহারের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রদেশ বিভাগ ও দেশ বিভাগের পরও বার বার পরিবর্তন হয়েছে এই জনপদের প্রশাসনিক সীমানা। বর্তমানে নবাবগঞ্জ জেলার জনবিন্যাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে বরেন্দ্র ও দিয়াড় এই দুই অঞ্চলে ভাগ করা হয়। দিয়াড়কে গৌড়াঞ্চল বা গৌড়ীয় ভাষা এবং বরেন্দ্র অঞ্চলকে বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। যাহোক, নিম্নে এই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হলো।

১. আদি ও অন্তে / এ / স্বরধ্বনি / এ্যা / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– তেল > ত্যাল, মেঘ > ম্যাঘ, রেখে > রাখ্যা, দেখে > দেখ্যা ইত্যাদি।

২. কখনো আদি / ই/ ধ্বনি / এ / ধ্বনিতে পরিণত হয়। লিচু / লেচু, ইঁদুর> এন্দুর। আবার কখনো কখনো /এ/ ধ্বনি /ই/তে পরিণত হয়। যেমনঃ সেলাই > সিলাই, ঢেকি > ঢিকি ইত্যাদি।

৩. শব্দের আদি / ও / ধ্বনি / উ / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন ঃ তোমার > তুমার, সোজা > সুজা, ছোড়া > ছুঁড়া ইত্যাদি।

৪. বাংলাদেশের অন্যান্য উপভাষার মতো নবাবগঞ্জের উপভাষায় অপিনিহিতির রূপ এক নয়। মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেছেন, 'বাংলাদেশের অধিকাংশ উপভাষায় অপিনিহিতি / 'ই' / ধ্বনির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষণীয়'।[৪৭] কিন্তু নবাবগঞ্জের বা রাজশাহীর উপভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম সম্পর্কে দুজন গবেষখ মন্তব্য করেছেন। নবাবগঞ্জের উপভাষার অপিনিতি সম্পর্কে ড. আবদুর রহীম খোন্দকার বলেছেন, 'বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের মতো এই উপভাষার অপিনিহিতি নয়। এই উপভাষার উচ্চারণে প্রচলিত অপিনিতিকে অর্ধ অপিনিতি (Half Epen thesis) বলা যেতে পারে'।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

৫. নঞর্থ্যক বাক্যে 'না' বা 'নাই' শিষ্ট বাংলার মতোই ক্রিয়াপদের পরে বসে। সম্ভাবক বিধিরূপে 'না' ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন– 'না অসা তুই ভালই কর‍্যাছিস'।

৬. পদ সংযোজনে 'না' নামপদের পূর্বে বসে। যেমন– 'না হামি না তুমি কেহুই কথা কহবো না' ইত্যাদি।

পাবনা জেলার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ– পূর্বপ্রান্তের এই কথ্যভাষাকে কেউ কেউ বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে পৃথক করে দেখেছেণ। ড. আবদুর রহীম খোন্দকার মনে করেন গঠনগত কারণে এই নিম্নভূমি এলাকা বরেন্দ্র অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পৃথক।[৪৯] ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পাবনা অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে কুষ্ঠিয়ার আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। জর্জ গ্রিয়ারসন মনে করেন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর উপভাষা থেকে পাবনার উপভাষা আলাদা। তিনি পাবনার মেয়েলী ভাষার আলোচনা করে লিখেছেন—

"The language of Pabna, perhaps, differs more than that of Rajshahi, and for these two districts it will be sufficient to give a version of the prapable of the prodigal son in the Language of the women of the former district.[৫০] পাবনার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. শব্দের অনাদি / এ / ধ্বনি / ই / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— হবে > হবি, কবে (বলবে) > কবি, নিজের > নিজির, ই হাতে > তাতি, ইত্যাদি।

২. অনাদি / ও / ধ্বনি / উ / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– যাবো > যাবু, খাবো > খামু।

৩. শব্দের আদি ও অন্তে / আ / এবং / এ / ধ্বনি / এ্যা / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ দিয়া > দিয়্যা, বিয়া > বিয়্যা, পেট > প্যাট, গেল > গ্যালো ইত্যাদি।

৪. আবার কোথাও কোথাও / ও / ধ্বনি /'ই'/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন– মরতে > মরতি, বলতে > বুলতি, যেতে > যাতি, আসতে > আস্‌তি ইত্যাদি।

৫. নঞর্থক ক্রিয়াপদে অতিরিক্ত নি প্রত্যয় যুক্ত হওয়া কুষ্টিয়া ও পাবনার উপভাষার একটি বিশেষরীতি। যেমন– বলব না > বলবনানি, করব না > করবানানি ইত্যাদি।

৬. সাধু বাংলার মতো ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপ এই উপভাষা রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন– মরতিছি, উঠিছি, গিছিলো, আসিছেন ইত্যাদি।

৭. মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়। দুধ > দুদ, গাধা > গাদা, ইত্যাদি।

৮. কোথাও কোথাও / ট / ধ্বনি / ড / হয় / যেমন– ছোট > ছোডো, ছুডো ইত্যাদি।

৯. এ ছাড়া পাবনার উপভাষার কিছু নিজস্ব রূপমূল আছে যা অন্যান্য বরেন্দ্রী উপভাষার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন– গ্যাঁদা (ছেলে) গেঁদী (মেয়ে) ইত্যাদি।

১০. নির্দেশক প্রত্যয় রূপে 'ড' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। যেমন ওখানে > ওডে, ঐখানে > ওইডে ইত্যাদি।

বস্তুত উত্তরবেঙ্গার বরেন্দ্রী উপভাষার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝায় যায়। বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে রাঢ়ী উপভাষারও সাদৃশ্য রয়েছে। বরেন্দ্রী উপভাষার তূলনামূলক আলোচনা করে ড. রামেশ্বর শ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, " উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দুটি প্রথমে একটিই উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায় উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।"[৫১] নিম্নে বরেন্দ্রী উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করা হলোঃ

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. অনুনাসিক স্বরধ্বনি রক্ষিত।

২. সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি আদিতে রক্ষিত, তবে মধ্য ও অন্তে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. অর্ধ অপিনিহিতি ব্যবহারের আধিক্য রয়েছে।

৪. 'র' ধ্বনির আগম ও লোপ দুইই হয়।

৫. ন > ল এবং ল > ন –তে পরিণত হয়।

৬. জ (j) > জং (Z) রূপে উচ্চারিত হয়।

৭. অধিকাংশ ক্ষেত্রে চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনি তালব্য রূপে উচ্চারিত।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ।

২. সামান্য অতীতকালে উত্তমপুরুষে 'লাম' বিভক্তি যোগ হয়।

৩. সর্বনামের উত্তম পুরুষের একবচনে মুই, হামি, বহুবচনে হামরা এবং প্রথম পুরুষের একবচনে উই বা 'অয়' হয়।

৪. কর্ম ও সম্প্রদানকারকে 'ক' অথবা 'কে' বিভক্তি হয়।

৫. কোথাও কোথাও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাবে উত্তমপুরুষের ভবিষ্যৎকালে 'করমু', 'যামু' ইত্যাদির প্রয়োগ।

সুতরাং দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনবিন্যাসের কারণে জেলা থেকে জেলা এমনকি থানা পর্যায়েও ভিন্ন ভিন্ন ভাষারূপ গড়ে উঠেছে। জনবিন্যাসে যেমন আদিম অনার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি বাংলা উপভাষার রাঢ়ী, কামরূপী, পূর্ববঙ্গীয় বঙ্গালী এবং বিহারী ভাষার প্রভাব পড়েছে এই উপভাষায়। ফলে, সামগ্রিকভাবে অখন্ড উপভাষিক অঞ্চল গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বাচক গোষ্ঠীর অভিবাসনের ফলে এই অঞ্চলের ভাষা বৈচিত্র্য ব্যাপকতা লাভ করেছে।

লক্ষণীয়, উত্তরবঙ্গের পটভূমিকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যেও লেখকগণ স্থানিক সমাজ ও ভাষা ব্যবহারে এই ভাষা বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছেন। ফলে সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক একটি পরিচয় কথাসাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমনটি হয়েছে বাংলা উপভাষাকেন্দ্রিক অন্যান্য জনপদ নিয়ে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপে রচিত সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. Mario Pei, 'The Story of Language', George Allen and Unwin Ltd. London, 2nd Impression, 1957, p. 11.

২. নীহারঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃ. ৬৭।

৩. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, 'গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ. ১১।

৪. অজয় রায়, 'আদি বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৪।

৫. অজয় রায়, 'বাঙালীর আত্মপরিচয়ঃ পুরাবৃত্তিক নৃতাত্ত্বিক আলোচনা' (প্রবন্ধ) 'বাঙালির আত্মপরিচয়', সম্পাদকঃ সফর আলী আকন্দ, আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৬৯।

৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৭. আবদুল করিম, 'বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী' (প্রবন্ধ), 'বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়,' পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

৮. তোফায়েল আহমেদ, 'যুগে যুগে বাংলাদেশ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২।

৯. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস', প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, ঢাকা পৃ. ১৬।

১০. অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

১১. অজয় রায়, 'বাংলাদেশঃ পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত', (নিবন্ধ), 'বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', সম্পাদনাঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী- ১৯৯০, পৃ. ২২।

১২. M. Abu Bakar, 'Journal Asiatic Society of Pakistan', Vol. XV, No. 1, P. 16.

১৩. ডঃ আহমদ শরীফ, অজয় রায় রচিত 'বাঙলা ও বাঙালী' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৭।

১৪. নীহারঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

১৫. তোফায়েল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

১৬. নীহারঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

১৭. নির্মল দাশ, 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১১।

১৮. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ', কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

১৯. নীহারঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ১৩।

২০. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, 'বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দাঃ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান' (প্রবন্ধ) 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৯৯।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০–১২১।

২৩. নীহারঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

২৪. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

২৫. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি; জেলাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা' ১৮৭২-১৯৩১, (প্রবন্ধ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, চতুদর্শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন-১৯৯৬, পৃ. ৫২।

২৬. নির্মল দাশ, 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', সাহিত্য বিহার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৫।

২৭. নির্মল দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. অজয় রায়, 'আদি বাঙালি; নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮।
২৯. G. A. Grierson, 'Linguistic Survey of India', Vol. V, 'Indo. Aryan Family, Eastern Group', Part- 1, reprint- Delhi, 1963, P. 163.
৩০. G. A. Grierson, 'Linguistic Survey of India', Vol-1, (Part- II) Delhi- 1968, P. 17.
৩১. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষাচর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে ১৯৯৪, পৃ. ১৮৪।
৩২. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'বরেন্দ্রভূমির ভাষা', 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫৩।
৩৩. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।
৩৪. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ১৮৩।
৩৫. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'বরেন্দ্রভূমির ভাষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৬-৮৭৯।
৩৬. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।
৩৭. Shambhu Chandra Chowdhory, "Notes on Rangpur Dialect', 'Indian Linguistics', Reprinted, Vol- II, 1965, P. 297.
৩৮. নির্মল দাশ, 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
৩৯. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯।
৪০. আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬৮।
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬৮, ৮৭১।
৪২. G. A. Grierson, 'Linguistics survey of India', Vol- V, Culcutta, 1903, P. 152.
৪৩. আলমগীর জলীল, 'বগুড়ার লোকভাষা', 'মাসিক মোহাম্মদী', ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৬৯ সাল, পৃ. ৩৫৩।
৪৪. আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৩।
৪৫. আলমগীর জলীল, ''রাজশাহীর লোকভাষা'', 'মাসিক মোহাম্মদী', ৩৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃ. ১৮৬।
৪৬. পি. এম. সফিকুল ইসলাম, রাজশাহীর উপভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৭৯।
৪৭. মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা' (প্রবন্ধ) সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা শীত, ১৩৮৮, পৃ. ২৪৬।
৪৮. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'গৌড়ীয় উপভাষা', 'সাহিত্যিকী', বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, ১৮শ বর্ষ, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৫।
৪৯. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'বরেন্দ্র ভূমির ভাষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫৩।
৫০. G. A. Grrierson, Ibid, p. 158.
৫১. রামেশ্বর শ., 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৬৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সমাজ

৪.০১ ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের স্থানিক পটসন্ধানী কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য মাত্রা অর্জন করেছে। বরেন্দ্রভূমির রুক্ষপ্রকৃতি, কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক জীবনযাত্রা আচার-আচরণ ও সমাজরীতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ কথাসাহিত্যে স্থানিক ঘটনাধারা, চরিত্র ও পটভূমির নিবিড় সংযোগ ঘটেছে। আবার কোন কোন গল্পউপন্যাসে লক্ষণীয় আঞ্চলিক বা স্থানিক পরিবেশ শুধুমাত্র ফ্রেমের কাজ করলেও আঞ্চলিকতার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বস্তুত স্থানিক ভৌগোলিক জীবনপটে বিধৃত কথাসাহিত্যে চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জীবন-জীবিকা বা বৃত্তিক পরিচয়সহ সব কিছুই লেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বস্তুনিষ্ঠ রূপ লাভ করা প্রয়োজন। আমাদের অধিকাংশ লেখকই এই ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর করেছেন। তাঁরা বরেন্দ্র অঞ্চলকে কেবল গল্পউপন্যাসের পটভূমি রূপে গ্রহণই করেন নি; বরেন্দ্রের প্রকৃতি, জলহাওয়া ও সংস্কৃতিপুষ্ট চেতনার সংযোগও ঘটিয়েছেন। বর্তমান অধ্যায়ে এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হবে।

৪.০২ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজ ঃ

উত্তরবঙ্গের অনার্য লোকায়াত সংস্কৃতির বহুবিচিত্র প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য এই অঞ্চলেরই অন্তরঙ্গ জীবনভাষ্য। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, কথাসাহিত্যে যেহেতু সমাজেরই অখণ্ড নিটোল প্রকাশ। তাই লোকবৃত্তান্ত, চরিত্র, পরিবেশ, রচনারীতি প্রভৃতি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং প্রতিটি উপাদান উপন্যাসের নিয়মে যথাস্থানে স্থাপিত করে সৎ ও সার্থক উপন্যাস রচিত হয়, যা কখনো প্রাণহীন অবয়ব সংস্থান নয়।'[১] লক্ষণীয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদের সমাজ-অবয়ব সংস্থান করতে গিয়ে আমাদের কথাশিল্পীরা নির্বাচন করে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও লোকজীবন বাস্তবতা এবং সংশ্লিষ্ট লোকভাষাও। কারন, আমরা জানি, সমাজ অবয়ব কেবলমাত্র কালিক ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। তার সামাজিক গতিশীলতা, রূপান্তরের পর্যায়ক্রমে এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সেতুবন্ধনের দায়িত্ব ঔপন্যাসিক অস্বীকার করতে পারেন না। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, 'জনপদ প্রধান কথাসাহিত্যে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ, ক্ষণমূহূর্ত অপেক্ষা যুগ, গন্ডিবদ্ধ জীবন অপেক্ষা দেশকাল আলিঙ্গিত জীবনধারা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উপন্যাস লেখকের সামাজিক সচেতনতা, দেশচেতনা ও শিল্পচেতনার সমাহারে গড়ে ওঠে এক শিল্পলোক।'[২] মূলত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েই গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন। আমাদের কথাসাহিত্যের বিশাল পটভূমিই হচ্ছে গ্রাম ও গ্রামীণসমাজ। বর্তমান আলোচনাতেও আমরা লক্ষ করি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদের গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করেই গল্পউপন্যাস রচিত হয়েছে। কোন্ কোন্ জনপদ ও স্থানিক সমাজকে পটভূমি নির্বাচন করে গল্পউপন্যাস রচিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)-এর কথাসাহিত্যে বৃহত্তর রংপুর, কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন জনপদের জীবনবিন্যাসের অনুপুঙ্খ চিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর 'অচেনা' (১৯৯৮), 'অচিন্ত্য পূর্ণিমা' (১৯৯৮), 'ইহা মানুষ', (১৯৯১), 'দূরত্ব', (১৯৮১), 'না, যেও না' (১৯৮৯), ত্রাহি'

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৮৮), 'শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ' (১৯৯৮), 'চোখবাজি' (১৯৯৪), 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৯৭), নারীরা (১৯৯৯) উপন্যাসসহ 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' (১৩৯৫) ও অন্যান্য গল্পে রংপুর কুড়িগ্রামের পটভূমি আলিঙ্গিত জীবনধারা বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেনঃ

> লক্ষ্য করে থাকবেন অনেকেই হয়ত যে, আমার গল্প এবং উপন্যাসে আমি একটি ছোট শহর এবং তার আশেপাশের কিছু জনপদ, গ্রাম ও ভূগোল ব্যবহার করে থাকি, শহরটির নাম জলেশ্বরী যে শহরে আমার জন্ম সেই কুড়িগ্রামের উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক এই শহর এবং এর মানচিত্র আমি গড়ে তুলেছি। ... কুড়িগ্রামের মাটি আমার শরীরে, কুড়িগ্রাম আছে আমার জলেশ্বরীর গভীরে।'[৩]

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের সর্বউত্তরে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের চিত্রপটে গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী শওকত আলী (জ. ১৯৩৬)। তিনি আঞ্চলিক জনপদের সামাজিক, ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক পটভূমিতে লিখেছেন 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪) এর মতো এপিকধর্মী উপন্যাস। এছাড়াও 'উত্তরের খেপ' (১৯৯২), 'দক্ষিণায়নের দিন' (১৯৮৫), 'কুলায় কালস্রোত' (১৯৮৬), 'নাঢ়াই' (২০০৩) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'লেলিহান সাধ' (১৯৭৭), 'শুন হে লখিন্দর' (১৯৮৬), 'উন্মুল বাসনা' (১৩৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ ও সমাজজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। রংপুর-গাইবান্ধা অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনের রূপচিত্র লক্ষ করি মঞ্জু সরকার (জ. ১৯৫৩) এর 'তমস' (১৯৯১), 'নগ্ন আগন্তক' (১৯৮৬), 'প্রতিমা উপাখ্যান' (১৯৯০), 'মৃত্যুবান', (১৯৮৬), 'অবিনাশী আয়োজন' (১৯৮২), 'মজ্জাকালের মানুষ' (২০০১) প্রভৃতি গল্পউপন্যাসে। বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা অঞ্চলের ভৌগোলিক জনপদ পরিস্ফুটিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)-এর গল্পউপন্যাসে। তাঁর 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে বগুড়ার খিয়ার অঞ্চলের গভীর ও বিশাল চিত্রপট পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬)-এর ঘটনা বিন্যাসে আংশিকভাবে এই অঞ্চলের সমাজজীবন ও সমাজভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বগুড়ার গ্রামীণ ও স্থানিক সমাজের পটভূমি বিধৃত তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলোর মধ্যে 'পায়ের নিচে জল', 'দখল', 'অপঘাত', 'ফোঁড়া প্রভৃতি অন্যতম। মঈনুল আহসান সাবের (জ. ১৯৫৮) এর 'কবেজ লেঠেল' (১৯৯২) উপন্যাসেও বগুড়ার স্থানিক ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। নাটোর-পাবনা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে সমাজমনস্ক উপন্যাস লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)। তাঁর 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' (১৩৫২), পদ্মা (১৩৪২) প্রভৃতি উপন্যাসে চলনবিল, বড়াল ও পদ্মা নদীর তীরবর্তী সমাজজীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। পদ্মা তীরবর্তী পাবনা অঞ্চলের সমাজজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে সরদার জয়েন উদ্দীন (১৯২৩-১৯৮৬)-এর 'আদিগন্ত' (১৯৫৬), 'নীলরঙ রক্ত' (১৯৬৫) অন্যতম। এছাড়াও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জ. ১৯৩৯), জুলফিকার মতিন প্রমুখ কথাশিল্পী এই অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে কিছু সমাজমনস্ক গল্প লিখেছেন। উত্তরবঙ্গের এইসব অঞ্চলের বিল ও বাঙালি নদী তীরবর্তী জনপদের জীবনভাষ্য ফুটে ওঠে সুবোধ লাহিড়ির, 'ভস্তার বিল' (১৩৭৬), শামসুল হক-এর 'নদীর নাম তিস্তা' প্রভৃতি উপন্যাসে। পাঁচবিবি জয়পুরহাট অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবন নিয়ে কথাশিল্পী তসাদদক হোসেন (১৯৩৪) এর 'মহুয়ার দেশে' (১৯৫৮) একটি ব্যতিক্রম ধারার উপন্যাস। উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের আঞ্চলিক বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে নওগাঁ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের ঐতিহাসিক ঘটনা কৈবর্ত বিদ্রোহের পটভূমিতে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) এর 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬) একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানিক পটভূমিতে রচিত কথাসাহিত্যে আবুবকর সিদ্দিকের (জ. ১৯৩৪) 'খরাদাহ' (১৯৮৭) উপন্যাস এবং 'চরবিনাশকাল' (১৯৮৭) গ্রন্থের গল্পসমূহ, 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ' (২০০০) গ্রন্থের 'বাইচ' প্রভৃতি গল্পে এই জনপদের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও সেলিনা হোসেন (জ.)-এর 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪), 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' উপন্যাস ও বিভিন্ন গল্পে এবং হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯)-এর ছোটগল্প, ভাস্কর চৌধুরী-এর গল্পউপন্যাস এবং সিরাজুল ইসলাম মুনীরের, 'পদ্মা উপাখ্যান' (১৯৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসে বৃহত্তর রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক জনপদের জীবনচিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লেখকের কথাসাহিত্যেও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অভিজিৎ সেন-এর 'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাসের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক উত্তরবঙ্গের রাজশাহী নওগাঁ জয়পুরহাট এবং পশ্চিবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ গৌড়াঞ্চলের বিশাল ক্যানভাসে আদিম যাযাবর জীবনের ছবি এঁকেছেন। অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর উপন্যাস 'গড় শ্রীখন্ড' (১৯৮৭), 'মধু সাধু খাঁ'-তে উত্তরবঙ্গের তিস্তা ও পদ্মা দুই নদীর তীরবর্তী জনমানুষের জীবনসংকট প্রাধান্য পেয়েছে। দেবেশ রায়, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় এঁকেছেন তিস্তাপারের দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলের জীবনচিত্র। এছাড়াও আবুল বাশার, অসীম রায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ প্রমুখ ঔপন্যাসিক তিস্তা ও পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের জনজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন। বস্তুত বর্তমান আলোচনায় শুধুমাত্র বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের রচিত কথাসাহিত্য নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

উপর্যুক্ত কথাসাহিত্যে আমরা লক্ষ করি, উত্তরবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে অবলম্বন করে আমাদের কথাশিল্পীরা গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, লেখকগণ সমাজের বিশেষ দিক ও সময় সম্পর্কেই কেবল তাঁদের দৃষ্টি সীমিত রাখেন নি। দেশকাল পরম্পরা সমাজবিবর্তনের প্রবহমানতাকে ধারণ করেছেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাই সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের আদিম সমাজজীবনের নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ আধুনিক সমাজবিবর্তনের পর্যায়-পরম্পরা স্তরবিন্যাসেরও ক্রম এবং দ্বান্দ্বিক সংকট উত্তরণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ করি। ফলে, উত্তর বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে বাঙালির জীবনাচরণেরও একটি সংহত রূপ পাওয়া যায়। বলা চলে, হাজার বছরের বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনের নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তার প্রতিচ্ছবিও শিল্পসাহিত্যে বিশেষমাত্রা লাভ করেছে। পাল-সেন শাসনামল থেকে শুরু করে মুসলিম শাসন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার বিবর্তন, দেশবিভাগ, পাকিস্তানী শাসনশোষণ ও সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশের গত ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে সমাজের নানামাত্রিক পরিবর্তন গোটা গ্রামীণসমাজের ওপর কার্যকারণ প্রভাববিস্তার করেছে। ফলে, লক্ষ করা যাবে, আমাদের কথাশিল্পীগণ আঞ্চলিক জীবন রূপায়ন করলেও কিংবা বিভিন্ন জনপদকেন্দ্রিক সাহিত্যপটভূমি নির্বাচন করে নিলেও সামগ্রিকভাবে আবহের ভিন্নতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যাসমূহের মধ্যে কতকগুলো ঐক্যসূত্র আছে। আমাদের কথাশিল্পীরা যেহেতু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়ে গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে লেখকদের রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট জীবনদৃষ্টিও রূপায়িত হয়েছে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে। তাই সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণে সাহিত্যও সমাজ বিবর্তনের ধারায় মূলত কতকগুলো মৌল বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কথাসিহত্যে উত্তরবঙ্গের জীবন ও সমাজপ্রেক্ষাপট আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। কাজেই সমাজ যেহেতু নির্দ্বন্দ্ব নয় এবং জীবনের নানামুখী ঘাতপ্রতিঘাত অধুনা সমাজবস্তবতার মর্মমূলে যুথবদ্ধ হয়ে ওঠে গল্প উপন্যাসেও। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার গ্রামীণ ও আঞ্চলিক জীবনবিন্যাসের অনুপুঙ্খচিত্রে তাই ধরা পড়ে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সংকটেরই প্রতিরূপ। এজন্যে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত কথাসাহিত্যে বিভিন্ন স্থানিক পটভূমি ব্যবহৃত হলেও দেখা যায়, শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা ছাড়া সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জনপদের মানুষের সার্বিক জীবনধারায় একধরনের ঐক্যসূত্র রয়েছে। তাই গল্পউপন্যাসের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ রেখে উত্তরবাংলার জীবনপটে রচিত কথাসাহিত্যের সার্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নলিখিত ধারায় আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. উত্তরবঙ্গের নদনদী ও বিল প্রভাবিত জীবনধারা;

খ. আঞ্চলিক ইতহিাস ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের প্রভাব;

গ. আদিবাসী নিম্নবর্গীয় সমাজজীবন;

ঘ. উত্তরবঙ্গের খরা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজ;

ঙ. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অবক্ষয়

উল্লেখ্য যে, স্থানের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত উপন্যাস ছোটগল্পের আলোচনায় সমাজস্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হলেও বিষয়বস্তুর ঐক্যের নিরিখে কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাই উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্যও বটে। নিম্নে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে।

৪.০৩ উত্তর বাংলার নদ–নদী ও বিলপ্রভাবিত জীবনধারা ঃ

উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও ভৌগোলিক পটভূমিতে নদনদী ও বিল প্রভাবিত জনপদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বিল আর ছোট ছোট শাখা নদীবাহিত অসমতল লালমাটিই উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। উত্তর সীমান্তে হিমালয় থেকে দক্ষিণে প্রমত্ত পদ্মা, পূর্বে খরস্রোতা তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, আর অভ্যন্তরে বিশাল চলনবিলসহ অনেক ছোট ছোট বিল, করতোয়া, পূনর্ভবা, আত্রাই, মহানন্দা, টাঙ্গোন, পাগলা, বারনই প্রভৃতি নদনদী পদ্মা যমুনার মিলিত স্রোতে মিশে গেছে। বলা বাহুল্য, হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী ও শাখা নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ দিয়েই। কাজেই এই নদীগুলো এই জনপদের ও সমাজের নিবিড় ইতিহাস ধারণ করে আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় ঃ

> বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ–নদী। এই নদ–নদীগুলোই বাঙ্গার প্রাণ; ইহারাই বাঙ্গাকে গাড়িয়াছে, বাঙ্গার আকৃতি প্রকৃতি নির্মাণ করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে।[৪]

লক্ষণীয়, বাঙ্গাদেশে কথাশিল্পীরাও নদীকেন্দ্রিক জীবনের বিবিধ বৃত্তিক প্রবণতাগুলো কথাসাহিত্যের অনুষঙ্গ করে নিয়েছেন। বিশেষত উত্তরবঙ্গের বিলাঞ্চলের প্রভাব এসেছে স্পষ্টভাবেই। যদিও উত্তরবঙ্গের নদী–নদীর সংখ্যা পূর্ববঙ্গের মতো নয়, তবুও মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে নদীর সংযোগ আছে, তা উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটেও লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বাংলা সাহিত্যে নদীপ্রভাবিত জীবন নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিংবা নদীর একটি ভূমিকা আমাদের কথাসাহিত্যে বরাবরই লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮)–এর উপন্যাসে নদী তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রধান অন্তরঙ্গ প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুন্ডলা (১৮৬৩), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) প্রভৃতি উপন্যাসে নদীকে কলকাতা ও অন্যান্য জমিদারী পরাগণার যোগাযোগ পথের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সেই ক্ষেত্রে লেখক নদীর দুই তীরের প্রাকৃতিক ও প্রাকৃত আটপৌরে জীবনেরও বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭–১৯২৭) প্রভৃতি উপন্যাসে নদী এ্যাডভেঞ্জারের প্রেক্ষিত, কিংবা কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছে নদী ও জীবনের দার্শনিক অভিজ্ঞান। রবীন্দ্র ছোটগল্প 'ঘাটের কথা' (১২৯১), পোস্ট মাস্টার' (১২৯৮), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১২৯৮) প্রভৃতি গল্পে নদীর প্রেক্ষাপটে বর্ণনায় লেখক প্রকাশ করেছেন দার্শনিক অভিজ্ঞান। নদীকেন্দ্রিক বৃত্তিক জীবন নিয়ে একেবারে বাস্তবতাবাদী কথাশিল্পী রূপে উপনাস লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬)। তাঁর অসামান্য সৃষ্টি 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) বাংলা কথাসাহিত্য নদীকেন্দ্রিক প্রথম বৃত্তিক উপন্যাস। পরবর্তী সময়ে রচিত সরোজকুমার রায় চৌধুরীর (১৯০৩–১৯৭২) 'ময়ুরাক্ষী' (১৩৪৩), অদ্বৈত মল্লবর্মনের (১৯১৪–১৯৫১), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৩৫৩), সমরেশ বসুর (১৯২২–১৯৭১) 'গঙ্গা' (১৯৫৭), মনোজ বসুর 'জলজঙ্গাল' (১৯৫১), নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' (১৯৪৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ–র (১৯২২–১৯৭১) কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) আবদুল জব্বার এর 'ইলিশমারীর চর' (১৩৬৮), আবু ইসহাক–এর 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৮৬), আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী', শহীদুল্লাহ কায়সারের (১৯২৭–১৯৭১), 'সারেং বৌ' (১৯৬২), হুমায়ুন কবীর (১৯০৬–১৯৬৯) 'নদী ও নারী' (১৯৫৪), শামসুদ্দিন আবুল কালামের (১৯২৬) 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) প্রভৃতি উপন্যাসে নদী ব্যবহৃত হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২১–১৯৭৫) এর 'ভাঙ্গাচর', 'ইছামতি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', কমলকুমার মজুমদারের, 'অন্তর্জলীযাত্রা' প্রভৃতি উপন্যাসে নদীকেন্দ্রিক জীবনদর্শন ও বৃত্তিক পরিচয় পাওয়া যায়। নদীনির্ভর বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি তাই কথাসাহিত্যেও অন্বিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবেই। সামগ্রিক মূল্যায়নে ''বাংলা উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে নদীর ব্যবহার বর্তমান শতকেরই ঘটনা। বঙ্কিম–রবীন্দ্র–শরৎ উপন্যাসে নদীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে; তথাপি বলা চলে নদীর প্রেক্ষাপটে মানুষের উপস্থাপনা এবং লেখকের জীবনবোধ ব্যক্ত করার প্রয়াস মূলত উত্তর তিরিশের সাহিত্যিকেরাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসে অনেক সময় মানুষের মনোভূমির এবং উপন্যাসের প্লটের সৌন্দর্য সাধনের জন্য নদীকে ব্যবহার করেছেন সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উপন্যাসে ব্যবহৃত নদী কখনোই মানুষের চরিত্র নির্মাণে এবং লেখকের জীবনবোধ প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে নি।[৫] উত্তর তিরিশের বাংলা উপন্যাসে অন্যান্য ল্যান্ডস্কেপের মত উত্তরবঙ্গের নদনদী ও বিলকেন্দ্রিক পটভূমিও লক্ষণীয় বিষয়। উত্তরবঙ্গের নদী ও বিলকেন্দ্রিক গল্পউপন্যাসে সাধারণত একদিকে বৃত্তিকজীবনঘনিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে; অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্চলের সামাজিক পটভূমি এবং কাহিনীর প্লটের সৌন্দর্যরূপে ব্যবহৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে, গল্পউপন্যাসে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিপরিচয়ের সঙ্গে স্থানিক পরিচয়ের যোগসূত্র সংস্থান এবং ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে যেমন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে; তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উত্তরবঙ্গীয় নদী ও বিলকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের প্রাণসত্তা, ব্যক্ত হয়েছে প্রবহমান জীবনকথা।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখে আসে কথাশিল্পী শামসুল হক-এর 'নদীর নাম তিস্তা' (১৩৭৩) উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাসে তিস্তা নদীর পটভূমি এসেছে উত্তরবঙ্গের ডাটোয়া বা মুসলমান জেলে জীবনের বৃত্তিক ও স্থানিক সমাজের অবয়ব রূপে। তিস্তা নদীর তীরবর্তী দরিদ্র জেলে গফুরের জীবনসংকট এবং তার মেয়ে গোলাপীর সহজ-সরল গ্রাম্য প্রেমকাহিনীর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক আবহের মধ্যদিয়ে একশ্রেণীর মানুষেরই জীবনচিত্র এঁকেছেন। তিস্তা নদী, রুহিয়া খাল, গোয়াকুল বিলকেন্দ্রিক জীবনবৃত্তান্ত এই উপন্যাসে বিধৃত। ডাটোয়া পাড়ার অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন ঃ বেলকার প্রায় মাইল খানেক উত্তরে তিস্তা থেকে একটা খাল বেরিয়ে গেছে। নাম তার রুহিয়া। প্রায় মাইল দুয়েক দক্ষিণে গিয়ে আবার সে মিশেছে তিস্তার সাথে। তিস্তা আর রুহিয়ার মাঝে ত্রিভুজের মতো উঁচু জায়গাটায় ডাটোয়া পাড়া। ডাটোয়ারা এ অঞ্চলের মুসলমান জেলে।[৬]

বংশপরম্পরায় তিস্তা নদীই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। তাই নদীর সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্ক। জীবিকার পটভূমিই শুধু নয়। নদী তাদের মনোভূমিও বটে। বিশেষত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গফুর ডাটোয়ার সঙ্গে নদীর নিবিড় সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন লেখক। 'একটা দিন নদীতে যেতে না পারলে মন ওর (গফুরের) উসখুস করে।'[৭] অথচ গফুরের ছেলে আসগর পিতার পেশায় সন্তুস্ট নয়। সে যায় ইউনুস জোলার বাড়ি তাঁত বোনার কাজ শিখতে। তার উপলব্ধিঃ 'যে ব্যওসায় পানির ওপর ভরসা করি বসি থাকা নাগে, তাক করার চায়া পানিৎ ডুবি মরায় ভালো।'[৮] কিন্তু গফুরের জীবন যৌবন সব কেটেছে এই রুহিয়া ও তিস্তার বুকে। 'নদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কতদিনের মনে মনে হিসাব করে গফুর। পুরা দুই কুড়ি দশ বছর। তাই তো নদীর সাথে তার নিবিড় আত্মীয়তা। একদিন না দেখলে মন ওর কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।'[৯] গফুর বিশ্বাস করে, নদীর সঙ্গে অন্যায় করলে কঠোর হাতে নদী শাস্তি দিতে পারে, আবার নদীর কাছে প্রার্থনা করলে নদী ভালোবেসে নিজের সম্পদ উজাড় করে দেয়। 'নদীর বুকে জাল বাইতে বাইতে গফুরও কতদিন অভিযোগ জানিয়েছে নদীর কাছে। রুহিয়া আর তিস্তা ওর একান্ত আপন, যেমন আপন ওর ছেলেমেয়ে দুটো। সারাদিন জাল বাইতে বাইতে গফুর রুহিয়া আর তিস্তাকে উদ্দেশ্য করে কত কথা বলে। মনের মত মাছ পেলে ওর আনন্দ ধরে না। তখন প্রাণ খুলে নদীর প্রশংসা করে। আবার যখন মাছ মেলে না, তখন আদুরে ছেলের মত নদীর কাছে আর্জি জানায়। কিন্তু বেয়াড়া কিছু বলে না। পাছে ওর গোসা হয়ে ওর ওপর থেকে কৃপা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।'[১০] গফুরের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে বিশ্বাস করে, তিস্তা দেবতার মত দয়ালু। একদিন কিশোরী গোলাপীকে নিয়ে মাছ ধরে গিয়ে তিস্তার প্রবলস্রোতে ভেসে গিয়েছিল আদরের মেয়েটি। ঝড়ের রাত্রিতে নদীর তীরে চিৎকার করে ডাকছিল গফুর। গোলাপী তখন তিস্তার করাল গ্রাসে অদৃশ্য।

> 'অবশেষে একেবারে হতাশ হয়ে নদীর পাড়ে বসে পড়ল গফুর। আজন্মের বন্ধন তার তিস্তার সাথে। আর সেই তিস্তা কি না গ্রাস করল তারই মা মরা মেয়েটাকে। নদীর উন্মত্ত স্রোতধ্বনির দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে পাগলের মত বিড় বিড় করতে লাগল গফুরঃ তিস্তা মোর বেটিক চিনিল্ না। হামি তো ঐয়ার কাছে কোন দোষ করি নাই।'[১১]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু গোলাপীকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল তিস্‌তা। সেই গোলাপীও এখন পূর্ণ যৌবনা। গোলাপীও তার প্রেমিক জবেদের সঙ্গে প্রেমাভিসার করে তিস্‌তা নদীর বাঁকে। বস্তুত এই উপন্যাসের পুরো ক্যানভাস জুড়েই নদীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলোর মনোভূমির সঙ্গীরূপে নদীও হয়ে উঠে অন্যতম প্রধান চরিত্র। কাহিনীর বিরাট অংশ জুড়ে রোমান্টিক আবহ থাকলেও ডাটোয়া জেলেদের বৃত্তিক জীবন সংকটও তীব্রমাত্রা লাভ করেছে। লেখক ডাটোয়া জেলেদের জীবন সংকটের চিত্র আঁকতে গিয়ে শ্রেণীসমস্যার কারণও চিহ্নিত করেছেন। গফুর ডাটোয়া সলিম ডাটোয়ার জালনৌকা এবং আড়তের সঙ্গে বিভিন্নভাবে দায়বদ্ধ। তাই সলিম ডাটোয়ার সমস্ত আদেশ–নির্দেশ তাকে মানতে হয় বিনাশর্তেই। সলিমের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে আসগরের বিয়েতেও গফুর রাজী হয়। কিন্তু আগসর সম্মত না হওয়ায় এবং গৃহত্যাগ করায় গফুরের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। মৃত্যুর পূর্বে সলিমের কার্মার্ত লোলুপতা থেকে গোলাপীকে রক্ষার জন্য জবেদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। আসগর দূরের শহরে কারখানার শ্রমিকের কাজ নেয়। একদিন ফিরে আসে। গফুরের কবর আর তিস্‌তা রুহিয়ার স্মৃতি পেছনে ফেলে ওরা চলে যায় দূরের কারখানায় কাজের সন্ধানে। এভাবেই প্রজন্মের পেশা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে গ্রামের আরো অনেকেই তাদের সহযাত্রী হয়। বলা যায়, সামাজিক সংকটের এই বাস্তবতায় তারা পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করে নতুন কাজের সন্ধানে ছুটে চলে। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি কুবের–এর সঙ্গে জবেদ এর আসগরের চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কুবের কেতুপুর গ্রাম ও মৎস্যশিকারের পেশা ছেড়ে ময়না দ্বীপে চলে যায় কৃষিকাজের সন্ধানে, অন্যদিকে আলোচ্য উপন্যাসে দুই নায়ক মৎস্য শিকারের পেশা ত্যাগ করে চলে যায় দূরের শহরের কারখানায় শ্রমিকের কাজের সন্ধানে। কিংবা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের গফুরের জীবনের সঙ্গে এই উপন্যাসের দুই নায়কের জীবন পরিণতির ঐক্যসূত্র লক্ষণীয়। বস্তুত শামসুল হক তার উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর মধ্যেও সমাজদ্বন্দ্বের প্রকট রূপটিও মূর্ত করে তুলেছেন। পাশাপাশি এই জনপদের মানুষের জীবনাচারণ গ্রামীণ স্থূল লাম্পট্য লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের ব্যাপারগুলিও লেখক অতি দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। তবে একথাও সত্য, শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণের চিত্রপট অঙ্কনে লেখক সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় সংকটের স্বরূপটি স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হননি।

বরং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরবঙ্গের নদী বিলাঞ্চলের জীবনপটে রচিত সুবোধ লাহিড়ীর 'ভস্তার বিল' একটি রাজনীতি সচেতন আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক আঞ্চলিক সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংকটকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। কাহিনীর শুরুতেই ঔপন্যাসিক বিল ও তৎতীরবর্তী জীবনের ছবি এঁকেছেন ঃ

> ''ভস্তার বিল। প্রায় তিন মাইল জায়গা নিয়ে পড়ে আছে। খুব পরিস্কার পানি। কেবল বর্ষার সময় যখন দু'দিকের নদী থেকে ঢল এসে বিলটিকে কানায় কানায় ভরে দেয় তখন এর পানির রং হয়ে ওঠে ঘোলাটে। ঢলের সঙ্গে মাছও আসে প্রচুর। একটু পানি কমলেই মাছগুলো সব আটকে পড়ে বিলের মধ্যে। আর বের হবার রাস্তা নেই। পানি আর মাছে যেন সারা বছরই টুপটুপ করে বিলটি। কবে কোন কালে জীবন যুদ্ধের তাগিদে কিছু লোক এসে ঘর বেঁধেছিল এই বিলের কাছে। আজ তা কারুই মনে নেই। তারপর ধীরে ধীরে কতগ্রাম গড়ে উঠেছে এখানে। বন্য কর্কশ জমির উর্বরতার শ্যামলিমায় ছেয়ে গেছে, আরও মানুষ এসেছে, মৌজা হুসনাবাদের জন্ম হয়েছে ও শস্যশ্যামল আমন গ্রাম রণবীর বালা। সবই হয়েছে এই বিলকে

Dhaka University Institutional Repository

> কেন্দ্র করে। লোকে বলে এ বিল নয় যেন সোনার খনি। সত্যিই সোনার খনি। খনি থেকে সোনা বের করতে তো অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার, কিন্তু এ বিলে অনায়াসেই মাছ পাওয়া যায়। সামান্য পরিশ্রম করলেই নানারকম ভাল ভাল মাছ ধরা পড়ে। কাছেই বন্দর, সেখানে নিয়ে গেলেই কাঁচা পয়সা। প্রতিদিনই এ ধারা চলে।''[১২]

এই বিলের অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, 'বন্যার পানিতে বাঙ্গালী, ভস্তা, করতোয়া এক হয়ে গেছে। এপার ওপার দেখা যায় না।'[১৩] অর্থাৎ বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলার মধ্যবর্তী বাঙ্গালী ও করতোয়ার মাঝে অবস্থিতি এই বিলের দুই তীরে পাঁচ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের জীবনচিত্রই এই উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। বিল ও নদীকেন্দ্রিক এই জনপদটির জীবনসংঘাত আঞ্চলিক ভৌগোলিক অনুষঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেও এর মর্মমূলে ফুটে ওঠে রাষ্ট্রীয় সংকট। ভৌগোলিক অনুষঙ্গ ও জীবনাচারণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র শের, নেদু ও পলাণ তিনজনই মৎস্যজীবী। তারা মৎস্য শিকারে ভস্তার বিল অঞ্চল ছাড়িয়ে চলে যায় বাঙ্গালী করতোয়া নদীর মোহনায়। বন্যার জলের প্রবল স্রোতের মুখের শিকার করে ঝাঁক ঝাঁক ইলিশ, কিংবা লাল মুখো বড় বড় রুই মাছ। কখনো কখনো তাদের জালে ধরা পড়ে বড় কুমীর। জলে-স্থলে সর্বত্র সংগ্রাম করতে হয় তাদের। তারা শ্রমের নায্য হিস্যা থেকেও বঞ্চিত হয়। পলাণ, নেদু ও শের গঞ্জের মাছের আড়তদার করিমের কাছে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়। করিমও একদিন সাধারণ মৎস্যজীবী ছিল। এখন সে মাছের আড়তদার। মাছ চালান দেয় শহরে। তার জাল আছে, নৌকা আছে। সেই সূত্রে সে অনেক অর্থেরও মালিক। রণবীলবালার জেলেরা তার নৌকা ও জাল ব্যবহার করে। সকল জেলেকেই সে প্রতারণা করে। অন্যদিকে, এই গ্রামেরই আরো একজন নব্যধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হচ্ছে ধনা মামা। শহরে সুতার ব্যবসা তার। জেলেদের জাল তৈরির জন্য চড়া দামে সুতা সরবরাহ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণ মৎস্যশিকারীরা দিন দিন নেমে আসে একেবারে প্রান্তিক জীবনে। উপরোন্তু জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জলকর ডাক ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা চালু হলে ভস্তার বিল ডাক নিয়ে দেখা দেয় ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব। একদিকে করিম আড়তদার, অন্যদিকে ধনা এবং তৃতীয় পক্ষরূপে গ্রামের সাধারণ মানুষ পলাণের নেতৃত্বে ভস্তার বিল ডাকের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। জমিদারী আমল থেকে গত ত্রিশ বছর ধরেই রণবীরবালা গ্রামের সরদার আফজালের নেতৃত্বে সাধারণ জেলেরাই এই বিলের স্বত্ত্ব জমিদারের কাছ থেকে পেয়েছে। তাদের সারা বছরের জীবিকার সংস্থানও হয়েছে এই বিল থেকেই। কাহিনীর দ্বন্দ্বে লক্ষণীয়, প্রধান চরিত্র শের এবং পলান, নেদু, সোনামিয়া প্রমুখ জেলেরা সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতিপক্ষ করিম, মফিজ, আজাহার, দারোগা প্রমুখের বিপক্ষে দাঁড়ায়। সাবেক জমিদার উপানন্দ সিংহ, ইজারাদার মঈনুদ্দিন শেখ, মাশি হালদার প্রমুখ অর্থলোভী চরিত্র এই গ্রামীণ শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ব্যক্তি হলো একোয়ার্ড এস্টেটের ম্যানেজার। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ব্যক্তি জেলেদের সমষ্টিগত দাবির সপক্ষে সমর্থন দেয়। অথচ, ধূর্ত শোষক করিমের প্ররোচনায় নায়ক শের বিভ্রান্ত হয়। সে সমষ্টিগত স্বার্থের কথা ভুলে নিজের স্বার্থের জন্য হাত মেলায় করিমের সঙ্গে। পলান আপোসহীন নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। কারণ, পলানের বাবা অতীতে এই বিলের জন্য গ্রামবাসীর স্বার্থের জন্য জীবন দিয়েছে। তাই সে সমষ্টিগত স্বার্থে বিল ইজারা নিতে গিয়ে কুচক্রীদের দ্বারা মার খায় এবং জেলে আটক হয়। সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে শের-এর দাদা বৃদ্ধ আফজাল সর্দারের সাহসী ও সৎভূমিকার শোষকের পরাজয় ঘটে। বস্তুত উপন্যাসে লেখক

Dhaka University Institutional Repository

গণজীবনের আত্মসতেন ও অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যঃ

> 'এসব শ্রেণী সংগ্রামরত সাহসী ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র চিত্রণ ছাড়াও এ গ্রন্থে ফিশারী অফিসারের চাপরাশি কর্তৃক আহনের নামে জেলেদের কাছে অর্থ আদায়ের বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে জেলেদের জীবনের বিচিত্র শোষণ কর্মের প্রাসঙ্গিক বিষয়টি আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে জীবন্ত প্রসঙ্গের অবতারণায় লেখক আবহমান স্থির পল্লীর আবহে জাগরমান দ্বন্দ্বের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা অবশ্যই প্রতিশ্রুতিশীল। তাই বিষয় বিন্যাসে লেখকের আংশিক সাফল্য স্বীকার করতেই হয়।'[১৪]

মূলত আলোচ্য উপন্যাসে বিলকেন্দ্রিক জেলেদের জীবনসংকট ও গ্রামীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটিতে সমাজের শোষক ও শোষিত শ্রেণীর স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে সামন্ত জমিদারের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক শোষণের নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামীণ প্রভাবশালী ব্যক্তির হীনস্বার্থে প্রশাসনের কর্মকর্তারাও প্ররোচিত হয়েছে। বিশেষত স্থানীয় থানা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গণবিরোধী তারই রূঢ়চিত্র ঔপন্যাসিক বিবৃত করেছেন। শামসুল হকের 'নদীর নাম তিস্তা' উপন্যাসের সঙ্গে 'ভস্তার বিল' উপন্যাসের জীবনচেতনাগত পার্থক্য এখানেই যে, শামসুল হক জীবনের সংকটকে দেখেছেন এধরনের অদৃষ্টবাদীর দৃষ্টিতে; অপরদিকে সুবোধ লাহিড়ী সংকট ও শোষণের কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ীরূপে দেখেছেন। কিন্তু শামসুল হকের উপন্যাসের নায়করা পলায়নবাদী এবং নিঃস্বতর জীবনপথের ভাসমান পথিক। তবে উভয় লেখকই উত্তরবঙ্গের মৎস্যজীবী মুসলমান জেলেদের জীবন ও নদী বিল প্রভাবিত পটভূমি অবলম্বনে উপন্যাস দুটো রচনা করেছেন। অপরদিকে, শামসুল হক আঞ্চলিক জীবন রূপায়নে তুলনামূলকভাবে সফল করেছেন বেশি। কারণ, উপন্যাসের আবহ নির্মাণে তিনি তিস্তা রুহিয়া ও বিলের যে চিত্র এঁকেছেন তাই নয়, তার বড় কৃতিত্ব হলো চরিত্রের সংলাপ হিসেবে তিনি হুবহু আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। ফলে, তার উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনাচারণ, বৃত্তিক পরিচয়সহ ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সুবোধ লাহিড়ী 'ভস্তার বিল' উপন্যাসের মৎস্যজীবী চরিত্রের মুখে প্রমিত ভাষার সংলাপ ব্যবহার করায় চরিত্রগুলো আঞ্চলিক পটভূমিতে বাস্তবানুগ হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে তিনিও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতই তৎসম শব্দবহুল ভাষায় সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। ফলে আঞ্চলিক জীবনের আবহ থাকা সত্ত্বেও 'ভস্তার বিল' সফল উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি।

উত্তরবঙ্গের চলনবিল, বড়াল নদী ও পদ্মা নদীর পটভূমি অবলম্বনে প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১–১৯৮৫) পদ্মা (১৩৪২) জোড়া দিঘীর চৌধুরী পরিবার (১৩৫২), 'চলন বিল' (প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই) উপন্যাস তিনটির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। লেখক উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জোয়াড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চলন বিল ও আশপাশের অঞ্চল নিয়ে ছিল তাঁর পৈত্রিক জমিদারী। যদিও বাল্যের সময়গুলো তাঁর কেটেছে দেওঘরে এবং ছাত্র ও কর্মজীবন শান্তিনিকেতন ও কলকাতাতেই;[১৫] তবু তাঁর শিল্পীসত্তার নাড়ির যোগ ছিল বাংলাদেশের নাটোরের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে। প্রমথনাথ–গবেষকের মন্তব্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> 'জোয়াড়ি ও তার আশপাশের মাটি ও মানুষ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। জোড়া-দীঘি পর্যায়ের উপন্যাসগুলির (জোড়া-দীঘির চৌধুরী পরিবার, অশ্বত্থের অভিশাপ, চলনবিল) পরিবেশ, পটভূমি, চরিত্র ও ঘটনারাজিতে স্থানীয় রঙ অনেকাংশ আজ্ঞীকৃত হয়ে আছে।'[১৬]

সুতরাং লেখকের সঙ্গে বাংলাদেশের নাড়ির যোগ এবং কিছু কিছু উপন্যাস ঢাকা থেকেও প্রকাশকের সূত্রধরে বিষয় ও প্রেক্ষিত বিচারে তাঁর উল্লিখিত উপন্যাসগুলো বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা সমীচিন মনে করি। বিশেষ করে তাঁর 'পদ্মা' উপন্যাসটির কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'পদ্মা' উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশীর সৃষ্টির উন্মেষও হয়েছিল এই 'পদ্মা'-র পটভূমি দিয়েই। তিনি 'মুক্ত বেণী' (১৩৭৮) উপন্যাসের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ

> 'পদ্মা থেকেই আমার উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলে ধরতে হবে। এই সময় কয়েক বছর পদ্মা নদী তীরে রাজশাহী শহরে বাস করতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠ থেকে এখানে এসে পদ্মার খোলা হাওয়া পেয়ে বেঁচে গেলাম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ পদ্মা আমার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠল, সকাল সন্ধ্যা দুপুর সব সময়ে। শীতকালে জল কমে গিয়ে চরের অধিকার বিস্তৃততর হলে সেখানে অনেক সময় বেড়াতে যেতাম, চরের অধিবাসীদের ছবি চোখে পড়তো। এইভাবে বহুদিনের যাতায়াতে ধীরে ধীরে পদ্মার সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ গড়ে উঠল, তার মধ্যে চরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মিশল ঘটলো।'[১৭]

'পদ্মা' উপন্যাসের বিশাল অংশ জুড়েই রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী চর চিলমারী নামক একটি বৃহৎ চরজীবনের ছবি পাওয়া যায়। মূলত উপন্যাসের নায়ক বিনয় ও চরবাসী কিশোরী কঙ্কনের সরল প্রেমকাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু চরের জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি সামাজিক লোকউৎসব বিভিন্ন লৌকিক প্রথাসংস্কার মিলিয়ে লেখক স্থানিক বর্ণিমাকে প্রাণবন্তু করে তুলেছেন। পদ্মা নদীর একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেনঃ

> মেঘে ম্লান, শরতে স্বচ্ছ শীতে শান্ত এই পদ্মা। কূলে শস্য, জলে নৌকা, স্থানে লোকালয় এই পদ্মা। বর্ষার প্রথম বারি সমাগমে সমাকূল, বৈশাখের মেঘ পতাকার দূঢ় সংকেতে নিঃশ্বাসরোধ করিয়া নিস্তব্ধ, উভয় তীরের ঝাউ ঝাড়গ্রাসী, ঘনায়মান, কলগর্জিতা, স্নেহশীল জননীর ন্যায় কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নতনয়না, কখনো বা নৃত্যশীলা নটিনীর ন্যায় দ্রুত চরণ চাঞ্চল্যে কলহাস্যময়ী, কখনো বা শবর-দুহিতা শ্যামা শর্বরীর মতো উচ্ছ্বাসিত কৌতুকে ধনুনিবন্ধ পানি শঙ্কায়িত যুগ্ম তীরতূনীরা; শ্রান্ত অঞ্চলা শরৎ শেষের ক্ষীণশশিকলা প্রায় কখনো দিক শয্যাপ্রান্তলগ্না। বর্ণ বৈচিত্র্যহীন বাংলার সম্প্রদায় প্রান্তর তলসায়িনী, একাকার বিরাট বিশাল, উদার, পদ্মা জগতের সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে একটানা আদি অন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা। বাংলার প্রাণ-প্রতীক এই বিরাট নাগিনী।'[১৮]

এই পদ্মার তীরের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে বিনয় ও কঙ্কনের প্রেমকাহিনী। বন্যা নদীভাঙনের দৃশ্যের পাশাপাশি প্রেমে দেখায় গভীর ট্রাজিডি। বিনয় পদ্মার চরেই বিয়ে করে পারুলকে, আর কঙ্কন ভেসে অদৃশ্য হয়ে যায় স্রোতস্বিনী পদ্মার স্রোতে। বস্তুত নদীকেন্দ্রিক জীবনের প্রেম ও প্রকৃতিতে অভিসিঞ্চিত এই উপন্যাসের কাহিনী। সত্যিকার অর্থে ঔপন্যাসিক প্রেমের ছবি আঁকতে মনোযোগী হয়েছেন, ঠিক ততোটা সমাজের প্রতি দৃষ্টি দেননি। এখানেই উপন্যাসটিতে পটভূমিকে ধারণ করেও বাস্তবতার অনুষঙ্গী হয়ে উঠতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'জোড়া–দীঘির চৌধুরী পরিবার' উত্তরবঙ্গের চলন বিল, বড়াল নদ ও করতোয়া–পদ্মানদীর বিশাল ক্যানভাসে রচিত অন্যতম উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক স্থানিক পটভূমিরূপে চলন বিল ও বড়াল–পদ্মার পটভূমি অবলম্বন করতে গিয়ে অঞ্চলের অতীত–বর্তমান ঘটনার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। একটি জমিদার পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অনুষঙ্গরূপে এনেছেন। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বৃহৎ নদী পদ্মাকেও একটি চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে পদ্মানদীর গুরুত্বপূর্ণ জলপথ রূপে বড়াল ও চলন বিলের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে। একদা মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সৈন্যসামন্তের রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম রূপে এই জলপথ ব্যবহৃত হতো। উপন্যাসের বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন ঃ

> রাজশাহী সহরের কিছু পূর্ব্বে চারঘাটের নিকটে পদ্মা নদীতে বড়ল নদের মুখ। বড়ল পদ্মা হইতে বাহির হইয়া জোড়াদিঘীর তল দিয়া রাজশাহী ও পাবনা জেলার অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া গোয়ালন্দের কিছু উজানে যমুনা নদীতে পড়িয়াছে, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন যমুনা নদী বর্ত্তমান স্থানে ছিল না, খুব সম্ভব বড়াল আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া একেবারে পদ্মায় পড়িত। এখন বড়ল সামান্য একটা শুষ্ক নদী, বর্ষার সময়ে জল থাকে, অন্য সময়ে শুষ্ক বা স্বল্প জল। রেনেল সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্রে দেখা যাইবে, উহা গভীর নীলবর্ণে চিত্রিত। এখন উহাতে যাহা কিছু নীলিমা তাহা চকুরীপানার প্রাচুর্য্যে। চৌধুরীদের উন্নতির সময়ে পদ্মার পরে এত বড় নদী আর এ অঞ্চলে ছিল না। ব্যবসায়–বাণিজ্য ছাড়া এ নদীপথের একটা রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকার মধ্যে এই নদীপথটাই হ্রস্বতম। নবাবী ফৌজ বড়ালের তীর দিয়া যাতায়াত করিত; নবাবী পল্টনের বড় বড় বজরা এই পথেই মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা যাইত।[১৯]

কিন্তু কালের প্রবাহে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো বদলে গেছে সমাজ জীবন। বড়ালের ফল্গুধারা আর নেই, পদ্মার গতিপথ বদলে গেছে। তবে এই জনপদ নিয়ে এখনও প্রচলিত আছে নানা কিংবদন্তী। চলনবিলের মাঝে দুটো গ্রাম জোড়াদীঘি এবং রক্তদহের দুই জমিদার পরিবারের দ্বন্দ্বসংঘাত নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীতুল্য। একদা তারা ছিল পেশাগত ডাকাত। চলন বিল, বড়াল পদ্মা নদীতে ডাকাতি করতো। ঘটনাক্রমে এই পরিবারের জামাতা চলন বিলে ঘুমন্ত বজরায় রাত্রির অন্ধকারে খুন হয়। জমিদার উদয়নারায়ন সিংহ আপন জামাতাকে অপরিচিত ব্যক্তি মনে করে খুন করে। নিয়তির এই নির্মম ঘটনা থেকে তারা আদি ব্যবসা ডাকাতি ত্যাগ করে। তবুও তার বিশাল লাঠিয়াল বাহিনীর দাপটে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারগণ উদয়নারায়ণকে সমীহ করে চলতো। উদয়নারায়নের পৌত্র দর্পনায়ন ও রক্তদহের জমিদার পরস্পর পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পটভূমিতে তৎকালীন জমিদারদের স্বেচ্ছারিতা ও অত্যাচারের মর্মন্তুদ নগ্নচিত্র প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করে কাহিনীর ব্যাপ্তিকে বিস্তৃত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুর্শিদাবাদের নবাব, পলাশীর যুদ্ধ, লর্ড ক্লাইভ, 'ওয়ান্টার লু'র যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করে অন্যাবশ্যকভাবে উপন্যাসের কাহিনীকে শ্লথ করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে নবাব সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। তবে এই উপন্যাসের ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে চলন বিলের কৃষক প্রজামন্ডলের খন্ড খন্ড জীবনচিত্র। বিশেষ করে জমিদার দর্পনারায়নের চলন বিলের বুকে বজরায় ভেসে ভেসে গ্রাম থেকে গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

খাজনা আদায়ের দৃশ্যে সাধারণ প্রজামন্ডলের সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনা উপন্যাসের কাহিনীকে দিয়েছে বাস্তবতার মর্যাদা। বামুনডাঙ্গা গ্রামের বর্ণনায় লক্ষণীয় ঃ

> 'গ্রামের নাম বামুনডাঙ্গা; নদীর নাম কঙ্কন; কঙ্কন বড়াল নদীর ছোট একটি শাখা; বর্ষার সময়ে বিলের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়; শীতকালে স্বতন্ত্র। বামুনডাঙ্গা গ্রামে কঙ্কন নদীর তীরে সস্ত্রীক দর্পনারায়ন আজ একমাস বাস করিতেছে।'[২০]

এই চররুইমারি, বামুনাডাঙ্গা কইজুড়ি প্রভৃতি গ্রামের পটভূমিই হচ্ছে চলন বিল ও তার প্রকৃতি। গ্রামে জমিদারের আগমনের দৃশ্যে প্রজামন্ডলের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনাঃ

> সেকালে জমিদার গ্রামে আসিলে প্রজারা খুসি হইত; ... গ্রামের প্রধানেরা প্রচুর পরিমাণে নজর লইয়া বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত লোক ঘাটে আসিয়া ভিড় করিয়া সকলেই সাধ্যমত ভেট আনিয়াছে। গোলায়া দই, ক্ষীর, ঘি আনিল, জেলে টাটকা মাছ আনিল; ময়রা সন্দেশ আনিল; চাষীরা তরিকরকারী আনিল; বেগুন মূলা, কুমড়ো লাউ; উচ্ছে নানা রকমের শাক, রুইগঞ্জের বিখ্যাত তাঁতীরা ধূতি চাদর, শাড়ীর ভেট আনিল; দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বজরা নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া গেল...।[২১]

চলন বিলের প্রকৃতি ও মানুষের খন্ড খন্ড জীবনচিত্র বর্ণনায় লেখকের মন্ময়ধর্মী কবিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু সাধারণ চরিত্রগুলোকে তিনি জীবন্ত করে তুলতে পারেন নি। সেইসঙ্গে দুই জমিদারের খেয়ালীপনা ও রক্তাক্ত সংঘাতের মূলে ঘটনাবিন্যাস অত্যন্ত শিথিল। উপন্যাসের কাহিনীকে জমাট বাধতে দেয়নি। সমালোচকের ভাষায়ঃ 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার-এ পটভূমিকা ও নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে এই ব্যবধান আরো তীব্র অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে।'[২২]

অতীত সমাজাশ্রয়ী জীবন কাহিনী বিন্যাসের কারণেই লেখক অতি কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। তবুও এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনায় মূলত অতীত জনপদের চালচিত্রের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে তোলে। ঘটনার বর্ণনার মাঝে মাঝে লেখকের মননধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে সমাজের রূঢ়চিত্রকেই স্পষ্ট করে দেয়।

> 'আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি বলিত, নরক দেখি নাই, কিন্তু নাটোর দেখিয়াছি। বোধ করি তাহার এ উক্তি মিথ্যা নয়। ব্যাধি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কদাচার, অত্যাচারে নাটোরের বায়ুমন্ডল ম্লান। যে যুগটা বাঙ্গাদেশের অন্যত্র হইতে অপসারিত, তারই খানিকটা অন্ধকার যেন এখানকার সূর্য্যালোককে মলিন করিয়া রাখিয়াছে।'[২৩]

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে লেখক মূলত সামন্ততান্ত্রিক জমিদার প্রথার যুগে এই জনপদের এমনই এক রূপবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের কোথাও উচ্চারিত হয়নি লেখকের কাঙ্ক্ষিত সমাজ অভিজ্ঞান ও সাধারণ মানুষের কল্যাণবোধের প্রতি সান্দ্র বিশ্বাস। ফলে আবেগসিক্ত গীতল কাহিনী পাঠককে আপতভাবে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে লেখকের দীপ্র চেতনার অভাব মর্মাহত করে।

'জোড়া-দীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসটির সম্পূরক কাহিনীরূপে লেখকের 'চলন বিল' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। চলন বিল কেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবনের ছবি এই উপন্যাসে তুলনামূলকভাবে বাস্তবরূপ পেয়েছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'চলন বিল' উপন্যাসটি 'জোড়া দীঘির চৌধুরী পবিরার' পরবর্তী অংশ। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এই 'চলন বিল' গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ 'বিলটি' একদিন ছিল প্রতাপশালী ডাকাত জমিদারদের ডাকাতির জায়গা। চলন বিলের আশে পাশের গ্রামগুলিতে ছিল এক এক জমিদারের প্রভাব। তাদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। কালের নিয়মে চলন বিলের নাব্যতা কমে আসে। নানা স্থানে চাষ-আবাদের জমি সৃষ্টি হয়। সেই জমিজমার দখল নিয়েও সংঘাত তৈরি হয়। উপন্যাসের কাহিনীতে চলন বিলের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে।'[২৪]

উত্তরবঙ্গের সমাজ ও পরিবেশ প্রেক্ষিত নিয়ে এ যাবৎ রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে রাজনীতিমনস্ক বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসটি। বলা চলে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'খোয়াবনামা' একটি মহৎ উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখকের গভীর সমাজমনস্ক রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে আঞ্চলিক জীবনের বর্ণবিন্যাস বা স্থানিক বর্ণনা, অন্যদিকে আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক, যাদুবাস্তবতা, মিথ-পুরাণের ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের শক্তিশালী প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। শিল্প ও সমাজ সম্পর্কে ইলিয়াসের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও সাহিত্যের বিপরীতে তার জীবনবোধ এবং শিল্পের প্রত্যয়কেই তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। আমাদের প্রবহমান সাহিত্য সমাজ ও বিজ্ঞানের বিবর্তনমূলক অনুষঙ্গগুলো সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রবলভাবে লক্ষ করা যায় ষাটের দশকের কথাশিল্পীর রচনায়। যেমনটি ক্রিস্টোফার কডওয়েল মনে করতেনঃ ''উপন্যাসের এবং বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য এমন কি প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মূর্ত অভিজ্ঞতার পরিপক্কতার প্রয়োজন।[২৫] বলা বাহুল্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিলেন পরিপক্ক ও প্রতিভাবন শিল্পীব্যক্তিত্ব। তিনি 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে ভৌগোলিক জীবনের অন্তরঙ্গ ঘটনাসংস্থানে আঞ্চলিক রাজনীতি ও জীবননীতির মৌলিক প্রবণতাগুলো স্পর্শ করেছেন। আমাদের কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ব্যতীত ষাটের দশকের পূর্বে সত্যিকার অর্থে এমন প্রতিভাবান শিল্পীর আর্বিভাব ঘটেনি। সুতরাং বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বিভাজনের একাধিক প্রসঙ্গেই এই উপন্যাসের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা দাবি করবে। কারণ, 'খোয়াবনামা' বহুমাত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিল্পসিদ্ধ উপন্যাস। এই রচনার মাধ্যমেই তিনি পেয়েছেন 'বাংলাদেশের উপন্যাসশাসকের' অভিধা।[২৬]

'খোয়াবনামা' বগুড়া অঞ্চলের যমুনা বাঙালি নদীসংলগ্ন কাংলাহার বিলকেন্দ্রিক জনপদের বিশাল গভীর চিত্রপটে রচিত একটি শিল্পিত জীবনভাষ্য। এই উপন্যাসে লেখক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ স্থানিক প্রাকৃতিক আবহকে ধারণ করেছেন। ফলে কাহিনীবিন্যাসে একদিকে যেমন সামাজিক সমষ্টিগত জীবনের ও সময়ের অখন্ডতার সামগ্রিক রূপায়ন লক্ষ করা যায়; অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়ও লাভ করা সম্ভব। বস্তুত আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীসূত্রপাত ঘটেছে কাংলাহার বিল এবং বিলকেন্দ্রিক গ্রাম গিরিরডাঙ্গা ও নিজগিরিরডাঙ্গার পটভূমিতে। কাংলাহার বিল ঘেষে দুই পারের গ্রামগুলোতে বাস করে কৃষক, মাঝি, কলু, কামার নানান পেশার মানুষ। হিন্দু মুসলমান, নায়েব জমিদার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। সময়ের অখন্ড পরিসরে এই মানুষগুলো বহন ধরে সমাজে ও রাষ্ট্রের বহুস্তর রূপান্তরের ইতিবৃত্ত। উপন্যাসের বর্ণনায় গ্রামগুলোর অবস্থান ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'বিলের পশ্চিমে বিলের তীর থেকে এদিকে খালপাড় পর্যন্ত জায়গাটা এখন পর্যন্ত খালিই পড়ে আছে। তারপরই মাঝিপাড়া। মাঝিপাড়ার মানুষ অবশ্য নিজেদের গ্রামকে ওভাবে ডাকে না, গোটা গ্রাম জুড়ে তো আগে তাদেরই বসবাস ছিলো। এখন পাঁচ আনা ছয় আনা বাসিন্দাই চাষা। আগে কয়েক ঘর কলু ছিলো, আট মাইল পশ্চিমে টাউনে তবিবর মুক্তারের 'রহমান ওয়েলমিল' হওয়ায় তিন বছরের মধ্যে কলুদের অর্ধেকের বেশি চলে গেলো পুবে যমুনার ধারে। যে কয় ঘর আছে তাদের কারো কারো ঝোঁক জমিতে আবাদ করার দিকেই বেশি।

বিলের ওপারে অনেকটা জমি জুড়ে চাষবাস, তারপর ছোট খালটা পার হলে চাষাদের গ্রাম। সেখানে একেকটা ঘরের পাশে বাঁধা গোরু, বৃষ্টির পানিতে ভিজে কালচে হয়ে যাওয়া হলদে খড়ের ভাঙাচোরা গাদা, ভেরেন্ডা ঝোপের পাশে গোবরের সার, কলাগাছের ঝাড়, বৌঝিদের আব্রু করতে শুকনা কলাপাতাই পর্দা, ঘরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা লাঙ্গল, মই ও জোয়াল। সকাল থেকে দুপুর, এমনকি আষাঢ়ের বিকালে বৃষ্টি না হলে সন্ধ্যে বেলাতেও এপারে দাঁড়িয়ে ওপারটা স্পষ্ট দেখা যায়। শরাফত মন্ডলের হাতে খাজনা দিয়ে দূরদূরান্তের জেলেরা এসে মাছ ধরে। ওপারের চাষারা, চাষদের বৌঝিরা পর্যন্ত সার করে দাঁড়িয়ে দেখে। সে সব দিনে বিলে হুলস্থূল কান্ড। জেলে আর কয়জন? সংখ্যায় তাদের তিনচারগুণ বেশি চ্যাংড়াপ্যাংড়া বিলের তীরে লাফাতে লাফাতে হৈচৈ করে। তখন কি বিল, কি জমি, কি পানি কি ডাঙা কারো কোন আব্রু নাই। তখন মানুষ বলো, গোরু বাছুর বলো, মেয়ে মানুষ বলো আর ছোলপোল বলো, মাছ বলো শামুক বলো,– সব, সব শালা উলঙ্গাবাহার হয়ে বেহায়ার মতো খ্যামটা নাচন নাচে।'[২৭]

দিনের এই দৃশ্যের পর রাতের দৃশ্য যায় বদলে। সন্ধ্যার অদৃশ্য কালো জাল ধীরে ধীরে বিলের এপার ওপার বিস্তৃত হতে হতে সমস্ত এলাকা জড়িয়ে ধরে। 'পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী– কী শুক্লপক্ষ কী কৃষ্ণপক্ষ– গিরিডাঙা নিজগিরিরডাঙ্গা– কাৎলারহার বিলের দুই পাড়ের দুই গ্রাম ও বিলের মধ্যে একাকার হয়ে যায়।'[২৮] এই বিলে সেই কবে ঘনকাশবন সাফ করে পাটের জমি তৈরি করেছিল শরাফত মন্ডল। আর বন্দোবস্তসূত্রে কাশবনের একাংশের মালিক টাউনের বাবু রমেশ বাগচি। চাষাপাড়ার চাষাদের, কামার পাড়ার কামারদের টুকুরো টুকরো জমি আকালের সময় চলে যাচ্ছিল জগদীশ সাহার দখলে। 'কামারদের ডেকে শরাফত টাকা দিলে সেই টাকা তারা জগদীশকে দিয়ে জমিগুলোকে ক্রোক হওয়া থেকে বাঁচায়। তবে সেগুলোর মালিক হয় শরাফত নিজেই।'[২৯] বস্তুত 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে কাৎলাহার বিল ও বিলকেন্দ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত কাহিনীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কয়েকশ বছরের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস এবং আঞ্চলিক লোককাহিনী আর কিংবদন্তী চরিত্রসমূহ। এই জনপদের ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহের মেলাও এসেছে কাহিনীর প্রেক্ষাপটরূপে। গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়িহাট, তরনীরহাট এবং পোড়াদহের মেলা প্রভৃতি উপন্যাসে বর্ণিত এলাকাগুলো প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর স্মৃতিবিজড়িত। যমুনা করোতোয়া নদীবিধৌত এই জনপদের ইতিহাসও সমৃদ্ধ। তেমনি রয়েছে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রথা ও পার্বন। অনুরূপ একটি পার্বন হচ্ছে পোড়াদহের মেলা। এই সময় এলাকা জুড়ে চলে উৎসবের আমেজ। খোয়াবনামায় এসেছে সেই বর্ণনা ঃ

'পরশু পোড়াদহের মেলা। মেলা উপলক্ষে আশেপাশের মেয়েরা পোড়াদহের চারিদিকে গ্রামগুলো মানুষজন গিজগিজ করছে। ইসমাইল সেই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাই না। মেলার একদিন আগে গোলাবাড়ি হাটে মুসলিম লীগের সভা। ইসমাইল হোসেন তো বলবেই, শামসুদ্দিন ডাক্তার কথা দিয়েছে খান বাহাদুর সাহেবকে নিয়ে আসার জন্য সে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে; বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। বটতলা ঘেঁসে মঞ্চ তৈরি হবে, মঞ্চের জন্য তক্তপোষ পাওয়া গেছে মুকুন্দ সাহার কাছ থেকে, চেয়ার দেবে নায়েব বাবু।'[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয়, ঔপন্যাসিক পরিবেশ আবহ ও চরিত্রের সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনায় কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। বস্তুত, এই উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক অধিবাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন। কাৎলাহার বিলের আদিকথা তো কিংবন্তীতুল্য। যা উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ে গেছে এক ধরনের কুহকবাস্তবতার জগতে। ফলে অতীত বর্তমান মিলে উপন্যাসের কাহিনী পাঠককে নিয়ে যায় এক ধরনের রহস্যময় চেতনার স্তরে। লেখকের বর্ণনা ঃ

> মেলা দিন আগেকার কথা। কাৎলাহার বিলের ধারে ঘন জঙ্গল সাফ করে সোভান ধুমা আবাদ শুরু করে বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে। সে সব দিনের এক বিকেল বেলা মজনু শাহের অগুণতি ফকিরের সঙ্গে মহাস্থানগড়ের দিকে যাবার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেপাই সর্দার টেলরের গুলিতে মারা পড়ে মুনসি বায়তুল্লাহ শাহ। কাৎলহার বিলের দুই ধারের মানুষ সবাই জানে, বিলের উত্তরে পাকুড়গাছে আসন নিয়ে রাতভর বিল শাসন করে মুন্সি।[৩১]

মূলত পুন্ড্রনগরী অর্থাৎ বগুড়ার এই অঞ্চলটি ছিলো ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পীঠস্থান। উপন্যাসে বর্ণিত মুনসী বায়তুল্লাহ শাহ্কে সেই সময়ের ফকির চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক। ইতিহাসে জানা যায়, 'নাগা সন্ন্যাসীর মতো একদল সশস্ত্র মুসলমান ফকিরও এই সময়ে উত্তরবঙ্গে ডাকাতি ও লুঠতরাজ করে। এই ডাকাতের সর্দার ছিলেন মাদারি সম্প্রদায়ের ফকির মজনু শাহ। বগুড়া জেলার ১২ মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক স্থানের নিকট মদরগঞ্জে এবং মহাস্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিলো।'[৩২] মাদারি ফকিরের অতীতাশ্রয়ী লৌকিক চরিত্র বায়তুল্লাহ মুনসি জনপদের কিংবদন্তী চরিত্র। লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, নিহত মুনসী এখন কাৎলাহার বিলের পাড়ে বড় পাকুড় গাছের উচুডালে অদৃশ্য রূপ ধরে বসে বিলশাসন করে। যমুনা বাঙালি নদী কাৎলাহর বিল মুনসীর শরীরের রক্ত চলাচলের মতো।

> 'মুনসির হুকুম দরিয়াতে গরজিলে
> কোম্পানি সিপাহি চোখে দ্যাখে আজরাইলে।'[৩৩]

তাকে নিয়ে গান বাধে চেরাগ আলি ফকির। চেরাগ আলিও মাদারি ফকির। খোয়াবনামা কাঁধে নিয়ে অঞ্চলের মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়ায়। সামাজিক, ধর্মীয় সব রকম উৎসবে অঞ্চলের মানুষ চেরাগ আলী ফকিরের বয়ান শোনে। জীবিকার অন্বেষণে যমুনার ভাঙন কবলিত এলাকা থেকে এসেছিল চেরাগ আলী ফকির। সঙ্গে তার নাতনি কুলসুম। গোলাবাড়ি হাটে দেখা হয় বৈকুণ্ঠের সাথে। সেই সূত্রে গিরিরডাঙা গ্রামের তমিজের বাপ সাগরেদ হয় চেরাগ আলির। বিয়ে করে কুলসুমকে। উত্তরাধিকার সূত্রে পায় খোয়াবনামা। সেই থেকে তমিজের বাপ স্বপ্নের মধ্যে হাঁটাচলা করে। দিনরাত পাকুড় গাছের মুনসীর সন্ধান করে। কাৎলাহার বিলে, যমুনা নদীতে সর্বত্র সে অনুভব করে মুনসীর অস্তিত্ব। তাই শরাফত মন্ডলের স্বত্ত্ব সে মানে না। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

> পানির মাছ তো মুনসিরই সম্পত্তি। কাৎলাহার বিলের মাছ তো বটেই, যমুনার মাছ বলো, বাঙালির মাছ বলো, মরা মানাসের দ'য়ের মাছ, এমনকি মুনসির সেই আমলে শাহ সুলতানের দরগায় কোম্পানি খাজনা ধরলে দুঃখে লজ্জায় শুকিয়ে যাওয়া করতোয়ার মাছ পর্যন্ত মুনসির পোষাজীব, সবাই মুনসির বলে। চেরাগ আলি বলতো, মুন্সির লোহার পাটিতে মাছের নক্শা।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

তমিজের বাপ মাঝিদের স্বপক্ষে অধিকার আদায়ের কথা বলে। অতীতের মুনসির বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার মতোই তমিজের বাপ তাদের কাছে হয়ে ওঠে বিপ্লবী প্রতিনিধি। অন্যদিকে, উপন্যাসে আরো একটি সাম্যবাদী অসম্প্রদায়িক চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে তেভাগার কবি কেরামত। পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য গান রচনা করে। পাকিস্তান হলে জেলে ও কৃষকেরা পাবে জলা ও জমির অধিকার। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আন্দোলনের নেতা ভবানীপাঠকের উত্তরসূরীরূপে বৈকণ্ঠগিরি আত্মপ্রকাশ আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। এইসব চরিত্রের অনুষঙ্গ লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্থানীয় পর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি, কলকাতার দাঙ্গাসহ উত্তরবঙ্গের দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের জীবনবিপন্নতার বিশাল প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে ইলিয়াস গবেষক যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ

> 'খোয়াবনামার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজনীতি ও ইতিহাস। তমিজ, তমিজের বাপ, কুলসুম, ফুলজান সবাই জড়ানো প্যাচানো ইতিহাসের অন্ধিসন্ধি থেকে উত্থিত। তাদের রক্তে মিশে আছে দীর্ঘ ঐতিহ্য ও সংস্কার বন্ধন।'[৩৫]

জলের ঢেউয়ের মতো সমাজও যে একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে, ঘটেছে সমাজ ও রাষ্ট্রগত জীবনের ও নানামাত্রিক পরিবর্তন তারই একটি প্রতিচিত্র ঔপন্যাসিক ভৌগোলিক ফ্রেমে বন্ধী করেছেন। কিন্তু মানবিক আবেদনের দিক দিয়ে খোয়াবনামা সার্বজনীনতা লাভ করেছে। কাংলাহার বিলের পটভূমিতে রচিত এই জনপদের জীবন কাহিনীর মধ্যে লেখক ধারণ করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের নান্দনিক অবয়ব। কারণ, 'খোয়াবনামা' একটি দলিল; রাজনীতির ইতিহাস। শোষিত শোষক শ্রেণীর ইস্তেহার, গ্রামীণ অর্থনীতির পূর্ণ বৃত্তান্ত। মাঝি, চাষী থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষের জীবনীপ্রতিমা। কৃষকশ্রমিক সকলের জীবনের সূক্ষ্ম অনুষঙ্গগুলোর বর্ণনাতেও ইলিয়াসের অনন্যতা ধরা পড়ে। সামাজিক পদস্থ ব্যক্তির দ্বারা কুলসুমরা, তমিজরা থাকে তটস্থ নির্যাতিত। তারা তাদের ঘামের শ্রমের মূল্য পায় না। ঘর-সংসার করা, সুখ ভোগ করা হয়ে ওঠে না তমিজের। কুলসুম, ফুলজানের প্রাণখোলা হাসি তজিমের ভাগ্যে বেশিদিন সহ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত তমিজকে হতে হয় ফেরারী আসামী, সংসারবিমুখ এক পথচারী বিদ্রোহী। এই চিত্র কী সেদিনের কাংলাহার বিলপাড়ের তজিম-কুলসুমের? নাকি সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র? কাংলাহার বিলপাড়ের শোষিত মানুষের আর্তচিৎকার কাংলাহার বিলপাড়কে ছাড়িয়ে বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তোলে। এখানেই শিল্পী ইলিয়াস সার্থক। স্থান-কাল-জনপদ উৎরে গিয়ে 'খোয়াবনামা' সর্বকালের সর্বস্থানের, সর্বজনের লালিত স্বপ্নের ঠিকানায় উত্তীর্ণ হয়েছে।'[৩৬] উত্তরবঙ্গের নদীকেন্দ্রিক আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সেলিনা হোসেনের চাঁদবেনে (১৯৮৪)। সেলিনা হোসেন সর্ব প্রথম উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও পরিবেশ বিপর্যয়ের পটভূমিরূপে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকটিত পদ্মা নদী ও তীরবর্তী জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি দিয়েছেন। ফারাক্কা বাধের প্রকোপে পদ্মার বিশাল অংশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছে মরুময়তা।

> এখনকার পদ্মা পরাজিত মানুষের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ধু ধু বালির রাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। অনেক দূরে চিক্ চিক্ করে জল। গ্রামের সবুজ কোল থেকে ছিটকে পড়ে পদ্মা এখন আর নিরন্ন মানুষের বুকের পাঁজর আর ভাঙে না। সে ক্ষমতা নেই ওর। মাঝে মাঝে বালুর ফাঁকে তির তিরে জল আঁটকে থাকে। প্রতিবাদহীন গর্জনহীন, শুধু নীরব জলের রেখা।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ফলে, এই অঞ্চলে জলের স্তর গেছে অনেক নীচে নেমে। চম্পাইগঞ্জের বিশাল বিশাল আমবাগানে আমের গুটিগুলো ঝরে যায়, ফসল ফলে না। খরার দাপটে শব্দ করে মাটি ফেটে যায়। আজু মৃধার জমিতে কামলা খাটতে গিয়ে চাঁদ স্পষ্ট শুনতে পায় মাটি ফাটার শব্দ। বালি ঝড়ে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। থু থু ফেলতে গেলেও মুখের ভেতর থেকে দলা দলা বালু বেরিয়ে আসে। এই রুক্ষ জমির সঙ্গে যুক্ত চাঁদের জীবন। রুক্ষ জমির মত রুক্ষ অসুস্থ বাতিকগ্রস্ত তার স্ত্রী ছমিরুন। একদা তারও যৌবন ছিল পদ্মার মত উজ্জ্বল প্রমত্ত। এখন পদ্মায় বাঁধ পড়েছে, তাদের জীবন জীবিকাতেও এসেছে সংকট। সেই সংকট তৈরি করেছে আজু মৃধা।

> 'ও শুনেছে ফারাক্কা বাঁধের কথা। সেই বাঁধের দরুন ওর শৈশব কৈশোরের কীর্তিনাশা পদ্মার পায়ে শেকল। বর্ষার ঢলও সে শেকল ভাঙতে পারে না। সেজন্যে এখন চাঁদের পায়েও বেড়ি। জমিতে পানি সেই, তাই ফসলের গবগবানিও উধাও; পেটে খিদে মরে না। বুকের হাড্ডি ঠেলে বেরিয়ে আসে। ফারাক্কার মতো আজু মৃধা। ওদের জওয়ানকীর পদ্মার বাঁধ দিয়ে রেখেছে। সারা দিনের পরিশ্রমেও পানির গভীরতা বাড়ে না, অনবরত চড়া পড়ে, বালু বাড়ে।[৩৮]

উপন্যাসের কাহিনীতে ফুটে ওঠে শোষণের চিত্র। সর্বহারা চাঁদ, হাফিজ, বসির, জমির শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয় মনে মনে। কিন্তু তারা দারিদ্র্যমলিন জীবনে জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। আজু মৃধার বাড়িতে চাল লুঠ করে। সব মিলিয়ে ফুটে ওঠে শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী। তবে উপন্যাসটির আবহও লেখক দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ভিন্ন দিকে। 'ফারাক্কার কারণে বিপন্ন হয়ে পড়া জনজীবনের কথা দিয়ে উপন্যাস শুরু করলেও এই জীবনের মূল সংকটকে তিনি কেন্দ্রীভূত দেখেছেন শ্রেণীশোষণের মধ্যে। অথচ ফারাক্কা প্রকোপে পীড়িত জনজীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ কথাচিত্র হিসেবে উপন্যাসটির ব্যাপ্তি লাভ করবার সম্ভাবনা ছিল অপর্যাপ্ত।'[৩৯] এছাড়াও চরিত্র ও পটভূমির বাস্তবানুগ ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও লেখক সমন্বয় ঘটাতে পারেন নি। তিনি উপন্যাসে পদ্মা নদীতীরবর্তী অঞ্চলের পটভূমি বা কাহিনীর কাঠামো গ্রহণ করলেও বগুড়া অঞ্চলের উপভাষায় সংলাপ রচনা করেছেন। ফলে উপন্যাসের আবহ ও চরিত্রের সঙ্গে ভাষারীতির অসঙ্গতি এর মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু কাহিনীর মর্মমূলে লেখক মনসামঙ্গল কাব্যের উপকরণ গ্রহণ করেছেন শাণিত চেতনার অনুষঙ্গরূপে। চাঁদের জীবনে ব্যক্তিসংকটের মধ্য দিয়ে সেলিনা হোসেন সামগ্রিকভাবেই সমষ্টিগত সংকটের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে 'শোষক শক্তির প্রতীক অত্যাচারী মহাজন জোতদার আজু মৃধার বিরুদ্ধে চাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বিশাল ক্রোধ।' উপন্যাসের মধ্যপর্যায়ে চম্পাইগঞ্জের মানুষ সংঘবদ্ধ আক্রমণে প্রমাণ করে আজু মৃধারা প্রকৃতপক্ষে শক্তিহীন, মানুষের সংগ্রামী মনোবলের কাছে তাদের পরজীবী অস্তিত্ব খড়কুটোর মতো।'[৪০] অস্তিত্ব বিপন্ন চাঁদ প্রজন্মহীন, ফসলহীন। ছমিরুনকে শহরে চিকিৎসা করেও সন্তান পায়নি। চিকিৎসার জন্য হারিয়েছে বাস্তভিটা। আজু মৃধা তাদের বাস্তভিটা গ্রাস করলে, চাঁদ হয়ে ওঠে আরো প্রতিহিংসাপরায়ন। অন্যদিকে সকিনার প্রেম ও সাহচর্যে সে নিজ জীবনে উপলব্ধি করে নতুনতর তাৎপর্য। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সে আজু মৃধাকে খুন করে। নতুন স্বপ্ন দেখে– 'সকিনা তুমি আর আমি তেমন লখিন্দরের জন্ম দেব যারা আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে আর কোন আজু মৃধা থাকবে না।'[৪১] এইভাবেই উপন্যাসে এক ধরনের মেসেজ প্রদান করেছেন ঔপন্যাসিক। তাই সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তির উত্থানের ইঙ্গিত। 'ফলে সঙ্ঘজীবনাবেগের ইঙ্গিত সত্ত্বেও এ উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকথায় পর্যবসিত হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতিতে সঙ্ঘশক্তির বিভক্ত সক্রিয়তার পটভূমিতে ব্যক্তিপ্রতীকের ব্যবহার নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। চাঁদের চেতনা ও সক্রিয়তার ক্রমবিকাশে সমাজসত্তা ও ব্যক্তিমানসের অন্তর্বয়নের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।'[৪২]

পদ্মা নদীকেন্দ্রিক জীবনপটে রচিত সিরাজুল ইসলাম মুনীরের 'পদ্মা উপাখ্যান' (১৯৯৩) আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে ফারাক্কার প্রকোপে পদ্মায় চর ও মরুময়তার যে চিত্রপট আমরা পাই, অনুরূপে প্রতিচিত্র এই উপন্যাসেও লক্ষণীয়। মরণবাঁধ ফরাক্কার ফলে গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করায় উত্তরবঙ্গের নবাবগঞ্জ রাজশাহী অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে মরুময়তা। ফলে এই জনপদে ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক দিকদিয়েও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় দেশের সাহিত্যেই লক্ষ করা যায়। ফারাক্কার প্রকোপে বিপন্ন এই জনপদের কথা অসীম রায়ের 'কচ দেবযানী', জয়ন্ত জোয়ারদারের 'ভূতানি দিয়ারা', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার কুঠি', আবুল বাশারের 'ভোরের প্রসূতি' প্রভৃতি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এইসব উপন্যাস পদ্মা নদীর দুই তীরের জীবনকে ধারণ করে আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র্যের দুষ্টক্ষতগুলো এইসব উপন্যাসে পাওয়া যায়। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম মুনীর এই জনপদে অন্বেষণ করেছেন নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর নিষিদ্ধ জীবনের রূঢ়চিত্র। বলা যায়, এই অঞ্চলের অন্ধকার জগত চোরাচালানের উপর তিনিই প্রথম আলো ফেলেছেন। উপন্যাসটির প্রোফাইলে বলা হয়েছেঃ 'পদ্মা নদীর দুই পারে দুই বাংলা। পদ্মার দুই পারের মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারার আড়ালে প্রবাহিত এক গোপন-নিষ্ঠুর নিষিদ্ধ জীবনের নানা কথকতা 'পদ্মা উপাখ্যান' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।'

'পদ্মা উপাখ্যান' উপন্যাসের ঘটনা একজন সরকারী কর্মকর্তার ব্যক্তিজীবনের প্রেমানুভূতি ও তাঁর কর্মস্থলের পরিবেশ প্রতিবেশের আবহকে কেন্দ্র করে বলয়িত হয়েছে। কাহিনীর বিভিন্ন অংশ পল্লবিত হয়েছে কাস্টমস্ কর্মকর্তা এনায়েত, তাঁর অধঃস্তন গরীমাদীপ্ত নামের অধিকারী বাদশাহ শাহজাহান, ইউপি. চেয়ারম্যান, টেপন মেম্বার, গ্রাম্যনেতা আনিকুল, লেংড়া ফরিদ, ছাত্র ডিউক, নিজামউদ্দীন, প্রগলভ নারী নাইমা, দালাল হারুন, হেদায়েতুল, নিম্নবর্গীয় জুলেখা এবং এনায়েতের স্ত্রী নীহারকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও কাহিনীর আবহে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, মেজর, বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর হাবিলদার হেলাল এবং পদ্মানদীর মাঝি-মাল্লা, চোরাকারবারীদের নিয়ে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। সেই সঙ্গে পদ্মাতীরবর্তী বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত নবাব সিরাজুদ্দৌল্লাহর ভগবান গোলা, পলাশীর যুদ্ধখ্যাত আম্রকানন, একদা কলকাতা হয়ে গোদাগাড়ী আমনূরা জংশন পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ঘটনা প্রভৃতির স্মৃতিচারণ মূলত এই উপন্যাসে 'Chronotope Values' এর বাস্তবতা সফলভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন লেখক।

পদ্মা উপাখ্যানের সূচনা ও সমাপ্তিতে একটি বৃক্ষের প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সদর্থক জীবন অভীপ্সায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনীর শুরুতে মরুর ফুল মরিয়মের বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে ঃ

> 'এখন চৈত্র মাস। কৃষকের ঘরে চৈতালী উঠার সময়। জনপদে মাঠে, বৃক্ষে, অন্তরীক্ষে সবখানেই চৈতালী হাওয়ার দাপট। কিন্তু পদ্মাতীরের হাওয়ার সে দাপট আরও অহংকারী, পদ্মারই ভেতর থেকে উঠে আসে উদ্বাহু। না নীল, না ধূসর, নীল ধূসর বললেও ঠিক হয় না, এমন একটা স্বাধীন, সীমাহীন আকাশ, যেটা এপারে গোদাগাড়ী ওপারে লালগোলার আকাশকে কোথাও সূক্ষ্মরেখায় বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

> করে নি, তেমন একটা আকাশ তলে দাঁড়িয়ে তীর সীমানার নিচে ডাঙ্গাল ও জলপ্রান্তের মাঝামাঝি উপুড় করা মরিয়ম ফুলটি হঠাৎই চোখে পড়ে এনায়েতের। মরিয়ম মরুর দেশের ফুল। আসন্ন সন্তান সম্ভাবা নারীদের প্রসব বেদনা উপশমের আশায় এই শুকনো ফুল পানিতে ভেজানোর সংস্কারের কথা সে জানে, দেখেছেও অনেকবার।'[৪৩]

এরপরই লেখক এনায়েতের পদ্মাদর্শন এবং পদ্ম নদীর ইতিবৃত্ত সন্ধানে চলে যান। কিন্তু ঘটনার বিবৃতি মাত্র নয়, কাহিনী ধীরে ধীরে ক্লাইমেক্সে রূপ নেয়। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং কতকগুলো টাউট কালোবাজারীর প্রত্যক্ষ সংঘাতের রূপ নিয়ে নির্মিত হয়েছে কাহিনীর অবয়ব। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নদীর ঘাটডাক নিয়ে। হরিশংকরপুর ও পিরিজপুর ঘাট ইজারার প্রতিযোগিতায় টেপন মেম্বার ও আনিকুলের দ্বন্দ্বের টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ডিউক নামক এম.এ. পাশ শিক্ষিত যুবকের নামও আলোচিত হয়। গ্রাম্য দলাদলি ও চেয়ারম্যানের কুমতলবের পাশাপাশি ডিউকের তৃতীয় শক্তিরূপে আবির্ভাব। কিন্তু লক্ষণীয়, এদের কারও মধ্যে দেশপ্রেম বা সুস্থমূল্যবোধ নেই। ডিউক শিক্ষিত যুবক হয়েও প্রথমে অজ্ঞাতে চোরাকারবারীর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরে সচেতনভাবেই এই পথেই বিচরণ করে। অন্যদিকে, ইউপি চেয়ারম্যান স্বস্ত্রীক হজ্ব করে এসেও এই অপরাধ জগতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেনি। ঔপন্যাসিক টেপন মেম্বার ও আনিকুলের মধ্যে ব্যক্তিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে এদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতদুষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তির ইঙ্গিত দিয়ে মূলত গ্রামীণ ও জাতীয় রাজনীতির দুষ্টচক্রটিকে চিহ্নিত করেছেন। আনিকুল তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের আত্মীয় প্রতিমন্ত্রীর আর্শিবাদে উচ্চ ডাকে পদ্মার ঘাট ইজারা নেয়। বিরোধীদলের সমর্থনপুষ্ট টেপন মেম্বার অনেকটা পরাজয় মেনেই ফিরে আসে। কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় ঘাটের ডাক দশগুণ বেড়ে যায়। বলাই বাহুল্য, আনিকুল প্রতিমন্ত্রীর আর্শিবাদপুষ্ট হয়ে পলিস্টার কাপড়, সোনা, ভিসিআর ফ্রিজসহ আরো অনেক দ্রব্য চোরাচালানের মাধ্যমে মূলত মুনাফা অর্জন করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, পদ্মার ওপার থেকে আসবে শাড়ি, লুঙ্গি, চিনি, গরু, হেরোইনসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি। এসবের সঙ্গে যুক্ত চোরাকারবারী ও মাঝিদের কাছ থেকেও আনিকুল লাভ করবে প্রচুর অর্থ। কিন্তু আনিকুলের লাভের আশা বিয়োগে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই গোদাগাড়ি বিডিআর ব্যাটলিয়নের দায়িত্ব নিয়ে আসেন নতুন আর্মি অফিসার মেজর এটি। ওপারে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে সীমান্ত সীল করা হয়েছে। বিডিআর এবং বিএসএফ দুইপারের সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতো টহল জোরদার করে। তবুও চোরাচালান বন্ধ থাকে না। চরাঞ্চলের পুরুষরা বেকার হলেও মেয়েরা বডিফিটিং ব্যবসা চালায়। শরীরে চার পাঁচটি দামী শাড়ি পেচিয়ে গোদাগাড়ি থেকে রাজশাহী মহাজনের আড়তে চালান করে দেয়। শাড়ি প্রতি তাদের পারিশ্রমিক পাঁচ টাকা। দিনে কেউ কেউ তিন চারবার যাতায়াত করে রাজশাহী থেকে গোদাগাড়ি। তবুও মেজর এটির দৃষ্টি এড়াতে পারে না। একদিন ঠিকই ধরা পড়ে রাঢ়বঙ্গীয় এক পেশীবহুল রমনী। রমনীর উরুসন্ধি উন্মোচন করে মেজর এটি। জনসমক্ষে বেআব্রু করে উন্মুক্ত নীলপাছায় শপাং শব্দে গর্জে ওঠে মেজর এটির হাতের বেত।

> ''কিন্তু পদ্মাপারের মেয়েটি অত্যাচারের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল মেজরের। তার রাঢ়বঙ্গীয় পেশীবহুল শরীর পদ্মার উন্মুক্ত হাওয়া বর্ষা কী চৈতে অকৃপণ সপ্রামের তেজ ধার দিয়েছে, তার নীল চামড়ায় তা নিয়েই সে ফুসে ওঠে, 'হামরা কি করবো তাহলে? না হলে হামাক তোমার সাথে লিয়া চল, হামাকে বিবাহ কর, ইসব হামি করব না।''[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে বর্ণিত হয় দারিদ্র্যের নান্দনিক প্রতিবাদ। ক্ষুধার নান্দনিকতায় ধরা দেয় অপরাধ জগতের সচিত্র প্রতিবেদন। স্বামী দুই নম্বরী ব্যবসা করতে গিয়ে পদ্মা নদীতেই বিএসএফের গুলিতে মৃত্যুবহরণ করেছে। তার মৃতদেহও উদ্ধার হয় নি। এখন প্রতিদিনই ক্ষুধা, ভাতশূন্য পাতিল ইত্যাদি অনুষঙ্গের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয় এবং ভাবে তার নিজের বাবাও এইভাবে সংসার যাপন করেছে। তার মা যা যা করেছে তার মধ্যেও গৌরবের কিছু ছিল না, তার স্বামী ছিল দুনম্বরী, তার হতে বাধা কোথায়। তারপর জুলেখা লালগোলার রসিক ঠাকুরসহ তার সম্মানিত অতিথিদের সামনে পদ্মার এপার ওপার দুই পারেই কাপড় তুলে দিয়েছে। তন্মধ্যে খিদিরপাড়ার অতিথি বুঝদিল লোক, জুলেখার পায়ের কড়ে আঙুল চুম্বন করে জুব্বার দীর্ঘ পকেট খামচে তার হাতে তুলে দেয় ত্রিমূর্তি আঁকা লালকটা নোট। মহাজনের মুখে পান মসলার তীব্র সুগন্ধি, সুগন্ধির সঙ্গে ঘামচোবানো শরীরের কুটগন্ধ দুয়ের সহ্য অসহ্যের মাঝখানে মহাজনের নেশা চুরচুর ভোল শোনে জুলেখা, 'তু বহুত কীমতি চীজ জুলেখা। ই শালা রসিক তুজকো তো পহচানা নেহী, ভেজ দিয়া মুজকো। ইশালা তুজকো লণ্ডীয়া বানা দেগা। কোই বাত নেহী, হামারা সাত কাল তুম খিদিরপুর যাওগে তুমসে হামারী রানী বনকে রহগী।'[৪৫] অন্যদিকে, প্রগলভ নারী নাইমা যে পেটের ক্ষুধার পাশাপাশি দেহের ক্ষুধা নিয়েও অফিসার এনায়েতের বাসার ঝি–এর কাজে গিয়েছিল; এনায়েত তার উদরপূর্তি করলেও জৈবিক সুখের প্রতি বিমুখ থেকেছে রুচিবোধের বৈদগ্ধতা এবং নীহারের প্রতি প্রেমের পবিত্রতার কারণেই। অথচ বাদশাহ শাহজাহান তার কর্মস্থলে কত অফিসারকে কত কিছুই না সাপ্লাই দিয়েছে। মেয়ে মদ থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছুই। নাইমাকেও এমনই উদ্দেশ্য উপঢৌকন দিয়েছিল সে। কিন্তু অন্যরকম অফিসার। একথা বোঝার পর নাইমা ফিরে যায় তার আদিম ব্যবসায়। চোরাচালানের জগতে তারও অবাধ বিচরণ। বস্তুত, নাইমা চরিত্রে লেখক এক ধরনের মর্বিডিটি বা পারভাসন চেতনা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আলোকে অবলোকন করেছেন। নাইমার সঙ্গমকাতরতা মূলত অর্থনৈতিক ও জৈবিক দ্বৈত সত্তায় উজ্জল হয়ে উঠেছে। কাজেই এনায়েত বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে এসে পদ্মাপারের এই নিষিদ্ধ জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার নির্মম অভিজ্ঞতা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু ডিউককে নিয়ে। কর্মস্থলে এসে একদিন দেখা হয় ডিউকের সঙ্গে। সে এই পদ্মাতীরের যুবক। ডিউক চোরাচালানের শেষ এসাইনমেন্টের কালো রাত্রিতে বিডিআরের গুলিতে নিহত হয়। অথচ সামাজিক ও চাকরির পদমর্যাদার কষ্টকর শৃঙ্খলের বৃত্ত ভেঙে এনায়েত ডিউকের রক্তমাখা দেহটা একবার স্পর্শ করতে পারে না, অথচ মৃত্যুর পূর্বদিনও তারা এক টেবিলে খেয়েছিল, এক শয্যায় শুয়ে জীবনের বিভিন্ন গল্পে পরস্পর অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এনায়েত যখন আত্মদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত, তখন নীহারের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চারবছরের বিরহের অবসান ঘটিয়ে সেইদিন এনায়েতের মাথায় স্নেহে হাত রাখে। নীহারের আদর পেয়ে এনায়েতের দু'চোখে জল আসে। সন্ধ্যার মুখোমুখি তারা যুগল পদক্ষেপে আবার সেই মরিয়ম ফুলটির কাছে এসে দাঁড়ায়। বন্ধুর মৃত্যুতে এনায়েত কোন সামাজিক শোক প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, একথা সর্বজনবিদিত ডিউক কালোবাজারী করতে গিয়ে বিডিআরের গুলিতে নিহত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তার পদমর্যাদার অলংকার পরে এনায়েত দূর থেকে অপরাধী বন্ধুর জন্য কেঁদেছে। আর মরিয়ম ফুলের সামনে এসে তার মনে হয়েছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

> আবার কবে পদ্মায় জল আসবে, এই মরিয়ম ফুলটি ডুবিয়ে দেবে তার আনন্দিত জলধারায়; পদ্মাপারের কোন মেয়ে জন্ম দেবে আর এক ডিউক–পুলিশ বিডিআর বা আততীয়র মতো কারোর গুলিতে যার কলিজা বিদীর্ণ হবে না; অথচ ভালবাসবে পদ্মার জল আর পদ্মাপারের মাটি।[৪৬]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মরিয়ম ফুলের প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় লেখক মূলত জীবনের সদর্থক অভীপ্সাকে উজ্জল করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে উপন্যাসের 'Chronotope values' সম্পর্কে লেখকের স্বজ্ঞান বিশ্লেষণও তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। পদ্মাপারের দুই তীরের জনপদে কেন এই অন্ধকার নিষিদ্ধ জীবনের হাহাকার? শিক্ষিত যুবক ডিউকের সচেতন বিশ্লেষণী বীক্ষণে চিহ্নিত হয় সেই সমস্যা। ফারাক্কার প্রকোপে নদীর নাব্যতা কমে সৃষ্টি হয়েছে মরুর মতো বিশাল চর। ফলে, কৃষিভিত্তিক জীবিকার প্যাটার্ণ বদলে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। ক্রমাগত দারিদ্র্য গ্রাস করে সমস্ত জনপদ। তাই–

> 'পদ্মা মহানন্দার দু'তীরের মানুষের দিকে এখন আর তাকানো যায় না। হতশ্রী দারিদ্র্যের থাবালিপ্ত, পোড়া কুঞ্চিত চামড়ার নিচে টান টান বাঁধানো অস্থি কঙ্কালের কাঠামো। জল হারিয়েছে প্রথমে, জলের কারণে মাটির ভ্রূণ, সবশেষে মাটির জীবন্ত কোষ। মাটির কারণে সবুজ ফসল, সবুজ ফসলের কারণে বিত্ত–বেসাত। বিত্তের কারণে চরিত্র, সম্মান। পদ্মাপাড়ের মানুষেরা এখন লাফাঙ্গা, কালোবাজারী, দুই নম্বরী।'[৪৭]

বস্তুত, পদ্মাপারের মানুষের এই জীবনসংকট নিঃসন্দেহে একটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা। সচেতন যুবক ডিউক তো স্পষ্টই উপলব্ধি করেঃ 'পদ্মাপারের মূল সমস্যা চোরাচালান নয়। এটা একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা, যেটার সমাধান করতে সরকারগুলো ব্যর্থ হচ্ছে।'[৪৮] একজন মেজর এটি স্ট্রীমরোলার চালিয়ে কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে? লক্ষণীয়, ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে দুই দেশের জলভাগাভাগির খেলা চলছে প্রায় তিন দশক ধরে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমস্যায় ও প্রকোপে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ দুই জনপদেরই জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে ক্রমগত। ক্রমেই দারিদ্র্যের নিকষ কালো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে এই জনপদ। এই অঞ্চলকেন্দ্রিক অন্যান্য উপন্যাসের মতো ঔপন্যাসিক সিরাজুল ইসলাম মুনীর এই সমাজসত্যটি তার মেধানুগত শিল্পনৈপুণ্যে উপস্থাপন করেছেন পদ্মা উপাখ্যানেও। বিশেষ করে ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার, লোকজ ভাষার প্রয়োগে তিনি সফল হয়েছেন। তবে ফোক মোটিফের দিকে অনুসন্ধিৎসু হলে চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, জনপদের ব্যবহারই কেবল সাহিত্যের উৎকর্ষের একমাত্র উপাদান নয়। প্রত্যেক লেখকই নিজস্ব সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে থেকেও বিশ্বজনীন হয়ে ওঠেন সাহিত্যে চিরকালীন মানবিক আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে। আমাদের সমাজজীবনবাদী কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের সীমিত জনপদে 'পদ্মা উপাখ্যান' দাঁড়াবে, কিন্তু সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করবে এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবু পদ্মা নদীর পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসটি বিষয়গৌরবের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। কারণ, এই উপন্যাসে কেবল আঞ্চলিকতার আবহ নেই, মর্মমূলে আছে রাষ্ট্রীয় তীব্র সংকটের কথাও।

উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে নদীকেন্দ্রিক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশাল ক্যানভাসে ঔপন্যাসিক স্থানিক বর্ণিমা ও ছবি আঁকতে পারেন। ছোটগল্পের পরিসর ছোট হলেও স্থানিক পটভূমিরূপে বিল ও নদী কেন্দ্রিক জীবনের স্বল্পায়তনের মধ্যেও বৃহৎ ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিল ও নদীকেন্দ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও আলিঙ্গিত হয়েছে এই জীবনধারা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, কবি ও কথাশিল্পী আবুবকর সিদ্দিকের (১৯৩৪) 'চরবিনাশকাল' (১৯৮৭),'বাইচ' (২০০১) গল্প দুটোর কথা। মহানন্দা ও পদ্মানদীর পটভূমিতে লেখক গল্প দুটি লিখেছেন। 'চরবিনাশকাল' গল্পে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানব মানবীর নষ্ট জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক শেষপর্যন্ত কুহক বা যাদুবাস্তবার আশ্রয় নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের বাদাবন অঞ্চলের এক কারখানা শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গের নবাবগঞ্জের মহানন্দা নদীতটে বকরীডাঙ্গা গ্রামের পাঁচবিবি ফিরে আসে নয় বছর পর। দীর্ঘ নয় বছর সে আরিচা ঘাটে পতিতাবৃত্তি করে এই শ্রমিকনাগরকে নিয়ে আসে নিজ এলাকায়। ট্রেন থেকে নেমে নবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী টমটম গাড়িতে আসে মল্লিকপুর পর্যন্ত। পাশে মহানন্দা নদীর ঘাট। বিশাল আমবাগান মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। খেয়াঘাটে মাঝিমাল্লার দৃশ্যপট। 'নদীর ওপারে বারুনীর মেলা মিলেছে। ঢোলবাঁশি কোলাহল জল ছাপিয়ে এপারে ভেসে আসছে।' এখানে ভগ্নভিটায় পাঁচবিবি খবর পায় তার পিতৃমাতৃ বিয়োগের। বুড়ি খুলে বসে গল্পের ছাপিঃ

> গ্যালো সোনের আগ্‌কার সোন। আ-ঘোন মাস ত্যাখুন। ঠিক সন্‌ঝে লাগ্যা গেলছে। গন্‌জের ঘাঁটা ঠান্‌ঠা হয়্যা আইস্‌ছে। হাটুয়ারা ক-খুন ঘরে ফির‍্যা গেলছে। হামি বুলে ত্যাখুন জ্বরে কাঁপতে লাগ্যাচি। পুরী বুঝিন উদিকে চুলায় ভাত চাপায়্যা বস্যা আছে। উত্তরের লদ্দী টপক্যা ল্যাণ্ড়ার ডালপালা মাড়্যা দিয়্যা কহছিল আয়! সন্‌ঝেতারা চুপি চুপি ডাক্যা কহছিলো, আয়! পরী আর পুরীতে নাই ত্যাখুন।[৪৯]

পাঁচবিবি তার মা পুরীর মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা শোনে। শ্রমিকনাগরকে দেখায় আমবাগান আর সম্পদ প্রাচুর্যের লোভ। কিন্তু লোকটি এক সময় মুক্তির নেশায় পথ খোঁজে। আমবাগানের অন্ধকার মাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আধাচেতন মানুষটা নদীর তীরে এসে পড়ে। ... পাড় ধরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লোকটা তাড়া খাওয়া মোষের মতো ছুটে চলে, ও মাজিবাই আমারে লইয়া যাও গো! ও মাজি বাই কতা নি হোনো![৫০] ওপারে মেলায় যেতে চায় লোকটি। কিন্তু নৌকার মাঝি স্রোতের টানে ভাসিয়েছে নৌকা। নৌকার ছইয়ের ভেতর লাশের স্তুপ দেখে লোকটি আর্তনাদ করে ওঠে। 'কিন্তু'-বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ ছাপিয়ে নদীর জল খলবল খলবল করে হেসে ওঠে।[৫১] বস্তুত চরবিনাশকাল গল্পে লেখক ঐন্দ্রিয়তাড়িত বিপন্ন মানুষের অবচেতন সত্তার আশঙ্কাকে প্রতীকময় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু পটভূমিরূপে প্রকৃতির রুক্ষ ও ভয়ার্তরূপটিও এঁকেছেন দক্ষশিল্পীর হাতে। বিশেষ করে, নদী ও আমবাগানের পটভূমিতে লেখক মানবজীবনের অন্ধকারসুড়ঙ্গের অতলান্ত রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে বরেন্দ্র ভূমির রুক্ষ প্রকৃতি আর দারিদ্র্যমলিন জীবনের অবক্ষয়ের চিত্রগুলো হয়ে উঠেছে নির্মম ও বাস্তব।

আবুবকর সিদ্দিকের 'বাইচ' গল্পটিও পদ্মা নদীর পটভূমিতে রচিত। 'বাইচ' আবহমান বাংলার নদীকেন্দ্রিক জীবনের চিরপ্রচলিত লোক-উৎসব। লেখক এই উৎসবকেন্দ্রিক গল্পের আবহে রাষ্ট্র রাজনীতি ও গণমানুষের দ্রোহী চেতনার ছবি এঁকেছেন। গল্পের কেন্দ্রভূমি রাজশাহীর পদ্মানদীর তীরবর্তী গোদাগাড়ি বাসুদেবপুর অঞ্চল। প্রাচীনকাল থেকে বাসুদেবপুর ঘাটে প্রজন্ম পরম্পরায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে নৌকা বাইচ। আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে পদ্মা নদীর ঘাটে মানুষের ঢল আসে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী চরবাসুদেবপুর ও মহিষালবাড়ি এবং অন্যান্য গ্রামের মাঝিদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। মেম্বার, চৌকিদার এবং উপস্থিত হয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা। সব মিলিয়ে জনতার উপচেপড়া আগমনের প্রচ্ছদপটে গল্পকার একদিকে পদ্মার রূপতরঙ্গ, অন্যদিকে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের ভাড়ামি বয়ান করেন কুহকবাস্তবতায়। গ্রামের উপচে পড়া নরনারীর জৈবিক বাইচও প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে এই নদীতীরে।

> এইবার দৃশ্যই মুখ্য। সে দৃশ্যের আঘাতে খান খান আবহমান নীরবতা। ... অবশ্যই এই আদিমতা আজও অক্ষতযোনি। তত্রাচ দূষিত ও নষ্টপ্রায় দ্বিরাচারী দারিদ্র্যে। বিশেষ বিক্ষত যন্ত্রনখে। এখন আবার সেই দেহসমাজ বলীয়ান ছন্দ পেয়ে সরল ডাইমেনশনে নৃত্যপর। দেড়-দু'শো হাত লম্বা বাড়াচি। কুচকুচে কালো। ধারালো তরবারির মতো একটানা দাগের পোঁচে পানির মাংস কেটে ছুটে আসা কান্ডখানা। প্রায় সোয়াশো বৈঠার হাত, অস্ত্রের মতো সমতলে ওঠাপড়া। .. প্রথম যে নৌকোটা সে বড় একা ডাকাবুকৌ বাকি নৌকোগুলো ঢের তফাতে। পাশাপাশি পাল্লায় খেপে মেতে এগুচ্ছে। তিন-চারটের মিশে বিশাল লম্বা কালো লাইন।[৫২]

কিছুক্ষণ পরেই মাইকে শোষিত হয়, 'চরবাসুদেবপুর ফাস্ট। মঈষালবাড়ি শেকেন। থাড আষাঢ়িয়া দহ। প্রাইজ দেবেন জেলা সদরের টিশি শায়েব শয়ং।'[৫৩] মাঝিদের মাঝে উৎসব পড়ে যায়। রেডিও পত্রিকার সাংবাদিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে মাঝিদের প্রধান আইনুদ্দি মাতব্বরের। আইজুদ্দি মাতব্বর শ্রেণী সচেতন। রেডিও টেলিভিশনের সাংবাদিকদের কথায় তুষ্ট নয়। তার শ্রেণীবাদী চেতনায় প্রকাশ করে ক্ষোভ। এমনকি, জেলা প্রশাসকের নিকট প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়েও। আইজুদ্দি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বলে- 'ই ফাঁকিজুখির কাম লয়খ হুজুর। কলস কুনঠে কলস?' কলসের পরিবর্তে তারা টার্কিশ টাওয়েল নেবার পক্ষপাতি নয়। গর্জে ওঠে মাঝির দল। গর্জে ওঠে লশকরহাটির লেঠেল আহাদালী মাতবর। আইজুদ্দি বলিষ্ঠ দেহে মাথা উচু করে মাইকে ভাষণ দেয়। জেলা প্রশাসক স্থানীয় চেয়ারম্যান পুলিশ প্রশাসন তাকিয়ে দেখে 'সারি সারি লাল নিশান পৎ পৎ উৎসাহে জয়বার্তা জানান দ্যায়... চরাচর জনপদে যূথজীবনের ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে... কৌম সমাজের প্রতিটি কোঠা।'[৫৪] মূলত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ দ্রোহী চেতনাকেই লেখক এই গল্পে উদ্বোধিত করেছেন।

শওকত আলীর 'ভবনদী' অনুরূপ নদীকেন্দ্রিক ছোটগল্প। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের টাঙ্গান নদীর পটভূমিকে এই গল্পে তিনি অবলম্বন করেছেন। এখানেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের শ্রেণীসচেতন জীবন অভীপ্সা। নিম্নবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। ফলে শওকত আলীর গল্পে আঞ্চলিক জীবনের চিত্র নানাভাবেই ফুটে ওঠে। 'ভবনদী' গল্পে নসরদ্দিন সাধারণ কৃষক। টাঙ্গোন নদী ও বন্যাকবলিত মাঠ পেরিয়ে মহাজনের বাড়ি যায় ঋণের আশায়। যেতে যেতে শিবদাস ঠাকুরের গান মনে পড়ে 'দিন গেল সন্ধ্যা হইল, ইবার হবি ভবনদী পার।' বন্যার জলে সোনালী সুতোর মতো জোঁকের আক্রমণ রক্ষা করে হাজি মহাজনের বাড়ি পৌছে। হাজি মহাজন তখন 'নূহ নবীর কাহিনীর সেই ভয়াবহ বন্যা নূহ নবী কিভাবে পুত্রকে ত্যাগ করলেন'- তার বর্ণনা দিয়ে যান উপস্থিত শ্রোতার উদ্দেশ্যে। কৃষক উমরালি মুমূর্ষু পুত্রের চিকিৎসার জন্য অর্থ কর্জ করতে চায়। কিন্তু মহাজন তখন তসবিতে মনোযোগ দেন। শেষে দোয়া লেখে দেন পুত্রের আরোগ্যের জন্য। এক সময় মহাজন বাড়ির অন্দরে চলে গেলে আধিয়ার কৃষাণেরাও ফিরে যায় নিজ নিজ বাড়ির দিকে। নসরদ্দিনও আবার ফিরে আসে।

> নসরদ্দিন ঘাটে এসে ভবনদী নয়, টাঙন নদী দেখে। দেখে ধারণা হয়- ভবনদী বুঝিবা এই রকমই উত্তাল বুঝিবা এই রকমই বিশাল। ভবনদী এবং টাঙন একাকার হয়ে যেতে থাকে তার

Dhaka University Institutional Repository

> চোখের সামনে। .. বন্যায় উত্তাল টাঙন নদীর ঘোলা পানি পাক খেয়ে খেয়ে কেমন তীব্র স্রোতে বয়ে যাচ্ছে তাই দেখতে পায় সে। বাঁয়ে বিস্তৃত জলরাশি কেবলি চকচক করছে– কিন্তু ডাইনে দেখো ভিন্ন দৃশ্য। সেদিকে কামারডাঙ্গার মাঠ, সেই মাঠের ভেতরে উঁচু দুই পাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকেছে সেই বিস্তৃত জলস্রোত। জলস্রোত এবং কঠিন মাটির তমুল লড়াই হচ্ছে সেখানে বোঝা যায়। থেকে থেকেই নদীর ক্রুদ্ধ গর্জন গোঁ গোঁ করে উঠছে। নদীর স্রোতের মাথায় শাদা ফেনা ভাসতে ভাসতে ছুটে যাচ্ছে দূর থেকেও নজরে আসে পানির রং ঐখানে দারুন সর্পিল।[৫৫]

নদীর রূপ দেখে নসরদ্দিন উদাসীন হয়ে পড়ে। আবার মনে পড়ে শিবদাস ঠাকুরের গান। জীবন–সংসার সবকিছুই তার কাছে মনে হয় ভবনদীর মতো জটিল এবং সংক্ষুব্ধ। 'সংসারও তো নদীরই মতোন– সাধ বলো, বাসনা বলো, সুখ বলো দুঃখ বলো– সবই তো বহে যায়।[৫৬] আমশায় রোগে ভুগে তার কঙ্কালসার মেয়েটির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে রুগ্ন স্ত্রীর কথা। নসরদ্দিনের চোখে ভবনদী আর টাঙনে কেবল ঢেউ তোলে ঘোলাজল। কিন্তু নদীর ভাটিতে চর জাগলে মহাজন সে চর দখল করে আবাদ বসায়। অন্যদিকে নদী কিষাণের পাড়া ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জলের এই ভিন্নমুখী আবরণে কেবলই তার মনে পড়ে শিবদাস ঠাকুরের গান। নসরদ্দিন উদাস দৃষ্টিতে দেখে দিবাবসান। কিন্তু টাঙনের প্রবল স্রোতে নসরদ্দিনের সামনে ঘটে যায় এক বিস্ময়কর ঘটনা। হাজি মহাজনের কন্যাপুত্র শহর থেকে গ্রামে ফেরার পথে টাঙনের ঘাট পেরুতে গিয়ে হঠাৎ জলের প্রবল তোড়ে ভেসে যেতে অদৃশ্য হয়ে যায়। নসরদ্দিন তখন শিবদাস ঠাকুরের গানটি বেশ স্পষ্ট শুনতে পায়। মূলত এই গল্পে শওকত আলী একদিকে লৌকিক দর্শন অন্যদিকে ধর্মীয় মিথের আবহে সমাজের নিষ্ঠুর সত্য রূপটি প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। হাজি মহাজনের বয়ানসূত্রে নূহ নবীর পুত্র ত্যাগের ঘটনা আলেখ্য এই গল্পে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায়। লক্ষণীয়, শওকত আলী সামাজিক ব্যঙ্গারচনায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য গল্পেও এই ধরনের ব্যঙ্গও প্রকাশ পেয়েছে।

আখাতরুজ্জামান ইলিয়াসের 'পায়ের নিচে জল' উত্তরবঙ্গের নদীকেন্দ্রিক অন্যতম একটি গল্প। যমুনা নদীর ভাঙন কবলিত জনপদের অস্তিত্ব বিপন্নতার চিত্র এই গল্পের বিষয়। গণজীবনের প্রতি ইলিয়াসের অপরিসীম মমত্বের পরিচয়ও এ গল্পে পাওয়া যায়। শ্রমজীবী জনজীবনের অস্তিমজ্জা ও সংস্কৃতির স্বরূপটি ইলিয়াস উপলব্ধি করতেন একান্তই হৃদয় দিয়ে। তিনি 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধে বলেছিলেনঃ 'কয়েকটি সাম্প্রাতিক বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এঁদের দারিদ্র ও বঞ্চনার কথাও কারো কারো লেখায় সার্থকভাবে এসেছে। কবিতায় নিম্নবিত্তের শোষণ ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এইসব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নিম্ন–মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করেছে, মধ্যবিত্ত সংস্কার ও খাটো বাসনা ঝেড়ে ফেলে বামপন্থী রাজনীতির বন্ধুর পথে তাঁদের পদচারণা ঘটেছে। কিন্তু ঐসব সাহিত্য ও শিল্পকর্মে নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় না। তাহলে এসব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নিম্নবিত্তের জীবনকে স্থিরচিত্রের বেশি মর্যাদা দেই কি করে?'[৫৭] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের মেরুদণ্ডের ওপর ভর করে দাঁড়নো শহুরে জীবনের মেকি মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্য ক্ষতটিকে চিহ্নিত করেছেন। সত্যিকার অর্থে বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনিই যথার্থভাবে নিম্নবিত্ত জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়সহ মধ্যবিত্ত ও

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চবিত্তের চোরাগলির ওপর আলো ফেলেছেন। সেই দিক থেকে ইলিয়াসের 'পায়ের নীচে জল' একটি সার্থক সৃষ্টি। গল্পের পটভূমি যমুনার চরাঞ্চল। নদীভাঙন আর বন্যাতাড়িত বিপন্ন গ্রামের মানুষগুলো যখন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ওয়াপদার বাঁধে জমায়েত হচ্ছে, তখন দেবাডাঙার আলতাফ মৌলভীর অবস্থান তাদের প্রতিপক্ষরূপে। গ্রামীণ সমাজের একজন গণবিরোধী চরিত্রের ভূমিকায় ইলিয়াস তাঁর স্বরূপ তুলে ধরেছেন। গৃহহীন, ভূমিহীন বিপন্ন মানুষগুলো বাঁধে যেন আশ্রয় না নেয়, তাতে বাঁধ ভেঙে গেলে সোনাতলা থাকবে না, সবগ্রাম, ধানী জমি, পাটক্ষেত, স্কুলের পাকাঘর, থানা অফিস, নতুন সার্কল অফিস, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ইউনিয়ন কাউন্সিলের টিনের ঘর সব যমুনার জলে ভেসে যাবে। কারণ সেখানে তো এমনই লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, 'যমুনা বড় গাঙ, ব্রহ্মপুত্রের পরিবার। ময় মুরব্বি কইছে, যমুনার সাত স্রোত, উনপঞ্চাশ তরঙ্গ– তো তার খোরাক লাগে না? ভাঙনগ্রাসী যমুনার খোরাক জোগাতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন, কর্মহীন নিরন্ন জীবন যাপন করছে বাঁধের ওপর। তাই এলাকার বিত্তবান আলতাফ মৌলভীকে পেয়ে বাঁধেই লোকজন ছুটে আসে– কর্মের আশায়, খাদ্যের আশায়। কিন্তু আলতাফ মৌলভী তাদের ধমক লাগায়–

> ''আল্লায় তগো এক ছটাক বুদ্ধি দেয় নাই, জাহলে কর্যা রাখছে। কও তো জাহেলে জানোয়ারে তফাৎ কী? কও যে। নিজেই এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে একটু দাঁড়ান, 'না জাহেলের পাও দুইখানা কম, সেদিক দিয়াও তরা কমই আছস। তিনটা বছর তরা বান্দের উপরে বসত করস, আরে, বান্দ ভাঙলে গরমেন্টের কি রে? যমুনা যদি একটা ছোবল মারে তো থানা এটি থাকবো? সোনাতলাও তুল্যা দিয়া যাবো না?''[৫৮]

আলতাফ মৌলভীর আসল ক্রোধ অন্য কারণেও। তার হাসখালির বর্গদার ফরু প্রামাণিক, সোয়াবিঘা জমি বিক্রি করে বাঁধে উঠে এলো অথচ তাকে জানালো না পর্যন্ত। সেখানে তার তিনবিঘা জমির সঙ্গে গোপালভোগ আমের বাগানটা বেশ হতো। এই নিয়ে তার ক্রোধের অন্ত নেই। কিন্তু এইবার সে করিম সাহেবের পুত্র আতিকদের জমি হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। ঢাকায় গিয়ে করিম সাহেবের স্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করেছে জমি তার কাছে বিক্রির জন্যে। ছেলে মিডিলইস্টে চাকরি করে। নব্যধনিক আলতাফ মৌলভী তাই আতিককে সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের বর্গাদার কিসমিত সাকিদারের বাড়ি। আতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজির ছাত্র। এখন তারা সপরিবারে ধানমন্ডিতে থাকে। ধানমন্ডির বাড়ির তিনতলা, গুলশানে নতুন বাড়ি, তার ভাইয়ের বিদেশে পড়তে যাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাতে গ্রামের জমি বিক্রি করতে আসে। সে জমি কিসমত সকিদাররা প্রজন্ম পরম্পরায় বর্গা করে আসছে। এই জমি আর করিম পরিবারের সঙ্গে আছে তার অনেক মধুময় স্মৃতি। কিসমত সাকিদার ও ছেলে আকালুর ব্যবহার আপ্যায়নে আতিক জমি বিক্রির কথা বলতে পারে না। এক ধরনের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় আতিক ফিরে যায় শহরে। ওদিকে ভাঙনপ্রবণ যমুনা প্রতি মুহূর্তে তেড়ে আসছে জনপদের দিকে। মূলত প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ও সমাজের শোষণ প্রক্রিয়ার জটিল গ্রন্থিতে লেখক বর্ণনা করেছেন বিত্তহীন ও বিত্তবান মানুষের দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াগুলো। গল্পটির মূল্যায়ন করে সমালোচক লিখেছেনঃ

> শোষক এবং শোষিতের একটা দ্বন্দ্ব চলে। ক্রমাগত এ মানুষগুলো একদিকে যেমন নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি দু'একজন মানুষ ফুলে ফেঁপে ওঠে সমাজ প্রতিভূতে পরিণত হচ্ছে। আখতারুজ্জামান গল্পের মধ্যদিয়ে মেসেজ প্রদান করতে গিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের গ্রামকে দেখান, সেখানে বুর্জোয়া শোষক গোষ্ঠীর হাত থেকে কিছু সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছতে আরম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে; একটু আধটু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছে অশিক্ষিত গ্রামের ভূমিহীন মানুষ, বাঁচার স্বপ্নকে বাস্তবের আধারে বাঁধতে চাইছে খুব ক্ষীণভাবে। গ্রামের এ মানুষগুলো বন্যা, খরায় অভ্যস্ত; তাদের চেহারায় পড়ছে পুষ্টিহীন অবসাদগ্রস্ততার ছাপ। এ ভূমিহীন অসহায় মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনবোধে লেখকের কলম দারুণ সোচ্চার।'[৫৯]

নদী ভাঙনে ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষের রূঢ়বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায় মঞ্জু সরকারের 'আমৃত্যু আকালু' গল্পে। নদীভাঙনে বাস্তহারা আকালু অন্যান্যের মতো আশ্রয় নেয় বাঁধের ওপর। বাঁধের দুই তীরে গড়ে ওঠে ঝুপড়ি ঘরগুলো। আকালুর ঘরের ছাঁদ ও বাঁধের উচ্চতা প্রায় একই সমতলে। কিন্তু আকালু ঘুমায় বাঁধে। স্ত্রী তিস্তাবিবি একমাত্র ছাগল নিয়ে ঝুপরিতে থাকে। বাঁধে শুয়ে শুয়ে আকালু আল্লার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে– ''সব হারাইয়া রাস্তার ফকির হইলাম। নদী যদি আর না জাগে, এত বড় দুনিয়াটায় তুই কি হামাক সাড়ে তিন হাত মাটিও রেজিস্ট্রি করে দিবু না হে খোদা?'[৬০] নদীরসঙ্গে জড়িয়ে আছে আকালুর জীবনের মর্মান্তিক স্মৃতি। নদীচরে তার ফসলের ক্ষেত, বাড়ির পাশে কলাবাগান, গাইগরু, খড়ের পালা, স্ত্রী তিস্তাবিবি আর পুত্র সান্টুর স্মৃতি তাকে জড়িয়ে থাকে। নদীতে ভিটেমাটি বিলুপ্ত হবার পরও চরের মাটিতে তার জীবন কেটে যাচ্ছিল বেশ। লেখকের বর্ণনায় ঃ

> নদী ভিটে–মাটি গিলে খাওয়ার পরও চরেই পরের জমিতে ঘর তুলে ছিল আকালু, সান্টু সেখানেও হেসেখেলে বড় হচ্ছিল। গেলবারের বড় বন্যায় সেই যে আরো অনেকের সঙ্গে বাঁধে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তারপরই বাঁধই হয়ে উঠেছে আকালুর ঘরবাড়ি। বন্যার সময়ে সরকারি রিলিফ না পেয়েও আকালুর সন্তান হাসিখুশি নিয়ে টিকে ছিল, কিন্তু সরকারী বাঁধে ঘর তোলার সাতদিনের মাথায় মাত্র তিনদিনের জ্বরে প্রলাপ বকতে বকতে মরে গেল ছেলেটি।[৬১]

এমন এক পোড়খাওয়া মানুষের জীবনে এক রাত্রিতে ঘটে যায় সব চেয়ে ভয়ংকর ঘটনা। গভীর রাত্রিতে বাঁধের ওপর ঘুমন্ত আকালুকে জাগিয়ে দুই যুবক জানতে চায় আকালুর বউ কোন ঘরে ঘুমায়। আকালুর সঙ্গে আলাপ হয়। প্রতিশ্রুতি পায় আকালু। বন্যাপীড়িত মানুষের তালিকায় আকালুর নাম এক নম্বারে থাকেব। তাকে ও তার স্ত্রীকে দেয়া হবে বেশি রিলিফ। আকালু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের কথা শুনে। একজন যুবক তৃষ্ণার জল খুঁজতে নেমে যায় বাধের নীচে আকালুর ঘরে। স্ত্রী তিস্তাবিবি সম্ভ্রম রক্ষার্থে চোর চোর করে চিৎকার করে। আগন্তুক যুবকদ্বয় চলে যায়। যাবার কালে শাসিয়ে যায় আকালুকে। গ্রাসবাসী ছুটে আসে। এই নিয়ে তৈরি হয় অনেক রহস্যময় গল্প ও ঠাট্টা রসিকতা। কিন্তু রাত ভোর হলে দেখা যায় আকালু রহস্যজনকভাবে মরে পড়ে আছে ঘরে বাধা ছাগলের গুমুতের সঙ্গে মিলেমিশে। তিস্তাবিবি কান্না শুনে গ্রামবাসী বন্যার জল দেখার মত দলে দলে আসতে থাকে। মূলত এই গল্পেও মঞ্জু সরকার সমাজের শোষক শ্রেণীর ও নষ্টচরিত্রের একটি কদর্যরূপ তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে নদীভাঙনে বাস্তহারা মানুষের ছিন্নমূল জীবনের এক ভয়াবহ রূপ অঙ্কন করেছেন।

উত্তরবঙ্গের নদনদী ও বিল প্রভাবিত জীবনের অন্তরঙ্গ পটভূমিতে রচিত ভাস্কর চৌধুরীর গল্পসমূহও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর 'বেহুলা', 'গফুরের জীবনদর্শন' 'শত্রু', 'রক্তপাতের ব্যাকরণ' প্রভৃতি গল্পে নদী ও বিলের পটভূমি এবং জীবনের নানা মাত্রিক সংকট প্রতিফলিত হয়েছে। একজন বৃদ্ধমাঝির জীবন কাহিনী নিয়ে 'বেহুলা' গল্পটি রচিত। বেহুলা নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে আছে বিরুমাঝির জীবনযৌবন। যৌবনের প্রতিটি স্মৃতি নিয়ে বিরুমাঝি বার্ধক্যেও নৌকা চালায়। বারবার ফিরে যায় যৌবনের মুখরিত দিনগুলোতে। একদা ময়ুরপঙ্খী বলে খ্যাত ছিল তার নৌকা। বারঘরা ঘাট থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বটতলা হাটে যাতায়াতের জন্য ব্যবসায়ী মহাজন কিংবা হাটুরেরা তার নৌকার অপেক্ষা করত। এখন বিরুমাঝি বৃদ্ধ ক্লান্ত তাই বাতিল সবার কাছে। তাই মনে মনে ভাবেঃ

> নৌকো বেচবো হারাণের কাচে। ঘিনৃঘিনে দ্যাওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রোম উঠা কুকুরের মতন বইসে থাইকবো। কুঁই কুঁই কইরে কাইন্দবো। দু'ফোঁটা জল বকের মত বোজা বোজা চোখ হতে টলটলে বেহুলায় পড়ে।[৬২]

বিলপ্রভাবিত জনপদের এক ভিন্ন চিত্রপট ধরা পড়ে ভাস্কর চৌধুরীর 'শত্রু' গল্পে। লেখকের বর্ণনাঃ 'দক্ষিণের ধানী জমির বিস্তৃর্ণ মাট। আর একটু নীচুতে নামলে তালতলার বিল। এখন সেখানে মাঝারি জল। মাঠ থেকে সোজা সরু রাস্তা গাঁয়ের ভেতর উঠে এসেছে। ধূলোময়। তার দুই পাশে বসতি।[৬৩] তালতলা বিলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকার মৌসুমে শরু হয় লাঠিয়ালদের মহড়া। গ্রাম্য লেঠেল বাহিনী মোড়লদের পক্ষে জমির ধান জোরপূর্বক কর্তনের লড়াইয়ে সামিল হয়। পেশাগতভাবে তারা লাঠিয়ালি কোরে জীবিকা নির্বাহ করে। সেই সামন্ত জমিদারী আমল থেকে এই প্রথা এখনও গ্রামীণ সমাজে টিকে আছে। ভাস্কর চৌধুরী শত্রুগল্পে জহিরুদ্দি, সোনাদ্দি, ফজর প্রভৃতি লাঠিয়াল চরিত্রে এই আদিম পেশার এক নির্মম চিত্র এঁকেছেন। রাত্রির অন্ধকারে জমির ধান জোরপূর্বক কাটতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীর আঘাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে ফজরালি ও সোনাদ্দি। 'আবছা আলোতে দেখা যায় সোনাদ্দি আর ফরালির রক্তাক্ত দেহ আলের ওপর পড়ে আছে। লড়াই বন্ধ। রক্ত ছুটছে শুধু। জমির পাকা ধানের তলে তলে রক্ত জমে।'[৬৪] ভাস্কর চৌধুরী অনুরূপ জীবন অনুষঙ্গে লিখেছেন 'রক্তপাতের ব্যাকরণ' গল্পটিও। এই গল্পেও উত্তরবঙ্গের নবাবগঞ্জ অঞ্চলের বিল প্রভাবিত জীবনের পটভূমি লেখক অবলম্বন করেছেন। গল্পের শুরুতেই লেখকের বর্ণনা ঃ

> চ্যাপটা থালার মতন এই বিল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। লম্বা-চওড়ায় সমান। তার মধ্যাঞ্চল ভাঙ্গাচুরো। সেখানে জলের ধারা চিকচিক করে। তার চারদিক ঘিরে জমি। ঘন বাদামী ঘাসে এবং সবুজ ধানে সজ্জিত। উঁচু দিকের অর্ধেক তার গাঁয়ের সকল কিষাণের। বাকি অর্ধেক জমি রোস্তম সর্দার আর জয়নাথের। জমির উপর ঘিরে সবার বাস।[৬৫]

এই বিলের জমিতে ওরা ফসল ফলায়; এখানে গান হয়, উৎসব হয়, হয় লড়াই আর খুনোখুনি। জন্মমৃত্যুর যাবতীয় অনুষ্ঠান যেন এই বিলকে কেন্দ্র করেই প্রজন্ম পরম্পরা চলে আসছে। অতএব ঘটনা নিদ্বর্দ্ব নয়। দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দেখা দেয়। রোস্তম সর্দার ও জয়নাথ দুইজনই বিত্তশালী। তারাই গ্রামবাসীর ভাগ্যনিয়ন্তা। অন্যদিকে, প্রকৃতিও মাঝে মাঝে চলে যায় সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। বৈশাখে মাটিতে বৃষ্টি নামে না। মাঠে ফসল পুড়ে খরায়। এই চিত্রপটে রোস্তম ও জয়নাথ আয়োজন করে কুস্তি লড়াইয়ের। গ্রামের দুই কুস্তিগির জহুর ও রতন কুস্তি লড়ে। সাধারণ মানুষ খরাপোড়া বৈশাখে কুস্তি দেখে। অপরদিকে, রোস্তম সর্দার ও জয়নাথ বিলে দমকল বসিয়ে পানি চালান করে তাদের নিজ নিজ ধানখেতে। ন্যামত মোল্লারা দমকলের পরিবর্তে প্রাচীন সেচ ব্যবস্থায় যাঁতে করে পানি দেয় তাদের ক্ষেতে। ফলে, বিলের পানি চলে যায় দুই জোতদারের জমিতেই। এই সংকট নির্মমভাবে উপলব্ধি করে গ্রামের অন্ধব্যক্তি লতিফ। সে গ্রামে লতিফ কানা নামে পরিচিত। 'তার অন্ধকার দৃষ্টির ভেতর শ্রাবণ নামে, তার সামনের যাবতীয় জটিল গ্রন্থি, লড়াই, জল, বিলের নতুন সমস্যা, জীবন ও জীবন ধারণের যাবতীয় কৌশল যা সে জানে, মানুষের মনের ভেতর দিককার মমতা মাখানো পর্দার

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব, সবকিছুই তার সামনে থেকে লুপ্ত হয়।'[৬৬] লতিফ কানাকে রোস্তম সর্দার কৌশলে জড়িয়ে দেয় নিজ কলঙ্কিত নারী জরিনার সঙ্গে। গ্রাম্য শালিসে তাকে দোষী প্রমাণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ জরিনার বক্তব্যে বুঝে যায় রোস্তম সর্দারের কদর্য পাপ আর বিল নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা। ন্যামত মোল্লাকে কারা যেন খুন করেছে বিলের ভেতর। তখন– ''একটি মাত্র বিলুপ্তির খবর মানুষের বুকের ভেতর ছিদ্র করে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে পড়ে। সম্মিলিতের জন্য একটি বিলুপ্তি এমনই বারুদময়তায় জ্বলে ওঠে যে নিমেষে চারটা চক্র এক হয়ে পড়ে। জহর–রতনের হাত এক সঙ্গে সম্মুন্নত হয়। ... লতিফের পায়ের দড়ি ছিড়ে পড়ে। তারা সবাই একসঙ্গে চোখের নিমিষে বিলের দিকে ছুটে যেতে থাকে।'[৬৭]

মূলত রক্তপাতের ব্যাকরণ গল্পেও শ্রেণীচেতনা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। ভাস্কর চৌধুরীর এই গল্পটি অন্যান্য গল্পের তুলনায় গভীর জীবনবাদীতার স্বাক্ষর রেখেছে। সেই সঙ্গে গল্পে আঞ্চলিক কাঠামো ও চরিত্রের সম্মিলনও যথার্থভাবে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য গল্পে লেখকের জীবন অভীপ্সা প্রায় অগভীর। আঞ্চলিক কাঠামোকে ধারণ করলেও গল্পগুলো একধরনের অতিকল্পনায় বাস্তবতার ভিত্তিকে মজবুত করতে পারেনি।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা এ কথায় বলতে পারি, উত্তরবঙ্গের নদী ও বিল প্রভাবিত জীবনে মূলত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনের ক্ষুন্নিবৃত্তিরই পরিচয় মেলে। নদী ও বিলনির্ভর মানুষের জীবিকা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম নদীর মতই বহমান। আমাদের কথাশিল্পীরা সেই জীবনানুষঙ্গকে অত্যন্ত বাস্তবানুগভাবে হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করেছে এবং রূপায়িত করেছে তাঁদের গল্প উপন্যাসে।

৪.০৪ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের প্রভাব ঃ

বাংলার সমাজ বিকাশের ধারায় এদেশের ভূমিনির্ভর অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সামন্তবাদ। কৃষকশ্রেণীর ওপর প্রজন্ম পরম্পায় শোষণ–নির্যাতন বাংলাদেশের সমাজ অভ্যন্তরে জন্ম দিয়েছিল বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের। কালক্রমে স্থানীয় আন্দোলনগুলো থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের। কাজেই বাংলার আদিম থেকে আধুনিক সমাজ বিকাশের মূলে প্রধান ভিত্তি রূপে গণ্য করতে হয় ভূমি ও পুঁজিকে। এই উপাদান দুটোর ওপর ভিত্তি করেই এদেশের সমাজবিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। আর মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস–এই সমাজতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসেও চুম্বক সত্য হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী মরিস কনকোর্থ বলেনঃ 'সমস্ত অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও চিরকাল উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির, অর্থাৎ তাদের সময়ের আর্থিক অবস্থার ফল; অতএব সব সময়ে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই গঠন করে প্রকৃত বনিয়াদ, যার ভিত্তিতে আমরা এর একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবনার উপরিসৌধটার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বের করতে পারি।'[৬৮] দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোটির পরিচয় পেতে হলে এই সমাজদর্শনকে সত্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। লক্ষণীয়, ঐতিহাসিক সমাজবিকাশের ধারায় আর্যপূর্ব বঙ্গদেশে যাযাবর, শিকারী, কৃষিজীবী গোত্র মিলিয়ে একটি অতি নিম্নবর্গীয় সমাজের পরিচয় মেলে। এই গোত্রগুলোর মধ্যে আদিম সাম্যবাদী প্রথাও প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে আর্যপ্রভাবিত সমাজে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক শ্রেণীস্তর। আর সেই আদিম কাল থেকেই শুরু হয় সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসন।[৬৯] তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, মধ্যযুগে ইউরোপের সমাজ অর্থনীতিতে যেরূপ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল ভারতবর্ষের বঙ্গদেশের সামন্ততন্ত্রের প্রক্রিয়া অনুরূপ ছিল না। বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল এই উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমি।[৭০] যুগের প্রবাহে বহু বহিরাগতের শাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও খ্রিস্টীয় পাঁচ শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত সামন্ত-ব্যবস্থার রমরমা অবস্থার পরিচয় মেলে। প্রায় তেরো শত বছর ধরে বিভিন্ন সামন্ত শাসক এই অঞ্চলে কখনো স্বাধীন কখনো সামন্তের অধীনতা স্বীকার করে রাজত্ব পরিচালনা করে। চন্দ্র পাল-সেন-দেব বর্মন ইত্যাদির পর তুর্কি-পাঠান-মোগলরা এক এক সময় এই অঞ্চল শাসন করে। ধর্মীয় পরিচয়ে চান্দ্র-পাল ছিল বৌদ্ধ, সেন-বর্মন ইত্যাদি ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং তুর্কি-পাঠান-মোগলরা ছিল মুসলিম।[৭১] এই তেরো শত বছরের ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের একটা গুণগত পার্থক্য ছিল এই যে, মধ্যযুগের ভারত তথা বাংলার শাসন ক্ষমতার কাঠামো বিন্যাসের স্তর ছিল অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষেত্র বিশেষে ছিল না বললেই চলে। ফলে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে প্রজাশ্রেণীর ভূমিস্বত্বের সম্পর্ক ছিল শুধুই রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৭২] সেই কারণেই 'ব্রিটিশ আমলের আগে মহাজনরা ব্যাপকভাবে কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করত না, বরং কৃষিঋণ দিয়ে কৃষককে তার নিজের জমিতেই চাষ করাতো। শুধুমাত্র উৎপন্ন ফসলের একাংশ নিজের হস্তগত করতো। জমির সঙ্গে কৃষকের সংযোগ তখনো ছিন্ন হয়নি। ফলে কৃষকের 'বিচ্ছিন্নতাবোধ'জনিত রাগ মহাজনের বিরুদ্ধে সে যুগে দানা বাঁধেনি।[৭৩] বাংলাদেশের মধ্যযুগের ভূমি ব্যবস্থায় কোন মধ্যস্বত্বভোগীর স্থান ছিল না। এই সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের বিশ্লেষণ ঃ

> মোঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান ছিল না। কারণ সে ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মাতব্বরের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতো। এ জন্য মোঘলি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কোনো বংশানুক্রমিক জমিদারী স্বত্ত্বের জন্ম দেয়নি এবং জমির উপর দখলীস্বত্ত্বের ভিত্তিতে মোঘল আমলে কোন আভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠারও ব্যবস্থা ছিলো না।[৭৪]

তবে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজের গুণগত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় একই রূপ। এই সামন্তবাদী সমাজের নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল শাস্ত্র ও আচার শাসিত ধর্মীয় দর্শনের ওপর। অর্থনৈতিকভাবেও তেমন উল্লেখযোগ্য গুণগত পার্থক্য ছিল না। কেবলমাত্র শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ধর্ম ও বর্ণের নিরিখেই পার্থক্য হয়তো করা যেতে পারে। শুধু এই ব্যত্যয় ছাড়া প্রাচীন যুগের হর্ষবর্ধন কিংবা শশাংক অথবা দেবপাল-মহীপাল কিংবা লক্ষন সেনের প্রশাসনিক চরিত্রের সঙ্গে ফিরোজশাহ তুঘলক, আলাউদ্দিন খিলজি কিংবা সম্রাট আকবরের প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খুব পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রাক্কালে বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে নগরায়ন, মধ্যবিত্তের বিকাশ, শিল্পের বিকাশ, কৃষি প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতির চূড়ান্তপর্বে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রেণীসংকট। বাংলার গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির মেরুদন্ডের ওপর ভর করে গড়ে ওঠে কলকাতানগর এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব তথা সামন্ততন্ত্রের ওপর গড়ে ওঠা পুঁজিবাদের বিকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ শোষণের আবর্তে বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হয় প্রকৃত কৃষক। জমিদারদের ওপর বংশানুক্রমে ভূমির মালিকানা আইনগতভাবে ন্যস্ত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে বিলুপ্ত হয় জমিদারী তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। কিন্তু সার্বিকভাবে ভূমিজ মানুষ তখন একেবারেই ভূমি থেকে ছিন্নমূল বা ভূমিহীন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাকপর্বে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিকে চূড়ান্তভাবে শোষণ করে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী সরকার। সমাজ ইতিহাসের এইসব জটিল প্রক্রিয়ায় গ্রামবাংলার মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শোষিত হতে থাকে। ফলে ভূমিজ জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পাকিস্তানী শাসনামল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বছরের সময়সীমার মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয়ভাবে বহু গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। বাংলায় সংঘটিত সশস্ত্র সংগ্রামের একটি কালানুক্রমিক বিবরণ নিচে দেয়া হলো। এগুলো থেকে বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক শ্রেণীগত স্বাধিকার অর্জনের প্রবণতা সম্পর্কে জানা যাবে।

১. কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ পাল আমল (অষ্টম শতক) সশস্ত্র সংঘর্ষের পর কৃষকদের ক্ষমতা দখল।
২. সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), বাখেরগঞ্জ বিদ্রোহ (১৭৯২) এবং এই সময়ের উপজাতীয় বিদ্রোহ।
৩. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), সিলেট বিদ্রোহ (১৭৮২-১৭৯৯), কুমিল্লার ফিরিঙ্গি খেদাও বিদ্রোহ (১৮৮৭)।
৪. ১৭৬৭ সালে সিলেট-ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণার কৃষক বিদ্রোহ ও তাদের উদ্যোগে নিঃস্ব প্রজাদের সমবায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য ঘটনা।
৫. ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ এবং তার পূর্ববর্তী কৃষক প্রতিরোধ (১৮২৪-১৮৩৩)।
৬. সুসং বিদ্রোহ (১৮২৪), নেতা টিপু শাহ।
৭. ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১) নেতা তিতুমীর (১৮২৭)। ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়।
৮. তুষখালী বিদ্রোহ (১৮৫৮-১৮৭৫)।
৯. নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১)।
১০. পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩)।
১১. ঢাকায় ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলন (১৯০০-১৯১৮)।
১২. মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০)।
১৩. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দু ফৌজ' গঠন ও সশস্ত্র আন্দোলন (১৯৪৩)।
১৪. নানকার বিদ্রোহ (১৯২২-১৯৪৯)।
১৫. টংক আন্দোলন (১৯৩৭-১৯৪৯)।
১৬. তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭)।
১৭. নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৪৯-১৯৫০)।

মূলত বাংলার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহগুলো দীর্ঘদিনের প্রজা শোষণ ও বিভিন্ন রকমের অনাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আঞ্চলিক অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।[৭৫] এইসব স্থানীয় আন্দোলন নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কত উদ্বিগ্ন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বিদ্রোহ দমেনর তৎপরতা ও পরাজয়ের ঘটনার মধ্যেও।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রসঙ্গে বাংলার জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিংক ১৯২৯ সালের ৮ নভেম্বর বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

> 'If security was wanting against extensive popular tumult of revolution, I should say that the permanent settlement, though a failure in many other respects and in most important essentials has this great advantage at least of having created a vast body of rich larded proprietors deeply interested in the continuance of British dominion and having complete command over the mass of the people.'[৭৬]

কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের কৃষক শ্রমিক আন্দোলনগুলো জাতীয় রূপ লাভ করে পরবর্তীকালে শহরে শিক্ষিত সমাজের তথা রাজনৈতিক পার্টিগুলোর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে। বিশেষ করে কংগ্রেস (১৮৮৫) এবং মুসলিম লীগের (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের (১৯১৯) মাধ্যমে শ্রমজীবী পেশাজীবী আন্দোলনগুলো বেগবান রূপ লাভ করে। সুতরাং একথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সামন্তবাদ থেকে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় আন্দোলনগুলোর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। আর বাংলার স্থানীয় আন্দোলনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ করি বিপ্লবের সূতিকাগার ছিল এই উত্তরবঙ্গই। কৈবর্তবিদ্রোহ থেকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের (১৯৬৭) দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র প্রত্যক্ষ। এমনকি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামেও সূচনা ও শেষ পর্বে উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে আছে। অবিভক্ত বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যেও এই ঐতিহ্য ও সংগ্রামীচেতনা বিশেষ উপাদান রূপে এসেছে। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ঐতিহ্য ও আন্দোলনের প্রভাবপ্রসূত কথাসাহিত্যের দিকে আলোকপাত করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। প্রসঙ্গত সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন ঐতিহ্যও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করে মূল আলোচনায় প্রবেশ করবো।

বাংলা কথাসাহিত্যের আদিপর্ব থেকে আধুনিককালে এবং বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানিক ঐতিহ্য আন্দোলনের পটভূমিকে অবলম্বন করেছেন অনেক কথাশিল্পী। বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮২) উপন্যাস দুটোর কথা। এই দুই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হচ্ছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। 'দেবী চৌধুরানী'-তে সন্ন্যাসীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় লেখক দেন নি, তবে যে নব্য দস্যুর উল্লেখ করেছেন এবং আশ্রমের বর্ণনা দিয়েছেন– সময়কালের বিবেচনায় তাদের সন্ন্যাসী বিদ্রোহী বলেই ধারণা করা হয়। অপরদিকে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনাকের মন্তব্যঃ 'আনন্দমঠ' সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভাব প্রেরণাসঞ্জাত ইতিহাসের মৌলচিন্তাপ্রসূত ও সুঅবয়াবন্বিত এবং আনন্দমঠ অনাগত বিদ্রোহ-বিপ্লবী মানসের মননশীল তত্ত্বজিজ্ঞাসার সাংকেতিক শব্দচিত্র ও নবোদবেধিত বিস্ময়; আর তা থেকেই পরবর্তী বিপ্লবীরা সমধি সংগ্রহ করেছিলেন জীবন বিপ্লবের উদ্বেগ ও উত্তেজনায়।[৭৭]

উত্তরবঙ্গের ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে চন্ডীচরণ সেন রচনা করেন 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১২৯২) শীর্ষক আর একটি উপন্যাস। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-১৮৫৭) পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর 'ভাগনাদিহির মাঠে' (১৯৫৫), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক (১৯৩৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

'জঙ্গলে', স্বর্ণমিত্রের 'দামিন-ই-কোর ইতিকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭-১৮৫৮) পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের 'চিত্ত বিনোদিনী' (১৮৭৪), উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'নানা সাহেব' (১২৬৮), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' (১৩১৮), চন্ডীচরণ সেনের (১৮৪৫-১৯০৬) 'ঝান্সীর রানী' (১৮৮৮), নরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ' (১৮৮৯) সত্যেন সেনের 'অপরাজেয়' (১৯৭০) প্রভৃতি স্মরণীয়। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) 'মিউটিনি', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) 'ভৈরবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা' (১৩০৫), শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯৫৮) 'ভীম চুলহা', হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬২-১৯৩৮) 'একটি স্মরণীয় ঘটনা', সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৯-১৯২৯) 'পরিণাম', প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্ম (১৩৬২) গল্পগ্রন্থের বারোটি গল্পেই এই বিদ্রোহের পটভূমি অবলম্বন করেছেন। 'খালেকদাদ চৌধুরীর 'রক্তাক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬) ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন পরগনায় অনুষ্ঠিত সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। সত্যেন সেনের 'অপরাজেয়' (১৩৭৭) উপন্যাসের পটভূমিও সিপাহী বিদ্রোহ, অপরদিকে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারাণের নাতজামাই', 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' প্রভৃতি গল্প রচনা করেন। এই ধারাবাহিকতায় সতীনাথ ভাদুড়ী, দেবেশ রায়, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাশিল্পীর গল্পউপন্যাসেও বিভিন্ন স্থানিক আন্দোলনের পটভূমি ও চেতনাগত প্রভাব লক্ষ করা যায়। দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও এই ধারাক্রম লক্ষ করি। বলা যায়, বাংলাদেশের স্থানীয় ও জাতীয় আন্দোলন এবং ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নই আমাদের কথাসাহিত্যের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে প্রায় মহাকাব্যিক সময় সারণিতে বর্ণনা করেছেন কোন কোন লেখক। সেই সঙ্গে সমাজ প্রবাহের এই অভিজ্ঞতাকেই তাঁরা উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণও করেছেন। ফলে মূলগত দিক দিয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় জীবনের স্তরপরম্পরা ঐক্যসূত্রে গল্প-উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে বস্তুত বাংলাদেশেরই সমাজজীবনের প্রামাণ্য দলিল। স্থানীয় আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের যোগসূত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং সমাজের অখন্ড প্রকাশ। হব্সের মন্তব্য স্মরণ করে বলা চলে- 'Local history can be of greatest value to National history when it gathers instances of events illusterating social trands or tendencies which are otherwise difficult to find.[৭৮]

বাংলাদেশেরও আঞ্চলিক শ্রেণী সংগ্রামের বহুকাল পরম্পরা চেতনাধারা নিয়েই সামগ্রিভাবে আমাদের সংস্কৃতি ও রাজনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। আমাদের কথাসাহিত্যও ধারণ করে চলেছে উত্তরাধিকারের চেতনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), সেলিনা হোসেনর 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২), নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (১৯৮৭), কাঁটাতারে প্রজাতি (১৯৮৯), ভালবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), গায়ত্রী সন্ধ্যা ১, ২, ৩ (১৯৮৪-৯৬) প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। এইসব উপন্যাসে বাংলাদেশ ও বাঙালির ঐতিহ্য সংগ্রামী ইতিহাসের পুণর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এই ঐতিহ্য অন্বেষায় লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আন্দোলনগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রাধান্য পেয়েছে। তন্মধ্যে পাল শাসনামলের কৈবর্ত বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত হয়েছে সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬); সেন শাসনামলের প্রান্তলগ্ন ও তুর্কি

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলের প্রারম্ভলগ্নের এক ক্রান্তিকালে উত্তরবঙ্গের সোমপুর বৌদ্ধবিহার অঞ্চলে বৌদ্ধদের জীবন সংগ্রামের আবহে রচিত শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪); নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে পাবনা অঞ্চলের চিত্রপট নিয়ে রচিত সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'নীল রং রক্ত' (১৯৬৪) এবং নাচোলের তেভাগা আন্দোলনসহ অন্যাণ্য স্থানীয় বিদ্রোহের অনুষঙ্গ নিয়ে সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (এক), 'নিরন্তর ঘটনাধ্বনি' ও 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়েছে। এছাড়াও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনাম' উপন্যাসেও উত্তরবঙ্গের স্থানীয় বিদ্রোহের পটভূমি কাহিনীর অনুষঙ্গারূপে গৃহীত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের বিভিন্ন গল্পেও স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের পটভূমি লক্ষ করা যায়। এছাড়াও আমাদের জাতীয় পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন, 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান', মুক্তিযুদ্ধের স্থানিক ক্যানভাস হিসাবে উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপে রচিত হয়েছে গল্প উপন্যাস। তন্মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৯৮), মঈনুল আহসান সাহেবের 'কবেজ লেঠেল' (১৯৯২) অন্যতম। বস্তুত এইসব আন্দোলনের প্রভাবসঞ্জাত কথাসাহিত্যে আমরা উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের দ্রোহীচেতনার পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় পটভূমিকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের নিবিড় পাঠসমালোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কালানুক্রমিকভাবে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আন্দোলনগুলো তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারেঃ

১. প্রাচীন সামন্ত বাংলার কৃষক বিদ্রোহ;
২. ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী বাংলার কৃষক বিদ্রোহ; ও
৩. পাকিস্তান বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের পটভূমিকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য।

এক.

প্রাচীন বাংলার বরেন্দ্র ভূমিতে কৃষক বিদ্রোহ এবং কৈবর্ত কৃষকদের ক্ষমতা দখলের ঘটনা আমাদের ইতিহাসে স্মারক হয়ে আছে। ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে কৃষক বিদ্রোহ ও প্রলেটারিয়েট কর্তৃক ক্ষমতা দখলের নেতা হিসেবে দিব্যোকের সংগ্রামী নেতৃত্ব কিংবন্তীতুল্য। দিব্যোক ছিলেন কৈর্বত বা জেলে-কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তবে তিনি পাল রাজদরবারে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ছিলেন। সুতরাং ইতিহাসের এই ঘটনাকে প্রাচীন আমলার নেতৃত্বে এক বেসামরিক অভ্যুত্থানও বলা যেতে পারে।[৭৯] কৃষক স্বরাজ উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দিব্যোকের পরে তার ভাই রুদ্রোক ও তার ছেলে ভীম জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এইসব কৃষক রাজাদের উচ্ছেদের জন্য উচ্চবর্ণীয় সামন্ত রাজারা মৈত্রী জোট গঠন করেছিলেন। তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় ও বরেন্দ্রভূমির এই সংগ্রামী ইতিহাস নিয়ে সত্যেন সেন রচনা করেছেন 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬) উপন্যাসটি। বলা যায়, বাংলার ইতিহাসে প্রথম গণবিদ্রোহীটি সংঘটিত হয়েছিল এই বরেন্দ্রভূমি তথা উত্তরবঙ্গেই। তাই সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উপন্যাসটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালির ঐতিহাসিক সমাজসত্যের পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করে কথাশিল্পী সত্যেন সেন এই উপন্যাসে একান্তভাবেই আমাদের ঐতিহ্যের স্মারক নির্মাণ করেছেন। কারণ আধুনিক যুগের উপন্যাস অর্থে আমরা যা সমর্থন করি, তা হলো– 'উপন্যাস মানুষের জীবনের গদ্য, উপন্যাস মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ও তাকে অভিব্যক্তি দেবার প্রথম নান্দনিক প্রচেষ্টা।'[৮০] সত্যেন সেন সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্বমুখর আত্মক্রিয়ায় জারিত হয়ে মানবিক অসঙ্গতি, বঞ্চনা, সংগ্রাম সংঘাতের ভেতর একটি প্রোজ্জ্বল, আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত শিল্পীসত্তায় আমাদের কথাসাহিত্যের পটভূমিতে স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত।[৮১] শোষিত কৈবর্ত বা শূদ্রদের বিদ্রোহী চেতনাকে তিনি উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য করে তুলেছেন। সমালোচক বলেন, 'বিদ্রোহী কৈর্বত' উপন্যাসের মূল কাহিনী কাল্পনিক নয়, এর বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি বিদ্যমান। বাঙ্লার পাল রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্রের শূদ্র কৈবর্তদের বিদ্রোহের উল্লেখ ইতিহাসে আছে। কিন্তু শূদ্র বিরোধী অভিজাতদের রচিত ইতিহাসে কৈর্বত বিদ্রোহকে অবশ্যই গৌরবমন্ডিত রূপে অঙ্কিত করে নি, কিংবা এ বিদ্রোহের কোন অনুপুঙ্খ বর্ণনাও কোথাও রক্ষিত হয়নি। এ কালের বিপ্লবকামী বুদ্ধিজীবী সত্যেন সেন তাঁর ঐতিহাসিক কল্পনার প্রয়োগে কৈর্বত–নায়ক দিব্বোককে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, সে সময়কার সমাজ পরিবেশকে তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমেত ইতিহাস থেকে তুলে এনে এ যুগের মানুষের সামনে এক জীবন্ত প্রতিমার মত সংস্থাপন করেছেন।[৮২] বলা যেতে পারে, সত্যেন সেন এই উপন্যাসে সমাজমনস্তাত্ত্বিক আবেদন সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের অনুপুঙ্খ উপাদানে সামন্ত রাজণ্যবর্গ বা বুর্জোয়াদের রীতি যত প্রোজ্জ্বল, নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস ততোটাই উপেক্ষিত। তাই বাঙ্লার প্রাচীন শূদ্র বা কৈবর্ত দাসানুদাসদের জীবনচর্যার তথ্য যৎকিঞ্চিত এবং অগৌরবের বর্ণনায় অতিরিক্ত তাদের শাস্ত্রে ও ইতিহাসেও। বস্তুত শূদ্ররা ছিল প্রাক আর্য জনগোষ্ঠী এবং শাসকদের সেবাদাস।[৮৩] এই নিম্নবর্গীয় জীবনের গণবিদ্রোহের পটভূমি অবলম্বন করে সত্যেন সেন তাই সমাজমনস্বত্ত্বকেই চরিত্রের ফ্রেমে বন্দী করেছেন। লোকায়ত সাহসকেই প্রাণবন্ত করেছে কাহিনীকারের নিজস্ব বিবরণের স্পষ্টতা। কিন্তু উপলব্ধির ইতিহাস দিয়ে কাহিনী বোনার পাশাপাশি যা সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল তা হলো লোকায়ত জীবনের নিজস্ব ভাষা। সত্যেন সেনের উপন্যাসে আমরা সেই মনোযোগ অবশ্য দেখি না। উপন্যাসে দ্বন্দ্বের চিত্র উপস্থান করার জন্য লেখক দুটো আবহ নির্মাণ করেছেন। তিনি সূচনাতেই পৌরাণিক শাস্ত্রাচারের আবহ সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গত রাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহাভারত পাঠ হচ্ছিল। মহারাজের মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বছরই এ উপলক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠ করা হয়ে থাকে।[৮৪]

গৌড়ের রাজপ্রাসাদে শাস্ত্রপাঠের আসরে উপস্থিত বিগ্রহ পালের স্ত্রী এবং রাজমাতা শংখ দেবী তখন ত্রিমুখী সংকটে চিন্তিত। একদিকে কারারুদ্ধ পুত্রের সঙ্গে ক্ষমতাসীন পুত্রের বিরোধ, দ্বিতীয়ত রাজআমাত্য বরাহ স্বামীর প্রতি আবিশ্বাস, তৃতীয়ত বরেন্দ্রী অঞ্চলে কৈবর্ত প্রজাদের বিদ্রোহ তাকে বিচলিত করে। এই পরিস্থিতিতে তিনি মুর্চ্ছা যাবার ভান করলে রাজবৈদ্য আসেন এবং শংখ দেবী তার সঙ্গে রাজ্য বিষয়ে গোপন পরামর্শ করেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে রাজআমাত্যবর্গের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় সংকট। বিশেষ করে পদ্মনাভের বক্তব্যে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত বিদ্রোহের তথ্য পাওয়া যায়। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আবহে বরেন্দ্রভূমির সংকট ও সংগ্রাম মূর্ত হয়ে ওঠে। রাজ আমত্য বলেনঃ

> আমি বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের কথা বলছি। ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; সেখান থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে সেগুলো ভাল নয়। এখানে ওখানে একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। আমাদের প্রতিপক্ষ যদি ওদের এই অন্তোষটাকে কাজে লাগায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।[৮৫]

গৌড়ের বণিকদের দ্বারা কৃষক প্রতারিত হয়। লক্ষ লক্ষ মন ধান লুঠ করে নিয়ে যায় তারা। বস্তুত, কৈবর্ত বিদ্রোহের অনেক কারণের মধ্যে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে অবৈধভাবে অতিরিক্ত ভূমিকর আদায়। দ্বিতীয়ত, বহিরাগত বৈশ্য ও আর্যরা শূদ্রদের ভূমিগ্রাস করে নিয়েছে; তাদের উচ্ছেদ করছে।[৮৬] এমতাবস্থায় কৈর্বতরা যে আন্দোলন করছে তাতে তারা সফল হতে পারবে না যদি তাদের স্বগোত্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

দিব্যোক পাশে না দাঁড়ায়। এই কারণে রাজামত্যরা প্রতিনিয়ত দিব্যোকের প্রতি দৃষ্টি রাখতো। কিন্তু দিব্যোক সামন্ত শাসকের ক্ষমতার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে স্বগোত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন এবং কেবর্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। তাদের সংগ্রামকেও তিনি ত্বরান্বিত করেছেন তার যোগ্যনেতৃত্বের দ্বারা। কৈবর্ত কৃষকদের উদ্দেশ্য দিব্যোকের আহবানঃ আমরা অসভ্য কৈবর্ত, গৌড়ের সভ্য লোকদের রীতিনীতি আমরা বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু বাঁচতে হলে আমাদেরও ওদের সংগে ওদের মতই ব্যবহার করতে হবে।[৮৭]

শিয়ালমারীর চাপাই মড়লের পুত্র পরভুর নেতৃত্বে বিপুল জনতা সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে গ্রামের পথে পথে। শত শত মৃতদেহ তাদের সামনে স্তুপ হয়ে ওঠে। তার জন্য কোন বিলাপ নেই ওদের। ওরা গর্বিত। রাজসৈন্য কৈবর্তদের ওপর দিনেরাতে চালিয়ে যায় নির্মম অত্যাচার। লেখকের বর্ণনা ঃ

> রাজার সৈন্যেরা শিকারী কুকুরের মত চারিদিককার গ্রামগুলিতে শিকার খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল। লুঠতরাজ, মারপিট আর হত্যাকান্ড চলল অবাধে। পাথরের মত অসাড় হয়ে পরে রইল মানুষগুলি, মুখ ফুটে কথা বলবার মত শক্তিটুকুও কারু রইল না। রাজনীতিতে সংবাদ পৌছল, অবস্থা আয়ত্বে এসেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আর এক জরুরী সংবাদ–বরেন্দ্রীর পূর্বপ্রান্তে নতুন গোলমাল দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে আরও সৈন্য পাঠাতে হবে। পদাতিক নয়, অশ্বারোহী সৈন্য। এভাবে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার চক্র গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।[৮৮]

এই উপন্যাসের নায়ক দিব্যোক কৈবর্তদের ওপর সামন্ত শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং কৈবর্ত যুবতীদের রক্ষার্থে নেপথ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করা হয়। শূরপাল ও রামপালের আক্রমণ কৈবর্তরা রোধ করে। দিব্যোক তখন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু অশিক্ষিত শূদ্র কৈবর্তদের বিবিধ সংস্কারবোধের জন্য তিনি উদ্যোগ নিলে স্বগোত্রের পক্ষ থেকেই তার প্রতি আঘাত আসে। অন্যদিকে শঙ্খদেবী ও রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় নদীপথে নৌকাডুবিতে মারা যায়। রামপাল পুনরায় গৌড়রাজ্য দখলের জন্য আক্রমণ পরিচালনা করেও পরাজিত হয়। যে কৈর্বত যুবক আকন–শৈশবে একদিন বিষমাখা তীর দিয়ে দিব্যোককে আঘাত করেছিল সেই পরবর্তীকালে দিব্যোকের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং কৈবর্ত সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব পায়। উপন্যাসের শেষে দিব্যোকের মৃত্যুলগ্নে অনুতপ্ত আকনকে দিব্যোক উপদেশ দেন।

> 'আকন এবার নিঃশব্দ হয়ে থাকতে পারল না, বলল, হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যা বললেন, আমি সেই মতই করব। দাও, এবার দরজাটা খুলে দাও। ওরা সব বাইরে অপেক্ষা করছে, ঘরের ভিতরে চলে আসুক।'[৮৯]

বস্তুত,কেবল সামন্ত রাজশক্তিকে পরাজিত করা নয়, নিজের জাতিগত অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রতিও দিব্যোকের দৃষ্টি দিল প্রখর। এজন্যে কৈবর্তদের নিকট থেকেও তাকে আঘাত পেতে হয়েছে। এমনই সব মানবিক গুণে দিব্যোক চরিত্রটি উপনাসে মাহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। শুধু উপন্যাসই নয় দিব্যোক প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রথম প্রতিনিধিও বটে। একালের মাহিষ্য কৈবর্তরা এখনও দিব্যোকের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে উৎসব পালন করে থাকে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেনঃ

> A movement was recently set on foot by a section of the Kaivarta or Mahisya community in Bengal to perpetuate the memory of Divya.

Dhaka University Institutional Repository

> They refused to regard him as a raslve, and held him up as a great hero called to the throne by the people of varendi to save it from the oppressions of Mahipala 11. An annual ceremory, Divya-Smriti-Utsava, was ogranised by them.[৯০]

এই উপন্যাসের তাৎপর্যগত দিক দিয়ে দিব্যোকে কেবল কৈবর্তদের প্রতিনিধি নয়, বৃহৎ অর্থ তাকে বাংলার কৃষকনেতা এবং গণমানুষের মুক্তির অগ্রদূত বলা চলে। ভূমির মালিকানার প্রশ্নে কৈবর্ত কৃষকরা যখন উচ্চারণ করেঃ 'জমির আবার কর কি? এ নিয়ম কোন কালে ছিল না। চাষী আর জমি কী আলাদা? এ মাটির স্বত্ত্ব নিয়েই আমরা জন্মাই। তখন তেভাগা আন্দোলনের 'লাঙল যার জমি তার' তত্ত্বের প্রতিধ্বনির মতই মনে হয়।[৯১] শুধু তাই নয়, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত– এটাই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। বিদ্রোহী কৈর্বতে আমরা এ বাণীর রূপায়ন দেখতে পাই।'[৯২] তাই 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' কেবল উত্তরবঙ্গের কৃষকদের আন্দোলনেরই দলিল নয়, চিরকালীন সংগ্রামের মানবিক প্রত্যয়ও বটে।

প্রাকৃত বাংলার ভৌগোলিক পরিমন্ডল এবং সমাজরাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস আর রহস্য মেশানো বাস্তবতার শিল্পীত প্রতিবিম্ব শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকতজন' উপন্যাস। উত্তরবঙ্গ তথা অনার্য ভূমির বিশ্বস্ত কথক শওকত আলী। 'অনার্য্যদের এই ভূমিতে হাঁটছেন শওকত আলী। তাঁর হাঁটার অর্ধেকটা পথই বোধ করি অনার্য্যভূমি এই গ্রাম।'[৯৩] 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে লেখক প্রাচীন বাংলার হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলে সামন্ত শোষণের প্রতিচিত্র এঁকেছেন। সামন্ত শাসনের নগ্নরূপ এবং অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রাম; অন্যদিকে বঙ্গাদেশে তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশীয় জনজীবনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দ্বন্দ্বসংকুল প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে। বস্তুত এই উপন্যাসে 'বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস' শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণীসংগ্রামের আদি বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্বজটিল স্বরূপ অনুধাবন শওকত আলীর সমাজ অধ্যায়নের ঐকান্তিকতার পরিচয়বাহী।'[৯৪] লক্ষণীয়, উপন্যাসের ঘটনা বলয়িত হয়েছে যে জনপদকে অবলম্বন করে তার চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত এবং বর্ণিল। গৌড়ের রাজধানী কেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গের ব্রাত্য–শূদ্রদের ওপর নির্যাতন শোষণের স্থানিক আলেখ্য বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা পেয়েছে। বিশেষ করে উপন্যাসের নায়ক শ্যামাঙ্গের শাস্ত্রাচার বিরোধী স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জনপদজুড়ে বিচরণের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। গৃহত্যাগী শ্যামাঙ্গ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদে ঘুরে ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

> পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার উভয় তীরের বিস্তৃর্ণ ভূ–ভাগের জনপদগুলির তখন প্রায় এইরূপ অবস্থা। গৌড়বঙ্গের রাজধানী লক্ষণাবতীতে মহামহিম পরাম ভট্টারক শ্রীলক্ষণ সেনদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজসভায় উমাপতি, ধোয়ী এবং জয়দেবের কাব্য গীতির সুললিত মূর্ছনায় সভাস্থল বিমুগ্ধ। জয়দেবের কৃষ্ণলীলার বর্ণনা শ্রবণে সভাসদবর্গ তুরীয়ানন্দে বিহ্বল, ধোয়ীর পবনদূতের বর্ণনায় কামকলানিপুণা রমনী কূলের উল্লেখে শ্রোতাবর্গ আহো অহো উল্লসিত হচ্ছে সাধু সাধু বর। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সন্দেহ করা হচ্ছে, যবন কেন্দ্রগুলিতে কেন তাদের যাতায়াত, গূঢ় পুরুষেরা বিচিত্র সংবাদ আনছে। তথাপি প্রজাকূলসুখী। ব্রাহ্মণ সুখী, কায়স্থ সুখী, বৈশ্য সুখী। কেবল ব্রাত্য শূদ্রদের গৃহে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই। মস্তোকপরি গৃহের আচ্ছাদন থাকে না। আজ যদি গ্রামপতি বসবাসের স্থান দিলেন, তো কালই বললেন, দূরহ দূরহ পামরের দল।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের নায়ক শ্যামাঙ্গ স্থান থেকে স্থানে পলায়ণ করেছে এবং জীবনের সংকট উত্তরণের অন্বেষণ করেছে। শ্যামাঙ্গ গুরু বসুদেব ও সামন্ত মহাপতির আদেশ মত শাস্ত্রানুগত শিল্পচর্চা না করায় তাকে বিল্বগ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে। পথে পথে স্থানে স্থানে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছেছে লম্পট এবং বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষী অভিমুণ্যের পরিত্যক্ত স্ত্রী লীলাবতির কাছে। শ্যামাঙ্গ এইভাবে পরিচিত হয়েছে উজবট গ্রামের মায়াবতী বসন্তদাসের সঙ্গে। বণিক বসন্তদাস দেশে দেশে ঘুরে রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তসারশূণ্য নীতিহীনতাকে উপলব্ধি করে দ্রোহী হয়ে ওঠেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু মিত্রানন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সামন্তস্বরাজ বিরোধী ও বিপ্লবী হয়েছে। বিদ্রোহী বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের অন্যতম মন্দিরসেবিকা কৃষ্ণা, ব্রাত্য রমণী শুক্লা ও বিভাবতীর আত্মসংগ্রামের কাহিনী উপন্যাসে বিশেষমাত্রা যোগ করেছে। অন্যদিকে, এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পিপ্পলী হাটে সামন্ত হরিসেনের কর আদায়ের প্রেক্ষাপট ও নির্যাতনের মর্মন্তুদ চিত্র। সামন্ত হরিসনের মন্দির নির্মাণের জন্য অঞ্চলের হাটগুলো থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় ও ডোমনীদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদের বৌদ্ধ ভিক্ষু চেতনানন্দ এগিয়ে আসে। কিন্তু সামন্ত হরিসনের নায়েব বজ্রসেনের অসির আঘাতে চেতনানন্দ আহত হলে কুসুম ডোমনীর নেতৃত্বে অন্যান্য ডোমনীরা বজ্রসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্তে তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ডোমনীদের এই দ্রোহী ভূমিকা উপন্যাসে ব্রাত্য রমনীর সংগ্রামেরই এক অনবদ্য প্রতিরূপ। এর ফলে, ক্রুদ্ধ হরিসেন দুই শতাধিক সশস্ত্র যোদ্ধাকে পিপ্পলী হাটে প্রেরণ করে কুসুম ডোমনীকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তখন–

> কুসুম ডোমনীকে ধরে এনে সর্বসমক্ষে দাঁড় করানো হলো এবং ঘোষণা করা হলো– এ স্বৈরিনী সকল বিরোধের মূল, দেহের সে অংশের কারণে এই স্বৈরিনী পুরুষ সমাজে বিরোধ এবং লোভের বীজ বপন করে, শরীরের যে অংশ যথার্থই নরকের দ্বার, সেই অংশটি আমরা প্রজ্বলিত করে দেবো। ঘোষণাটি সামন্ত হরিসেনের। ঘোষক কেবল বাক্যগুলি সচিৎকার উচ্চারণ করে গেলো এবং তারপর সর্বসমক্ষে কুসুমকে নির্বস্ত্রা করে তার যোনিদেশে একটি উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো।[৯৬]

শাস্ত্রাচারী হিন্দু সামন্তের এই বিভৎস নগ্নচিত্র সর্বকালের মানবতাকে স্তব্ধ করে দেয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই নিষ্ঠুর তাণ্ডব থেকেই মুক্তি পেতে ব্রাত্যজীবীরা সেই সময় ইসলাম ধর্মের সাম্য ও সামাজিক শ্রেণীগত সামনাধিকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত শূদ্র ডোম চন্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় প্রাকৃত মানুষের মধ্যে লেখক সঞ্চারিত করেছেন দ্রোহ ও প্রতিবাদী চেতনা। উপন্যাসে শ্যামাঙ্গ একাই শাস্ত্র বিরোধী নয়। শাস্ত্রাচার বিরোধী জীবনাচারণের বিরুদ্ধে আর একটি প্রতিবাদী নারী চরিত্র হচ্ছে লীলাবতী। পৌরুষত্বহীন নপুংসক স্বামী অভিন্যুর সংসার ছেড়ে লীলাবতী শিল্পী শ্যামাঙ্গের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাচার থেকে মুক্ত হয়ে শ্যামাঙ্গ যবনধর্মে পরিত্রাণ কামনা করেছে। কিন্তু লীলাবতীর কাছে শাস্ত্রীয় ধর্ম মুখ্য হয়ে ওঠেনি। তার কাছে বড় হয়ে ওঠে স্বাভাবিক নারীত্বের ধর্ম। তার বক্তব্য ঃ

> 'আমার ধর্ম কোথায়? আমি তো বুঝি না সত্যই আমার ধর্ম বলে কোনো বস্তু কখনো ছিলো কিনা। যদি ছিলো বলে ধরে নিই, তাহলে সে ধর্ম আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, এমন বিবাহ দিয়েছে, যা আমি চাই নি– যে ধর্ম আমার জীবন বিপন্ন করেছে, যে ধর্ম আমাকে পিতৃহীন করেছে, বলো তাকে আমি ধর্ম বলবো?'[৯৭]

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জীবনের রূঢ়বাস্তবতাকেই শুধু প্রকাশ করেন নি; ধর্মীয় আচরণে রাজনৈতিক শোষণের চিরকালীন প্রথার বিরুদ্ধেই মানবিক প্রত্যয় উচ্চারণ করেছেন। লক্ষ্য করা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাঙ্গা যবন সৈন্যদের শূলের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে; অন্যদিকে শাস্ত্রবাদী অভিমূন্য নীলাবতীকে পেতে চেয়েছে জীবিত বা মৃত যে কোনভাবেই। শ্যামাঙ্গের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়েই ঔপন্যাসিক প্রদোষে প্রাকৃতজনের সমাপ্তি দেখিয়েছেন। তবে শিল্পীর মধ্যদিয়েও ব্যক্ত করে গেছেন উত্তরাধিকারের অঙ্গীকারঃ

> 'যদি কোনো পল্লী বালিকার হাতে কখনো মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ্য করে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কিনা; আমাদের বিশ্বাস, কোনো না-কোনো পুত্তলিকে অবশ্যই পাওয়া যাবে আর যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দীর শ্যামাঙ্গা নামক এক হতভাগ্য মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও।'[৯৮]

বস্তুত 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাস সামগ্রিকভাবেই একটি শোষিত শ্রেণীর দ্রোহের কাহিনী। শওকত আলীর প্রাকৃত নরনারীরা দ্রোহ উত্থাপন করে সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মবণিকদের শোষণ অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে। 'বরেন্দ্রভূমির জনপদগুলোতে তখন প্রদোষকাল। এখানে যবন জাতির হাতে মহাকালের ডমরুতে অনাহত ধ্বনি আর লক্ষণ সেনের মহাসামন্ত ও সামন্তবর্গ প্রজাপীড়নে মত্ত। সেই সহস্রাধিক বছর পূর্বের ইতিহাস প্রদোষ মূহূর্তের জটিল আবর্তে ঘূর্ণমান কয়েকজন নরনারীর সংগ্রামী মনোবল, চারিত্রিক ঋজুতা, প্রতারণাহীন ঋজু স্বদেশপ্রেম, প্রণয়ের দৃঢ়তা ও ঐতিহাসিক ব্যাতার সঙ্গে অস্তিত্বের সংরাগকে একাত্ম করে শওকত আলী আরেকবার বাঙালি জাতিসত্তার সংগ্রামী চেতনাকে স্মরণ করিয়ে ছিলেন তাঁর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে।'[৯৯]

বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে ভূমির মালিক রূপে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপের বিষয়টিও এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে হরিসেনের প্রজাশাসন ও নির্যাতনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক এই মেসেজটি প্রদান করেছেন। সেই সঙ্গে সামন্ত শাসকের স্বার্থরক্ষার জন্য গ্রাম পর্যায়ে কৃষক বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রেও স্থানীয় লাঠিয়াল বা সৈন্যবাহিনীর ভূমিকার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণে লক্ষণীয়, 'মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে জমিদার শ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। জমিদাররা কৃষি উৎপাদন, হস্তশিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতো তা অপরিসীম। উৎপাদিত পণ্যের বৃহৎ অংশের ভাগ পাবার বিষয়ে রাজা ও জমিদারের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব বিরাজ করলেও জমিদার শ্রেণী রাজকীয় সরকারের অর্থনৈতিক শোষণের অংশীদার ছিল।'[১০০]

দুই.

এই অংশীদারিত্ব আরো প্রকট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসনামলে। নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার ফলে প্রত্যক্ষভাবে কৃষকরা রাষ্ট্রীয় শাসকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। জমিদাররাও কোম্পানীকে সহযোগিতায় এগিয় আসে। ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামালের যোগান দিতে বাধ্য করা হয় বাংলার কৃষক সমাজকে। গবেষকের মন্তব্য ঃ

> The zamindars helped the new rulers, not only by ensuring revenue collection, but also by their loyalty as social class which the company neened at the time. The European indigo planters is Bengal also rendered valuable services to the sustenance of the British industry and for a period occupied a valuable position. Following the industrial revaluation, the expending British textile industry needed a steady supply of indigo.[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ফরায়েজী আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর তাই ব্যাপক অর্থ হিন্দুমুসলমানের অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল নীল বিদ্রোহকে (১৮৫৯–১৮৬২) কেন্দ্র করে। বস্তুত নীল বিদ্রোহ ব্রিটিশ বাংলায় স্থানীয় কৃষক আন্দোলনগুলোর মধ্যে ব্যাপক মাত্রা পেয়েছিল। যশোর, নদীয়া এবং উত্তরবঙ্গের পাবনা অঞ্চলে সেই সময় ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষক আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭৩ সালে পাবনা জেলার কৃষকরা ব্রিটিশ জমিদার ও শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। মূলত সার্বিকভাবে এই প্রেক্ষিতটিই ছিল– বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্ব। প্রাক্ মুসলিম ও মুসলিম শাসনামলের সামন্ত ভূমিস্বামীদের শোষণের এক স্তর থেকেই এই পর্বটি ছিল পুঁজিবাদের অন্য এক স্তরে বাংলার কৃষক সমাজের নির্যাতনের ইতিহাস। যদিও প্রাগৈহাসিক কাল থেকেই ভারতে নীলচাষ হতো এবং সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ডাচরাও ভারতে উৎপাদিত নীলকে উৎকৃষ্ট মনে করতো। কিন্তু সেই সময় নীল চাষ বা উৎপাদিত হতো আদিম পদ্ধতিতে। পরবর্তীকালে নীলের উচ্চমূল্য ও ইংল্যান্ডের শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলাদেশে নীলচাষকে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসে।[১০২] তাদের জোরপূর্বক নীলচাষ করানো হতো। এজন্যে বিরোধিতা করলে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হতো। 'যশোর নদীয়া পাবনা জেলায় নীলচাষ বেশী হত আর ঐ সব অঞ্চলেই ঐ বিদ্রোহ তীব্র আকার নেয়। চাষীরা নীলকুঠির ওপরে হামলা করে, নীলচাষের জমি নষ্ট করে ফেলা হয়, সশস্ত্র কৃষকেরা একযোগে সরকারী অফিস আদালত ও কাজারী আক্রমণ করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার কৃষকরা নীলবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ১৮৭২–৭৩ সালে পাবনা–বগুড়া ও অন্যান্য জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ শাসক ও জমিদার মহলে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল আর এই বিদ্রোহ ছিল সহিংস্র ও ভয়াবহ। স্মরণীয় যে, ১৮৬৮–৬৯ সালে উত্তরবঙ্গে আবার ওয়াহাবী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে বহু ওয়াহাবী নেতাকে বন্দী ও বিচার করা হয়।[১০৩] পাবনা অঞ্চলের এই কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকে অবলম্বন করেই কথাশিল্পী সরদার জয়েন উদ্‌দীন 'নীল রঙ রক্ত' উপন্যাসটি লিখেছেন।

বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে নীল বিদ্রোহের পটভূমি ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮১৪–১৮৮৩), 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), লালবিহারী দে' (১৮২৪–১৮৯৪)–এর 'বেঙ্গল পিজ্যান্ট লাইফা' (১৮৫৯), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১২) এর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–এর (১৮৬১–১৯৪১) 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসেও নীল বিদ্রোহের উত্তুঙ্গ পরিস্থিতির বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে রচিত সমরেশ বসুর 'ভানুমতি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাস দুটিতে নীল বিদ্রোহের খন্ডিত পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীল তুইয়া' নীল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০–১৮৭৩)–এর নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি তৎকালীন বাংলার সামাজিক দলিল হয়ে আছে। বলা যায়, এই বিষয় ও প্রেক্ষিত নিয়ে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'নীল রঙ রক্ত' উপন্যাস। 'নীল রঙ রক্ত'–এ অনাপোষকামী সংগ্রামী জীবনালেখ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি অর্জন করেছেন আপন সময়ের গণ–মানুষকে ঐতিহ্য–সচেতন ও সংগ্রামী করার প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুত শিল্পীর মহত্ত্ব।'[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাবনার নগরবাড়ি ঘাট থেকে নাটোরের বনপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠে। কাহিনীর শুরুতে দেখা যায়, জটাজুটধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী করম আলীকে নিয়ে পথ চলতে চলতে অতীত ইতিহাস বিবৃত করে।

> বাঘ সে তো বনের পশু, তার কথা বাদ দাও; বাঘের চেয়ে হিংস্র জানোয়ার নীল কুঠিয়াল আর জমিদার যারা মানুষের রক্ত নিঙরে নীল জমায়, গরীব দুঃখীর পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করে।[১০৫]

বৃদ্ধের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ঘটনা বিবৃত হতে থাকে। নীল কুঠিয়ালদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীতে মূর্ত হয়ে ওঠে গ্রামীণ কৃষক সমাজের নিরন্ন দিনের চালচিত্র। 'তখন চারিদিকে কেবল অন্নহীনের ভীড়। .. যা কপালে জুটেছে তাহলো নিপীড়ন।' নীলকরদের সর্বগ্রাসী লোভে আর সীমাহীন নির্যাতনে বিপর্যস্ত কৃষকের অস্তিত্ব। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা ঃ

> 'যেখানে সে জমিখানা ভাল তার উপরেই নীলকরদের লোভ। চাষ দেওয়া হলো কি না হলো আর অমনি এসে ফোটা দিল, 'দে বেটা আমায় দে। আমার নামে এ দাগে নীল ফেলা'। দিলে তো ভাল করলে। আর না দিলে তো রক্ষে নেই। ট্যাঁ ফুঁ করবার সময় পাবে না। পাইক বরকন্দাজ লেলিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। মুৎসুদ্দি হুকুম পেয়ে মালখানায় তুলবো। সে আঁধার কোঠায় তিনদিন বন্ধ করে রেখে হ্যাঁ আদায় করে তবে ছেড়ে দেবে।'[১০৬]

চিনেখড়া গ্রামের কৃষক ভৈরব করকে জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করার জন্য কুঠিয়ালদের এমন কৌশল দেখা যায়। লেখক দেখিয়েছেন, ভৈরবের প্রতি নির্যাতন হলে তার স্ত্রী কালিতারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী মুসলমান চাষী নিজামুদ্দীন তাকে সাহয্যে করার জন্য লাঠি হাতে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত কালিতারা ও নিজামুদ্দীনের যৌথ লাঠি উপন্যাসের প্রারম্ভেই শ্রেণীমৈত্রীর অঙ্গীকারে যূথবন্ধ হয়ে ওঠে। শ্রমজীবী শ্রেণীর অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এবং ঐক্যবোধ ইতোপূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীঘি' গল্পেও দেখানো হয়েছে। হিন্দু যুবতীকে যখন সামন্ত জমিদারের লেঠেল বাহিনী নির্যাতন করছে, সেই পাশবিকতা দেখে খোদাভক্ত বৃদ্ধ লেঠেল হাসিতুল্লাহ ক্রোধে দুঃখে ফেটে পড়ে এবং তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যায়। বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিতুল্লাহকে আদর্শবাদী এবং শ্রেণী সংগ্রামী চরিত্ররূপে জমিদারের স্বার্থবাহী অন্যান্য লেঠেলদের প্রতিপক্ষ শক্তিতে এনে দাঁড় করানোর আভাস দিয়েছেন। সামন্তবাদের আগ্রাসন, শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রলেটারিয়েটদের শেষাবধি মরাবাঁচার লড়াইয়ে উদ্যোগী করে তুলেছেন। আমরা লক্ষ করি, সরদার জয়েনউদ্‌দীনও হাসিতুল্লার মতো নিজামুদ্দীনকেও শ্রেণীসংগ্রামী অসাম্প্রদায়িক চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভেই নিজামুদ্দীনের এই সংগ্রামী ভূমিকা শেষ পর্যন্ত প্রবল ও সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। বলা যায়, 'নীলকর ও জমিদারের শোষণের প্রতিবাদে উপন্যাসের গোড়াতেই কালিতারা ও নিজামুদ্দীনের যৌথ লাঠি যে মৈত্রী ও সহমর্মিতার রাখীবন্ধন ঘটালো উপন্যাসের শেষ প্রান্তেও তা মীর সাহেবের নেতৃত্বে ও শ্যামলালের সেনাপতিত্বে জীবনত্যাগী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অক্ষুন্ন থেকেছে।'[১০৬] গ্রামের কৃষকরা যখন সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজছে তখন কালিতারা সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বলেছেঃ

> যাতে সববনাশ হয় তা কেউ করে না, আমরাও করবো না। মানে এ তল্লাটে নীলচাষ আর হবি না। সকলের কথায় তাই–ই বোঝা গেল। তাহলি বেপদ আসবিই। ক্যান না লুভীর লোভ সহজে যায় না। তাই বলি কি– বেপদ ঘারের উপের আসে পড়লে টপ করে বুদ্ধি মেলানো যেমন যায় না; তেমনি চট করে দশজন এক সাথে হয়া লাঠিও ধরা যায় না। আর কার কখন বেপদ হবে সেডাও তো জানা কথা লয়।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণ ও নির্যাতন বিরোধী প্রতিবাদে অসাম্প্রদায়িক চেতনা অক্ষুণ্ন থাকলেও লেখক জমিদার চরিত্র সৃষ্টিতে সম্প্রদায়গত দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। এই লক্ষ্যে হিন্দু রাজা কৃষ্ণ দেবকে প্রজাশোষক ও মুসলমান জমিদার আজিমুদ্দৌলা চৌধুরীকে প্রজাবৎসল রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে সমাজমনস্তত্ত্বকে লেখক সার্থকভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। তাই প্রজাদের মধ্যে বিষ্ণু শর্মা নিশিকান্ত প্রভৃতি চরিত্রে ভীরু আপোষকামী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে ভৈরব রায়, প্রহ্লাদ মিস্ত্রি আপোষহীন শ্রেণীসংগ্রামী চরিত্রে দীপ্ত বলিয়ান। প্রহ্লাদ মিস্ত্রীর ঘোষণা ঃ

> 'কুড়োল দিয়ে জীবনভর তো কাঠই কাটলাম। কাঠই চিরলাম। এখন স্বর্গে যাবার আগে একটুখানি লড়ে যাই। যে কুড়ালির কামাই খালাম এতকাল– তার মুখে একটু রক্ত সিঁদুর মাখাই যাই– দেখে যাই জমিদার কুঠিয়াল কত শক্তি ধরে।'[১০৮]

দূর থেকে সংবাদ আসে যশোর নদীয়া কুঠিয়াল জমিদাররা প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়েছে। পাবনা ও ফরিদপুরে জ্বলছে এই আশঙ্কায় মেঘাই সরদার, শ্যামলাল, প্রহ্লাদ মিস্ত্রী, রফিক মন্ডল, কালিতারা, তোতা মীর, মীর সাহেব সহ প্রত্যেকেই সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। প্রকাশ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বেতাই, ফৈজুরী, নিশানপুর, বনগাঁ– তালগাছি, চিনেখড়াই গ্রামের কৃষকদের মধ্যে।

> 'ভোর না হতেই বেতাই, ফৈজুরী, নিসানপুর, বনগাঁ, তালগাছি চিনেখড়া প্রভৃতি গ্রামের কৃষকেরা ক্ষেপে গেল। আজ কুঠীর নীলকরদের শ্মশান হবে; সেখানে চিতা সাজাবো। নীলচাষ আর সয় না।[১০৯]

একদিকে নীলকুঠিয়ালদের নির্যাতন, অন্যদিকে দেশীয় জমিদারদের শোষণ এবং তাদের মধ্যসত্ত্বভোগী নায়েব গোমস্তাদের নির্বিচার অত্যাচারের চিত্র 'নীল রঙ রক্ত' উপন্যাসের ক্যানভাসে এক রুদ্ধশ্বাস আবহ সৃষ্টি করেছে। রাম রাম বাড়ুজ্জের মতো নায়েব চরিত্র, কালি মুখার্জী, তাউডা দেওয়ানদের কুকীর্তিতে কৃষকরা আরো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি কৃষক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ 'আর জুলুম সয় না। আমরা এমন জায়গা চাই যেখানে গোলামী নাই– জমিদার নাই, মনিব নাই, তাই আমরা লড়ব।' সুতরাং সেই লড়াইয়ে তারা জীবন উৎসর্গ করলো। কারো জেল হলো। যারা পালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া হলো। আর মেয়েরা ইজ্জত হারিয়ে পড়ে রইল শ্মশান স্বদেশে।[১১০]

বস্তুত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হবার নয়। কারণ, 'পুঁজির ইতিহাস পৃথিবীর মতই প্রাচীন, এর সূচনা নেই সমাপ্তিও নেই।'[১১১] তাই মুক্তিকামী মানুষের বিপ্লবী প্রত্যয় দিয়েই ঔপন্যাসিক কাহিনীর সমাপ্তি এনেছেন। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে মীর সাহেব কালিতারার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ শোন কালিতারা, মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন জিতবেই। কেননা, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা নিঃস্বার্থ নিঃস্পাপ। এটাই আমার স্বপ্ন।[১১২]

মূলত এই বক্তব্যের মাধ্যমেই লেখক গণজীবনের স্পন্দিত বিপ্লবকে চিরকালীন রূপ দিতে পেরেছেন। 'নীল রং রক্ত' উপন্যাসে তাই স্থানীয় বা আঞ্চলিক দ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনীন মুক্তিকামী মানুষের বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছে। সরদার জয়েন উদ্‌দীনের গণজীবনচেতনার সফলতা এখানেই নিহিত। ব্যাপক অর্থে তিনি সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে রূপ দিতে পেরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিন.

উত্তরবঙ্গের কৃষকদের স্থানীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষলগ্ন ও পাকিস্তানী শাসনের প্রারম্ভে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেভাগা প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে সারা বাংলা জুড়েই ছোটবড় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কৃষক বিদ্রোহগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এগুলো ছিল শক্তিশালী প্রতিরোধ। ১৯৪৬-এর আগস্টের দাঙ্গার এক মাসের মধ্যেই সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়।[১১৩] তেভাগা আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নরহরি কবিরাজ লিখেছেন ঃ

> 'তেভাগা আন্দোলন ছিল বর্গাদার বা ভাগচাষীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ফ্লাইড্ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) থেকে জানা যায়, ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারের জমিতে প্রজাস্বত্ত্বের অধিকার ছিল না, তারা ছিল হয় মজুরীজীবী অথবা ভাগচাষী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে ইংরেজের হৃদয়হীন শোষণনীতি বাংলার কৃষকদের জীবনে এনেছিল ঘোর অমানিশা। পঞ্চাশের মন্বন্তর এরই ফলশ্রুতি। সবার আগে ভূমিহীনরা, ভাগচাষীরা ও গরীব কৃষকেরা এই মন্বন্তরের বলি হল। মন্বন্তরের পরেই চাষীদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক ক্ষুদ্র শোষকশ্রেণী জোতদার মহাজন ফুলে-ফেঁপে উঠল। গরীব কৃষকেরা নিজের জমি জোতদারের কাছে বিক্রি করে সেই জমি চাষ করতে লাগল ভাগচাষীরূপে। সমস্ত জমি, সম্পদ জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত হল। এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকসভা আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।'[১১৪]

বলাই বাহুল্য, কৃষক সমিতির ডাকে সারা বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অল্পবিস্তর হলেও প্রায় ১৯টি জেলায় ৬০ লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রধান এলাকা ছিল- উত্তরবঙ্গ রংপুর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা আর ২৪ পরগনা জেলার আবাদ এলাকায়, যেখানে জোতদারি শোষণ ছিল সবচেয়ে তীব্র এবং বর্গাচারের সংখ্যা ছিল বেশি।'[১১৫] এই সম্পর্কে একটি রিপোর্টে বলা হয় ঃ

> উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বড় বড় জোতদারের সংখ্যাও বেশী আবার আধিয়ারের সংখ্যাও বেশী। পাঁচ হাজার, দশ হাজার বা পনের হাজার বিঘা জমি আছে, এরূপ জোতদারের সংখ্যা এ অঞ্চলে একেবারে কম নয়। অপরপক্ষে রংপুর জেলার শতকরা ৭২ জন, বগুড়ার শতকরা ৬৪ জন, পাবনা জেলার শতকরা ৫৫ জন আজ ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছে।[১১৬]

ফলে, তেভাগা আন্দোলন উত্তরবঙ্গ ও সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। গণবিদ্রোহ দমনের জন্য শাসকশ্রেণী ও কঠোর মনোভঙ্গি গ্রহণ করে। তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে উত্তর বাংলার এই জাগ্রত গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। মুসলিম লীগ তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধীতা করাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী বলে মনে করল।[১১৭] অনেক স্থানেই নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে কৃষক বিদ্রোহ দমন করা হয়। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই শহীদ হন ৪০ জন কৃষক, গ্রেফতার হন ১২০০ জন এবং আহত কৃষকের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার।[১১৮] উত্তরবঙ্গের আধিয়ার আন্দোলন রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকারের শাসনামলে এইসব বিদ্রোহ তীব্র আকার নেয়। সেই সঙ্গে বেড়ে চলে সরকারের পুলিশ বাহিনীর নির্যাতন। তন্মধ্যে রাজশাহীর নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ দমনে সরকারি নির্যাতনের মাত্রা অন্যসব ঘটনাকে

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়িয়ে যায়। বিশেষত কাক দ্বীপের অন্তস্বত্তা কৃষাণী অহল্যামাতার হত্যার পর নাচোলের ইলামিত্রের প্রতি নির্যাতন ছিল পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের এক নগ্ন প্রকাশ। নাচোলে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে রমেনমিত্র, ইলা মিত্র, কমরেড আজহার উদ্দিনের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। ইলা মিত্রকে সাঁওতালরা রাণী মা বলে ডাকত। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নাচোলের কেন্দুয়া গ্রামে পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল ও একজন দারোগা মারা যায়। এই ঘটনার পর নূরুল আমিন, লিয়াকত আলী খান সরকারের দুই হাজার সৈন্য সেই গ্রামে হামলা চালায়। এই সম্পর্কে কমরেড মনি সিং জানিয়েছেন ঃ

> 'ইলা মিত্রকেও তারা নির্মমভাবে অত্যাচার করল। সে অত্যাচারের কৌশল ভয়ঙ্কর, অমানুষিক ও বর্বর। তাঁর উপর যে পৈশাচিক ও বীভৎস অত্যাচার করা হয়েছিল, তা একমাত্র নাৎসী ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের সাথে তুলনা করা যায়। তাকে কেবল মারপিট করে শয্যাশায়িত করা হয়নি, তাঁর যৌনাঙ্গে গরম ডিম ও লোহার ডান্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সভ্য জগতে এর তুলনা বিরল।'[১১৯]

বস্তুত তেভাগার এই পটভূমিতে উত্তরবঙ্গের জনপদ কেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে অপ্রতুলও নয়। এই প্রসঙ্গে তেভাগার পূর্ণাঙ্গ পটভূমি লক্ষ করা যায়, সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯) উপন্যাসে। কাহিনীর সময়কাল পঞ্চাশের দশক এবং পটভূমি পাকিস্তানী ঔপনিবেশ শৃঙ্খলিত বাঙ্গার ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ নাচোলের লালমাটি। এই নিকট অতীত থেকে ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছেন কাহিনীর উপাত্ত। উপন্যাসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> 'বৃটিশ উপনিবেশ–শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষে ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দূর অতীত অভিযাত্রা আর বিংশ শতাব্দীর পূর্ববাঙ্গার আয়ুবী দশকে ঔপন্যাসিকের ইতিহাস আর পুরাণের প্রাণশক্তিময় জগতের শরণ–প্রার্থনা নিঃসন্দেহে ভিন্ন তাৎপর্যে চিহ্নিত। এই অর্থেই বর্তমান আশির দশকের বাঙ্গাদেশের বিরুদ্ধ প্রতিবেশে নাচোলের ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'র প্রকাশনা প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যবহ।'[১২০]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র। কৃষক বিদ্রোহ এই উপন্যাসের প্রধান অনুষঙ্গও বটে। কিন্তু মোট সাতাশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত কাহিনীর মূলসূত্র অন্বেষণ করলে বোঝা যায়, সেলিনা হোসেন এই জনপদের জীবন বৈচিত্র্যসহ ঐতিহ্যবাহী রেশন শিল্প জোতদার পরিবারের সংকট ও উদ্বেগকে রাজনৈতিক ঘটনার সমান্তরালে বিবৃত করেছেন। তৎকালীন সমাজ পরিপার্শ্বকে লেখক বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। কমিউনিস্ট নেতা এবং জমিদার রমেন মিত্রের সহধর্মীনি রূপে ১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের এই জনপদে আগমন। তারপর ঘটনা পরম্পরায় তিনি নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৫০ সালে পাকিস্তানী পুলিশের দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। বস্তুত ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালে সারা উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন যখন সাফল্য ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়ে আসছিল; ঠিক তখনই নাচোলের তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়।

> কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ থেকে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ ও নাচোলের তেভাগার দাবিতে সাঁওতাল হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষীদের আন্দোলন তীব্র বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল।[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়। লেখক জানিয়েছেন, ১৮৫৫ সালে বিহার অঞ্চলে তারা একবার বিদ্রোহ করেছিল। অত্যাচারী জমিদার ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পূর্বতন অভিজ্ঞতার কথাও এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের একটি অংশ জীবিকার সন্ধানে এই অঞ্চলে এসেছিল। লেখকের বর্ণনায়ঃ

> বিদ্রোহের পর ওদের এক অংশ এসে মালদহ জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাচোল এবং আশে পাশে বসতি গড়ে। অন্য অংশ জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি জায়গায় চলে যায়। কিন্তু যে আশায় ওরা নীড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে আশা ওদের পূরণ হয়নি। উত্তরবঙ্গের জোতদারদের পীড়নে জীবন অতিষ্ঠ হয়েছে। বর্গাদার চাষী হয়ে খেটেছে ওদের জমিতে। নিজের খরচে নিজের শ্রমে ফসল ফলিয়ে তার অর্ধেক নিজের খরচে তুলে দিয়ে আসতো জোতদারের গোলায়। এছাড়া ছিল নানা রকমের আবওয়াব ও বেগার। বড় ভয় করতো জোতদারদের খেয়ালখুশিকে। কেননা, যখন তখন বিনা কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবার ভয় ছিলো।[১২২]

উপন্যাসের বৃহৎ অংশ জুড়ে সাঁওতালদের বিদ্রোহ প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে ঔপন্যাসিক তেভাগা আন্দোলনকে একটি সার্বজনীন রূপ দিয়েছেন। সর্বধর্মের শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম এই উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যও ছিল তাই। তিনি গ্রন্থের পশ্চাৎ মলাটে উল্লেখ করেছেনঃ 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের শিল্পরূপ। এ উপন্যাসে ইলা মিত্রের মতো ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর পাশাপাশি উঠে এসেছে আরো অনেক সাধারণ জন-আনন্দ বেদনা, আশা, নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে যাদের প্রত্যেকে এক একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ইতিহাসের বিচারে তেভাগা আন্দোলন হয়তো কাঙ্ক্ষিত পরিণতি অর্জন করতে সফল হয়নি। কিন্তু এ এক অমোঘ সত্য যে কখনো নিঃশেষ হয় না জনগণের শক্তি ও সংগ্রাম। জীবনের বিনিময়ে জীবন অর্জন করে নবতর প্রেরণা। সেখান থেকে উজ্জীবিত হয় নতুন প্রজন্ম। এভাবেই ভরে ওঠে ইতিহাসের সাদা পৃষ্ঠাগুলো। উপন্যাস মানবের সঙ্গে মানবের সংযোগ সেতু। এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায় মানুষকে। কাঁটাতারে প্রজাপতি এমন এক রচনা যা পাঠককে নিয়ে যায় নিজের কাছ থেকে বহুদূরে এবং একই সঙ্গে ফিরিয়ে আনে নিজের খুব কাছে।'

কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা 'রাণী মা' বা ইলামিত্র। পাশাপাশি জোতদার আকমলের শ্রেণীচ্যুত হয়ে কমিউনিস্টপার্টির নিবেদিত সংগঠক হয়ে ওঠার ব্যাপারটিও বেশ গুরুত্ববহ। এছাড়া ছমির আলী, শান্তি, রতন, তারা বানু, আছিয়া, ইয়াসিন, রমনী, কয়েদ চাচা এবং কুতুব, জোহরা প্রভৃতি চরিত্রের ভীড় এই উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক। কারণ, তেভাগার পটভূমি নাচোলের নিস্তরঙ্গ জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখকের এই সমাজমনোস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ কাহিনীকে পূর্ণতা দিয়েছে। তবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে- হরেক চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। পার্টির কাজে অমনোযোগীতার কারণে যে হরেক প্রায়ই ইলা মিত্রের কাছে তিরস্কৃত হতো, উপন্যাসের শেষাংশে তার ভূমিকা ও দায়িত্বনিষ্ঠা সত্যিই মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। ঘটনার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৫০ সালের এক শীতের সকালে নাচোলের সোনালি ফসলের মাঠে ঘটে যায় হত্যাকাণ্ড। পাঁচ পুলিশ ও তফিজউদ্দীন দারোগা নিহত হয়। কৃষকদের এই প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের পর সরকারের সেনাবাহিনী ঝাপিয়ে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনরত কৃষকের ওপর শুরু হয় হত্যা জুলুম ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। আন্দোলনের প্রাণশক্তি ইলামিত্র ও অন্যান্যরা আত্মগোপন করেন। ইলামিত্র ছদ্মবেশ ধারণ করেও শেষ রক্ষা পাননি। ইলামিত্র সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন রহনপুর রেলস্টেশনে। তারপর শুরু হয় নির্যাতন। নাচোল থানার সেলে চারদিন বন্দী রেখে তার ওপর বিভিন্ন কায়দায় চলে নির্যাতন ও ধর্ষণ। ইতোমধ্যে আজাহার, অনিমেষ লাহিড়ী ধরা পড়ে। বন্দী হয় শত শত সাঁওতাল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাঃ ''নাচোল থানার চারদিন অমানুষকি অত্যাচারের পর ওদের নিয়ে আসা হলো চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ থানায়। এর মধ্যে ধরা পড়েছে অনেকে। শেখ আজাহার হোসেন আর অনিমেষ লাহিড়ী ধরা পড়েছে রামচন্দ্রপুরে শেখ আজাহারের বাড়িতে। ট্রেনে করে পালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কিছু সাঁওতাল, তাদেরকে রাজশাহীর কাছে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার হয়ে আসতে থাকে আরো অনেকে।''[১২৩]

এই উপন্যাসে ইলা মিত্রের প্রতি নির্যাতনের বিভৎস বর্ণনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লেখক ইলামিত্রের ডায়েরী ও জবানবন্দী ব্যবহার করেছেন। ৭-১-৫০ তারিখে গ্রেফতারের পর থেকে ২১-১-৫০ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা এই উপন্যাসের বিধৃত হয়েছে 'How Humanity Attacked under liakat-Nurul Amin Regime' ইলামিত্রের এই জবানবন্দী বিধৃত আছে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে তা সংযোজন করেছেন। বলা যায়, সেলিনা হোসেন তৎকালীন শাসকের মানবতা বিরোধী চরিত্রটিই এই উপন্যাসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি।

> 'ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন মানবতা-লাঞ্ছিত এই নিপীড়ন কাহিনী উপস্থাপন করেছেন দু'ভাবে। প্রথমত, পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইলার অনুভবজাত প্রত্যয়কে ব্যক্ত করেছেণ শিল্পিত ভাষ্যে। দ্বিতীয়ত, আদালতে ইলামিত্র প্রদত্ত জবানবন্দীর বঙ্গানুবাদকৃত অনুলিপি, কারা-হাসপাতালের শয্যার শায়িত আজমল কর্তৃক পাট করার মধ্য দিয়ে ঐ ইস্তেহারের ঐতিহাসিকতাকে তিনি প্রমাণনিষ্ঠ করেছেন।[১২৪]

বস্তুত, সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের প্রাগ্রসর চৈতন্যকেই ধারণ করেছেন। 'পুড়ে যায় গ্রাম এবং মানুষ ঘাসফুলে তবু প্রজাপতি'- উৎসর্গপত্রে লেখকের এই শাশ্বত প্রেরণাই মূর্ত হয়ে ওঠে। সেলিনা হোসেনের অপর দুই উপন্যাসে খণ্ডিতভাবে তেভাগার প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' এক (১৯৯৪) এবং 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' (১৯৮৭) উপন্যাসের কাহিনীতে তেভাগার অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে মুনীর চৌধুরীর নাটক রচনার বিষয়বস্তু রূপে বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ লেখক সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও 'গায়ত্রীসন্ধ্যা' (এক) উপন্যাসে দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের মহাকাব্যিক সময়সারণি পাওয়া যায়। এই উপন্যাসেও লেখক ১৯৫০ সালে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনর প্রসঙ্গ এনেছেন। লক্ষণীয় উপন্যাসের মফিজুলের বাবা নসরুল্লাহ ঘটনাক্রমে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের জড়িয়ে পড়েছিল। পরে রাজশাহী কলেজে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মফিজুল বহিঃস্কার ও রাজবন্দী হয়ে জেলে যাবার পর উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী কৃষক নেতা হাজী দানেশ, জান খাঁ, সীতাংশু, অমূল্য প্রমুখের সংস্পর্শে এসে আন্দোলনের প্রেরণা পায়। রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে থাকাকালে সঞ্চয় করে বিপ্লবের শিক্ষা। তখন জেলের বাইরে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপন্যাসের নায়ক রাজশাহী কলেজের বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক আলী আহমদ জানতে পারেন, খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের ওপর পাক প্রশাসনের নির্মমগুলি চালানোর খরব।

> 'খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি চালানোর খবর শোনার পর থেকে একটা লাল রঙের মহানন্দা নদী আলী আহমদের চোখের সামনে দিয়ে বইতে থাকে। স্বপ্নে বাস্তবে নদীটা ওকে ভূতের মতো তাড়া করে। জেলখানার লোকজনকে ধরে মফিজুল বেঁচে আছে এই খবরটা পেয়েছে, দেখার সুযোগ নেই।'[১২৫]

বস্তুত,পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলার স্বাধীনতাত্তোর প্রেক্ষাপট পর্যন্ত আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনা মহাকাব্যিক ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে গয়ত্রী সন্ধ্যার তিন খন্ডে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে তেভাগার ঐতিহাসিক মূল্য ঔপন্যাসিক স্মরণ করেছেন তার এই দুই ঔপন্যাসেই। তবে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' ঔপন্যাসের কাহিনীর অবয়ব নির্মাণে অনবদ্য আবহের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনসহ জাতীয় আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ 'খোয়াবনামার' কাহিনীতে যূথবন্ধ হয়ে উঠেছে। সমালোচকের বিশ্লেষণঃ

> ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ এবং ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭–এর দেশবিভাগ যদি এ সময়গুলোকে ধরেই বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, দেশ বিভাগ, ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, মুসলিম লীগ কংগ্রেস ইত্যাদি বহুবিধ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে গেছে, যা খোয়াবনামায় এসেছে ধীরে ধীরে, বর্ণনার জন্য বর্ণনা নয়, চরিত্রের প্রয়োজনেই এসেছে। তাই কোনো বর্ণনাকে চাপানো সত্য মনে হয় না বরং সত্য সত্যের মতোই, জীবন জীবনের মতোই স্বচ্ছ এবং প্রবহমান।[১২৬]

তবে উত্তরবঙ্গ তেভাগা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হলেও শুধুমাত্র সেলিনা হোসেনের 'কাঁটা তারে প্রজাপতি' ব্যতীত উত্তরবঙ্গের পটসন্ধানী অন্য কোন উপন্যাসে তেভাগার প্রসঙ্গ এককভাবে আসেনি। সম্প্রতি শওকত আলী তাঁর নাড়াই উপন্যাসে রংপুরের তেভাগা আন্দোলনে অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পটভূমি অবলম্বনে জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত অন্যতম একটি উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৯৮) উপন্যাসে অবলম্বন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। মঈনুল আহসান সাবেরের 'কবেজ লেঠেল' (১৯৯২) উপন্যাসেও বগুড়ার সল্লাপ ব্যবহৃত হলেও ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠেনি। উপর্যুক্ত উপন্যাসদ্বয় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পটভূমিতে রচিত তা ভাষা ব্যবহারে বোঝা যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত আঞ্চলিক ল্যান্ডস্কেপ সৈয়দ হকের উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে। 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ কৌশলে লেখক নিজেই কথকের ভঙ্গিতে বলছেনঃ

> 'আমরা এখন দ্রুত পায়ে পৌঁছে যাই বাংলাদেশের দূর উত্তরে, ... এখন আমরা সেই উত্তরে যাই, উত্তরের প্রাচীন একটি জনপদে যাই, জলেশ্বরীতে যাই, জলেশ্বরীর একটি গ্রামে যাই– যেতে হবে আমাদের সন্তর্পণে, এখন এ যুদ্ধের কাল যেতে হবে আমাদের টহলদার মিলিটারির দৃষ্টি এড়িয়ে, এখন এ গণহত্যার কাল, গ্রামটির নাম বকচর; লোকশূন্য এখন এ গ্রাম; এখানেই গোপন ডেরা স্থাপন করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল, জলেশ্বরী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং আমরা প্রবেশ করি প্রাচীন একটি কিংবদন্তীর ভেতরে এবং আমরা প্রত্যক্ষ করি নতুন একটি কিংবদন্তীর জন্ম।'[১২৭]

Dhaka University Institutional Repository

জলেশ্বরী অর্থাৎ সাবেক রংপুর জেলার উত্তর পূর্বদিকে কুড়িগ্রামের নদীনালাসহ ভৌগোলিক জনপদের চিত্রপটে নির্মিত উপন্যাসের কাহিনী। জনজীবনের বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে লেখক কখনো বর্তমান, কখনো অতীত ইতিহাস, লোকজ বিশ্বাস, জনশ্রুতি, কিংবা সাম্প্রতিক স্মৃতিচিত্র অনবদ্য কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রাচীন জনপদের একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে লেখক মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দীনের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন অতীত ইতিহাসের সঙ্গে আবার তৎকালীন একাত্তরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং তৎপরবর্তী সংবাদপত্রের প্রামান্য দলিলসহ সাম্প্রতিক খন্ড খন্ড ঘটনা। এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্যঃ

> সাধারণভাবে মনে হতে পারে এটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। কারণ এতে রংপুরের জলেশ্বরী অঞ্চলের জনপদের ও কৌমের সামাজিক ইতিহাস, তার কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি একটি পীর পরিবারের উত্থান-পতনের ইতিহাস, রংপুর অঞ্চলের লোকভাষা লোকসঙ্গীত, নদীনালা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।[১২৮]

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক সামাজিক ও পারিবারিক, ধর্মীয় জীবনাচারের পাশাপাশি নির্দিষ্ট জনজীবনের লোকবিশ্বাস সংস্কার কিংবদন্তী ও মিলের ব্যবহারে মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন লেখক। কাহিনীর ব্যাপক বিস্তারের ফলে ঘটনাসমূহ অতীত বর্তমানের পুনর্বিবরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মহিউদ্দিন। তিনি জলেশ্বরীর এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন শাহ সৈয়দ কুতুব উদ্দিন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে রংপুরে এসেছিলেন। মোঘল সম্রাট আকবরের পরিবারের এই শিক্ষক ধর্ম প্রচারের জন্য রংপুরে এসেছিলেন। কুতুবউদ্দিন তার সমকালে এদেশীয় হিন্দুদের পরাজিত করে ইসলামের প্রচার করেছিলেন। তারই মাজার এখন এই জনপদে কিংবদন্তী হয়ে আছে। মহিউদ্দিন সেই কিংবদন্তীতুল্য পরিবারের বংশধর এবং জলেশ্বরী কলেজের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা দলের কমান্ডার। কাজেই উপন্যাসের কাহিনী শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিন থেকে অধ্যাপক কমান্ডার মহিউদ্দিন পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটকথা, কাহিনীর অন্তর্বলয়ের সময়কাল ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই দীর্ঘ কাহিনীতে লেখক মূলত মহিউদ্দিনের যুদ্ধজীবন ও তার প্রেমিকা ফুলকির প্রেমবিষয়ক ঘটনাকে প্রধান অনুষঙ্গ করে তুলেছেন। তবে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুলতান, বশির, আলম, হায়দার, অবিনাশ, সালামত, সাত্তার প্রমুখ গেরিলা যুদ্ধের অভিন্ন সহযোগী হয়ে উঠেছে। সীমান্তবর্তী চন্দ্রনাথের ভিটেবাড়িতে তাদের ক্যাম্প। সেখান থেকেই তারা জলেশ্বরীতে পাক সৈন্যের ওপর অনেক আক্রমণ চালিয়ে সফল হয়েছে। এমনকি, মান্দার বাড়ি অঞ্চলের গেরিলা নেতা আকবর হোসেনের সঙ্গেও তাদের নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তবে মহিউদ্দিন ও তার দল বাংলার বর্ষাকালের জন্য প্রতীক্ষা করে। এই সময় জলেশ্বরীর তিন দিক থেকে প্রবাহিত আধকোশা নদী স্ফীত হয়ে ওঠে। তখন বল্লারচর থেকে হাগুয়ার হাট পর্যন্ত মরা খালগুলো কেটে দিলে আধকোশা নদী চারিদিক থেকে জলবেস্টন করে ধরবে জলেশ্বরীকে। আর জলবেস্টিত জলেশ্বরীতে বন্দী পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালানো সহজ হবে। তাই মহিউদ্দিন তার গেরিলা সৈন্যদের নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। শুধু আধকোশা নদীই নয়, এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় রংপুরের তিস্তা, মহানন্দা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর গতিপথ সম্পর্কে মহিউদ্দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও উপন্যাসের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র হচ্ছে মান্দারবাড়ির গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন। আকবর হোসেন বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মাঝে মাঝে মহিউদ্দিন ও আকবর হোসেনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও অবস্থানগত চিন্তাচেতনা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সমকালে দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রসঙ্গ কাহিনীর ব্যাপ্তি বহুদূর প্রসারিত করেছে। কিন্তু লক্ষ করা যায়, এই উপন্যাসে লেখক আঞ্চলিক জীবনসংলগ্ন অভিজ্ঞতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বিশেষ করে 'জনজীবনের নানা প্রসঙ্গে চাষী জীবনের বাস্তবতা এবং আঞ্চলিক লোকভাষার প্রয়োগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র অভিমুখী প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টির প্রভাবেই ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক সংগ্রামী আশাবাদকে তাঁর উপন্যাসে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন।'[১২৯] বস্তুত এই উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক প্রামাণ্য দলিল ব্যবহার করেছেন। ফলে ঐতিহাসিক সত্যকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথেই। কিন্তু রসসৃষ্টি বা মানবিক আবেদনের তাৎপর্যে এবং আঞ্চলিক জনপদের ব্যবহৃত অবকাঠামোগত নিপুণ প্রয়োগে তা হয়েছে নবতর সংযোজন।

অপরদিকে, মঈনুল আহসান সাবের তাঁর 'কবেজ লেঠেল' উপন্যাসে একটি অঞ্চলের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। চরিত্রগুলোর সংলাপে মনে হয় কবেজ লেঠেলের পটভূমি বগুড়া অঞ্চল। কিন্তু ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের একটি আঞ্চলিক আবহ উপন্যাসে ধারণ করলেও পটভূমির স্পষ্ট প্রয়োগ ঘটাননি। কিংবা বলা চলে, ভৌগোলিক পটভূমি উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে চরিত্রের অনুষঙ্গী ভাষার ব্যবহার সত্ত্বেও উপন্যাসটির কাহিনী শেষ পর্যন্ত বর্ণনাভঙ্গির উপর দাঁড়িয়েছে। অথচ স্থানিক পটভূমির ওপর কাহিনীর ভিত্তি গড়ে উঠলে এটি সফল সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারত।

উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি নাচোল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে ঔপন্যাসিক ভাস্কর চৌধুরী রচনা করেছেন 'লালমাটি কালো মানুষ' উপন্যাসটি। আমাদের কথাসাহিত্যে বিষয়গৌরবের দিক থেকে উপন্যাসটি অভিনব। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। মুজিব সরকার গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী প্রেরণ করে নক্শালদের দমন করতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ১৯৭৩–৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে গ্রামবাংলায় দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ডাকাতি, গ্রামের পর পর গ্রাম জ্বালিয়ে সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়। বস্তুত বরেন্দ্র ভূমির এই অঞ্চলটিও ছিল তৎকালীন এক অগ্নিগর্ভ সময়। এই সময়পটে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের সমাজ বাস্তবতার নিরীখে ঔপন্যাসিক ভাস্কর চৌধুরী 'লালমাটি কালো মানুষ' উপন্যাসে তুলে আনেন শ্রেণীসংগ্রামের ধারাবাহিক এপিসোডেরই একটি পর্ব।

লালমাটি কালো মানুষের কালপরিসরকে লেখক একটি ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় রাজশাহী জেলার পশ্চিমাঞ্চল নবাবগঞ্জ, রহনপুর, নাচোল ইত্যাদি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিভাজনের আবহ তৈরি করেছেন লেখক। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে এই জনপদের আধাসামন্ত জোতদাররা ভূমির মালিক হয়ে ওঠে। তেভাগা আন্দোলন বিরোধী এইসব ভূস্বামীদের মধ্যে হিন্দুমুসলমান উভয় শ্রেণীই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। পাশাপাশি বহু আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় চাষীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তারা ভূমির বিস্তার ঘটেয়েছিল। পাক সরকারের সময় তারা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থবাহী শ্রেণী। স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার ১০০ বিঘার উর্ধ্বে জমির মালিকানা আইনগতভাবে নিরোধ করার উদ্যোগ নিলেও বাস্তবায়ন করতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ এই আধা–সামন্ত জোতদারদের শ্রেণীশত্রু বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সমাজবাদী দলগুলোর মধ্যে মস্কো ও পিকিংপন্থী দুটো গ্রুপে বিভক্তি ঘটে যায়। পিকিং পন্থীরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপরীতে বন্দুকের নলকেই ক্ষমতার উৎস রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং শ্রেণীশত্রু খতমের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। আমাদের সমাজ অনুষঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত নিয়ে ভাস্কর চৌধুরীর 'লালমাটি কালো মানুষ' উপন্যাস।

বরেন্দ্র অঞ্চলে নকশালরা 'পেটকাটা দল' নামে পরিচিত। সত্তরের দশকের এই সময়টাতে তারা বরেন্দ্রের জোতদারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাঃ

> বেশ কিছুদিন থেকে বরেন্দ্রের কাঁকনহাট, ললিতনগর, আমনুরা নাচোল এই চার এলাকা জুড়ে চলছে। বরেন্দ্রের এই বংশের জোতদারের ঘুম হারাম করেছে। লোকে বলে পেটকাটা দল। বড় জোতদার বাথানে আসলেই এ দল খবর পায়। তারপর একদিন বিদ্যুৎ বেগে সব লন্ড ভন্ড করে জোতদারকে বাইরে টেনে আনে। তারপর জবাই করা ছাগলের মতো পা উপরে বেঁধে পেট কেটে ফ্যালে। সব ভুঁড়ি আর কলিজা হৃৎপিন্ড বের করে তার ভেতর ঢোকায় কম্বলের টুকরো। লিখে রাখে জনমের মত খা। তারপর বাড়িতে আগুন দিয়ে খুলে দিচ্ছে ধানের গোলা। লুটপাট এখন নিত্যদিনের ঘটনা। রাস্তায় ট্রাক আর গরুর গাড়ি আটকিয়ে লুট হচ্ছে ধান। লিখে দিচ্ছে 'বরেন্দ্রের সোনা বাইরে যাবে না।'[১৩০]

উপন্যাসের সূচনাতেই এমন একটি হত্যাকান্ড ঘটে। প্রধান চরিত্র বাদলের বাবা খুন হয় বাথানে। মৃত বাবার সৎকার করতে পারে না বাদল। সে নিজেও নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ বাদলকেই হত্যকারী রূপে সন্দেহ করে। তাই তাকে আত্মগোপন করতে হয়। আত্মগোপনের পূর্বমূহূর্তে বাদলের জীবনে ঘটে যায় আর একটি ঘটনা। তা হলো সাঁওতাল যুবতী কুন্তির সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তাকে চলে যেতে হয়। কুন্তির জীবনেও আছে অতীত ইতিহাস। এক মুসলমান যুবক জোতদার (মীরের ব্যাটা) অবৈধভাবে এক সাঁওতাল যুবতীর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হলে কুন্তির জন্ম হয়। ফলে, কুন্তি আর সাঁওতালদের দৈহিক রূপ নিয়ে জন্ম নেয় না। মীরদের অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা বিতাড়িত হয়ে চলে আসে চৌধুরীদের এলাকায়। কামলা কৃষক ইন্দু আর মাগুর পিতৃমাতৃ পরিচয়ে বড় হয় কুন্তি। এইভাবে কুন্তি যৌবনপ্রাপ্ত হলে বাদল চৌধুরী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের ঘটনা বিস্তারে বাদল ও কুন্তি দুজনই জড়িয়ে পড়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। কিন্তু আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির নয়। শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারারাই বিভ্রান্ত হয়। একদিকে নকশাল অন্যদিকে রক্ষীবাহিনী ত্রাস সৃষ্টি করে এলাকা জুড়ে।

> বরেন্দ্রের জীবনের সঙ্গে খুনখারবিসহ লুটপাট, দুই পার্টির আলাদা আলাদা ঠ্যালায় বাড়তে থাকে। বরেন্দ্রের মানুষ বুঝে উঠতে পারে না আসলে এসব দল কাদের জন্য কাজ করছে এবং একথা কেউ বোঝাবার জন্যে তৈরিও হয়না। ফলে তৈরি হতে থাকে ভীতি। সারাদিন বরেন্দ্রের মানুষ পরিশ্রম করে আর রাতে প্রচন্ড ভীতির ভেতর ঘুমহীন কাটাতে থাকে। কারণ এই দুই দলকে শায়েস্তা করতে রক্ষীবাহিনী বরেন্দ্রে ঢোকে এবং কোন ঘটনা ঘটলেই তারা এলাকাবাসীর উপর চড়াও হয়।[১৩১]

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গের এই বরেন্দ্র অঞ্চলকে নকশালরা মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে কাজ করে চলে। ফলে দ্বন্দ্বটা হয় ত্রিমুখী। একদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল জাসদ অন্যদিকে নকশালদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সরকারী প্রশাসন তথা রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির এই ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাঁর ভাষায় ঃ

> ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে সারা বরেন্দ্রে লুটপাট বাড়ে। জোতদারহীন বরেন্দ্রে ছোটজোতের মালিক, ধানবাহী গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ধানবাহী ট্রাকের ড্রাইভার থেকে হেলপার, হাটবাজারে মুদির দোকানদার, কেউ রেহাই পায় না হত্যাযজ্ঞ থেকে। দুটি রাজনৈতিক দল, যারা প্রাকশ্যে ও গোপনে লিফলেটের মাধ্যমে শহরের দেয়ালে দেয়ালে শ্রেণীশত্রু খতম ও বন্ধুকের নল থেকে ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে ঘোষণা প্রচার করে তারা নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বরেন্দ্রের গরীব কালো মানুষের পাড়া, লালমাটির পুরানো ঘরগুলিতে ঢোকে জীবনত্রাস। তারা বাহিরে ধান না বেচলে কাপড় পাবে কোথায়, কোথায় পাবে নৈমিত্তিক বাৎসরিক সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, তার দিশা করতে পারে না। ওদিকে নকশালবাদীরা যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে এলাকা দখল করে। দলের মানুষ দলের ভেতর লোক অদল বদলের মাধ্যমে অভিযানগুলো কেন্দ্রের অপারেশন সেলের নির্দেশক্রমে চালিযে যাচ্ছিলো, তারাও বিভ্রান্তিতে ভোগে। কারণ যে সব অঞ্চলে গাড়োয়ান মরেছে, সে অঞ্চলে ঐরাত্রে ঔই অঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত নকশালবাদীরা কোন অভিযান চালায়নি, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীরা একই বিভ্রান্তি এড়াতে পারে না। অথচ ঘটনা ঘটে যায় এবং স্থানীয় মানুষ তখন পেটকাটা দল, আর মশালবাদী দলের উপর এর চাপ চাপিয়ে নিজেদের সরকারি নিরাপত্তার জন্যে সরকারের কাছে ফরিয়াদ করে। স্থানীয় প্রশাসক মুখে বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। রক্ষীবাহিনী তার বিশাল ক্ষমতায় ঘটনা ঘটার স্থানের আশপাশের লোকজনকে পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলে।[১৩২]

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের এই আবহে লেখক নায়ক নায়িকা বাদল এবং কুন্তির জীবনে দেখিয়েছেন বিয়োত্মক পরিণতি। বিপ্লবী বাদল শহীদ হয়, কুন্তি প্রসব করে পুত্র সন্তান। জোতদারের উত্তরাধিকারী রূপে এই সন্তান বেড়ে উঠবে এমন ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয় উপন্যাসের কাহিনী। কিন্তু সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিপ্লবের অসফল পরিণতি। বস্তুত 'সমগ্র উপন্যাসের পরিণতিতে লালমাটির বরেন্দ্র ভূমির কালো মানুষের বৃহত্তর জীবনের রাগ-অনুরাগ, ঘৃণা-বিদ্বেষ কঠোর দারিদ্র্য, তার বিপরীতে শোষণ নিপীড়ন অন্যায়-অত্যাচার, তারই মধ্যে প্রভূভক্তি প্রেম, দুঃস্বপ্নে মরীচীকা, প্রচণ্ড আসক্তি আর তীব্র বিরাগ– অর্থাৎ মানবজীবনের সব কিছুর বিশাল বৃত্ত তৈরি হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয় না বলে লেখকের ওপর এক ধরনের অভিমান জেগে ওঠে। অভিমান এজন্যে যে, তিনি আশা দিয়ে তিনি আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন। বিশাল পরিব্যপ্তি জীবনের এক মহালোকগাথার সম্ভাবনাকে তিনি একটি চিকন, সংকীর্ণ গল্পের সূতোয় পর্যবসিত করেছেন।'[১৩৩] যদিও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিণতিকেই ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও কথকতার মহত্ত্বম রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে মনোযোগী হন নি। কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক যথার্থই বলেছেন ঃ

> "ভাস্কর চৌধুরীর এই বই মহাকথকতার প্রস্তাবনা মাত্র। সেই কথকতার যোগ্য প্রায় সমুদয় আয়ুধ ভাস্কর গ্রহণ করে ফেলেছেন। ভাষা, লিখনশৈলী সামান্য শ্লেষাত্মক এবং নিরুচ্ছাস একভঙ্গি দৃষ্টি যে দৃষ্টি ভিতর পর্যন্ত পৌঁছায় কিন্তু এখনও নিরাময় এবং সমগ্রতা জানেনা। বিষয়গৌরব সবই ভাস্করের আয়ত্বে এসে গেছে। এখন বিশালের জন্য আমাদের অপেক্ষা।[১৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ও জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাপকভাবেই এসেছে। কালপরম্পরা বহু আন্দোলনের পটভূমি অবলম্বিত কাহিনী উপর্যুক্ত উপন্যাসসমূহের মধ্যে লক্ষ করা যায়। কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা ছোটগল্পে অবশ্য সেই ক্যানভাস ব্যাপক যাত্রা অর্জন করতে পারেনি। তাই ছোটগল্পে স্থানীয় আন্দোলনের প্রভাব সামান্য। তবে সামাজিক অনুষঙ্গরূপে তা একেবারে উপেক্ষিতও হয়নি। বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, সদরার জয়েন উদ্‌দীনের গল্পে লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখে আসে সৈয়দ শামসুল হকের নেপেন দারোগার দায়ভার' গল্পটির কথা। কৃষকনেতা দেবেশ বক্সি জেল হাজতে নির্মম অত্যাচারে মারা যায়। তাঁর লাশ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে নেপেন দারোগা ও দুই সেপাই শিউশরণ আর রামদাস গ্রামে আসে। হিমালয়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসা আধকোশ নদীর ওপর কাঠালবাড়ি গ্রামের কৃষকনেতা দেবেশ বকসির লাশ গ্রামে নিয়ে আসবে ইংরেজ সরকারের সেপাই-দারোগা। গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে তারা। এই ভয়ে আশপাশের লোক গ্রামশূণ্য করে আত্মগোপন করে। এমনকি আধকোশা নদীর পারাপারের মাঝিও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তারা পায় সুখিয়া ডোমকে। সে নিজের ইচ্ছেয় নেশা করে টালমাটাল অবস্থায় প্রিয়নেতা দেবুদার লাশদাহ করার জন্য কাঠতেল সংগ্রহ করে। নেপনে দারোগা রাতে লাশ নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে শিউশরণ, রামদাস ও সুখিয়া ডোম ফিরে এলে শ্মশানে লাশ দাহ হবে। এমন সময় অতিলৌকিকভাবে উপস্থিত হয় এক পৌঢ়া। নদীর তীরে একদিকে মৃত্যুলাশের মাংশলোভী শেয়ালের আনাগোনা, অন্যদিকে আধিভৌতিকভাবে পৌঢ়ার ভৎর্সনা নেবেন দারোগাকে সন্ত্রস্ত্র করে তোলে। বুড়ি চিৎকার বলে, "মনোত দয়ামায়া নাই তোমার, ব্যাটা নাই তোমার। মুখ দিয়া রক্ত উঠি মইবরে তোমার একেক ব্যাটা, কয় দিলোম। হামার দেবুক তোমরা মারি ফেলাইছেন? কোন্ অপরাধ করছিল সে যে তোমার জানের উপর দিয়া উঠি গেইলো? কথা কন না বড়? ভগবান তোমার রাও কাড়ি নিছে? ভাল কইরছে। নির্ব্বংশ হন তোমরা। কুষ্ঠ হয়া ভিক্ষা করেন, মুই চোখ মেলি দ্যাখো"[১৩৫] এমন পরিস্থিতিতে নেপেন দারোগার বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। তার মনে হয় ' বুড়ি মতই আরো অনেকে, শতশত হাজার হাজার লোক আশে পাশেই অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।[১৩৬] নেপেন দারোগা নিজ হাতে কৃষক নেতা দেবেশ বসসির মুখাগ্নি করে এবং একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে ফেলে। দারোগা উপলব্ধি করে, 'চিতার আগুনে রক্তিম চাঁদের আলোর দিকে লকলক করে ওঠে। কাঠ পোড়ার চড় চড় শব্দে শতশত কণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়।''[১৩৭] বস্তুত উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলনে বহুনেতার জীবন বিনাশ হলেও আন্দোলনের অনিশেষ আয়োজনেকেই লেখক গল্পের শেষে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। কারণ, তেভাগার মরণজয়ী সংগ্রাম এই অঞ্চলে ব্রিটিশ পর্ব থেকে পাকিস্তানী শাসনামল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আরো বেগবান রূপ পেয়েছিল। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য গল্পটিতে ব্রিটিশ পর্বের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকেই অবলম্বন করেছেন। সেই পর্বে 'সামন্তবাদ বিরোধী তেভাগা আন্দোলন কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে সেই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিল।[১৩৮] আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ পটভূমি দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে আর একটি গল্প শিখেছেন কথাশিল্পী শওকত আলী। তাঁর 'নবজাতক' গল্পে তেভাগার স্মৃতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বর্তমানের শোষণ কৌশলের প্রেক্ষাপটে।

Dhaka University Institutional Repository

বংশপরম্পরা জোতদার শ্রেণীর শোষণ এবং শ্রমজীবী শ্রেণীহিংসার প্রতিফলন এই গল্পে লক্ষ্য করা যায়। 'টাঙনের ওপরকার সাঁকোটাকে এখন অতিকায় বৃশ্চিকের মতো দেখতে লাগছে। ঐ সাঁকোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মন্তাজ আলীর বহুবার শোনা সেই পুরানো কাহিনী মনে পড়ে যায়। কাহিনী নয়, বলা যায় স্বপ্ন। কবে যেন আধিয়ার আর কিষাণেরা মহাজনের ঘরে ধান তোলেনি। মহাজনের ধান বাঁচাতে পুলিশ আসে শহর থেকে। বন্দুক লাঠি আর হাতকড়া নিয়ে গ্রামকে গ্রাম কিষাণের ওপর হামলা চালায়।'[১৩৯] তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল যে রক্তে ঘামে আর মাটিতে তার অনিবার্য আবেদন শেষ হবার নয়। মন্তাজ আলী মহাজনের শোষণে নির্মমভাবে উপলব্ধি করে পূর্বপুরুষের আত্মদানের ইতিহাস। মনোহর বর্মন এখনও সেই স্মৃতিরোমন্থন করে কাঁদে। মন্তাজকে সর্তক করে কৃষক হাসেন বলেঃ

> ''হায় হায় বাপ উকথা কহিস না। কেহ শুনিলে ধরে লিয়ে যাবে। ভাতার খাকির কান্দর কত কিষাণ আধিয়ারের সভা হইল। সভার উপর গুলি চলিল। আর ধানের গোড়াত অক্ত জমাট হয়ে থাকিল কা'দর মতোন। ধানের গোড়া শুকাল, অক্তও শুকালো– সান্তালের অক্ত, পলিয়ার অক্ত; মুসলমানের অক্ত। ওহ্ সে কতো অক্ত বাহে– আর শুনিস না বাপ, উকথা শুনিবা চাহিস না।[১৪০]

কিন্তু শীতের রাতে আগুনের উত্তাপে বলশালী গোবৎসের জেগে ওঠার ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে মন্তাজের দ্রোহ। লেখক শওকত আলী এই প্রতীকের মধ্যদিয়ে মূলত নিম্নবিত্তের সংগ্রামী চেতনাকেই শাণিত রূপ দিতে পেরেছেন। গল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে সমালোচক যথার্থই লিখেছেনঃ

> হাসান আলী স্মৃতির কথা বলে, তেভাগার রক্তাক্ত যুদ্ধের স্মৃতি। সেই স্মৃতির মধ্যে গুরুটার বাচ্চা প্রসব মোটেই তুচ্ছ বিষয় নয়। নবজাতক গোবৎস আর রক্তাক্ত মাতৃজঠর মোটেই অভিন্ন নয় তেভাগার রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে। লেখক যখন বলেন, চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে শুধু সেই রক্তের আর কান্নার গন্ধের স্রোত এবং নবজাতক গোবৎস জেগে থাকে মন্তাজ আলী চোখের সম্মুখে, তখন আমরা বুঝতে পারি অগ্নিগর্ভ উত্তরবঙ্গে কেমন করে বারবার নবজাতক আসে রক্তাক্ত পথে অথচ তার চারপাশে নিয়ে থাকে অন্ধকার রাত।'[১৪১]

লক্ষণীয়, প্রাচীন সামন্তবাংলা থেকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামন্তবাদের প্রাক্কালে সমগ্র বাংলাদেশে যত কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, তার অধিকাংশই ঘটেছে এই উত্তরবঙ্গে। এমনকি, ১৯৬৭ সালে ভারতে নকশালপন্থী চরম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ী থেকেই। কাজেই উত্তরবঙ্গ বরাবরই ছিল আন্দোলনের সূতিকাগার। কৈবর্তবিদ্রোহ থেকে শুরু করে তেভাগা মুক্তিযুদধ ও নকশাল আন্দোলনের স্থানিক ঘটনা আলেখ্য তাই এই জনপদকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভূমি ও পুঁজিবাদী সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এই সমাজসত্যটি আমাদের সাহিত্যে উপেক্ষিত হয়নি। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিসংগ্রাম একটি চলমান প্রক্রিয়া– তাই সাহিত্যেও তার চূড়ান্ত পরিণতি আসতে পারে না। কিন্তু সময় ও সমাজের গর্ভ থেকে কথাশিল্পীরা খুঁজে নিয়েছেন জীবনেরই মৌলভাষ্য। উত্তরবঙ্গীয় জনপদকেন্দ্রিক এই বিষয়গৌরব নিঃসন্দেহে আমাদের কথাসাহিত্যের এক মহান অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.০৫ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ঃ

আদিবাসীরা প্রত্যেক দেশের কালিক ও সামাজিক আবর্তের সন্তান। আদিম বন্য অবস্থা থেকে শুরু করে প্রাচীন বর্বর অবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতার উত্তরণের ধারায়– মানবপ্রগতির বাইরে এমন কিছু জনগোষ্ঠী রয়ে যায়, যারা সভ্যসমাজের কাছে আদিবাসীরূপে পরিচিতি লাভ করে। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার ভারতবর্ষেও অসংখ্য আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে টিকে আছে। সভ্যতার সমস্ত সংঘাত তাদের বিপর্যস্ত করেছে। তারা বারবার বাস্তচ্যুত হয়ে যাযাবরের মতো ভেসে গেছে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই ধারাক্রম উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসেও লক্ষণীয়। উত্তরবঙ্গে প্রধানত সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহাড়িয়া, মাহালি, কোচ, মেচ, হাঁড়ি, ডোম, মুন্ডা, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি রূপে গণ্য হলেও আদিবাসীরা প্রাক্‌বাঙালি বা উৎস আদিম মানবরূপে স্বতন্ত্র জীবনবিন্যাসে চিহ্নিত। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের কালপরম্পরায় বিভিন্ন জীবিকা পেশা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে এলেও মূল জীবনধারায় হিন্দুমুসলমানের চেয়ে বিভিন্নভাবেই স্বতন্ত্র বা পৃথক। বৃত্তিক ক্ষেত্রে কৃষিজ কর্মসম্পৃক্ত হলেও পশুপালন, বন্যজন্তু শিকারের প্রতি তাদের আগ্রহ বরাবরই বেশি। সামাজিক আচার–অনুষ্ঠানেও তাদের মধ্যে আরণ্যক সংস্কৃতিই প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও লোকবিশ্বাস, প্রথাপ্রচলন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছেদ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতির দিক দিয়েও তারা উত্তরবঙ্গের হিন্দু ও নিম্নবর্গীয় গ্রামীণ মুসলমানদের চেয়ে স্বতন্ত্র। আদিবাসীরা নিজ সমাজের বাইরের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন, বৈষয়িক ক্ষেত্রেও নিরন্তর বিপর্যয়ের মুখে পতিত। বাংলাদেশে ঔপানিবেশিক শাসনকাল থেকে আদিবাসীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যক্ষ সংঘাতে আসে। রাষ্ট্র নির্মমভাবে আদিবাসীদের বিদ্রোহগুলো দমন করে। ফলে, অস্তিত্বের সংকটে পরাক্রান্ত আদিবাসীরা কখনো কখনো হিন্দু রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়েছে। তবে হিন্দু হতে চায়নি বা হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানী শাসন আমল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর প্রেক্ষাপটেও রাষ্ট্রকর্তৃক আদিবাসীরা সমান নাগরিকের মর্যাদা পায়নি। ফলে কখনো কখনো খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে শুধুই আর্থসামাজিক মর্যাদার প্রত্যাশ্যায় এবং সাংস্কৃতিক অবাধ জীবন অভ্যাসের তাগিদেই। উত্তরবঙ্গের এই জনগোষ্ঠীর একটি অংশ আদিবাসী রূপে দীর্ঘদিন যাবত শোষিত হয়ে আসছে। সমাজের নিচুশ্রেণীর মানুষরূপে তারা বিবেচিত।

তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজি 'ট্রাইব' থেকে বাংলা 'আদিবাসী' শব্দটি গৃহীত হলেও সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় আদিবাসী শব্দটি আক্ষরিক অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। বস্তুত নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় 'আদিবাসী' বা 'উপজাতি' বলে কোন স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠী নেই। সাধারণভাবে আদিবাসী বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়, যারা সেই অঞ্চল বা দেশের প্রাচীন আদিবাসী এবং আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। 'এনসাইক্লেপিডিয়া ব্রেটানিকা'–য় আদিবাসী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> In modern times the term 'Aborigins' has been extended in signification and is used to indicated the inhabitants found in a country of its first discovery in contradiction to colonies or a new races, the time of whose introduction into the country in unknown.[১৪২]

মোটকথা, আদিবাসীরা হচ্ছে অঞ্চল বা দেশের মূল বাসিন্দা এবং দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নৃতাত্ত্বিকভাবেই সুগ্রোথিত। অথচ তারা আদিকাল থেকেই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনগ্রসর আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারা নিজ দেশেই নিরন্তর মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা মূলত আদি অস্ট্রোলিয়েড এবং মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[১৪৩] ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এক জরিপে দেখানো হয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় মোট আদিবাসীর মধ্যে ৬২.০% শতাংশই হচ্ছে সাঁওতাল।[১৪৪] প্রধানত সাঁওতালরাই উত্তরবঙ্গের ভূমিজ জনগোষ্ঠী। সেইজন্যে এই দেশ ও জনপদের ভূমি এবং পুঁজির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের জীবনসংস্কৃতি অর্থনীতিতেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে তাদের জীবনে নানান সংকট এসেছে বারবার। হিন্দু ও খ্রিস্টানধর্মের কৌশলীপ্রভাব তাদের প্রভাবিত করার ফলে জীবন ও জীবিকার প্যাটার্ণ গেছে বদলে। সবচেয়ে চূড়ান্ত কথা হলো এই যে, বাংলার সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল শক্তিরূপে স্থানীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই সাঁওতালরাই। তাই স্থানীয় ও জাতীয় বহু গণআন্দোলনে আদিবাসীদের অবদান অসামান্য। তবুও রাষ্ট্র তাদের ভূমি দেয়নি, দেয়নি ভাতের অধিকার। নিশ্চিত হয়নি তাদের প্রজন্মের ভবিষ্যত।

এমনই এক সংকট ও জীবনাভিস্পাকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে পাওয়া যায় আমাদের কথাসাহিত্যেও। আদিবাসীদের সংগ্রামী ঐতিহ্য, ত্যাগ আর জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার চালচিত্র আমাদের কথাশিল্পীরা এঁকেছেন তাঁদের গল্পউপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীদের জীবনচর্চা লক্ষ করা যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখের রচনায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের জীবনভাষ্য অপরিসীম মমত্বে এঁকেছেন বিশিষ্ট কথাশিল্পীরা। তন্মধ্যে রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪), তাসাদ্‌দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৯৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন নির্মম বাস্তবতায় রূপায়িত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনের খন্ডিত পরিচয় মেলে। বিশেষ করে সাঁওতালদের তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক কথাসাহিত্য নিয়ে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দৃষ্টিপাত করেছি। তবে অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠভাবে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী মানুষের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায় শওকত আলীর (জ. ১৯৩৬) বিভিন্ন গল্পে। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হচ্ছে 'ফাগুয়ার পর', 'পুশনা', 'রঙ্গিনী' 'শুন হে লখিন্দর', 'কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ' প্রভৃতি।

উল্লিখিত গল্পউপন্যাসে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের বেদনার্ত জীবন সংকট আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের জীবনভাষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের কথাশিল্পীরা কয়েকটি প্রধান প্রবণতাকেই চিহ্নিত করেছেন। তা হলো– রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীরূপে তাদের অবস্থান। দ্বিতীয়ত সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে তাদের জীবনের নানা মাত্রিক পরিবর্তন। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়েছে, যে আদিবাসীদের নিয়ে বাম রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তঃসারশূন্য ভূমিকা– এক ধরনের সৌখিন ব্যাপার বা ফ্যাসান হয়েছে মাত্র। দায়বাদী সমাজসচেতন রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে তাদের রক্ষা করতে পারে নি। কথাশিল্পীরা এই দিকগুলোও সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন। মূলত উল্লিখিত গল্প উপন্যাসগুলোর অন্তরঙ্গ আলোচনার মাধ্যমেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই বিষয়ে প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া যায়, তাসাদদুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৩৬৬) উপন্যাসটির দিকে। বাংলাদেশের সাঁওতালদের জীবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাসরূপে গ্রন্থটি বিষয়গৌরবের দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ ধর্মীয় সংস্কার কৃষ্টি এবং ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যকেও যথাসাধ্য শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। পাকিস্তান শাসনামলে তাদের সমাজবিবর্তনের এক ক্রান্তিকালকে লেখক উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক সাঁওতালদের জীবন ও জনপদের বর্ণনা দিয়েছেনঃ

> পদ্মার পাড় থেকে হিমালয়ের সীমানা পর্যন্ত এই লাল মাটির রূপ এমনি বিচিত্র। আর ওই দেশের মানুষের রূপও তেমনি বিচিত্র। নিপুণ কারিগরের হাতে কুঁদে গড়া নিকষ কালো পাথরের মত দেহ। পুষ্ট, পেশল। কাজের সময় ঝাকড়া চুল থেকে মাংসল পেশীতে পর্যন্ত আশ্চর্য ছন্দের হিন্দোল বাঁধা থাকে। আর মেয়েরা সে মেয়েদের কৃষ্ণকলি শরীর, মসৃণ আর চিকণ কালো রঙ, উত্তাল যৌবন আশ্চর্য ফুল ফুটিয়ে রাখা সারা অঙ্গে। ... কেবল এই লাল মাটির দেশে পাওয়া যাবে এদেরকে। আর আশ্চর্য এই মানুষদের জীবন, এর হাওয়া, পরিবেশ।[১৪৫]

এই লালমাটির দেশ উত্তরপাড়া নামক একটি সাঁওতাল গ্রামের কথা নিয়েই উপন্যাসের আয়োজন। কর্মমুখর দিনশেষে রাত্রিতে শাল মহুওয়ার বনে এরা মাতাল হয়। ডিম ডিম শব্দে মাদল বাজে। নরনারী মাদলের তালে তালে নেচে ওঠে। এমনই আবহের মধ্যে উত্তরপাড়া গ্রামের কয়েকটি প্রধান চরিত্র নিয়েই কাহিনীর বিস্তার। উপন্যাসের প্রাণবন্ত চরিত্র মংলী, মঙ্গু, চুণু, চম্পা এইসব যুবক যুবতীর নিরাভরণ আদিম প্রবৃত্তির পাশাপাশি মুসলমান গ্রামীণ শোষকদের কদর্যতার চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন। আদিবাসী যুবক যুবতীরা নানা মাত্রিক সংকট থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য নিজস্ব ধর্মবোধ লৌকিক আচার বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। মূলত ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নময় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন লেখক। অর্থাৎ রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক শ্রেণীশোষণ ও গ্রামীণ অবক্ষয়ের বাস্তবতাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক তাসাদ্দুক হোসেন এই আদিম জীবনাভিজ্ঞান বর্ণনায় ভৌগোলিক ডক্যুমেন্টেশনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি, হিলি, পার্বতীপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন। সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায়ঃ 'সাঁওতাল তরুণ-তরুণী মঙ্গু ও মংলীর প্রেম-দ্বন্দ্ব-মিলনকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ সমভূমি ও বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক পটভূমিতে জীবন-সংগ্রামে রত সাঁওতাল উপজাতির সামাজিক জীবন, দারিদ্র্য, তাদের কয়েকজনের খ্রীস্টান হিসেবে ধর্মান্তর গ্রহণ, তাদের আশ্রয়দাতা জোতদার পরিবার কর্তৃক তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় দিকসমূহ আন্তরিকতার সঙ্গে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। এ গ্রন্থে লেখকের শ্রেণীসচেতনার পরিচয় অস্পষ্ট থাকে নি। তবে উত্তরবঙ্গের কৃষক-আন্দোলনের প্রসঙ্গে সাঁওতালদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের বিষয়ে লেখক গুরুত্ব আরোপ করেননি, তাদেরকে নতুন পরিস্থিতিতে সংঘবদ্ধ করার সম্ভাব্য বাস্তব-সত্যটিকেও লেখক এড়িয়ে গেছেন।'[১৪৬] এছাড়া লেখক সাঁওতাল সমাজের মৌখিক আচার ও সংস্কৃতিকে ধারণ করলেও তাদের ভাষাগত স্বরূপটি তুলে ধরতে সফল হননি। ফলে জীবনবিন্যাসে এক ধরনের রোমান্টিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, রূপায়িত হয়নি বাস্তবতার শিল্পরূপ।

উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও ওঁরাও সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪) একটি শিল্পসফল উপন্যাস। কাহিনীর প্রেক্ষাপট পুরনো হলেও বক্তব্যে রূপায়িত হয়েছে জীবনের নতুন তাৎপর্য। লেখক কাহিনী নির্মাণে আমাদের নিয়ে চলেন এক আদিমতম আবহের ভেতর।

Dhaka University Institutional Repository

> বিশাল আদিম আরণ্যক ভূখণ্ড। সেই আরণ্যক ভূখণ্ডেই বাস করে আরণ্যক মানুষ। চাঁচিয়া, ধানজুড়ি, ঘিরলা, খাগড়াবনে অরণ্যচারী মানুষেরা বসত গড়ে তোলে। পাড়া বসায় শিকার করে। প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নীলাভ কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ হড়। হড়রাই সেই নীলাভ অন্ধকারের পবিত্রতা দু'হাতের মুঠোয় ভরে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আর অনেক দূরে থেকে শঙ্খিনী সাপের আঁকা বাঁকা দেহভঙ্গীর কুটিলতা নিয়ে পথ খোঁজে খোঁজে এগিয়ে আসে সভ্যতা।[১৪৭]

অরণ্যের বুক চিরে যায় অদ্ভুত যন্ত্রদানব। আদিবাসীদের কাছে এই যন্ত্রদানব সংবাদ নিয়ে আসে বাইরের সভ্যতার। 'গ্রামের সবচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষ কিষাণ কুজুর বলেছে, 'ওটা নাকি কলের সাপ। মুখ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে পেট বোঝাই মানুস নিয়ে ঝড়ের গতিতে জঙ্গাল মাঠ ডাঙ্গা নদী পার হয়ে যায়। বীরবাড়ির মানুষেরা ওঠাকে বলে য়্যালগাড়ি। বীরবাড়িতে রাজবংশীদের বসবাস বেশি। ওরা অন্যরকম। শিকার করে না। চাষাবাদ করে। দূর দূরান্তের হাটে গঞ্জে যাওয়া আসা ওদের। ওদেরই একজন একবার খাগড়াবনের হাটে এসে বলেছে– 'ওটা শিলিগুড়িতে যায়। লোকেরা দূরের পথে ওই রেলগাড়ি চড়েই যাওয়া আসা করে।'[১৪৮] বস্তুত আদিবাসীদের অতিপ্রাকৃত আদিম জীবনের ভূখণ্ডকে লেখক স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য রেলগাড়ির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। একদিকে, ফিউড্যাল সমাজের অগ্রগতিতে শিল্পপুঁজির বিকাশের ইঙ্গিত, অন্যদিকে আদিবাসীদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থানের দুই রূপের মধ্যে রেলগাড়ির বর্ণনা দিয়ে লেখক নিগূঢ়ভাবে সমাজবাস্তবতাকেই তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালি ঘূর্ণি' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ–র 'লালসালু' উপন্যাসেও অনুরূপ রেলগাড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'চৈতালি ঘূর্ণি'–তে আদিবাসী সাঁওতালদের সামনে সভ্যতার বিস্ময়কর দানবরূপে রেলগাড়িকে এনেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রেলগাড়ির ব্যবহার করেছেন ক্ষমাহীন ক্ষুধার্ত বিশ্ব থেকে জীবিকার সন্ধানে মানুষের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার মাধ্যম রূপে। রিজিয়া রহমান রূপদক্ষ শিল্পী হিসেবে তাঁর উপন্যাসের প্রারম্ভেই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, ফুলবাড়ি, বীরগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে একদিকে সাঁওতাল সমাজ অন্যদিকে সামন্ত হিন্দু মুসলিম শাসনের ফলে অগ্রবর্তী জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিযুক্ত রেলগাড়িকে উপস্থাপন করেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রতীক হিসাবে। একদিকে জেগে উঠছে সমাজবিভক্ত উচ্চশ্রেণীর মানুষের প্রাচুর্য, অন্যদিকে বেড়েই চলেছে আদিম মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস। রিজিয়া রহমান 'একাল চিরকাল' উপন্যাসে এমনই এক নির্মম সমাজবাস্তবাতাকে শিল্পায়িত করেছেন।

কাল নদীর এপার ওপার দুই রকম দৃশ্য। একপারে খাগড়াবন, মাদারী ঝাড়, শালবন। এখানে বাঘ বুনোশুয়োর নীলগাই নির্বিঘ্নে ঘোরে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে বুনোহাতি, অজগর পদ্মগোখরো, হরিণ। হোপনা সরেন, চুবকা, ঝুড়ুমারন্ডী, মুংলা প্রজন্ম পরম্পরায় বন্য পশুপাখি শিকার করে। অপর পারে, দিগন্ত দূরবিস্তৃত মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে চলে রেলগাড়ি সভ্য সমাজের দিকে। তবুও কাল নদীর পাড়ে ওঁরাও সাঁওতালরা ঘরবাঁধে, স্বপ্ন দেখে, ভালবাসে, জন্ম দেয় সন্তানের। কিন্তু এই অরণ্যের জীবনও নির্দ্বন্দ্ব নয়। তাদের ওপর নেমে আসে সভ্য মানুষের অত্যাচার। কখনো অত্যাচার করে সামন্ত জমিদার। তাদের বন্দুকের নলে ঝরে কালো মানুষের লাল রক্ত। কখনো খ্রিস্টান পাদরী ছদ্মবেশী দয়ালু রূপে প্রবেশ করে ওদের প্রাকৃত প্রাঙ্গণে। বিলুপ্ত করে সাঁওতালদের লৌকিক বিশ্বাস ও জীবন সংস্কৃতিকে। ফাগুয়া, পুশনার মত উৎসব তাদের জীবন থেকে চলে গেছে। অরণ্যের সম্পদ, কৃষিক্ষেত চলে গেছে জমিদার নায়েবের

Dhaka University Institutional Repository

দখলে। আর শারজম বিহারে চলছে খনন কাজ। ভূমিহীন আদিবাসীরা ক্ষেত মজুরের কাজে দলে দলে চলেছে শারজম বিহারের দিকে। শারজম বিহার প্রজেক্ট পরিচালনা করছেন আর্কিওলজি এক্সক্যাভেশন ডিরেক্টর ডক্টর আব্বাস। তিনি আবিষ্কার করেন দুটো টেরাকোটা। পোড়ামাটির মূর্তিতে দেখা যায়, মশাল হাতে শিকারের পশু তাড়িয়ে চলেছে একদল আদিবাসী মানুষ। অন্য টেরাকোটায় দেখানো হয়েছে হাতির পিঠে সোওয়ার এক রাজপুরুষ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আদিবাসী মানুষকে।

টেরাকোটার প্রত্নভাষ্যে ডক্টর আব্বাসের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের আদিম লড়াই। একদিন জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষ এই সাঁওতালরা বিহারের ময়ূরাক্ষীর স্রোতে রক্তগঙ্গায় ভেসে ভেসে এই জনপদে এসেছিল। গড়ে তুলেছিল আরণ্যক ভূমি জুড়ে তাদের আবাসন। একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছিল। এই শালবনে ওরা বাঁচার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। একদা রাজাবাহাদুরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছিল। বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসা আগুনে ওদের বুক পুড়ে গিয়েছিল। এখন তারা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। তারা গরীব খ্রিস্টান। তবে তারা আজো স্বপ্ন দেখে সাঁওতাল অধ্যুষিত এই শারজম বিহারে খনন কাজ শেষ হলে বেরিয়ে আসবে কেরোসিন খনি। দূর হবে তাদের দুঃখ। কিন্তু– ''কালচক্র ঘুরে চলে। কালনদী বহে যায়। একদিন যা ছিল আদিবাসীদের উৎসব মুখরিত জনপদ তা হয়ে যায় শ্রীহীন পরিত্যক্ত ভূমি। হোপনা সরেন– পলাময়ী–বেসরা চম্পা–চুবকা– ফুলাও–হাসদা– ঝড়ু মারন্ডী মুরকা– মুল্লা মুনি পিওনি প্রমুখ আদিবাসীদের দুঃখ হরণের ক্ষুধাক্ষরণের দিন আজ অতীত। সেদিনের সুখ দুঃখের কথা যার মনে নিঃশব্দ ঢেউ তোলে, সে হলো খনন প্রজেক্টের নাইট গার্ড বুড়ো মার্টিন লূথার সোরেণ। এক্সক্যাভেশন উপলক্ষে মাটি খোঁড়া হচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। কোদালের মুখে উঠে আসে শারজোম বিহারের প্রত্ননির্দশন। সোরেন স্বপ্ন দেখে আর এক পৃথিবীর, সেখানে সে আর তার বোন সেরমা দিমস তৈরি করতে চেয়েছিল সবুজ স্বপ্ন।[১৪৭] এইভাবে ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান আদিবাসীদের প্রত্নজীবন ভাষ্যকে আধুনিকতার মাত্রা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সাঁওতালদের লৌকিক বিশ্বাস, প্রথা সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ভাষা ও সঙ্গীতের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক সফল হয়েছেন। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন বাস্তবভাবে জীবন চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন।

আদিবাসী সমাজের অতিঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় শওকত আলীর ছোটগল্পে। এই অপজাত নিম্নশ্রেণীর মানুষের বর্হিবাস্তব ও মনোবাস্তবের জগতে লেখকের সফল বিচরণ। আদিবাসী সাঁওতাল ক্ষেতমজুর, দুর্ভিক্ষপীড়িত কুলিমুটেমজুরদের আদিম অন্ধকার জীবনের আচরণ–ভাষা সংস্কৃতি এ সবই তাঁর গল্পে বিশ্বস্ত বর্ণবীক্ষণে অঙ্কিত। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের মানবেতর জীবনের রূঢ়বাস্তব রূপ সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা ও ধারণা খুব স্বচ্ছ থাকায় তিনি এদের জীবনাচারণের নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বেশ কিছু গল্পে। 'ফাগুয়ার পর' এই ধরনের একটি গল্প। বৃদ্ধ সাঁওতাল সুখলালের জীবন উপলব্ধির নির্মমতাকে উপজীব্য করা হয়েছে এই গল্পে। বৃদ্ধ বয়সে সুখলালকে সন্তানদের সংসারে পরজীবী জীবন যাপন করতে হয়। সুখলাল রোদে বসে ঝিমোয়। পিঁচুটি ভরা চোখ তুলে পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকায়।

> 'পিঁচুটি ভরা ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে সুখলাল দেখে তিনটে মাতাল জ্যোৎস্নালোকিত উঠোনের ওপর টলে টলে নাচছে আর গান গাইছে। সুখলাল দেখে ঝাপসা চোখে। কিছু কথা বলতেও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। ঘুমের ব্যাঘাত হয়,তাই একদিন চিঁ চিঁ করে ক্ষীণ গলায় আপত্তি জানিয়ে ছিলো বলে তিন ভাই মিলে ওকে লাথি মেরে মেরে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছিলো।'[১৫০]

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেরা নেশা করে বুঁদ হয়ে ঘরে ফেরে। বনোয়ারীলাল, গিরিধারী, ছেদিলাল তিন ভাই নেশার ফূর্তিতে নাচে, গান গায়। আবার ঝগড়াঝাটি মারামারি করে। সুখলাল নিরবে দেখে সেইসব দৃশ্য। তাদের মধ্যে খুনোখুনির উদ্যম দেখে সুখলাল শঙ্কিত হয়, নিরবে কাঁদে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় যৌবনের দিনগুলোর কথা–

> 'সেই গাড়ির তীব্র সিটি, দুদ্দাড় করে প্লাটফর্মে ভিড় জমানো। হুড়মুড় করে গাড়ির কামরায় লাফিয়ে ওঠা। মাথায় মোট তুলে ছুটে বেরুনো গেট থেকে। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে পয়সার জন্যে ঝগড়া করা। গেলো কোথায় দিনগুলো, কোথায় উধাও হলো সেই পরিচিত পুরনো দুনিয়াটা।'[১৫১]

যৌবনের ভোজবাজি আর বার্ধক্যের কাতরতার মাঝে সুখলাল মেলাতে পারে না জীবনের সদর্থক কোন উপলব্ধি। বড় ছেলের বউ গঙ্গামায়ীকে সুখলাল স্নেহ করে কন্যাতুল্য। কিন্তু গঙ্গামায়ীর প্রতি বনোয়ারীলালের উদাসীন্য সুখলালকে মর্মাহত করে। সে মনে মনে শঙ্কিত হয় হয়তো গঙ্গামায়ী দিনের পর দিন বনোয়ারীলালের অনাগ্রহে অন্যপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। তাই গঙ্গাকে সে উপদেশ দেয়, পরপুরুষের প্রতি নজর দেয়া অন্যায় পাপ। এই কথা শুনে গঙ্গা ক্ষেপে যায়। 'হাঁ বুড়ো, এই দেখছো তুমি। আমার চরিত্র দেখছো এখানে বসে বসে। আর আমি তোমায় ঘিউ–তেল কলা দিয়ে পূজো করছি। হায় ভগোবান, এ বুড়ো মরে যায় না কেন গো।'[১৫২] বনোয়ারীলাল বাপকে তর্জন করে বলে, 'শালা বুড়ো বয়সে এই ল্যাজ গজাচ্ছে তোমার। নিজের বেটির মতো ছেলের বউয়ের ওপর খারাপ নজর দাও।'[১৫৩] সেই সঙ্গে বানোয়ারীলালের দুইভাই এসে যোগ দেয়। সুখলালকে বলে, 'এ শালা লুচ্চা, নিজের বউ থাকতে অন্যের বউয়ের দিকে নজর ছিলো। রান্ডীবাজি করেছে বুড়ো বয়সেও। এ শালার আদতই হলো বজ্জাতের আদত।'[১৫৪] সুখলালের অথর্ব বার্ধক্যের অসহায়ত্ব চরিত্রের আন্তঃমানস প্রতিক্রিয়ায় তীব্র হয়ে ওঠে। আপনজনদের কাছে এমন নির্মম আঘাতে বুক ভেঙে যায় সুখলালের। তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকে নিজের ভেতরের শক্তি জাগাতে চেষ্টা করে। মনে হয় 'সমস্ত শক্তি একত্রিত করে একখানা হাতে এবং একখানা পায়ে আনলো। নিজের শরীরটা যে এতো ভারী হতে পারে কোনদিন ভাবেনি সুখলাল বুড়ো। চকিতে একবার মনে পড়লো সে কুলির দল ছাড়িয়ে বিদ্যুৎ গতিতে মাথার প্রকাণ্ড মোটটা নিয়ে সকলের আগে ছুটে বেরিয়ে এসেছে, পেছনে ট্রেনের ইঞ্জিনটা চিৎকার করে উঠেছে একটু আগে। গেটের কাছে একটুখানি হুড়োহুড়ি। তারপর হালকা পায়ে লাফিয়ে উঠেছে কাঠের ওভার ব্রীজের ওপর। তরতর করে ছুটে চলেছে সবাইকে পাশ কাটিয়ে।'[১৫৫]

বস্তুত, সুখলাল অবচেতনে এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পৌঁছে যায় মৃত্যুর মোহনায়। 'ফাগুয়ার পর' গল্পের নামকরণের মধ্যে লেখক একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করেছেন। সুখলাল চরিত্রের দুটো রূপ গল্পে বিশেষত্ব পেয়েছে। বার্ধক্যের জ্বরামৃত্যুর যন্ত্রণা, অন্যদিকে যৌবনের সুখস্মৃতি সুখলালের পৃথক অনুভূতিকে স্পষ্ট করে তোলে। ফাগুয়া হচ্ছে সাঁওতালদের বসন্তকালীন একটি উৎসব। এখানে ফাগুয়ার পর বলতে লেখক সুখলালের অবসিত যৌবনের মুহূর্তকেই এবং মৃত্যুকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্ন্তচেতনার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে শওকত আলী মূলত সাঁওতালদের সামাজিক ও পারিবারিক যূথহীন জীবনের বাস্তবতাকেই মূর্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'ফাগুয়ার' মত 'পুশনা'ও হচ্ছে সাঁওতালদের একটি সামাজিক উৎসব। শওকত আলী 'পুশনা' গল্পেও আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন বাস্তবতার রূপায়ন ঘটিয়েছেন। মহুয়া মদের নেশায় সাঁওতাল নরনারীরা প্রায় নগ্ন হয়ে উন্মত্ত যৌবনলীলায় মত্ত হয়। প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে এই নেশা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দলে দলে সাঁওতালরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় পুশনার উৎসব আর জমে ওঠে না। ফসল তোলা শেষ হলে আগের দিনে সাঁওতালরা দল বেধে শিকারে যেতো। জঙ্গালের মাঝে শিকার পুড়িয়ে সারারাত ধরে আনন্দে নাচ গান করতো। তাতে তাদের আদিম দেবতা বুড়ো বোঙ্গা তুচ্ছ হতো। কিন্তু বুড়ো গুপীনাথ আজ দেখে ভিন্ন দৃশ্য। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বধর্ম ত্যাগ করছে, আগের মতো মাদলের শব্দের নয়, গির্জার ঘন্টাধ্বনি তাদের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। গুপীনাথ উপলব্ধি করে ঃ

> কালী বোঙা, বুঢ়া বোঙা, শিব বোঙা, সবাইকে ভুলে এরা গির্জায় নাম লিখিয়েছে। এই শীতে সাহেবের হাত থেকে টাকা আর কম্বল পাবার জন্যে খৃস্তান হয়েছে। দেওবারে গীর্জায় দাঁড়িয়ে যিশু বোঙার গান গেয়েছে।[১৫৬]

অথচ পশুনা ফাগুয়ার আমোদ ফূর্তির মাধ্যমে সাঁওতালরা তাদের স্বাধীন চারিত্র্যকেই তুলে ধরতো। ছোটনাগপুর, দুমকা, হাজারীবাগের সাঁওতালরা একদা স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণায় খ্রিস্টান ইংরেজ সাহেবদের বিরুদ্ধে তীর ছুঁড়ে লড়াই করেছিল। সেই সময় খ্রিস্টান সাহেবদের বন্দুকের সামনে বিদ্রোহী সাঁওতালরা আত্মাহুতি দিয়েছিল। সেই বিদ্রোহী চেতনা সাঁওতাল যুবক যুবতীদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকার কথা। কিন্তু ডেভিট মাস্টার সেই দ্রোহী চেতনা আর সাঁওতালদের আদি পুরুষের ঐতিহ্যকে ম্লান করে যিশুর প্রতি আহ্বান জানায়। ফলে বৃদ্ধ গুপীনাথ ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করেঃ শালা গরু। ঘাস ছাড়া সব যেমন কিছু বোঝে না; এ শালা ডেভিডও যিশু ছাড়া কিছু বোঝে না।[১৫৭]

গির্জার ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সাঁওতালদের প্রাণের সুরের সংযোগ নেই। ঔপনিবেশিক নির্মম বর্বরতার অনুষঙ্গারূপে এই দেশে গির্জার ঘন্টাধ্বনি এসেছে। গল্পকার গুপীনাথের আশ্চর্য জীবনবোধের মধ্যে তুলে ধরেন এই সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপঃ

> নেশাগ্রস্ত, মাতাল, ক্রুদ্ধ আর শক্তিমান বুড়ো গুপীনাথ উপুড় হয়ে পড়ে থেকে বহু দূরাগত একটা ঘন্টাধ্বনি শুনলো, যে ঘন্টাধ্বনি শুনলে রাগে তার ব্রহ্মতালু উথলে উঠতো- সেই ঘন্টাধ্বনি ধীর লয়ে ডেকে ফিরছে মানুষদের। গুপীনাথ বুড়ো শেষবারের মতো ছুটে যেতে চাইলো। উঠতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাত-পাগুলো পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। নাড়াতে পারলো না। তখন ছুটে যাবার ইচ্ছাটাকেও ছেড়ে দিলো সে। আর খোলা মাঠের মাঝখানে আকাশের নীচে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে শুনলো, ঘন্টার শব্দ বাজছে, ক্রমাগত চারদিকে বেজে যাচ্ছে অনেকগুলো ঘন্টা। সেই শব্দ শুনতে শুনতে আরেকবার মাথা তুলে শুনতে চেষ্টা করলো, পুশনার মাদল করতালের বাজনা কানে আসে কিনা।[১৫৮]

বস্তুত, আলোচ্য গল্পে লেখক সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিপন্ন অস্তিত্বের স্বরূপটি প্রতীকায়িত করে তুলেছেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীরা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ক্রমেই জাতিচ্যুত হয়ে পড়ছে। এটাই বৃদ্ধ গুপীনাথের বেদনা। শওকত আলীর একাধিক গল্পে গুপীনাথ চরিত্রটি এসেছে। তাঁর 'রানীগঞ্জ, অনেক দূর' গল্পটিও সাঁওতাল সমাজকে নিয়ে এবং এই গল্পের চরিত্রও বৃদ্ধ গুপীনাথ। উত্তরবঙ্গের হাড় কাঁপানো শীতে দরিদ্র সাঁওতালদের মিশনের পাদ্রীরা কম্বল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই বৃদ্ধ গুপীনাথ

Dhaka University Institutional Repository

অনেক দূর হেঁটে নজিপুর মিশনে গিয়েছিল কম্বলের আশায়। কিন্তু কম্বল না পেয়ে ফিরে যেতে যেতে দেখা হয় তার গাঁয়ের ছেলে ঢেলা কিস্কুর সঙ্গে। ঢেলা কিস্কু মিশন স্কুলে লেখাপড়া করেছে, এখন নসীপুরের পাঠশালায় পন্ডিতি করে। তার সঙ্গে কথোপকথনে ব্যর্থ ক্ষুব্ধ গুপীনাথ বলে, 'দেখিস নাই ধলা ফুলের বাসনা কম, ধলা গরুর দুধে মিঠা কম, ধলা মেঘে পানি নাই, শরীলে ধলা দেখা দিলে চটক ব্যামার নয়। যে শালা ধলা মানুষকে বিশ্বাস করে, সে শালা বেকুব।[১৫৯]

বৃদ্ধ গুপীনাথ কষ্ট করে পথ চলছে, শীতের আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করবে। এমন আশঙ্কায় ঢেলা কিস্কু তাকে নসিপুরের স্কুল ঘরে রাতে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করে। বৃদ্ধ মানুষ শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজলে কষ্ট পাবে, রোগ হবে ইত্যাদি বলে তাকে থাকার প্রস্তাব দিলে গুপীনাথ হেসে ওঠে। তার বিশ্বাস সাঁওতালরা কখনো বৃদ্ধ হয় না। কিস্কুকে বলে–

> 'সান্তালের বাচ্চা কখনো বুড়া হয় না রে। শালের পাতায় করে দু চুম্বক পচুই খেলে জওয়ান মাঝিনের সঙ্গ নাচবার জন্যে তার রক্ত চনচন করে ওঠে। হামি বুড়া কেন হতে যাবো? বুড়া হয়েছিস তোরা। এ তোদের কেমন পরব বাপ, সে হামি বুঝি না, আঁ? পচুই নাই, মান্দল নাই, নাচ নাই। মরদের জাঙ্গোর সঙ্গে সঙ্গে লেগে জওয়ান মাঝিনের টালমাটাল পা নাচতে নাচতে টাল খেয়ে পড়ল না, এ কেমন পরব হলো তোদের আঁ?'[১৬০]

মিশন পড়ুয়া ঢেলা কিস্কু বলে 'উসব পাপ'। তারা বোঙা বিশ্বাস করে না। সে জন্যেও গুপীনাথের আফসোস। কালো কালো সাঁওতাল নারীর পেট থেকে জন্ম নিচ্ছে ধলা ধলা সন্তান। এইসব কতবড় পাপ ভাবতেই গুপীনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে গুপীনাথ রেগে ওঠে বোঙার ওপরও। মহাজন ধান লুট করে, ঘরে ভাঙে, ভিটে ছাড়া করে তাড়িয়ে দেয়, পুলিশ এসে সাঁওতালদের পেটায়, মহাজনের ব্যাটারা সাঁওতাল যুবতীদের টেনে নিয়ে নিয়ে পেট বানিয়ে দেয়, এইসব যদি যুগ যুগ ধরে সাঁওতালদের সয়ে যেতে হবে, তবে বোঙার দরকার কি? ক্রমাগত ক্রোধে আর হতাশায় গুপীনাথের শুরু হয় শ্বাসকষ্ট কাশি। শীতের সন্ধ্যায় আকাশ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টি। শীতের কম্বল প্রত্যাশী গুপীনাথ খোলা আকাশের নীচে ভিজতে ভিজতে উপলব্ধি করে নসিপুর থেকে রানীগঞ্জ বহুদূরের পথ। অর্থাৎ সাঁওতালরা এই হীমযুগ থেকে উষ্ণ রোদ্দুরের সকালে কোনদিন পৌঁছুতে পারে না। গুপীনাথ বুড়োর জীবনবোধের মাধ্যমে মূলত শওকত আলী সাঁওতাল সমাজের চিরকালীন পরাধীনতা ও শোষণের ভয়াবহ নগ্নতাকে রূপ দিয়েছেন।

ক্রমাগত মার খেতে খেতে বেঁকে যাওয়া মানুষগুলো যখন পিঠটান করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের ভয়ঙ্কর জেদী রূপটি প্রকাশ পায়। 'কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ' শওকত আলীর এমনই এক দ্রোহী চেতনার গল্প। দিনাজপুরের টাঙ্গোন নদী পারের সাঁওতাল পল্লীতে ঘটে চলেছে নানা পরিবর্তন। বৃদ্ধ কপিলদাস মর্মুর চোখের সামনে ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। শুধু বার্ধক্যে এসে তার জীবন টাঙনের মৃদু প্রবাহের মতোই নিঃস্তরঙ্গ। এখন তার জীবন স্মৃতি আক্রান্ত।

> পুরনো ঘটনা ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিয়ে আসে চোখের সামনে। পুশনা পরবে কি তুমুল নাচ জুড়েছে দেখো কপিলদাস। তার গলায় বাঁধা মান্দল কী রকম শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়েদের গলায় কেমন শানানো স্তব। কপিল দাস দেখতে দেখতে নিজের যৌবন কালে চলে যায়।[১৬১]

যৌবনে মহাজনের খামারবাড়িতে সমস্ত ধান জোর করে কিষাণদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল। এক পাদ্রি সাহেবকে নৌকা থেকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। বনে খড়গোশ শিকার করতে গিয়ে বাঘের

Dhaka University Institutional Repository

বুকে তীর গেঁথে হত্যা করেছিল বিরাটাকার চিতাবাঘ। আর এখন টাঙনের তীরের সাঁওতাল বস্তী উচ্ছেদ করে সেখানে মহাজনের ট্রাক্টর চলে আসছে সাঁওতালদের ঘরের আঙিনায়। গুড়িয়ে দেবে সমস্ত কিছু, বাস্তচ্যুত হবে সাঁওতালরা।

> 'ট্রাক্টর চলে আসবে সংসারের বুকের ওপর? সংসারের বাচ্চা কাচ্চা, গাই গরু, সব্জিক্ষেত, সুখ আহলাদ সব কিছুর ওপর দিয়ে গড়গড় করে চলে বেড়াবে-ই কেমন কথা, ম্যানেজার মহাজন ওরকম হুকুম কেমন করে দেয়?'[১৬২]

মহিন্দর, দীনদাস, আরো সব সাঁওতাল যুবকেরা এমনকি সাঁওতাল সর্দার গুপীনাথ কেউই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। কপিলদাস চড়া গলায় বলে, 'ক্যানে হামার কমরত, জোর নাই আঁ?' কিন্তু তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। তার নিজের ছেলে মহিন্দর পর্যন্ত বিরক্ত হয়। বৃদ্ধ কপিলদাস দমে না। সাঁওতাল বাচ্চাদের সাথে গল্প করে বাঘ শিকারের। তারপর তাদের ধনুকের ছিলায় জোর টান দিয়ে গেঁথে ফেলে তীর। দূরে অন্ধকারের অদৃশ্যে ছুঁড়ে প্রথম তীর। 'চারিদিকের মানুষের বসত। মেয়েরা বুড়োর কান্ড দেখে হাঁ হাঁ করে ওঠে। সভার মানুষের মধ্য থেকেও কয়েকজন এগিয়ে আসে। ... আর সেখান থেকে সে তার তৃতীয় তীরটা সঠিক নিশানায় ছুঁড়বার জন্য তৈরি হতে থাকে।'[১৬৩]

বৃদ্ধ কপিলদাসের এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের দ্রোহী চেতনাকেই লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রতিবাদী কপিলদাস হয়ে উঠেছে সংগ্রামের প্রতিবাদের এক বিপ্লবী প্রাণপুরুষ।

শওকত আলী কপিলদাসকে অন্ধকারের মধ্যেই জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেখিয়েছেন। মূলত সাঁওতালদের জীবনের বিশাল অংশই অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে আছে আদিমতার গন্ধ। লেখক তাই বারবার অন্ধকারের দৃশ্য এঁকেছেন। 'পুশনা' গল্পে গুপীনাথ দেখেছে অন্ধকারের মধ্যে লন্টন হাতে ডেভিট মাস্টার ও তার দুই সাগরেদ ঢুকে গেছে সাঁওতালদের ভেতরের প্রাঙ্গণে। সেখানে মাতাল বেহুঁশ হয়ে আছে সাঁওতাল যুবতীরা। 'ফাগুয়ার পর' গল্পে বৃদ্ধ সুখলাল দেখে, তার অবাধ্য সন্তানেরা 'মাঝ রাতে একে একে ঘরে ফেরে তারা। ঘরে বাতি জ্বালায় না কেউ। এসে অন্ধকারেই পড়ে থাকে ঘরের ভেতরে। মাতলামির ঘোরে গলা ছেড়ে গাঁ গাঁ করে গান করতে থাকে।'[১৬৪] কিংবা 'রানীগঞ্জ অনেক দূর' গল্পে বৃদ্ধ গুপীনাথ নসিপুর থেকে ফেরার পথে প্রবেশ করতে থাকে বিশাল অন্ধকার গহ্বর। 'গুপীনাথ বুড়োর তখন মনে হচ্ছে সে দৌড়ে চলেছে। অন্ধকার বনপালার ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। ... আসমানে এখনো ভুলকা তারা ওঠেনি। রাত পোহাতে অনেক দেরি।'[১৬৫] 'কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ' গল্পেও 'কপিলদাস বুড়ো দু'হাতে তীর ধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে। বিমূঢ় মানুষজনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অন্ধকার গাছপালা কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়।'[১৬৬]

এইভাবে অন্ধকারের কোলাজওয়ার্ক নির্মাণ করছেন শওকত আলী। আদিবাসী জীবনের ভয়ঙ্কর এই আদিমতার এক দুর্ষর্ষ চিত্র পাওয়া যায় তাঁর 'শুন হে লখিন্দর' গল্পেও। গল্পের শুরুতেই লেখকের বর্ণনাঃ

> 'লণ্ঠনের আলোর নিচে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাতে তখনও রক্তাক্ত ছুরিখানা। ঐ অবস্থাতেই সে দু'হাতে সদ্য ছাড়ানো গোসাপের চামড়াখানা মেলে ধরে। বলে, তুই সদাগর লখিন্দর বাবু, বহত জানবুজ তোর, কহ রক্তই তো জানোয়ারের জান, না কী'?[১৬৭]

ছাল-ছাড়ানো রক্তাক্ত গোসাপ মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে গুপীনাথ তার মহাজন লক্ষীকান্তের সঙ্গে কথা বলে। শোষক মহাজন শ্রেণীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল সাঁওতাল সমাজ। যুগ যুগ ধরে তাদের শোষণ করে চলেছে

Dhaka University Institutional Repository

মহাজনেরা। সাঁওতাল প্রজারা মহাজনদের সমীহ ও ভয় করে। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রজাদেরও ভয় করে মহাজন। রক্তাক্ত গোসাপ যখন আক্রোশে আর্তনাদে ঘরের মেঝেতে ছুটোছুটি করে তখন লক্ষীকান্ত মহাজন গুপীনাথের ঘরের চকিতে বসে উপলব্ধি করতে পারে সাঁওতাল জাত ক্ষেপলে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। গুপীনাথ মহাজন লক্ষীকান্তের সঙ্গে পুরনো হিসেবের বোঝাপড়া করতে চায়। মহাজনকে জব্দ করার জন্যে থলের সাপের বাঁধন খুলে দেয়। বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকে ভয় দেখায়। কৌশলী লক্ষীকান্ত তাকে বশে আনতে বিভিন্ন কসুর করে। এক সময় সিগারেট বের করে নিজে ধরায় এবং গুপীনাথকে দেয়। মাথা ঝাঁকিয়ে গুপীনাথ বলে, 'উ বান্দরের চ্যাট হামি খাই না, তুই খা।'[১৬৮] লক্ষীকান্ত তাকে যতই এগিয়ে যেতে পাশ কাটাতে চায়, গুপীনাথ ততই তাকে ফাঁদে আটকায়। তার একটাই দাবি, পুরনো হিসেব মিটিয়ে ফেলতে হবে। উন্মাদ সাপুড়ে সাঁওতালের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে ভেবে লক্ষিকান্ত ভয়ে হীম হয়ে আসে। রাতে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে চাইলে গুপিনাথ তা নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারেই হিসেব চুকিয়ে নিতে হবে তাকে। সকালের জন্যে তার প্রতীক্ষার সময় নেই। লক্ষীকান্তের সকাল বেলা হিসেবের প্রস্তাব শুনে গুপীনাথ হো হো হেসে উঠে বলে–

> 'নিন্দ হামার আসে না লখিন্দর– সদাগর নিন্দায়, তার বহু সনকা নিন্দায়, ব্যাটা লখিন্দর নিন্দায়, পুত্রোহু বেহুলা নিন্দায় জগৎ সংসার নিন্দায়– কিন্তুক জাগে কে? না মা বিষহরি। মা বিষহরি নিন্দায় না, তার সন্তানেরা নিন্দায় না। আসমানের দেওয়া নামে গাহি বিরিক্ষ উলট–পালট করে– ডরে কেহ বাহার থাকে না– কিন্তুক ঐ সময় কে থাকে বাহার? কহ লখিন্দর কে থাকে বাহার? বাহার থাকে বিষহরি মায়ী আর তার সন্তানেরা। হামি বিষহরির সন্তান, বিষহরি মায়ী যেমন দুনিয়ার পাপ–তাপ জ্বালা যাতনা বিষ নিজের ভিতর ধরে রাখে আর নিজে নিজে জ্বলে, হামরাও অমন। আমিও বিষ ধরে রাখি আর জ্বলি। বুঝে দেখ, সওদাগরের বেটা লখিন্দর গহমা হামার ভাই, আলাদ হামার ভাই, বোরাও হামার ভাই– হামরা সবাই বিষ ধরে রাখি তাতে দুনিয়াটা শান্তিতে থাকে। কিন্তুক যুদিন হামার শান্তি থাকে না, হামাকে যদি মারে ফালাবা চাহেন– তেখুন? মহাজন বুঝে দেখ, তেখুন হামার আর উপায় নাই– হামরা তেখুন দংশাই।'[১৬৯]

গুপীনাথের দ্রোহ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। গল্পে মীথের রহস্যময় পরিবেশে ফুটে ওঠে জীবনের অসামান্য আয়োজন। প্রজন্ম পরম্পরায় শোষণের যে খতিয়ান তার হিসেব মেটাতে চায় গুপীনাথ। তার বক্তব্য–

> হিসাবটা যে বহুত দিনের লখিন্দর। কতোদিন আর ঘুরে ঘুরে যামো হামরা। সান্তানী পাহাড়ত হামার দাদা, পরদাদার বাস ছিল। কালীনাগের রক্ত হামার শরীলে বহে যাচ্ছে। কতকালের পুরানা হিসাব, ফম করে দেখ তুই। কত আকাল গেল, ব্যারাম গেল, বানবরিষা গেল– কিন্তুক হামরা খোরকি পাই নাই। সদাগরের বেটা সেই হিসাবটা ইবার দিবা হবে।'[১৭০]

গুপীনাথের এই দ্রোহের মুখোমুখী লক্ষিকান্ত মহাজন সমূহ বিপদের আশঙ্কায় অনুরোধ করতে থাকে– নিভন্ত লণ্ঠনে তেল দিতে। অন্ধকার তার বড় ভয় করে। কিন্তু গুপীনাথের নির্দয় উচ্চারণ 'লখিন্দর হামরা কিন্তুক আন্ধারে থাকি। আন্ধারে জনম, আন্ধারে মরণ। ... ইবার হামি নিন্দামো, এক চোখ হামার নিন্দাবে অন্যচোখ থাকবে সজাগ। বিষহরি মায়ীর একচোখ, সেই চোখটা হামি আর যে চোখ কানা, সিটা হইল হামার ভাই কালি গহমা। কালি গহমার বস্তার মুখ হামি খুলে দিনো। হামার হিসাবটা মিটায় দে তুই।'[১৭১] আজন্ম বিদ্রোহী সাঁওতালের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পায়। অত্যাচারী মহাজনদের রাতের ঘুম হারাম করে দিতে পারে গুপীনাথদের বিদ্রোহ। 'শুন হে লখিন্দর' গল্পে শওকত আলী অঙ্কন করেছেন তারই ভয়ালরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল আদিবাসী ছাড়াও শওকত আলীর গল্পে ডোম ঝাড়ুদার ('রঙ্গিনী' রঙ্গিন) রাজবংশী ('মনোহর' বর্মন/ লেলিহান সাধ, রামদাস বর্মন/ 'ভবনদী') প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষের কথাচিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের খণ্ডিত জীবনচিত্র সেলিনা হোসেন, ভাস্কর চৌধুরী, মঞ্জু সরকার প্রমুখের গল্প উপন্যাসে মূর্ত হয়ে ওঠে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সাঁওতাল ওঁরাওদের জীবন নিয়ে প্রত্যাশিত বড়মাপের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র থাকলেও আমাদের কথাসাহিত্যে সেই প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। সামগ্রিকভাবে যে সামাজিক নির্যাতন ও অবক্ষয়ের মাঝে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা অস্তিত্ব ধারণ করে আছে তার সঠিক চালচিত্র আমাদের কথাসাহিত্যে ব্যাপক মাত্রা অর্জন করতে পারেনি।

৪.০৬ দুর্ভিক্ষের চিত্রপট ঃ

বাংলাদেশের সমাজাশ্রিত কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের খণ্ড খণ্ড নানাচিত্র মূর্ত হয়েছে। সাহিত্যে বিধৃত এইসব চূর্ণচিত্রের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের বাস্তব অবয়ব। বস্তুত পঞ্চাশের দশকটি ছিল বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে বড় রকমের অভিঘাতের সময়। এই সময় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ মুখ্য উপজীব্য রূপে দেখা দেয়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র উপমহাদেশের কঠিন সময় ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে কথাসাহিত্যেও পালাবদল ঘটতে থাকে। গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেনঃ 'বাঙলা উপন্যাস শুধুমাত্র ব্যক্তি প্রধান জীবনচিত্র না হইয়া ঘটনা প্রধান সমাজচিত্র হইতে চাহিতেছে। ...উহা একটা পরিবর্তনমান পৃথিবীর এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিতে যত্নপর।'[১৭২] সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র ও সমাজের রূপান্তরের অভিঘাতগুলো তীব্র হয়ে উঠেছিল। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনে মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা এবং স্বাধীনতাত্তোর সামাজিক অবক্ষয়ের নানামাত্রিক ক্ষয়ক্ষয়িষ্ণুতার পটভূমিই আমাদের কথাসাহিত্যেরও ক্যানভাস। সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলো কথাশিল্পীরা রূপায়িত করেছেন তাঁদের কথাসাহিত্যে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই তখন চলছিল এইসব মানবিক অভিঘাত। লক্ষ্য করা যায়, এই দশকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংকটগুলো নিয়েই বাংলার কথাসাহিত্যিকরা গল্প উপন্যাস লিখেছেন। ফলে সামগ্রিক অর্থে অবিভক্ত বঙ্গসাহিত্যে এই মানবিক অভিঘাতগুলো স্মারক হয়ে আছে। সমালোচক বলেন ঃ

> 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বুকে দেয় মন্বন্তর অসহায় মৃত্যুর মিছিল, উত্তাল গণবিক্ষোভ, আগস্ট বিপ্লবের মত সত্যিকার জাতীয় বিপ্লব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অসহনীয় তীব্রতা তিক্ততা, মুদ্রাস্ফীতি, যথেচ্ছ যৌন সংসর্গের সুযোগ-সুবিধা, মুনাফাখোর-মজুতদার কালোবাজারির জন্ম, মধ্যবিত্ত জীবনে বুকচাপা অসহনীয় দারিদ্র্য, কৃষকদের ভূমিহীন দাসত্ব ও মৃত্যু, অবাধ গণিকাবৃত্তি, ভদ্রসমাজে সর্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করার গোপন ক্ষয়রোধের মত বীজাণু সঞ্চার এক কথায় সমস্ত রকম জীবন ও সমাজের অন্তর্নিহিত সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের অপচয়, মহতী বিনষ্টি। আর এই সমস্তই বাংলা কথাসাহিত্যে স্থান গ্রহণ করেছে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে।'[১৭৩]

বলা বাহুল্য, দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও এই ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। দেশীয় জীবন পরিবেশে পূর্ববঙ্গের লেখকগণ মানুষের ঐ সব অভিঘাতগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত করেছেন তাঁদের গল্প উপন্যাসে। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক কাঠামোতে রচিত কথাসাহিত্যের পটভূমিতেও প্রধান প্রধান সামাজিক ও মানবিক সংকটগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি, স্বাধীনতার পরও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক জীবনে সে অবক্ষয়ের চিত্র ফুটেছে, তাও অন্বিষ্ট হয়েছে কথাসাহিত্যে। বর্তমান আলোচনায় উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পউপন্যাসে প্রতিফলিত সমাজচিত্র অনুসন্ধানই আমাদের অন্বিষ্ট। তবে স্মরণ করা প্রয়োজন, সামগ্রিক মূল্যায়নে বাংলাদেশ ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কলোনি মাত্র। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ও জীবনে সামগ্রিক অর্জনের মূলে রয়েছে কলোনিয়াল অভিজ্ঞতা। সমালোচক বলেন ঃ

> উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উন্মূলিত অস্তিত্ব গ্রামীণ জনস্রোতের নগরমুখিতা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি এই ভূখণ্ডের জীবনবিন্যাসকে করে জটিল ও দ্বন্দ্বময়।[১৭৪]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কৃষিকেন্দ্রিক সামন্ত শোষণ, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসন–শোষণে বাংলাদেশের জনজীবন বংশপরম্পরায় পরাধীন রয়ে যায়। অব্যাহতভাবে বাংলার মানুষের জীবনে যুক্ত হতে থাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানামাত্রিক সংকট। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, পাকিস্তানী শাসন নির্যাতন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, সর্বোপরি ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট, খাদ্যাভাব, হত্যা, লুণ্ঠন; অন্যদিকে শিল্প ভূমি প্রভৃতি পুঁজির অবৈধমালিকানা সমাজদেহে গভীর ক্ষত ও ক্ষয়ের সৃষ্টি করে। সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রায়ণের জন্যে লড়াই সংগ্রাম দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশের মানুষকে নির্মম আত্মপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ফলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের মানুষ অব্যাহতি পায়নি। ভূমিজ মানুষ ভূমিতে পায়নি নিজস্ব অধিকার। ফলে, সমাজের অসম বিকাশের ধারাবাহিকতায় পূর্বাপর সমাজকাঠামোর মধ্যেই নিহিত রয়ে যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের বীজ। বারবার বাংলাদেশে দেখা দেয় মারাত্মক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ।

সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদগণের মতে, দুর্ভিক্ষ দুটো কারণে হয়। প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।[১৭৫] বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ। প্রকৃতির নেতিবাচক দিকগুলো জনজীবনের ওপর যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তবু বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের মূলে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য ব্যাপার। এদেশের অধিকাংশ দুর্ভিক্ষ মনুষ্যসৃষ্ট। দেশে দীর্ঘ স্থায়ীভাবে খাদ্যঘাটতিকে দুর্ভিক্ষ বলে চিহ্নিত করা হলে বলা যায় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ এখন একটি স্থায়ী সমস্যা। দুর্ভিক্ষ সমস্যাকে বলা হয়ঃ

> True Famine shortiag of tatal food so extreme and pratraceted as to result in widespread persisting hunger, notable emaciation in many of the affected population and a considerable elevation of community deathrate attribatable at least in part of deathes from starvation.[১৭৬]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার, খাদ্যঘাটতি, মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি সংকটগুলোই দুর্ভিক্ষের কারণ। বিশেষজ্ঞগণ কোন দেশের নিম্নরূপ অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলে চিহ্নিত করেন। যেমনঃ

১. অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি;
২. শহরাভিমুখে মানুষের যাত্রা বৃদ্ধি;

Dhaka University Institutional Repository

৩. অপুষ্টির প্রকোপ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি;
৪. বাজারে খাদ্য সংকট দেখা দেয়া;
৫. প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগের পরপর জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা;
৬. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি;
৭. বেকার ও ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি;
৮. অন্য কোথাও থেকে ত্রাণের জন্য খাদ্য সহজে সংগ্রহ করা যায় না;
৯. মানুষ গাছের পাতা কচুর লতা, মান কচু খেতে শুরু করে;
১০. অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়;
১১. সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে খাদ্য ঘাটতি ঘোষণা করে।[১৭৭]

বঙ্গাদেশে বিভিন্ন সময়ে মন্বন্তর হয়েছে। পূর্বাপর বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ[১৭৮]

সাল	দুর্ভিক্ষের কারণ	পরিণতি
১৭৬৯-৭০	মানুষ ও প্রকৃতি সৃষ্ট	মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা যায়।
১৮৬৬	প্রকৃতি সৃষ্ট	দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু।
১৯৪৩	মানুষ ও প্রকৃতি সৃষ্ট	সরকারী হিসাবে ১৫ লক্ষ এবং বেসরকারী হিসাব মতে ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল।
১৯৭৪	মানুষ ও প্রকৃতি সৃষ্ট	ব্যাপক অন্নকষ্ট ও বহুলোক ক্ষয় হয়।

দেশবিভাগের পূর্বে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগের পর ১৯৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে। সেই সময় বহুমানুষ গ্রাম থেকে খাদ্যের সন্ধানে কলকাতায় ও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বড় শহরগুলোর রাস্তায় ফুটপাতে বস্তিতে উন্মুল উদ্বাস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। 'মন্বন্তরগ্রস্ত মানুষজনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। কেবল বেঁচে থাকার সমস্যাই (Struggle for existence) প্রধান হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তাই স্বাভাবিক নীতিবোধ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। অনাহারের চাপে পিতা সন্তান বিক্রি করে, স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অর্থের বিনিময় নারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়।'[১৭৯] ১৯৪৩ এবং ১৯৭৪ সালের দৈনিক পত্রিকার পাতায় পাতায় এই ধরনের বহু রিপোর্ট প্রকাশ হয়। 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় লেখা হয়ঃ 'দারিদ্র্যের জ্বালায় পূর্ববঙ্গে অসঙখ্য নারীর বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন। বহু অভিভাবক কর্তৃক পুত্রকন্যা বিক্রয়।'[১৮০] ১৯৭৪ সালেও বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রাম থেকে ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন শহরে খাদ্যের সন্ধানে মানুষ জড়ো হয়েছিলেন এবং পথে ঘাটে পড়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। চুয়াত্তরের গ্রাম' শীর্ষক এক রিপোর্টে আনু মুহম্মদ লিখেছেন ঃ

> 'ক্ষুধার কাছে স্নেহমমতা ভালবাসা টিকতে পারেনি। তাই গ্রামে অভূতপূর্ব পত্নীতালাকের হিড়িক পড়েছিল এবার। শতাধিক পরিবারে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ না ঘটলেও সবাই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। সবাই অক্ষম, অসহায়, আশ্রয়হীন। স্বামী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, স্ত্রী পারলে চেয়ে চিন্তে খাচ্ছে; ছেলেমেয়েরা পথে পথে পড়ে মরছে। কেউ কারো দায়িত্ব নিতে পারছে না।'[১৮১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় সমগ্র দেশে ৪ হাজার ৪ শত ১৫টি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন ৩০ লক্ষ দুস্থ লোককে রুটি বিতরণ করা হতো। ঢাকায় গড়ে প্রতিদিন ৮২ জনের লাশ দাফন করা হতো।[১৮২] তবে এই অবস্থার আরো ভয়াবহ রূপ ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায়। গ্রামগুলো প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছিল। নারীরা দলে দলে পতিতাবৃত্তিতে নেমে পড়ে। শিশুরা অপুষ্টি অনাহারে আমাশয়, করলো প্রভৃতি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ক্রমেই খাদ্যদ্রব্য বাজারে দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অপর একটি রিপোর্ট বলা হয় ঃ

> 'বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে প্রতি মন মোটা চালের খুচরো মূল্য ছিল ১৪১.৭৮ টাকা (সরকারী হিসাব কৃষি বাজারজাতকরণ পরিদফতর) আগস্টে তা হয় ১৪১.২৫ টাকা, সেপ্টেম্বরে ২২১.৮০ টাকা এবং অক্টোবরে তা দাঁড়ায় ২৫১.৭৮ টাকায়। রংপুরে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক ছিল। জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে প্রতি মণ মোটা চালের দাম ছিল যথাক্রমে ১৫০.০৫ টাকা, ১৭৪.৭৫ টাকা, ২৭৩.৬৩ টাকা এবং ২৭৪.৭৮ টাকা। বেসরকারী হিসাব মতে দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে চালের দাম অবশ্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার মাঝামাঝি ওঠানামা করত। অপরদিকে, কৃষি শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় ছিল সমগ্র বাংলাদেশে ৮.০৬ টাকা, রংপুরে ৬.৩৩ টাকা। রংপুরে লঙ্গরখানায় শতকরা ৮২% পরিবার ছিন্নমূলে পরিণত হয়েছিল এবং ২৪.৭৫% পরিবার বিছিন্ন হয়েছে।[১৮৩]

সেই সময় রংপুরের ৫৮ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ৬০% ছিল ভূমিহীন। ফলে, ব্যাপকভাবে বেকারত্ব বেড়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয় ঃ বর্তমানে রংপুরে শতকরা ৫ জন ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী। শতকরা ১০ জন আটা ও ভাত খাচ্ছে। শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ জনের কোন ক্রয়ক্ষমতা নেই।[১৮৪]

বস্তুত দেশবিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশে এমন কতকগুলো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে যে সমাজের বিবর্তনের ধারাও সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। আর এইসব সামাজিক অভিঘাত সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পরও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে প্রতিবছরই প্রায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নিরব দুর্ভিক্ষ চলে। স্থানীয়ভাষায় একে বলা হয় উত্তরবঙ্গের মঙ্গাকাল।[১৮৫]

১৯৯১ সালেও উত্তরবঙ্গের এইসব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয়। ১৯৯১ সালে পত্রিকার প্রতিবেদনে লেখা হয় ঃ সাম্প্রতিক বন্যায় গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ বহু জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ কৃষি শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বন্যার কারণ জেলায় খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। ফলে অখাদ্য খাওয়ায় সারা জেলায় ব্যাপক আকারে ডায়রিয়া এবং আমাশয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত জেলায় ১৫৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।[১৮৬]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন 'ক্ষুধার রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক রচনায় ক্ষুধার সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করে বলেছেন– দুর্ভিক্ষ ও স্থায়ী বঞ্চনা ব্যাপক অপুষ্টি দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের কারণ। ভারতে স্বাধীনতার পর দুর্ভিক্ষ হয়নি, কিন্তু ব্যাপক অপুষ্টি ও অনাহারের সমস্যা রয়ে গেছে।তাই ক্ষুধা সমস্যাকে দূর করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।[১৮৭] অনুরূপ বাংলাদেশেও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পরও উত্তরবঙ্গে অপুষ্টি অনাহার বিপুল জনগোষ্ঠীকে বিকলাঙ্গ করে রেখেছে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরের দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে লেখা হয়েছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

> গোটা পঞ্চগড় জেলা মঙ্গার কবলে পড়েছে। দিন যতো যাচ্ছে মঙ্গা বা আকালের ভয়াবহতা ততোই বাড়ছে! জেলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে কর্মসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। পঞ্চগড় জেলার পাঁচটি উপজেলার দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, পাথর শ্রমিক ও ভূমিহীন পরিবারের প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছে। ... খোদ সরকারি দলের নেতারাও অভাবের কথা স্বীকার করেছেন। অভাব মোকাবেলায় জেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে ৫শ' ভিজিএফ কার্ড ও টেস্ট রিলিফ হিসাবে ১৯৯ টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ... কেউ কেউ আগাম ফসল বিক্রি করে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে। মজুরি নেমে গেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। দিনমজুররা বাধ্য হয়ে ঘরের খুঁটি, চালা, ছোট ছোট গাছ, হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল, থালা বাসন অল্পদামে বিক্রি করে দিয়ে জীবন ধারণ করছে। ... অন্যদিকে চাল, ডাল, লবণ মরিচ, পিঁয়াজ, কেরোসিন, সোয়াবিন তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্য সামগ্রীর দাম লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৮৮]

কাজেই বলা যেতে পারে, খাদ্যসংকট উত্তরবঙ্গের বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি স্থায়ী সমস্যা। বিপর্যস্ত কৃষির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শহরগুলোতে নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি, যেখানে মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। রাজশাহী নবাবগঞ্জের রেশম শিল্প, নাটোরের চিনি শিল্প, টেক্সটাইল মিলস, পাবনার তাঁত শিল্প, বগুড়ার স্টীল মিল, ব্যাবল শিল্প, ঔষধশিল্পের দিক থেকেও অনগ্রসর। অর্থনীতিবিদ ফারুক আবদুল্লাহ এক গবেষণায় দেখিয়েছেন– 'বাংলাদেশের মোটশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা মাত্র ২১ শতাংশ ১৯৮৬ সালে বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত এবং এগুলিতে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৯ শতাংশ বরেন্দ্রভূমিতে আছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তাতে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৮ ভাগ ও ১৭ ভাগ ছিল বরেন্দ্রভূমিতে। বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৩.৭ শতাংশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ২৪.২ শতাংশ বাস করে বরেন্দ্র ভূমিতে। এদিক থেকে দেখা যায়, বর্তমানে বরেন্দ্রভূমি গোটা বাংলাদেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ।'[১৮৯]

শুধুই তাই নয়, উত্তরবঙ্গের সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে নিহিত রয়েছে এদেশের জাতীয় রাজনীতির অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটও। রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সূত্র ধরে অসৎ নেতৃত্ব, সামরিক শাসকের ছত্রছায়ায় পেটিবুর্জোয়া আমলাতন্ত্র, গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু অংশের নগরকেন্দ্রিক জীবনবিন্যাস ইত্যাদি বিবর্তনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। ফলে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রামীণ ও শহরে মধ্যবিত্তের টানাপোড়ন ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলে। কালোবাজারী, ঋণখেলাপী, আদম ব্যবসা, নারী নির্যাতন, শিশুশ্রম প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ প্রবণতা– এমন সব ঘটনা গভীরভাবে সমাজদেহকে প্রভাবিত করতে থাকে। সমাজের এইসব বৈশিষ্ট্য কথাসাহিত্যিকরাও তাঁদের গল্পউপন্যাসের অনুষঙ্গ করে নেন। বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাপকতা গভীর অন্বেষণের ব্যাপার। বাংলা সাহিত্যে দুর্ভিক্ষর ছবি যেন এপিসোডের মত চিত্রায়িত হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসমূহ যথাক্রমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯–১৯৭১) 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮–১৯৫৬) 'চিন্তামণি' (১৯৪৫), গোপাল হালদারের (১৯০২–১৯৯৩) পঞ্চাশের পথে (১৯৪৪), 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৪–১৯৫০) 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯), সরোজরায় চৌধুরীর (১৯০৩–১৯৭২) 'কালোঘোড়া' (১৩৫৩), সুবোধ ঘোষের (১৯০৮–১৯৮০), 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) প্রভৃতি অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত উপন্যাসগুলো তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত। অপরদিকে, দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের লেখকদের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌র 'লালসালু' (১৯৪৮) শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'আলমনগরের উপকথা' (১৩৭১), শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫), শওকত ওসমানের 'জননী', আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' প্রভৃতি অন্যতম। অনুরূপ বাংলা ছোটগল্পেও দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ভীড়', 'পার্থক্য', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষলক্ষ্মী', 'বোবাকান্না', ইস্কাপন', 'অহেতুক', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ', 'বন্যা', 'কন্ট্রোলের লাইন', 'মানুষ ও গরু', সরোজরায় চৌধুরীর 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'আগুন', 'ছন্নছাড়া', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরোসিন', 'হাড়', 'বস্ত্র', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অবগার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজকাল পরশুর গল্প' গ্রন্থের সবগুলো গল্প এবং 'পরিস্থিতি' সংকলনের কয়েকটি গল্প দুর্ভিক্ষের পটভূমি আশ্রিত। এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ', 'রসাভাস', 'পুনশ্চ', 'মদনভস্ম', কমলকুমার মজমুদারের 'নিম অন্নপূর্ণা', নারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত', 'কালোজল', 'দুঃশাসন', 'হাড়, ননী ভৌমিকের 'একদিন ১৯৪৪', 'কাফের' প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত গল্প। এছাড়াও বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের রচিত দুর্ভিক্ষের গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা', 'মৃত্যুযাত্রা', শওকত ওসমানের 'একশ বছর পরে', 'আজবজীবিকা', 'ব্ল্যাক আউট', 'আকালের গল্প', হাসানাত আবদুল হাই–এর 'ক্ষুধা', বিপ্রদাস বড়ুয়ার 'বানভাসী' প্রভৃতি। উল্লিখিত গল্পউপন্যাসের অধিকাংশেরই প্রেক্ষাপট ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন স্থানিক পটভূমিকে অবলম্বন করে রচিত।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটভূমিকেন্দ্রিক দুর্ভিক্ষের উপন্যাসসমূহের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'নারীরা', 'ইহা মানুষ' অন্যতম। উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের ক্যানভাস ব্যাপকভাবে আশ্রিত না হলেও ছোটগল্পের খন্ড খন্ড চিত্রে একটি সামগ্রিক সমাজকাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলোর মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', শামসুল হকের 'মোমবাতি', সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'কসম', শওকত আলীর 'আকাল দর্শন', ডাকিনী', 'অচেনা', সোজা রাস্তা' এবং কথাশিল্পী মঞ্জু সরকারের 'মজ্জাকালের মানুষ' গ্রন্থের 'প্রিয় দেশবাসী', 'কার্তিকের অতিথি', 'গো–জীবন', 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা', অবিনাশী আয়োজন', 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা', 'ভূতের সাথে যুদ্ধ', 'আমৃত্যু আকালু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব উপন্যাস ও ছোটগল্পে উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের চালচিত্র ফুটে ওঠে। লক্ষণীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন কালিক ও স্থানিক আবহ এইসব গল্পউপন্যাস ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত গল্পউপন্যাসগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনার দাবি রাখে সৈয়দ শামসুল হকের 'নারীরা' (১৯৯৯) উপন্যাসটি। ব্রিটিশশাসিত বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীজীবনের করুণ আলেখ্য এই উপন্যাসের কাহিনী। উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল। অবশ্য কাহিনীর পটভূমি নির্মাণে লেখক কৌশল অবলম্বন করেছেন। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে বাংলাদেশের নারী সমাজের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক অত্যাচার নির্যাতনের বিষয়গুলো উপস্থাপনের প্রয়োজনে লেখক গ্রহণ করেছেন একটি ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপট। ফলে অতীত ও বর্তমানের আবহে কাহিনীর যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাক্রমের ইঙ্গিত দিয়ে লেখক প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। ব্রিটিশ শাসক তখন জাপানী সৈনিক ও বঙ্গদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু-এর আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার সারা দেশে সৈন্য ছাউনি ফেলেছে। তার মধ্যে অন্যতম সেনাছাউনি কুড়িগ্রাম অঞ্চলে, বুড়ির চর অঞ্চলের আবহ নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত। তবে যুদ্ধ ও সেনাছাউনি আবহমাত্র। মূল কাহিনী ১৯৪৩ সালের তথা পঞ্চাশের মন্বন্তরকে নিয়ে। যখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে মানুষ বিপর্যস্ত, তখন বুড়ির চরে ব্রিটিশ সৈনিকরা ছাউনি ফেলেছে। উপন্যাসের কথক মকবুল উৎকর্ণ শ্রোতা বালকদের গল্প শোনায় ঃ

> 'তার বাদে মাথা ঘুরি যায় ইংরেজের। এলায় উপায়? সুভাষ বোস যে যোগ দিছে জাপানীর সাথে। এলায় তো তাঁই ভারতবর্ষ ইংরাজের হাত হতে উদ্ধার করিয়াই ছাড়িবে রে। এদিকে হামার ইন্ডিয়াতেও জনগণের মধ্যে ধুমা ধরি উঠিছে আন্দোলন- তখন জিন্না কি করে? সে তখন ইংরাজের কানে কানে কয়, হামার যে পাকিস্তানের দাবী সেই পাকিস্তানের রাজী হয়া যান, ভারতবাসী সকল মোছলমান মুঁই তোমার পিছনে দেমো কাতার বান্দিয়া। নামাজ না পড়ে জিন্না, বড় মুসলমান তাঁই, ইসলামের নামে এক দ্যাশ চায় পত্তন করিতে। এদিকে গান্ধীর দল নামিছে রাস্তায়- ভারত, ভারত ছাড়ো, আগে তোমরা ভারত ছাড়ো। বড় লাট বদলি হয়া যায়, নয়া বড় লাট হয়া ওয়াভেল আসেন, সমস্বরে ভারতবাসীরা কয়, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হ্যায়, ওয়াভেল পাক্কা গুন্ডা হ্যয়।'[১৯০]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে সামন্তশ্রেণী ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক সাধারণ মানুষেরা আরো বেশি শোষিত ও নির্যাতিত হয়। সেখানেই সৈনিক ক্যাম্প ফেলা হয়েছে, তার পাশেই গড়ে উঠেছে পতিতালয়। খাদ্যের সংকটে অভিভাবকরা দিশেহারা। ফলে নৈতিকতায় ধ্বস নামে। গ্রামের অল্পবয়েসী ও যুবতী মেয়েরা খাদ্যের জন্য পতিতালয়ের খাতায় নাম লেখায়। এমনই এক অন্ধকার অস্বস্তিকর সমাজপরিবেশে লাজলজ্জা ও মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অধরচন্দ্রের দুইকন্যা তৎকালীন ব্রিটিশের দালাল ইউনিয়নবোর্ডের সেক্রেটারি বিভূতিচন্দ্রের পা ধরে অনুরোধ জানায় পাড়ার খাতায় তাদের নাম লেখানোর জন্য। ইংরেজ কর্মচারী এবং ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পিটার ডি কস্তা বড় মেয়ে সোনাকে নিজের জন্য পছন্দ করে। এদেশীয় এজেন্টরা কিভাবে পরিস্থিতির সুযোগে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে বাস্তব প্রমাণ মেলে এই চরিত্রের মাধ্যমে। নৃশংস এইসব অসমাজিক কর্মকাণ্ডে বিবেকহীন হৃদয়হীন চরিত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ দুর্ভিক্ষের মূল কারণেও তারা সক্রিয়। ইংরেজ এবং এই দেশীয় তল্পীবাহকরা দুর্ভিক্ষের তথা সংকট সৃষ্টি করেছে। তারই বর্ণনা দেয় উপন্যাসের কথক মকবুলঃ

> আন্ধার আকাশ জমি। ভাত কোনঠে? আকাশে অগ্নির লাল নীল পুষ্প ফোটে, নীচে ভাঙ্গি যায়, য্যান খেলা করে পরী। বেহেস্তের আজরাইল বুঝি অগ্নির মশাল ধরি নামি আসিয়াছে। জাপানীর সাথে যুদ্ধ, এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ বলি প্রচার করে ইংরেজ। কতকাল চলে এই যুদ্ধ তার কোনো ঠিক নাই, সকল কেবা কবে দেয় সাধারণ মানুষেরে? আসল বর্ণনা হয়- বাঙ্গাদেশে জাপানী বা জার্মানীর সাথে নয়, ভাত, লাল তপ্ত উষ্ণ ভাত, তার সাথে যুদ্ধ জনতার।[১৯১]

স্কুল মাস্টারের দুই মেয়ে সোনা ও রূপার মত শত শত যুবতী বংশ পরম্পরায় এগিয়ে চলেছে এই অন্ধকার পথে। অন্নপ্রার্থী এই সব নারীর নাম 'ভাতের দাসী'। ভাতের দাসী তো শুধু ব্রিটিশ বাংলায় নয়,

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বর্তমানেও ভাতের অভাবে নারীকে পতিতালয়ের খাতায় নাম লেখাতে হয়। ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্তবাদ ও ভোগবাজী পুঁজিবাদ আর সাম্প্রতিককালে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রাক্কালেও বার বার তারা জড়িয়ে পড়ছে অভাব দারিদ্র্য আর মঙ্গা বা দুর্ভিক্ষের কবলে। আজও স্বাধীন বাংলাদেশের নারীরা পুরুষশাসিত সমাজে হয়ে উঠেছে শুধুই ভোগের পণ্য। লেখকের বক্তব্যঃ সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জলেশ্বরীতে বেশ্যাপল্লী বসেছিল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, ইংরেজ চলে গেছে, পাকিস্তান হইছে, পাকিস্তানও শেষ হয়ে গেছে, এখন বাংলাদেশ, এখনো জলেশ্বরীর কালিবাড়ির পাশ দিয়ে গলিতে সে পল্লী রয়ে গেছ।[১৯২]

বস্তুত,ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তানী শাসন তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্থানপতনে ভৌগোলিক বিভাজনসহ দেশের নাম পরিবর্তন হয়েছে মাত্র, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বপর্বান্তরের বাঁকবদল হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত মলিন মানুষের ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ আমলে বাংলার নারীরা যে অভাবনীয় দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে তারই মর্মন্তুদ চিত্র ফুটে ওঠে এই উপন্যাসে।

দেশ-বিভাগোত্তর পাক-বাংলার শাসনকালের আর একটি সমাজবাস্তবতার মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'ইহা মানুষ' (১৯৯১) উপন্যাসে। এই উপন্যাসেও লেখক কাহিনী উপস্থাপনে কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর বালকবেলার স্মৃতিকথকতার মত করে ঘটনা বিবৃত করেছেন। জলেশ্বরীতলায় 'সার্কস-এ আজম'-এর আগমন সংবাদে এলাকায় হৈ চৈ পড়ে যায়। লেখক শৈশবের স্কুল জীবনের সেই অদ্ভূত রোমাঞ্চকর উত্তেজনার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন কাহিনীতে। তবে বালকজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতা। আর তা হলো দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে রিফিউজি মোহাজিররা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ও দেশবিভাগের পর মানুষ বেছে নেয় বিভিন্ন বৃত্তিক জীবন। 'সার্কাস-এ আজম' এর স্বত্ত্বাধিকারী মোহাব্বত খাঁ কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। সেখান থেকে সার্কাস দেখাতে আসে জলেশ্বরীতলায়। তার সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ বাঘ-ভল্লুকের খেলার পর দেখানো হয় খাঁচায় বন্দী এক হাড় জিরজিরে ক্ষুধিত মানুষকে। তার নাম রজমান। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে রমজান স্ত্রীকে হারিয়েছে। স্ত্রী চলে যায় কুসুমপুরের পতিতালয়ে। ভাগ্যচক্রে রজমান এসে জোটে মহব্বত খাঁ-র 'সার্কাস এ আজমে'। সার্কাসে জন্তুর নাম করে মানুষ দেখানোর অভিযোগে জলেশ্বরীর মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জলেশ্বরীর রহমত শেখ দারোগা তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় যাত্রায়। দেশবিভাগের পর মানুষের দুরাবস্থার চরম রূপটি প্রকাশ পায় রমজানের জীবন ইতিহাসে। দুর্ভিক্ষপীড়িত রমজান স্বেচ্ছায় মহব্বত খাঁর সার্কাসে জন্তু রূপে খেলা দেখায় শুধুই দুমঠো ভাতের প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় তাৎপর্য এই যে, রাষ্ট্রই মানুষকে জন্তু করে রাখে। রাষ্ট্র মানুষকে খাদ্য দেয় না, দেয় না মনুষত্বের সামান্য মর্যাদা। তাই জলেশ্বরীর কমলারানীরা পতিতারূপে লাইসেন্স পাবার জন্যে রহমত দারোগার কাছে নির্যতিত হয়। রজমানকে নিহত হতে হয় রাতের অন্ধকারে। মানুষ ও জন্তুর লাশ যেমন কলকাতার দুর্ভিক্ষে পাশাপাশি পড়ে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছিল তেমনি পাটক্ষেতে পড়ে থাকা রজমানের লাশ জন্তুর লাশের মত জলেশ্বরীতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। রজমান জীবনে উপলব্ধি করে তার নামের তাৎপর্য। সে বলেঃ 'রমজান মানে রোজার মাস, উপোসের মাস, সেই উপোস তোমার লাগাতার লেগেই আছে। বারো মাসই তোমার রজমান মাসে, বারো মাসই তোমার রোজার মাস।'[১৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

দেশের ভূগোল আর শাসকের পরিবর্তন হলেও রজমান আলীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। তাই তাদের কাছে বারোমাসই রজমান মাস্। উপোসের মাস। তাদের জন্ম জন্তুর মতো, তাদের মৃত্যুও জন্তুর মত। তাই মহব্বত খাঁ–র সার্কাস খাঁচার 'ইহা মানুস' তো জন্তুরই সমতুল্য। অপরদিকে, মহব্বত খাঁ যেহেতু মোহাজির উর্দুভাষী রিফিউজি। তাই তারা তৎকালীন পাকিস্তানের এক নম্বর সিটিজেন। সুতরাং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মুসলিম লীগের এম.পি. রহমত দারোগাকে ইষৎ ভৎসর্নাও করে মহব্বত খাঁকে থানা হাজতে আটকিয়ে রাখার জন্য। বস্তুত, আলোচ্য উপন্যাসে লেখক দেশবিভাগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটসহ সাধারণ ক্ষুধিত মানুষের অন্তরজ্বা রূপটি সার্কাসের ম্যাজিক কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত সার্কাসের ভেলকিবাজী খেলা দেখায় তারই ইঙ্গিত বহন করে উপন্যাসের কাহিনী। সৈয়দ শামসুল হক এই উপন্যাসে কাহিনীর আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছে, কিন্তু দেশবিভাগোত্তর উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অপ্রকাশিত থাকেনি। ফলে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক আবহ নেপথ্য পটভূমি রূপে গৃহীত হয়েছে, অপরদিকে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঘটনার কেন্দ্রীয় প্রেক্ষাপট। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্প 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' (১৯৮৯) এর পটভূমিও উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ। লেখকের বর্ণনা এখানেও স্মৃতিচারণ মূলক। তিনি জলেশ্বরীর গ্রামাঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেই কথকের ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। রংপুর অঞ্চলের খরা ও দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেনঃ

> এ এমন মরুভূমি যেখানে মানুষ দিনান্তে এক মুঠো অন্নও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ, কারণ কয়েক বছর যাবৎ চলছে নিদারুণ খরা; এ এমন এক মরুভূমি যেখানে মানুষ তার শেষ জমিটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলছে, তার শেষ বিক্রয়যোগ্য বস্তুটি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে ফেলেছে, তার শেষ চালাটিকে পর্যন্ত খুলে খুলে পড়তে দেখেছে এবং সেই মরুভূমিতে আমি অচিরেই টের পাই শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে চলাচল করছে মহাজনেরা– এখনো যদি বিক্রয় বা বাঁধাযোগ্য কিছু সম্পদ এই হতভাগ্যদের অবশিষ্ট থেকে থাকে।[১৯৪]

প্রাচীন ধনীবংশের দেওয়ান ইদ্রিস খাঁ গল্পের প্রধান চরিত্র। প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলে বর্তমানে সে নিঃস্ব দরিদ্র। অভাবের তাড়ানায় 'ইহা মানুষ' উপন্যাসের রজমান আলীর মতো নিজেকে চণ্ডীবাবুর কাছে মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। যেন আধুনিক সমাজে প্রাচীন দাসপ্রথার মতো তার জীবননির্বাহ। সে এখন চণ্ডীবাবুর গরুর গাড়ি চালক। ভেতরে বাইরে তার চরম দ্বন্দ্বের ফলে মানসিক বিপর্যয় ঘটে। সে বলে– দাঁড়ান, এইকাল সেইকাল, সব বাজে কথা। আইনের কথা কি শোনান? ধনী লোকের লোভের আইন কোনোদিন ওঠে না, তাদের আইন আগেও ছিল, এখনো আছে। চণ্ডীবাবু এক হাজার টাকায় আমাকে কিনছে, সত্য সত্য সত্য।[১৯৫]

বিক্রিত দাসানুদাস দেওয়ান ইদ্রিস খাঁকে যদি ভোলা মাস্টার চুরি করে, তবে তার দাসত্ব ঘুচে যেতে পারে। এমনই প্রত্যাশা করে ছিল লোকটি। কিন্তু গল্পকার শেষ পর্যন্ত রূপোর গ্লাসে পানি পান করে ইস্তত হয়ে ফিরে যান, কেবল ভিন্ন পরিবেশে আপাত অবিশ্বাস্য কাহিনীর পড়ে থাকে দেওয়ান ইদ্রিস খাঁর জীবন কথা। অর্থাৎ প্রায় চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্র্য থেকে লোকটির মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবনের রূঢ়বাস্তবতার কথাচিত্র পাওয়া যায় শওকত আলীর ছোটগল্পেও। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'আকাল দর্শন' গল্পটির কথা সর্বাগ্রে স্মরণে আসে। উত্তর জনপদে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ডি–

Dhaka University Institutional Repository

হিউম্যানাইজেশন কাজ করে এবং দুর্ভিক্ষ একটা পারপিচুয়াল ব্যাপার। গল্পের নায়ক আবিদ পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য দুর্ভিক্ষের উপাত্ত সপ্তাহে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের মীড়গঞ্জে এসে পৌঁছে। সন্ধ্যালগ্নে ট্রেন থেকে মীড়গঞ্জ স্টেশনে নেমেই সে অর্জন করতে থাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদ ও জীবন থেকে পাওয়া ডি-হিউম্যানাইজেন এবং পারপিচুয়াল ব্যাপারগুলো। মীড়গঞ্জের স্টেশন মাস্টারের সহযোগিতায় তার গন্তব্যস্থান মাদারডাঙা যাবার জন্য অনেক চেষ্টায় আক্কাশ আলী নামে এক কুলিকে পায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত আক্কাশকে দেখে চমকে ওঠে আবিদঃ লোকটা অন্ধকার থেকে লণ্ঠনের আলোর সীমানায় এসে পৌঁছলে তার পুরো অবয়বটা স্পষ্ট হয় এবং তাকে এক নজর দেখেই আবিদ দমে যায়- এই নাকি কুলি? হাড়-হাড্ডিসর্বস্ব খিটখিটে লম্বা চেহারা- চুল দাড়িতে মাথা মুখ ঢাকা, ওরই মধ্যে চোখ দুটো শুধু জ্বল জ্বল করে।[১৯৬]

তার শরীর থেকে পচামাটিও গোবরের বিশ্রী দুর্গন্ধ এসে আবিদের নাকে লাগে। তার শরীর মন গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু অগত্যা লোকটিকে ব্যাগ থেকে বিস্কুট বের দিলে সে গোগ্রাসে বিস্কুট খেয়ে আবিদের স্যুটকেশ নিয়ে পথে চলতে থাকে। স্টেশন থেকে তার গন্তব্য স্থান ছয় মাইলের পথ। পায়ে হেঁটে রাত্রিতেই তাকে যেতে হবে সেখানে। মাঝপথে এসে লোকটি আবার খাবার বায়না ধরে। সে তিন দিন থেকে উপোস দিয়ে আছে। পথ চলার শক্তি তার নেই। শামুক, ব্যঙ, গাছের পাতাও আর খাদ্য হিসেবে পায় না মানুষ। আবিদ তাকে আর একটি কলা খেতে দিলে- সে আবার পথ চলতে শুরু করে। এরপর আবিদ শোনে আক্কাশের জীবনকথা। ডি.হিউম্যানাইজেশনের কঠিনতর সাক্ষাৎ পায় আবিদ। দুই সন্তানকে খাদ্য দিতে না পারায় আক্কাশ নিজ হাতে গলা টিপে তাদের হত্যা করেছিল। আর স্ত্রীর প্রসঙ্গে বলেঃ

> উ-শালীর বেটিরও খালি কান্দন। আকালের দিন কুছু মিলে না- গাও ছাড়ে মানুষ পালায় যাচ্ছে- উ-শালী বুঝে না, খালি প্যাখনা ধরে ভাত আনে দ্যাও। ঐসম কি ভাত মিলে? মুই কচুর পাত আনে দ্যাও সজনার পাত আনে দ্যাও- সিজায় সিজায় খায় আর হাগে। গোহা দে অক্ত বাহির হয় মাগীর। মাগী অক্ত হাগে আর কান্দে। আর ঐ প্যাখনা-ভাত খামু। .. স্যালা, একদিন মুই দুই মুঠা চাউল আনে দিনো- কহিনো ভাত আন্ধেক। তো মাগি করিল কি শুনিবেন? ভাত ঠিকই আন্ধিলে- কিন্তুক মোর তানে থুলে নাই, সবগিলা ভাত নিজেই খায় ফালালে। মুই আসে দেঁখো হাড়ি, ঢনঢন। ভোকে মোর প্যাকেত আগিন জ্বলে যাছে ঐসম। দিশ-দুয়ার দেখো না। মুই মাগীর প্যাটত পাও দে চিপে ধরন- শালীর বেটি নিকলা মোর ভাত। তো মাগী ছাড়ে দে গোলামের ব্যাটা কহে মোর পাওখানা কামরায় ধরিল। মুঁই স্যালা মাগীর চুল ধরে দিনু একখান টান। শালীর বেটি ফের চিত্তর হয়ে পড়িল। মুঁই তার ছাড়াবা পারোঁ না। একখান খুটা ছিল দুয়ারের বগলত- ঐ খুটাখান উঠায় দিনু একখান বাড়ি- বুঝ মাগী কেমন লাগে। মাগীর মাথা ফাটে অক্ত বাহির হয়ে গেল- তাহো মাগী ছাড়ে না পাছড়াপাছড়ি করে। অক্তগিলা হাতত লাগিল মুখত লাগিল। মুঁই জিভা দে চাটো আর খাঁও। নুনছিয়া স্বাদ লাগে। পাছড়া পাছড়ি করো আর অক্ত চাটে চাটে খাঁও।[১৯৭]

বৃউটির শেষ পরিণতি কথা জানার ইচ্ছে থাকে না আবিদের। তার শরীর গুলিয়ে বিবমিষা বোধ করে। মানুষ হয়ে মানুষের রক্তপান করার চেয়ে ডি-হিউম্যানাইজেশন আর কি হতে পারে? তাই আবিদের মনেও আতঙ্ক হয়। আক্কাশ বারবার লোলুপ চোখে আবিদের কাঁধে খাবার ব্যাগটার দিকে তাকায়। অবশেষে রাতের অন্ধকারে আমবাগানে এসে আবিদের ওপর আক্রমণ করে আক্কাশ খাবার ব্যাগটা ছিনিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মূলত গল্পের পটভূমি জুড়েই ক্ষুধার্থ মানুষের আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও শওকত আলীর 'অচেনা', 'সোজারাস্তা', 'ডাকিনী' গল্পেও দুর্ভিক্ষের চিত্রপট পাওয়া যায়। 'অচেনা' গল্পের দিনমজুর চরিত্র কিসমত অভাবের তাড়নায় মহাজনের গোলাঘরে সিঁদ কেঁটে রাতের অন্ধকারে ধান চুরি করে। ধান চুরি করতে এসে তার মধ্যে কোন অনুশোচনা হয় না। কারণ তার উপলব্ধিঃ

> একবার করে আকাল পড়ে আর শালা তোমাদের জমি বাড়ে। আকালের জন্যে মহাজনের জমি বাড়ে নাকি মহাজনের জমি বাড়ানোর জন্যে আকাল হয়– এও একটা তার কাছে দুর্বোধ্য সমস্যা। তার অনুমান, মহাজনের জমি বাড়াবার জন্যেই আকাল হয়। ... বাড়ুক আকাল, জমি জায়গাও চলে যাক তোমার দখলে। ... তুমি তোমার কায়দায় বড়লোক হও। আর আমিও তোমার কায়দায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করি।[১৯৮]

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের এই নির্মম সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে লেখক সামাজিক সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। কারণ, কিসমতের জমি বাড়ির ভিটা এমন কি ঘরের বউ পর্যন্ত চলে গেছে মহাজনের দখলে। মানুষকে নিয়ত যারা বিভিন্নভাবে শোষণ করে, মূলত তাদের কারণেই সৃষ্ট হয় দুর্ভিক্ষ। 'অচেনা' গল্পে লেখক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। 'সোজা রাস্তা' গল্পের পটভূমিতে চৈত্রের খরাদগ্ধ দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তরবাংলার গ্রাম। কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচীর অধীনে কাজ পেলে তারা নরনারী মিলে রাস্তার মাটি কাটার কাজে অংশ নেয়। গল্পকার এই আবহে ব্যক্ত করে একদিকে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের চালচিত্র, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের দ্রোহীচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবার বলদীপ্ত প্রয়াস। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষে তাদের অনুভূতি এমন ঃ

> আকাল এমনই গোলমেলে ব্যাপার আসলে হুঁশজ্ঞান যদি কিষাণের চালে ঝোলানো নিবু নিবু লণ্ঠনের মতো দোল যায়, তাহলে কোনটা ঠিক, আর কোনটা বেঠিক কে বলবে? .... আকালের দিন কখনো ফুরোবে। কেননা আকাল চলে গিয়েও যায় না– খাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে শরীরের হাডডির জোড়ে জোড়ে থাকে চোখের মণির ধূসর কালো বিন্দুটিতে–মগজের ছায়ায় ছায়ায়। আকালের যেতে অনেক দেরি হয়।[১৯৯]

এই গল্পে লেখক দুঃস্থ মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে মৃত্যুঞ্জয়ী কিন্তু বিধ্বস্ত মানুষের গল্পেও শওকত আলী যুক্ত করেন জীবনের নতুনতর মাত্রা। অনুরূপ 'ডাকিনী' গল্পেও লক্ষণীয় উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত এক ক্ষুধিত নারীর ক্রোধের বর্ণনা।দুর্ভিক্ষের প্রকোপে স্বামী সন্তানহারা মেয়েটি শহরের এক হোটেল মালিকের লালসার কবলে পড়ে। হোটেল মালিক নেকবর মিয়ার দেয়া খাবার সে গোগ্রাসে খায়। রাতের অন্ধকারে নেকবর মিয়া যখন তাকে স্বপ্নের মেয়েমানুষ বলে কাছে পায়; তখন মেয়েটি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে 'অন্ধকার ঘরে মনে হয় সে দুধ দিচ্ছে ছেলেকে। হাত দিয়ে ধরে সে মাথাটা। আর তক্ষুনি মনে হয় বোঁটা কামড়ে যেন ছিঁড়ে নিতে চাইছে একটা জানোয়ার। .....তখন তিস্তাপারের মেয়েমানুষ জানোয়ারটার টুঁটি কামড়ে ধরেছে।'[২০০] রক্তাক্ত নেকবর কাতরাতে থাকলে, উলঙ্গিনী মেয়েটি সবাইকে ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। আদিম অন্ধকার ও ক্ষুধার মধ্যে মেয়েটি হারিয়ে যায়। সমালোচক বলেন, 'আমরা পাঠকেরা চমকে উঠি। কোন তিস্তাপাড়? উৎস কোথায় সে নদীর? রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কিংবা আরো উত্তরে তিব্বত–চীন। তারই মাঝপথে মহান বিপ্লবের পীঠস্থান

Dhaka University Institutional Repository

নক্সালবাড়ি। তাই তো তিস্তাপারের মেয়ে দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়েও ক্ষুধার আগুণকে পরিণত করে প্রচণ্ড ক্রোধের আগুণে। নেকবর মিয়ার ভোগের স্বপ্নকে খানখান করে দেয় সে। কামড়ে ধরে তার আদিম লালসাভরা শরীর।'[২০১] বস্তুত ভোগবাদী পুঁজিবাদের কণ্ঠই কাঁমড়ে ধরে শোষিত মানুষ। শওকত আলী সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চেতনা এইভাবেই সঞ্চারিত করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের পটভূমি আশ্রিত সরদার জয়েনউদদীনের 'কসম' গল্পটিও। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট অবলম্বন করা হয়েছে এই গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব, মজুতদার, ঠিকাদার, কালোবাজারীর ফলে গ্রামের খাদ্য জোরপূর্বক সংগ্রহ করে শহরের সৈন্যদের জন্য স্তুপ করা হয় এবং গ্রামের মানুষ নিরন্ন জীবনে ভেসে যেতে যেতে ভিখারীতে পরিণত হয় তারই চিত্র ফুটেছে এই গল্পে। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র পাবনা অঞ্চলের গৃহস্ত সদুমণ্ডল ভিখারী হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্যচুরি করে খাওয়ার অভিযোগে প্রহৃত হয়। বস্তুত 'সরদার জয়েনউদদীন'কসম' গল্পে দুর্ভিক্ষকে ধারণ করেছেন তুলনামূলক বৃহত্তর পটে–শুধু তথ্যগত নয়, তত্ত্বগত সততাতেও।'[২০২]

এই জনপদের আর্থসামাজিক জীবনের সঙ্গে কথাশিল্পী মঞ্জু সরকারের নাড়ির সম্পর্ক। তাঁর উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত গল্পে দুর্ভিক্ষের নানা চিত্র মূর্ত হয়েছে। মঞ্জু সরকার নিচুশ্রেণীর মানুষের বিপন্ন জীবনযাত্রা ও হতাশার সঙ্গে সঙ্গে দ্রোহীচেতনার কথাও লিখেছেন। তাঁর 'মজ্জাকালের মানুষ' (২০০১) গল্পগ্রন্থের প্রায় সবগুলো গল্পই উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকে অবলম্বন করে রচিত। এইসব গল্পে লেখক নানা মাত্রিক সমাজ অনুষঙ্গ যুক্ত করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীক অব্যবস্থাপনা,স্থানিক শোষক শ্রেণীর শোষণ প্রক্রিয়া, নিম্নবিত্ত মানুষের হতাশা ও দ্রোহের চালচিত্র তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর গল্পগুলোতে। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'প্রিয় দেশবাসী'–তে উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পে আকালগ্রস্ত মানুষের মাঝে রাষ্ট্রপতির ত্রাণ বিতরণের সময় নাটকীয়ভাবে কোলাকুলির দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। তিস্তা নদীর ওপর দিয়ে ফটফট শব্দে হেলিকপ্টার উড়ে আসে স্কুল মাঠে। সমবেত জনতার ভিড়ে কৃষক আমানুল্লার সঙ্গে কোলাকুলি করেন রাষ্ট্রপতি। গ্রামবাসীসহ তার পরিবারের সদস্যদের ধারণা রাষ্ট্রপতি শত টাকার বান্ডিল আমানুল্লাহকে দিয়েছেন। কিন্তু কাদাপানিতে মাখামাখি আমানুল্লাহ বোঝাতে পারে না তার নিঃশেষিত জীবনের যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে গ্রামবাসী তাদের ভাগ্য মেলাতে থাকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের কথা মনে করে। মূলত রাষ্ট্র এভাবেই ভাগ্যাহত ক্ষুধিত মানুষের সঙ্গে ভোট ও ভাতের রাজনীতি নিয়ে প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছে। আকাল ও রাজনীতির নগ্ন রূপটিই লেখক এই গল্পের অনুষঙ্গ করে তুলেছেন। উত্তরবাংলার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে একজন বেকার শ্রমিকের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'কার্তিকের অতিথি' গল্পে। আশ্বিন কার্তিকে বেকার মমতাজ কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় দূরে। কিন্তু কাজ মেলেনি। স্টেশনে নেমে দেখে– বেআব্রু একটি মেয়ে। 'প্রায় বে–আব্রু এবং আবর্জনার মতো পরিত্যক্ত একটি নারী শরীরে, তার জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবারের কার্তিক মাসী আকাল কতোটা প্রতিফলিত হয়েছে, তা অনুধাবনের চেষ্টা ভেতরে কাজ করলেও লোকটা স্পষ্ট কিছু ভাবতে পারে না।'[২০৩]

বেকার কামলা মমতাজ আলী বিনা টিকেটে রেলে চড়ায় দন্ড দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে তার মনে হয়– 'খালি বারিত যাবার দে, তারপর দেখিম আকাল কন্দুর আর মুই কন্দুর।' কিন্তু মমতাজ বাড়ি গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেখে উপোস দিয়ে পড়ে আছে স্ত্রীসন্তান। অখাদ্য খেয়ে অপুষ্টিতে রক্ত আমাশয় ভুগছে তার শিশুটি। বড় মেয়েটি বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত। কার্তিকের ক্ষেত জুড়ে সোনারঙের ধান শিষ দোল খায়। অঢেল শস্যের মাঝে মনতাজ দাঁড়িয়ে থাকে মুকুটহীন সম্রাট যেন। মনতাজ ভালই জানে তার ঘরে একটি ধানের শীষ উঠে না। কারণ তার শেষ সম্বলটুকু– আশি সালের মঙ্গায় সাত কিস্তিতে মাত্র পাঁচশ টাকার বিনিময়ে সেরাজ চৌধুরীর কাছে বেঁচে দিয়েছে। সম্পত্তি হারানোর শূন্যতা ভেতরে দগদগে ঘা সৃষ্টি করে রেখেছে, সেই ঘায়ে খোঁচা পড়তেই মনতাজের বুক জ্বলে যায়।[২০৪]

গল্পে বেকার মজুর মনতাজের জীবন সংকট শুধু নয়, গল্পকার সমাজ ও সম্পত্তির বিবর্তনের স্তর পরম্পরা রূপটিও ধারণ করেছেন। একদিকে ক্ষুধাতাড়িত মানুষের সামাজিক পারিবারিক ও বৃত্তিক জীবনের নানামাত্রিক সংকট, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় চরিত্রের নগ্নতাকেও স্পষ্ট করে তোলেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে প্রকৃত মজুরদের চেয়ে চামচা দালালদের মজুরী বেশি, চেয়ারম্যানের চেলা চামুণ্ডা সন্তানদের জন্য রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে সুবিধা। কারণ তারা– ভোটের ক্যানভাস, গুন্ডামী, দালালী আর চৌধুরী চেয়ারম্যানের পাছার মাছি খেদিয়ে সংসার চালায়।[২০৫]

'গো–জীবন' গল্পটি বুভুক্ষু নিম্নকোটির এক নারীর কাহিনী। গল্পের প্রধান চরিত্র বৃদ্ধা ঘুতুর মা জীবনের শেষ সম্বল নালটি নামক গরু হারানোর বেদনায় করুণ মৃত্যুবরণ করে। সামান্য টাকার লোভে ঘেতু তার মায়ের গরুটি বিক্রি করে। মায়ের জন্য নতুন শাড়ি এবং কয়েকটি টাকার নোট গুঁজে দিলে পরদিন সকালে দেখা যায়ঃ নতুন কাপড়খানা গলায় বেঁধে মা একটি বাঁশের খুঁটিতে ঝুলে আছে।[২০৬]

'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা' গল্পের নায়ক একজন নাপিত। কানাই নাপিত দুর্ভিক্ষের দিনেও তার বংশপরম্পরা পেশায় অভ্যস্ত। নিতান্তই জীবিকার প্রয়োজেন সে চুল কেটে বেড়ায়। অথচ, তাকে কামলা কিষাণ থেকে চেয়ারম্যান পর্যন্ত সকলেই প্রতারণা করে। পারিশ্রমিক না দিয়ে উল্টো তাকেই চড় থাপ্পড় দেয়। তাকে নাওয়ার জাত হিন্দু বলে গালিগালাজ করে। ক্ষোভে দুঃখে কানাই নাপিত বাইশার বিলে তার যন্ত্রপাতির বাক্সটি ফেলে দেয়। পরক্ষণেই তাকে দারিদ্র্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির করে তোলে। সে মনস্থির করে– তাকে চলে যেতে হবে দূরে যেখানে কার্তিক মাসে আকাল নেই। কিষাণ কামলা আর হিন্দু মুসলমান কিংবা ধনীগরিবে কোন ভেদ নেই। মূলত সমাজের এই নিম্নবর্গীয় ক্ষুধিত মানুষের মধ্যেও গল্পকার সুস্থ ও স্বভাব সুন্দর জীবনচেতনা ফুটিয়ে তোলেন।

অপরদিকে, 'অবিনাশী আয়োজন' গল্পে লেখক দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দ্রোহকে প্রকাশ করেছেন। গল্পে ফেলুদা কর্মকার সমশের মনতাজ এবং শিয়ালু ও সিরাজ চেয়ারম্যান চরিত্রে সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। শ্রমের হিস্যা বঞ্চিত এবং শোষণ পীড়িত মানুষেরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচনাকের মন্তব্যঃ

> গল্পের পুরো কাহিনী জুড়ে অসংখ্য ভুখা মানুষের ভিড়। ফেলু কামার, সমসের শিয়ালু, মনতাজ এবং আরো অনেক অন্নহীন বিপন্ন জগতে বাসিন্দা একজোট হয়ে পরামর্শ করে জীবনকে জিইয়ে রাখার জন্যে উপায় সন্ধান করে, তখন কি একরোখা ও নিয়ত ক্রুদ্ধ সমসেরের নেতৃত্বে একটি ডাকাত দল গঠন করে রক্তচোষা মহাজন সেরাজ চৌধুরীর ধানের গোলা লুঠ করার ফন্দি করে।[১০৭]

গল্পে স্পষ্ট হয় প্রলেটারিয়েট ঐক্যের আহ্বান। সেরাজ চেয়ারম্যান স্থানীয় শোষক চরিত্র হলেও– তাকে বলা যায় রাষ্ট্রীয় শোষকেরই প্রতিনিধি। তার বিরুদ্ধেই ক্ষুধিত মানুষ তুলে নেয় সংগ্রামী হাতিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

শোষণের নানামাত্রিক দুষ্টচক্রকে মঞ্জু সরকার চিহ্নিত করেছেন তাঁর গল্পগুলোতে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, তাঁর 'আবরণ' গল্পেও মহাজন নজর মন্ডল একটি গ্রাম্য স্থূল চরিত্র। মূলত এই গল্পে দরিদ্র জীবনের নৈতিক চরিত্র স্খলনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তি খালেক মিয়া ও তার স্ত্রীর জীবনের রূঢ় বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন। খালেক মিয়া সৈয়দ বংশের নিঃস্ব সন্তান। দারিদ্র্য ক্ষুধা তার নিত্য সঙ্গী। তার স্ত্রী দুই সন্তানের জননী রুমালীকে অন্নবস্ত্র যোগাতে পারেনি নিয়মিত। এমনকি, দারিদ্র্যের প্রকোপে ও ক্ষুধার তাড়নায় ন্যূনতম মানবিক বোধটুকুও তার লুপ্ত হয়ে যায়। স্ত্রীর কথা বিবেচনা না করে হাড়ির সমস্ত ভাত চেটেপুটে খায়। উপরন্তু স্ত্রী রুমালীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তার শিশু সন্তান দুটো একদিন নানা নানীর বাড়ি বেড়াতে যায়। এদিকে খালেক মিয়াও হাটে এসে অপেক্ষা করে নজর মন্ডলের কাপড়ের দোকানে। তার প্রাপ্য টাকা পেলে খাদ্যবস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরবে। খালেকের মতো অন্যান্য কামলাও অপেক্ষা করে নজর মন্ডলের কাপড়ের দোকানে। কিন্তু নজর মন্ডল আর আসেনা। শেষে বাড়ি ফিরে দেখে নজরমন্ডল তার ঘরে এবং রুমালীর পরণে নতুন শাড়ি। লজ্জায় ঘৃণায় খালেক মিয়া আড়ষ্ঠ ও ভারাক্রান্ত। তবুও শেষ সম্মানটুকু হারানোর ভয়ে কোন প্রতিবাদ করে না। স্ত্রীর শরীরে নতুন শাড়ির আবরণের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে বংশানুগত আত্মসম্মানের আবরণ।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত আর একটি অসাধারণ গল্প 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা'। এই গল্পেও মঞ্জু সরকার উত্তর বাংলার রংপুর অঞ্চলের গ্রামীণ প্রেক্ষাপট অবলম্বন করেছেন। মঙ্গাকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়ে। কিন্তু প্রতিমণ পাটের দাম ত্রিশ টাকা, ধানের দাম আড়াইশ। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের দাম নিম্নমুখী। তাই ধানপাট চাষ করেও কৃষকের বারো মাসের অভাব ঘোঁচে না। এই গল্পের চরিত্র নঈমুদ্দিন প্রান্তিক জীবনের মানুষ। কাঁধের দুই প্রান্তে শক্ত দড়িতে বাঁধা দুটো মস্ত ডালার ভার নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বেড়ায়। এক প্রান্তের ডালায় ভাঙা সুটকেশে সাজানো মেয়েদের মন কাড়ানিয়া হরেম রকম পণ্য। অন্য প্রান্তে বিনিময় মূল্যের দ্রব্য। পাটের বিনিময়ে, ধানের বিনিময়ে সাবান আলতা চুড়ি ফেরি করে। এক ধরা পাটের বিনিময়ে চাষী বউ কেনে আধখানা সাবান। নঈমুদ্দিন পাঁচসের পাট পাঁচ টাকায় বিক্রি করলে লাভ হয় দুই টাকা। একারণে গ্রামের লোকজন তাকে 'নঈমুদ্দিন ঠক' নামে ডাকে। কিন্তু মঙ্গাকালে তার ব্যবসাতেও মন্দা। তার শেষ সম্বল দুটো মুরগী ও পাঁচসের পাট হাটে বিক্রি করতে গিয়ে দাম পায় মাত্র বিশ টাকা। বাজারে একসের চালের দাম পনেরো ডাকা। তাই ক্ষুধার অন্ন জোটে না। অপরদিকে, গ্রামের মহাজন, চেয়ারম্যানের কাছেও মঙ্গার দিনে সাহায্য পায় না। আবেদন নিবেদন করেও বঞ্চিত হয়। চেয়ারম্যানের বড় ছেলে শহরে থাকে। তার বাসায় কাজের ঝি প্রয়োজন। নঈমুদ্দিন তার ষোড়শী কন্যাকে তুলে দেয় চেয়ারম্যানের হাতে। মেয়েটির স্বামী দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তাকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কিন্তু মেয়ের জন্য নঈমুদ্দিন বিনিময়ে পায় না কিছুই। চেয়ারম্যান শহর থেকে ফেরার পর তাকে দেখা করতে বলে। নঈমুদ্দিনের চার বছরের ছোট মেয়েটি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ওদিকে ইরি ধান ক্ষেতে শিষ দেখা দেয়। কিন্তু নঈমুদ্দিনের মনে কোন সান্ত্বনা নেই।

> চারদিকে মানুষের সচল কঙ্কাল। কঙ্কালের মুখে হাসি নেই, দেহে হৃদয় নেই– হৃদয়জাত মায়া–দয়া–রাগ–অনুরাগ– স্নেহ–ক্ষোভ–আবেগ কিছুই নেই। আছে কেবল হাজার বছরের পুরণো ক্ষুধা এবং তথাপি বেঁচে থাকার বাসনা। হাগামোতার কারণে শরীরে যৌনাঙ্গ টিকে আছে বটে, চিরকালীন যৌন প্রবৃত্তিটুকু অকালে লুপ্ত হতে চলেছে। অথচ এমন বিভৎস

Dhaka University Institutional Repository

> বাস্তবেও তারা রাষ্ট্র ও সরকারের মহানুভবতা ভোলে না, সরকারি জন্মশাসন সফল করতে দলে দলে ফ্যামিলি প্লানিং অফিসে ছুটে যায়, একটি মেয়ে দশবার লাইগেশন করাতেও আপত্তি করে না। বিনিময়ে অবশ্য কটি টাকা মেলে। কিন্তু তাতে আকাল কাটে না; কঙ্কালের মানবিক স্বাস্থ্যও ফেরে না। খোদার বান্দা পোষা জন্তুর মতো আবারো খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।[২০৮]

জীবিত মানুষ প্রেতের মতো ঘোরাঘুরি করে। বুনো ওল কচু তুলে নিয়ে যায় চাষী বউ। গায়েবী আওয়াজের মতো উড়োখবর আসে দূর থেকে আসছে ত্রানের হেলিকপ্টার। প্রথমেই মহাপীড়িত কুড়িগ্রামে আসবে। একজন যুবক বক্তৃতার ঢঙ্গে বলে–

> উড়োজাহাজের ইলিপ যদি খাবার চান, মঙ্গায় ধুকি ধুকি চুপচপি মরি গেইলে হবার নয়। শোনেন নাই মার্শাল ল'র আদেশ–এদেশে অনাহারে একজনেরও মরা চলবে না। তার চেয়ে সাগর পারের মাইষের মতো জলোচ্ছাসে ভাসি যাও, ঘূর্ণিঝড়ে উড়ি যাও, ডাইরিয়া কলেরায় লাইন ধরি মরতে থাকে, তা হইলে টেলিভেশনে পেপারে তোমার ফটো ছাপা হইবে বাহে, আর বিদেশ থাকি সরকারও মেলা ভিক্ষা পাইবে। তারপরেই না ভিক্ষার ছিটেফোঁটা তোমার কাছেও পাঠায় দেবে। দলে দলে মরো শালারা, মরো সগাই।[২০৯]

কুড়িগ্রামের চায়ের দোকানে দোকানে ঝোলে সামিরক প্রেসিডেন্টের ছবি। দোকানে বসে আড্ডা দেয় মেম্বার চেয়ারম্যান। খবর আসে ত্রাণের হেলিপ্টার আসছে। ওদিকে দুর্গত অঞ্চল থেকে বাঁচার জন্য নঈমুদ্দিন চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষ দলে দলে ছুটছে খাদ্যের সন্ধানে। নঈমদ্দিনের আঠারো বছরের সংসার ভারে সাজাতে পনের মিনিটও লাগে না। স্ত্রী সন্তান নিয়ে নঈমুদ্দিন অঞ্চল ত্যাগ করে। হঠাৎ মাথার ওপর উড়ে আসে রিলিফের হেলিকপ্টার। নঈমদ্দিনের বউ বিস্ময়ে তাকায়। নইমুদ্দিন ততোধিক অবজ্ঞা ও অনাস্থার কথা উচ্চারণ করে স্ত্রী সন্তানকে তাগিদ দেয় সামনে পথ চলতে। বস্তুত গল্পকার মঞ্জু সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের দায়দায়িত্বের অবহেলা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক কর্মীদের শ্রেণীচরিত্রকে আলোচ্য গল্পে শ্লেষ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গল্পে এক ধরনের স্যাটার ও দ্রোহের সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি নিরন্ন মানুষের বাঁচা মরার অস্তিত্ব সংকটেরও এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্য অশিক্ষা আর সংস্কারবাদী এইসব নিরন্ন মানুষের মনের গহীন থেকে গল্পকার তুলে ধরেছেন বাস্তবতার অনুষঙ্গ। পাশাপাশি নইমুদ্দিন মেয়ে নসিফার মতো গ্রামের মেয়েরা শেকড় ছিঁড়ে চলে যায় শহরে এক অনিশ্চিত জীবনের অদৃশ্য দৃশান্তরে।

মূলত মঞ্জু সরকার এই অঞ্চলের সাহিত্যিক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন তাঁর গল্পগুলোর মাধ্যমে। 'মঙ্গাকালের মানুষ' গ্রন্থের সবগুলো গল্পেই দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকেছেন– তবে অনুষঙ্গরূপে তিনি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করেছেন। ফলে অতিবাস্তবতার কথাচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি গল্পে ফুটিয়ে তোলেন এক ধরনের ম্যাজিক রিয়ালিটি। ভূতের সাথে যুদ্ধ তাঁর অনুরূপ একটি যাদুবাস্তবতার গল্প। মাছুয়া মফিজ বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। গল্পে তার নিরন্ন নিঃস্বজীবনের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র একটি খেড়িঘর আর নিজের শরীর ছাড়া মফিজের কিছুই নেই। তার দশ বছরের মেয়েটিও শহরে দাসীবান্দর কাজ করে। অবিরল বর্ষায় যখন প্রান্তর ভেসে যায়– মফিজ রাতের আন্ধারে মাছ ধরতে এসে হারিয়ে ফেলে পথ। মনে হয় কোন অশুভ শক্তি তাকেই ক্রমেই অতলান্ত অন্ধকারে টেনে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাস করে নিচ্ছে। তার মনে সক্রিয় হয়ে ওঠে অতিলৌকিক শক্তি ভূতের বিশ্বাস। মূলত গল্পকার ভূতের প্রতীকে শোষক শ্রেণীর এমন শক্তির কথা প্রতীকায়িত করেছে মফিজের জীবনে। যারা মফিজদের জীবন আঁধারের ভূতের মতো গ্রাস করে নেয়। মফিজেরা অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্যে মূলত সেই অদৃশ্য শক্তির সঙ্গেই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলেছে। বিলের সেই কিংবদন্তীর ভয়ঙ্কর পিশাচটির কবলেই পড়েছে সে। মাছের লোভ দেখিয়েই কি খবিসটা এমন বর্ষার রাতে তাকে নিধুয়া পাথারে ডেকে এনেছে? পরিচিত মানুষের গলায় সে মফিজের নাম ধরে ডেকেছিল? নাকি স্ত্রীর শরীরের ভর করায় মফিজ তাকে বোতলে ভরতে চেয়েছিল বলেই এমন প্রতিশোধ? কানের কাছে নাকি সুরে কথা বলছে কে? তোর রক্ত খাইম, তোর কলিজা খাইম।[২০৯]

মফিজ অন্ধকারের পাথরে ছুটে চলে দিকচিহ্নহীন। কোন দিন আলোকিত সকালের কাছে পৌছেছিল কিনা গল্পে সেই দৃশ্য আপাত অদৃশ্য। অতি নাটকীয়ভাবে ম্যাজিক রিয়ালিটির মাধ্যমে গল্পকার বিবৃত করেন কাহিনী। ফুটে ওঠে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর বাস্তবতার প্রতিচিত্র।

৪.০৭ রাজনৈতিক সংকট ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রপট ঃ

রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট এবং প্রায় চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ উত্তর বাংলার সামজ জীবনে নানা অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। বিশেষত স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, নারী ও শিশু নির্যাতন, শ্রম শোষণ, গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের হাত ধরে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং নব্যপুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, অপরদিকে বেকারত্ব, হতাশাগ্রস্ত যুবক শ্রেণীর নৈতিক চারিত্রিক স্খলন সমাজদেহকে অসুস্থ করে তোলে। বলাই বাহুল্য, এটাই সমগ্র বাংলাদেশেরই চিত্রপট। উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এই অবক্ষয়ের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। এই প্রেক্ষিতের সূত্র ধরে বাংলাদেশের সাহিত্যেও সামাজিক অবক্ষয়ের অনুষঙ্গটি উঠে এসেছে। সমাজের এই নিবিড় ও অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গটি এ দেশের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত রূপের আলোকেই আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক কাঠামো প্রধান গল্প উপন্যাসগুলোই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখে আসে কথাশিল্পী আবুবকর সিদ্দিকের 'খরাদাহ' (১৯৮৭) উপন্যাসটি। আবুবকর সিদ্দিকের প্রথম উপন্যাস 'জলরাক্ষস' (১৯৮৫)–এ দক্ষিণ বাংলার বন্যা জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক দুষ্টচক্রের দ্বারা নির্যাতিত জনমন্ডলীর অস্তিত্ব সংগ্রামের বা মরা বাঁচার লড়াই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষয় অবক্ষয়ের মধ্যে বন্যার্ত ক্ষুধিত মানুষের বিপন্নতা ও মানবিকতার চরমতম সর্বনাশ। 'খরাদাহ' উপন্যাসেও আবুবকর সিদ্দিক উত্তরবঙ্গের রুক্ষ কর্কশ খরাপীড়িত ভূমি ও ক্ষুধার্ত মানুষকে অবলম্বন করেছেন। রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের মধ্যবর্তী লালমাটির রুক্ষ অসমতল বরেন্দ্রভূমিকে এই উপন্যাসের ক্যানভাসরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে কাহিনী, চরিত্র ও ভাষার সংস্থাপনে উপন্যাসটি আগাগোড়া আঞ্চলিক কাঠামোতে গড়ে উঠেছে। নিরস শুষ্কমাটি বৃক্ষহীন খরাপীড়িত আকালগ্রস্ত ভূমন্ডলের কালো কালো কঠিন আমজনতার অভিষেক ঘটেছে এই উপন্যাসে। প্রাকৃতিক রুক্ষ শুষ্ক ক্যানভাসটি তারাশঙ্করের কিংবা হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গীয় ভূমি ও মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উপন্যাসের প্রোফাইলেও লেখা হয়েছে– 'যেন মনে হয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক টুকরো কঠিন রাঢ় মৃত্তিকা এই বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর এলাকায় 'বরীন' নামের ব্যতিক্রমী চেহারা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পাথুরে লালমাটি লু হাওয়ার হলকা, দয়ামায়াহীন খরা, পোড়াকালো নরনারী তাদের গণগণে মেজাজ– এই সব মিলিয়ে অমানবিক শোষণ ও লড়াইয়ের এক ভয়াবহ ছবি আমূল উঠে এসেছে আবুবকর সিদ্দিকের কলমে। এই ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আরো অনেক গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু 'খরাদাহ' সত্যিই ব্যতিক্রম এবং স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বলা যায়, লেখকের পূর্বতন কমিটেড সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ জীবন থেকে অর্জন করা অভিজ্ঞতার অপূর্ব সংশ্লেষণে 'খরাদাহ' বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শুধু ব্যতিক্রম সৃষ্টিই নয়; এই ধরনের উপন্যাসের কোন পূর্বপথিকৃৎ নেই। বরেন্দ্রভূমির গ্রাম, গ্রামীণ সামন্ত জোতদার, ভূমিহীন ক্ষুধিত মানুষ, বিয়ের নামে নারীদের বাজার ব্যবসা, অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের দ্বৈতশাসন শোষণে গণজীবনের ক্ষয় এবং গণশক্তির অভ্যুদয় গল্পের সমাপ্তিতেও সমাপ্ত হয় না, যার সঙ্গে বিষয়গত সাদৃশ্য টমাস হার্ডির ওয়েসেক্স, গোর্কি, শলোকভের উপন্যাসে রাশিয়ার কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বা তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসুর আঞ্চলিক কথাসাহিত্যের মতই ভাষা ও কাহিনীর আঞ্চলিক গৌরবে 'খরাদাহ' আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আঞ্চলিক আবহ থাকলেও আবেদন সর্বমানবিক গণশক্তির পক্ষে। উপন্যাসটি রচনা সম্পর্কে আবুবকর সিদ্দিক নিজেই বলেছেনঃ উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি, তার জনপদজীবন ... পূর্ণ প্রকরণ দাপটের সঙ্গে জায়গা করে নেয় এই পৃষ্ঠাগুলোতে। সেই কাঠাল গাছ, সেই এস্তেস্কার নামাজ, সেই চটকা গান, সেই খরা ও লু. নিস্ফল প্রস্রাবচেষ্টা, দুর্ভিক্ষ, ট্যানা, আনধুনি বিটিছাওয়া, পথে পথে গাঁও প্রান্তরে যা যা দেখেছি ও শুনেছি, সমস্ত চিত্রমালা চলে আসে কলমের মুখে। আর রাজশাহীর মাটিতে প্রথম পা দিয়ে অবধি বাজারে বন্দরে ব্রাত্যজন মুখে অহরহ যে শ্লেষকৌতুকে মেশানো বুদ্ধিশাণিত জ্যান্ত সল্লাপ শুনে আসছি, তার আদলমড়ল আমার চরিত্র– সল্লাপে। তবে কমলকুমার থেকে আমার আভিমুখ্য তো আলাদা। মনে মনে বামপন্থায় সমর্পিত লেখক আমি। ফলে শুকনো মৃত কাঠাল গাছটি এ কাহিনীর উপসংহারে উজ্জীবক হয়ে ওঠে। আর মাঝামাঝি জায়গায় এসে বাহাউদ্দিন ও মসিদ খাঁকে ছাপিয়ে কিষাণ ভল্লা হয়ে ওঠে নিয়ামক নায়ক। তার নেতৃত্বে শোয়াশো মোষের পিঠে (এটা রূপকার্থে) আড়াই শ কিষাণ। এরা একটা গণবিদ্রোহের উদগম ঘটায়।[২১০]

উত্তরবঙ্গীয় বরেন্দ্রভূমির ও রূঢ়প্রাকৃতিক ক্যানভাসে গ্রোথিত কাহিনীতে লেখক–মনের সূক্ষ্ম অভিনিবেশ সামাজিক শ্রেণীস্তর ও দ্বন্দ্ব আলেখ্যের দিকে। বোঝা যায়, কাহিনী রাজনীতি মুখ্য, তবে রাজনৈতিক নিরস বক্তব্যে ভারাক্রান্ত নয়। 'খরাদাহের কাহিনী দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দুঃশাসন শোষণ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা নির্ণয়েই থেমে যায়নি বরং দিয়েছে আলোর সন্ধান মুক্তির দিশা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সামজ পরিবর্তনে শোষিতের ভূমিকা সম্পর্কে খরাদাহ পাঠককে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।'[২১১]

লেখক এই উপন্যাসে শোষকশ্রেণীর দুই প্রতিনিধিকে উপস্থিত করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূমির মালিকানা সূত্রে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি মসিদ খাঁ, অন্যজন হলো, শহরে পুঁজিপতি চামড়া ব্যবসায়ী এবং পতিতালয়ের কালোটাকার মালিক বাহাউদ্দিন। শহর ও গ্রামের এই দুই প্রতিনিধি চরিত্রের হাতের পুতুল সাধারণ মানুষগুলো বংশপরম্পরায় তারা শোষণ করে সাধারণ মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমের হিংসা, শোষণ করে সমস্ত সম্পদ, হরণ করে নারীর সম্ভ্রম। সুবিধাভোগী এই শ্রেণীকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। লেখকের ভাষায়ঃ নুরুল আমিন, আয়ুব খান, শেখ মুজিব, জিয়া সবার বেলা পুঁজি খাটিয়ে রেখেছে শহরের মালিক বাহাউদ্দিন ও গ্রামের মহাজন মসিদ খাঁ।[২১২]

এক জেলার সীমানা পেরিয়ে অন্য জেলার খরাগন্ধ ধুলো ওড়া প্রান্তর মাড়িয়ে বেরাম্ভণপুর গ্রামে মসিদ খাঁর পরগণায় দেখা হয় এই দুই নায়কের। তাদের যোগসূত্রটা চমৎকার। কাহিনীর জটিল গ্রন্থিতে একটা ঐক্যসূত্র আছে। একদিকে, গ্রামীণ সামন্ত মসিদ খাঁর যথেচ্ছ জৈবিক ব্যাভিচারে বাড়ির ঝি চারুদাসীর গর্ভে জন্ম নেয় চেকনদাসী। অথচ চেকনের পিতৃপরিচয় হলো মসিদ খাঁর কেনা গোলাম কেসমতের মেয়ে রূপে। হালে সুন্দরী চেকনদাসী গর্ভবতী হয় মসিদ খাঁর একমাত্র পুত্র আরশাদ খাঁর দ্বারা। কুমারী চেকনদাসী অপবাদ মোচনের জন্যে একবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে রক্ষা করে মজিদ খাঁর আড়াইশ কিষাণের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চু পালোয়ান ভল্লা। ভল্লা ও চেকন পরস্পরের প্রতি মানবিক আকর্ষণ অনুভব করলেও প্রকাশ করেনি। শেষ পর্যন্ত গ্রামের নাটু ঘটকের সঙ্গে গরুর হাটে বাহাউদ্দিনের পরিচয়ের সূত্র ধরে চেকনের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয় তার নপুংসক নকলপুত্র দলিল উদ্দিনের সঙ্গে। দলিল উদ্দিনকে বর সাজিয়ে শহরে লম্পট বাহাউদ্দিন চেকনকে হস্তগত এবং আপন কামনা চরিতার্থ শেষে পতিতালয়ের বারবনিতার কাজে লাগিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে ট্রেনে চেপে খরাগন্ধ দুপুরে বরযাত্রীর আগমন ঘটে। তারপর শুরু হয় স্টেশন থেকে খাখা শূন্য প্রান্তরের বর্ণনা। বরযাত্রী ও ঘটকের খিস্তি খেউড়, গ্রাম্য স্থূল রসিকতা ইত্যাদি। তন্মধ্যে নির্মম দুটো দৃশ্য উপন্যাসের কাহিনীকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। একটি দৃশ্য খরাপীড়িত মানুষের বৃষ্টির জন্য আর্তনাদ, জিকিরে সারিবদ্ধ হাজার হাজার মানুষের কাতারবন্দী হয়ে মাঠের মধ্যে ইস্তেস্কার নামাজ পড়া; অন্যটি হলো, বেরাম্ভণপুর গ্রামের সীমানায় খরাদগ্ধ পাতাঝরা একটি কাঁঠালগাছের বর্ণনা। এছাড়াও আরো একটি দৃশ্য হচ্ছে– খরার দেশের নিঃস্ব মানুষেরা দলে দলে অঞ্চল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে খাদ্য ও কাজের সন্ধানে। উত্তরবঙ্গে আকাল পীড়িত মানুষের এই ধরনের নিরুদ্দেশ্যে যাওয়াকে বলে 'ভোটান' যাওয়া। শত শত মানুষের ভোটান যাওয়ার অসামান্য চিত্র লেখক এঁকেছেন। দিনের এইসব দৃশ্যের পর উপন্যাসে বর্ণিত হয় আরো একটি ঘটনা তা হলো– শুষ্কপুকুরে গর্ত করে সেখানে টিউবয়েল বসিয়ে গ্রামের মানুষের পানি সংগ্রহের চেষ্টা। অপরদিকে বরযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে– সারাদিন রোদে হেঁটে এসে কোঁথ দিয়েও কারো একফোঁটা প্রস্রাব হয় না। গরম শরীর ঝলসে গেলেও একবিন্দু ঘাম শরীর থেকে ঝরে না। এই রকম এক পরিবেশে উপন্যাসের দুই নায়ক মসিদ খাঁ ও বাহাউদ্দিনের সাক্ষাৎ হয় কিসমতের বাড়িতে। কিন্তু বিবাহপূর্ব সৌজন্য সাক্ষাতে দুই নায়কের সৌজন্য বিনিময়ও শ্রেণীগত আভিজাত্য ও অহংকারে খুব প্রীতিকর হয় না।

উপন্যাসের শেষে দেখা দেয় ক্লাইমেক্স। বাহাউদ্দিন ও মসিদ খাঁর শ্রেণী অহংকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে চেকনদাসীকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে ভল্লা। ভল্লার নেতৃত্বে কিষাণ বাহিনী শহুরে শোষক বাহাউদ্দিনকে শেষ করে চেকনকে উদ্ধার করে; অন্যদিকে মসিদ খাঁ আত্মগোপনের জন্য প্রাচীন নীলকুঠির গোপন সুড়ঙ্গ পথে পৌঁছে যায় পাতালের ঘরে। সেখানে পাতালের কালনাগের দংশনে তার পতন হয়। লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যে কারবালার কাহিনী ও এজিদের মিথের ব্যবহার করে কাহিনীকে দান করেন বিশেষ ব্যঞ্জনা। অপরদিকে, শ্রমজীবী ভল্লার নেতৃত্বের বিজয়ের শুভলগ্নে সম্পন্ন হয় না চূড়ান্তপর্ব। সংগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

শেষপর্বে ভল্লারও পতন ঘটে। কিন্তু অদম্য গণশক্তির কোন বিনাশ নাই। এই বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়েই লেখক কাহিনী শেষ করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেনঃ আবুবকর সিদ্দিক তাঁর খরার উপন্যাসটি শেষ করেছেন একটি প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে। ... ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে এক সময় আষাঢ় আসে, বৃষ্টি নামে ছত্রী সেনার মতো। যে খরা অনন্ত জতুদাহে সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করেছিলো তা এখন জুড়িয়ে স্থির শান্ত। একটা মরা বুড়ো কাঠালগাছ সেও সাধ মিটিয়ে ভিজতে থাকে আর কী আশ্চর্য, তার শুকনো গুড়ি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে একটি দুটো কাঁচা ডাল।[২১৩]

গ্রামের প্রবেশ পথে ঝরাপাতা কাঠালগাছ, খরা এবং কাহিনীর শেষ দৃশ্যে বর্ষার আগমন ও নতুন পাতা গজানোর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে লেখক অদম্য গণশক্তির উত্থানকেই প্রতীকায়িত করেছেন। মূলত আবুবকর সিদ্দিক গণজীবনের প্রতি দায়বাদী লেখক। তাই শুধুমাত্র শোষণের ও অবক্ষয়ের চিত্রই নয়, তিনি শোষণ থেকে উত্তরণের জন্য গণজীবনের জাগরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করে সমালোচক যথার্থই লিখেছেন ঃ 'খরাদাহ উপন্যাস বিধৃত জীবন নির্মেদ বাস্তবতার প্রতিফলনে রূঢ়, রক্তাক্ত ও বীভৎস। আবুবকর সিদ্দিক সমাজজীবনের অব্যাহত পচন ও বিনষ্টির বিপ্রতীপে যে রক্তমুখী দ্রোহ প্রত্যক্ষ করেন, রাষ্ট্র ও সমাজের গণবিরোধী স্বভাবের কারণেই সম্ভবপর দ্বারপ্রান্তে এসে তা হয়ে পড়ে গদিচ্যুত। দীর্ঘদিনের শোষণ পীড়নের অভিজ্ঞতায় জনপদে যে ক্রোধের জাগরণ ঘটে, তার মধ্যে সঙ ঘচেতনার অনুপস্থিতির ফলে এই ক্রোধ রক্তপাত ও হিংস্রতায় নিঃশেষিত হয়। বাহাউদ্দিন কিংবা মসিদ খাঁর মতো সামাজিক অপশক্তির পতন জীবনের গতিকে সম্মুখগামী করে না। বরং রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজের অন্তর্বর্তী একটা বিশাল ক্ষত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২১৪]

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিশদ চিত্র পাওয়া যায় সৈয়দ শামসুল হকের 'দূরত্ব' (১৯৮১), 'না, যেও না' (১৯৯১), 'ত্রাহি' (১৯৮৮), 'শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ' (১৯৯৮), 'চোখবাজী' (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' (১৩৯৫) গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে। মূলত জলেশ্বরী অঞ্চলের পটভূমিতেই লেখক গল্পের জায়গাজমি ও মানুষজনকে চরিত্ররূপে অবলম্বন করেছেন বারবার। এইসব গল্পউপন্যাসে লেখক আঞ্চলিক আবহ অবলম্বন করলেও মূলত সামগ্রিকভাবে সমাজকাঠামো ও তার সংকটগুলোই তুলে ধরেছেন এদেশীয় সর্বমানবিক জাতীয় সমস্যা রূপে।

লক্ষণীয়, 'দূরত্ব' (১৯৮১) উপন্যাসে সৈয়দ শামসুল হক আশির দশকের বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাহিনীর পটভূমি উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম জেলার ছোট্ট শহর রাজারহাট। লেখকের বক্তব্যঃ রাজারহাটকে শহরের মানুষ বলবে, গ্রাম। আর কয়েকটি কুটির নিয়ে মাঠ ও গাছের ভেতরে যাদের বসতি তারা বলবে শহর। প্রশাসনিক নথিপত্রে রাজারহাট ছোট শহর বলে বর্ণিত। রেল ইস্টিশান আছে, ডাকঘর আছে। শনি-মঙ্গল হাট বসে, দৈনিক বাজার তো আছেই। একদিকে ডোবা, আর একদিকে ধানক্ষেত নিয়ে একটি ব্যাংক আছে। ইস্কুল আছে। আর হালে একটি কলেজ হয়েছে।[২১৫]

আর এই কলেজেই অধ্যাপনার জন্য আসে জয়নাল। ইতিহাসের প্রভাষক জয়নালের অভিজ্ঞতায় আমরা জানতে পারি পুরো অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের তীব্র সংকট এবং সমস্যার কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর পঁচাত্তর পরবর্তী সমাজের দ্বন্দ্বময়, জটিল ক্ষতবিক্ষত অবস্থার চিত্রই সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

শাসসুল হক তুলে আনেন। 'এই রাজারহাট কলেজের ইতিহাসের নতুন অধ্যাপক জয়নালের অভিজ্ঞতাসূত্রে আমরা পেয়ে যাই সমাজজীবনের পচন, বিনষ্টি ও অবক্ষয়ের মর্মন্তুদ পরিচয়। আদিম অন্ধকারের পাশবিক বীভৎসতায় বন্দি এই গ্রাম, মানুষের ব্যক্তিসত্তা, মুক্ত চেতনা ও আত্মজীবনকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে ফেলে, স্তব্ধ করে দেয়। অন্ধকারে উন্মত্ত হিংস্র জন্তুর নেপথ্য শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজারহাট ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ। 'কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুর রহমান সাহেব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শান্তি কমিটির মেম্বার ছিলেন।'[২১৬] কলেজের সচেতন ছাত্রসামজ অধ্যক্ষকে ঘৃণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা জয়নাল এই কলেজে চাকরি করতে এসে এখানকার সমাজ নামক অচলায়তনে বাঁধা পড়ে। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ এবং অধ্যক্ষ আবদুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী নানা অকর্ম চালায়। উচ্চশিক্ষিত যুবক জয়নাল এই বৈরী পরিবেশে ক্রমেই নিঃসঙ্গ হতে থাকে এবং মানসিক শক্তি হারাতে হারাতে ক্রমেই সকলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে। এই নিঃসঙ্গ জীবনের অবচেতনে ধীরে ধীরে মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ছাত্রী সালমার সঙ্গে। এক সময় সালমার প্রতি জয়নাল আসক্ত হয়ে পড়ে। তবে সালমা স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি দেওয়ান খাঁর কন্যা–একথা জানার পর জয়নালের মোহমুক্তি ঘটে। কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান সালমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে জয়নাল তা প্রত্যাখ্যান করে। আধাগ্রাম আধাশহরে এই বাজার হাটে লোক মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে একটি অশুভ শক্তির খবর। গ্রামে অশুভ এক জন্তুর আক্রমণের কথা বিশ্বাস করে না কেবল জয়নাল। কিন্তু একদিন 'মানুষের তুলনায় পাশবিক অথচ পশুর তুলনায় অত্যন্ত মানবিক সেই আর্তনাদ করে চোখের পলকে তাকে উর্ধ্ব আকাশে নিক্ষেপ করে আবার মাটিতে ছুঁড়ে দেয়। তার বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডের প্রবল ও অবিরাম ধুপধাপ সে শুনতে পায়। অথবা, কলেজের জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠে অতিকায় কিছু একটা দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায়।[২১৭] সদ্য চামড়া তোলা একটি ষাড় গোলাপী মেদময় দেহে তাকে তেড়ে আসে। প্রচন্ড চিৎকার করে অন্ধকারে ছুটে পালাতে গিয়ে জয়নাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অজ্ঞান অবস্থায় তার সেবা শুশ্রূষা করা হয় চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁর বাসায়। তখন জ্বরতপ্ত প্রলাপে জয়নাল বারবার তার ছাত্র জীবনের স্মৃতিমুগ্ধ বান্ধবী সালমার নাম উচ্চারণ করে। দেওয়ান খাঁ নিজ কন্যা সালমার প্রতি তরুণ অধ্যাপকের আসক্তি এবং আপন মর্যাদার কথা বিবেচনা করে জয়নালকে বাধ্য করে বিয়েতে রাজী হতে। রাজারহাট থেকে জয়নাল আর কোনদিন ঢাকায় ফিরে যাবার সুযোগ পায় না। জয়নাল বাধ্য হয়েও রাজী হয় সালমাকে বিয়ে করতে। আত্মস্ত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, 'আমি রাজী' কিংবা করে না; তার মনে হয়, সে তার অস্তিত্বের ভেতর অন্য কারো কণ্ঠ শুনতে পায়।'[২১৮]

মূলত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা শহুরে শিক্ষিত যুবক জয়নাল যে প্রত্যাশা দিয়ে মফস্বলের গ্রামীণ কর্মজীবনে এসেছিল; তার সে প্রত্যাশা ভুলুণ্ঠিত হয়। লেখক সৈয়দ শামসুল হক এই উপন্যাসে এই সমাজ সত্যটিই দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল দুষ্টচক্র এভাবেই প্রগতিমনস্ক মুক্তচিন্তার মানুষকে বিপন্ন করে, নষ্ট করে দেশ ও সমাজের গণতান্ত্রিক পরিবেশ। উপন্যাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সমালোচক যথার্থই বলেছেনঃ

> সৈয়দ শামসুল হক 'দূরত্ব' উপন্যাসে সমাজমূলের অসঙ্গতির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। রাজারহাটের প্রতিবাদী চরিত্র ভূধর সরখেলের সমাজ বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে গ্রামীণ জীবনে স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধী শক্তির হিংস্র নিয়ন্ত্রণ। জয়নালের মতো শুদ্ধ তারুণ্যের আত্মবিক্রয়ের কার্যকারণও নিহিত রয়েছে সমাজবিন্যাসের পাশব অন্ধকার গহ্বরে।[২১৯]

Dhaka University Institutional Repository

'দূরত্ব' উপন্যাসেরই এপিসোডরূপে রচিত তাঁর 'না যেও না' (১৯৯১) উপন্যাসটি। কাহিনীর পটভূমি রাজারহাট এবং চরিত্রগুলো পূর্বোক্ত উপন্যাসেরই। ইতিহাসের অধ্যাপক জয়নাল রাজারহাট কলেজে এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের অপতৎপরতা থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। ছাত্রদের নিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তচেতনার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনকি তার স্ত্রী সালমাও তাকে সন্দেহ করে। 'দূরত্ব' উপন্যাসে পঁচাত্তর পরবর্তী শাসনামলের প্রেক্ষাপটকে লেখক অবলম্বন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় 'না যেও না'-তে অবলম্বন করেছেন জিয়াউর রহমানের শাসনকালের পরবর্তী এরশাদের শাসনকালকে। এরশাদের শাসনামলে জয়নাল লক্ষ করে- রাজারহাট এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধী চক্রটি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাচ্ছে। পক্ষান্তরে কলেজের ছাত্রলীগের নেতা হারুনর রশীদেরা হচ্ছে নির্যাতনের শিকার। জয়নাল হারুনর রশীদদের সমর্থন করে, সৎ পরামর্শ দেয় বলে অধ্যক্ষ আবদুর রহমান জয়নালের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। রাজারহাটে এরশাদের আগমনে কলেজের অধ্যাপিকা হাসনা বানু ব্যাপক তৎপরতা দেখায় এবং এরশাদের সান্নিধ্যে যায়। এ নিয়ে এলাকায় যুবকরা রোমাঞ্চকর মন্তব্য করে বেড়ায়। এমন কি, কলেজে ছাত্রীদের টয়লেটে অধ্যাপিকা হাসনা বানুর সঙ্গে এরশাদকে জড়িয়ে অশালীন মন্তব্য লিখে রাখে কারা। অধ্যক্ষ ছাত্রলীগের নেতা হারুণর রশীদকেই এজন্য অভিযুক্ত করেন। এমন কি, জয়নাল ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় যেতে চাইলে অধ্যক্ষ তাকেও সন্দেহ করেন। তাই জয়নালেরও আর ঢাকায় যাওয়া হয় না।

বস্তুত গ্রামীণ এই প্রেক্ষাপটে লেখক জাতীয় রাজনৈতিক দ্বিধাবিভক্তি এবং স্থানিক পর্যায়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্মকে অনুষঙ্গ করেছেন। বলা যায়, উপন্যাসের শৈল্পিকগুণের দিক দিয়ে এইভাবে ব্যক্তির নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের কৌশল অবলম্বন করা উচিত ছিল। তাতে করে উপন্যাসের শৈল্পিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। তবে সমাজের মহৎতাৎপর্যকে অর্থপূর্ণভাবে উপন্যাসে সংযুক্ত করাও ঔপন্যাসিকের কাজ। সমাজের ও রাষ্ট্রের কালানুক্রমিক বিকাশের ধারায় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলের নাম ব্যবহার সঠিক মাত্রা পেয়েছে। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে মেরুকরণ ও দ্বিধাবিভক্ত সমাজচরিত্র নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকেই সৈয়দ শামসুল হক অবলম্বন করেছেন। রাজারহাট কলেজের এই প্রজন্মের একজন অতি তরুণ ছাত্রনেতার বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপ। ছাত্রনেতা বলে ঃ

> আপনি তো জানেন, স্যার। সপ্তগ্রামের সময় আমরা ছোট ছিলাম। আমরা বড় হয়ে শুনেছি প্রিন্সিপাল সাহেব রাজাকার ছিলেন। ... দেওয়ান খাঁ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। আমাদের এখানে অনেক মানুষ তারা ধরিয়ে দেয় মেলিটারির হাতে। বঙ্গবন্ধুর আমলে চুপ করে ছিলেন। জিয়া সাহেবের আমলে মাথা তোলেন। আর এখন এরশাদের দলে যোগ দিয়ে সে কি তারা করছে আপনি সবই জানেন। ছাত্রলীগের উপর কি অত্যাচার করছে আপনি নিজেই দেখেছেন। ছাত্র ইউনিয়নের সব ছেলেকে তিনি কাফের বলেন। বলেন, তারা দেশের শত্রু, আর আমাদের বলেন, ভারতের দালাল। আমাদের রাজনীতি করতে দেখলে গা জ্বলে, ছাত্র শিবিরকে দিনের পর দিন সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন।[২২০]

বস্তুত,স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে বহু ভাঙনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ে গ্রামীণ জীবনেও। সৈয়দ শামসুল হক রাজারহাটের গ্রামীণ আবহে মূলত এদেশের রাজনৈতিক দুষ্টচক্র আর তাদের অশুভ তৎপরতায় গ্রামীণ অবক্ষয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী বিপিনকে উন্নতি করতে দেখে তার দোকানঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বিপিনের মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করলেও বিপিন কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। বিপিন জলেশ্বরীতলা থেকে চলে যায় বুড়িরচরে। সেখানে গিয়েও একই দৃশ্য দেখে। সফর আলী বসুনিয়ার যুবতী কন্যাও ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে মুজিববের লোকের হাতে। একেরপর এক এইসব দৃশ্য দেখে বিপিন পাগল হয়ে যায়। পাগল বিপিন উন্মাদের মতো বলে, শুধু হিন্দু মেয়েই নয়, বাংলাদেশে মুসলমানের মেয়েও ধর্ষিত হয়। মজিববের দল বিপিনকে ভারতে চলে যেতে বলে। কিন্তু বিপিন ভারত চেনে না। সে কেবল চেনে পীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দীনের মাজার। পীরের কবরে মাথা ঠুকে আহাজারি করে সে বলে ঃ

> বাবা তোমার স্থান ছাড়িয়া মুই চননু। তোমার মাটি ছাড়া আর কোন মাটি মোর নাই। আবার যদি কোনকালে তোমার দয়া হয়, বাবা হামার ফির তোমার কাছে জায়গা দিবেন। ... শয়তানের শাসন চলিছে এলা এই দ্যাশোত। অন্তরের শয়তানের মুঁই যুঝাবারে পাঁও, কিন্তু বাইরের শয়তানের মোকাবিলায় মুঁই নাচার। কেবল মুই ক্যানে? ভালো মানুষর ঠাঁই আর নাই এই দ্যাশে।[২২২]

বস্তুত,স্বাধীনতার পর গ্রামীণ জীবনে নিরীহ মানুষজনের ওপর একশ্রেণীর দুর্বৃত্তের নির্মম অত্যাচার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি হিংস্র মনোভাব লেখক সমাজ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি প্রক্ষেপে অবলোকন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। বিপিন এদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি। যাদের মানসম্মান বিষয়সম্পত্তি সব কিছুই লুণ্ঠিত হয় মজিবরের মতো দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিবিদ্বেষ ও বিভেদাত্মক চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তির তাণ্ডবের প্রসঙ্গ নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন– 'চোখবাজি' (১৯৯৪) উপন্যাসটি। ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙেছে উগ্র মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন বিজেপি ও শিবসেবা। তারই প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বাংলাদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির অংশ হিসাবে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে জলেশ্বরীতলার একটি ঘটনাকে। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল জামাতি চক্র উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করে। মুক্তিযোদ্ধা হায়দার ও সহযোগীরা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। উপন্যাসের অন্যতম হিন্দু চরিত্র নিতাই বাবু প্রাণের ভয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। জামাতিচক্র নামের মধ্যেও বাঙালিত্ব ও হিন্দুত্ব খোঁজে। হায়দারের বোনের নাম মালতি'– হিন্দুর নাম বলে তারা প্রচার করে। তারা আরো প্রচার করে যারা স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে তারা অমুসলিম এবং মুসলমানের শত্রু। দেশে অমুসলিম হিন্দু সংস্কৃতি চালু করে তারা ইসলামী আদর্শকে ব্যাহত করতে চায়। হায়দারের বাবা গফুর মিয়াকে জলেশ্বরীতলার থানার দারোগা মেয়ের নাম হিন্দু রাখা সম্পর্কে বলে ঃ

> 'আপনার হায়দার আর মহিউদ্দিন না কি নাম বললেন, ওরা ইসলাম মানে নাই, নামাজ পড়ে নাই, আল্লাখোদা ভয় করে নাই, ইন্ডিয়ার টাকা খেয়ে পাকিস্তান শেষ করেছে। আমি পলিটিক্স আলোচনা করি না, গফুর মিয়া তাই এ কথায় ক্ষ্যান্ত দিলাম। তবে এতে সন্দেহ নাই যে, তারা দেবদেবীরও পুজা করে। অন্তত মনে মনে করে। না হলে মুসলমান ঘরের মেয়ের নাম হিন্দু রাখবে কেন? এই সোজা কথাটা বুঝতে পারেন না।'[২২৩]

অন্যদিকে, বায়োস্কোপওয়ালার চোখবাজির মতো ধর্মান্ধ অনুভূতি দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে গ্রামের মানুষকে। হাবিবার ভন্ড প্রেমিক আলী তাকে বোঝায় শবে কদরের রাতে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি নদী, গাছ, পাহাড় সব আল্লাহকে সেজদা করে। হাবিবাকে সেই সেজদা দেখানোর জন্যে প্রান্তরে এনে গভীর রাত্রিতে আলী তাকে ধর্ষণ করে। কিশোরী হাবিবা আলীর বলৎকারে মারা গেলেও ধর্মীয় শাস্তির বিধান থেকে মুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

পায় না। বিবাহপূর্ব যৌনমিলনের জন্য তাকে এক কোমর মাটিতে পুঁতে একশত কংকর নিক্ষেপ করে মহাপাপের দন্ড প্রদান করা হয়।

বস্তুত ধর্মীয় লেবাসে ক্ষমতালোভী নরপশুদের তান্ডবলীলাকেই লেখক মুখ্য উপজীব্য করেছেন। এই উপন্যাসে সংখ্যালঘু নিতাইকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভারতে বিতাড়ন করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করেছে। নিতাইয়ের মেয়ে স্বরস্বতী উন্মত্ত হয়ে বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে গেলে তাকে থামানো হয়। ওদিকে হায়দার মহিউদ্দীনের ওপর চলে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও হামলা। সৈয়দ শামসুল হক এই উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতাকেই নির্মম চিত্রকল্পে উপস্থাপিত করেছেন। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক পরিবেশ নেই দেশে। দেশের সর্বত্র মানবিক বিপন্নতা দেখা দিয়েছে– সৈয়দ হক এই চিত্রই তুলে ধরেছেন। সমাজ অবক্ষয়ের (Social decadent)–এর অন্তরঙ্গ চিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলোতেও লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও তিনি উত্তরবঙ্গের এই ল্যান্ডস্কেপ জলেশ্বরীতলাকে অবলম্বন করে অধিকাংশ গল্প লিখেছেন। সুতরাং তাঁর গল্পের মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ প্রচ্ছদ এই উত্তরবঙ্গ। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থের 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' (১৩৯৫)–তে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সামজজীবনের বিস্তৃত পটভূতি ব্যবহার করেছেন। সমাজ রাষ্ট্র সংস্কৃতির সামূহিক মানবিক বিষয়কে বিশিষ্টতা দান করেছেন বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে। এইসব গল্পেও লেখক সচেতনভাবে আঞ্চলিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে স্থানিক আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তবে এগুলোকে প্রচলিত ফর্মের ছোটগল্প যায় না। সৈয়দ শামসুল হক বক্তব্যপ্রধান এইসব গল্পে ব্যবহার করেছেন কথকের ভঙ্গি। বক্তব্যপ্রধান এই গল্পগুলো তাঁর নিরীক্ষাধর্মী 'গল্প প্রবন্ধ' নামে পরিচিত। তিনি নিজেও এগুলোকে গল্পপ্রবন্ধ বলে স্বীকার করেন। একটি গল্পের শুরুতে তিনি লিখেছেন 'এই গল্প প্রবন্ধের শেষটুকু আমি জানি।'[২২৪] বলা যায়, বিষয়গত কারণেই তাঁর এই গ্রন্থের গল্পগুলো নিরীক্ষাধর্মী এবং বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই সমাজের অবক্ষয় ও নানা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাকে গল্পে রূপায়িত করতে গিয়ে আঙ্গিকগত কৌশল অবলম্বন করেছেন।

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে গল্পনির্মাণ করলেও সৈয়দ শামুসল হকের গল্পের বিষয়চেতনা জাতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। সুতরাং গল্পগুলোতে আঞ্চলিক জীবনকাঠামোর ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার রূঢ়চিত্র রূপায়িত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হচ্ছে– 'কোথায় ঘুমাবে করিমন বেওয়া', 'আরো একজন', 'গুপ্তজীবন প্রকাশ্য মৃত্যু', 'নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়', 'জলেশ্বরীর দুই সলিম', 'সংসদ সদস্যের জুতো' প্রভৃতি অন্যতম।

বল্লার চরের পরিবেশ প্রতিবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকেই লেখক চিত্রায়িত করেছেন 'কোথায় ঘুমাবে করিমন বেওয়া' গল্পে। জলেশ্বরীর করিমন বেওয়া নির্বাচনের সময় সরকারী দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ফলে, নির্বাচনের পর সরকারি দল তার ওপর প্রতিশোধ নেয়। তার মৃত্যু হলে সরকারি দলের নেতারা ঘোষণা দেয়, করিমনের জানাজা বল্লার চরে হবে না। তার পোষ্যপুত্র সাত আট বছরের বালকটিকেও তারা জারজ সন্তান বলে প্রচার করে। অথচ বল্লার চরের মসজিদের মাওলানাসহ সবাই জানে করিমন আট বছর আগে এই ছেলেটিকে দত্তক নিয়েছিল। শুধুই সরকারি দলের পক্ষে কাজ করার জন্য তার এই পরিণতি। শেষ পর্যন্ত করিমনের ভাই ও পৌষ্যপুত্র তার মৃতদেহটি জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারের দ্বিতীয় সিঁড়িতে রেখে দেয়। সারা

Dhaka University Institutional Repository

জলেশ্বরী করিমনের লাশের গন্ধে ভরে যায়। তার মৃতদেহটি ঘুমাবার জন্য একখন্ড জমিও দেয় না রাজনৈতিক নেতারা। লেখকের বর্ণনা ঃ

> লাশ একটি প্রকাশ্য জায়গায় ফেলে রাখা অপরাধ কিনা কেউ ভাল করে বলতে পারে না; এ সম্পর্কে জলেশ্বরীর নানাজন নানামত প্রকাশ করে; ইতোমধ্যে লাশ ফুলে ওঠে, লাশ পচে ওঠে, লাশ একটি রমনীর কৈশোরব্যাপী রচিত কাঁথার ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়, দীর্ঘ হয়, বৃহৎ হয়, মীমাংসা হয় না; জলেশ্বরীর সর্বত্র করিমন বেওয়ার লাশের গন্ধ কেবলি পাওয়া যায়। ... আমরা বিকটভাবে আবিষ্কার করি, করিমন বেওয়া আমাদেরই পাশে ঘুমিয়ে আছে। কারণ সে আর কোথায় ঘুমাবে?[২২৫]

মূলত করিমন বেওয়ার লাশ একটি প্রতীক চরিত্র। সামগ্রিকভাবে সমাজের সুস্থ মূল্যবোধ আজ গলিত লাশের মতই। তারই দুর্গন্ধ নিয়েই আমাদের সামাজিক বসবাস। লেখক রুগ্ন সমাজ অবক্ষয়ের এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর 'আরো একজন' নামক গল্পেও সমাজ অবক্ষয়ের চিত্র এবং বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি মহৎ অর্জন ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দিনে অন্তর থেকে শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল অর্পণ করে। কিন্তু জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজার শরীফের খাদেম সৈয়দ আবদুল সুলতান ফতোয়া জারি করে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হিন্দুদের মতো পুজো করার সামিল। যারা শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাবে তার মহাপাপী, তারা দোজখবাসী হবে। পরকালে সত্তর হাজার সাপ তাদের দংশন করবে। যখন ভয়ে যন্ত্রণায় কাতরাবে, পিপাসার্ত হবে, তখন বেদ্বীন নাছারাদের বিষাক্ত ঘায়ের পুঁজ তাদের পান করতে দেয়া হবে। এই ধরনের বক্তব্য শুনে জলেশ্বরীর সাধারণ এক অশিক্ষিত মানুষ কসিমুদ্দিন খাদেমের প্রতিবাদ করে। সে বলে, মাজারে সেজদা করলে পাপ হয় না, পুজা হয় না, শহীদ মিনারে ফুল দিলে পুজা হবে কেন? খাদেম কসিমুদ্দিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে। কসিমুদ্দি জবাবে বলে ঃ

> এইবার মুঁই ঢাকা যামো, আর একুশে ফেব্রুয়ারি দেখিমো শহীদ মিনারে গিয়া ফুল দেমো, পত্রিকায় মুঁই দেখিছো ফুলে ফুলে ভরি গেইছে শহীদ মিনার। য্যান বেহেস্তের এক টুকরো হুয়া আছে গো। মুঁই সেই শহীদ মিনারে যায়া হামার দ্যাশের যাবত শহীদের নামে সালাম করিমো, তা হামাকে দোযখে সইত্তর হাজার সর্পে দংশায় হামার কোন দুস্ক নাই, বাহে।[২২৬]

কসিমুদ্দি ঢাকায় গিয়ে যাদুঘরে তার মেয়ের গলা থেকে হারিয়ে যাওয়া বংশের স্মৃতি চিহ্ন মুদ্রা দেখে চিৎকার করে ওঠে। নিজের মুদ্রা বলে দাবি করে। কেউ তার কথা শোনে না/ক্রোধে উন্মত্ত কসিমদ্দি রাস্তায় চলন্ত গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। এই খবর শুনে জলেশ্বরীর খাদেম প্রচার করে ঃ

> শহীদ মিনারে গিয়েছিল কসিমুদ্দি। ফুল দিয়েছিল, আল্লাহ তাকে মাফ করে নাই, সাথে সাথে উঠায়া নিছে, ফুল দিয়া সে নামতে পর্যন্ত পারে নাই, বাসের নিচে জীবন দিছে, মালেকুল মওত তার জান কবচ করছে। হেই, মুসলমান সাবধান, সাবধান, সাবধান।[২২৭]

বস্তুত ধর্মীয় আবরণ দিয়ে প্রতিনিয়ত সত্যের সঙ্গে ছলনা করে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কৃষক কসিমুদ্দিরা এইভাবে বারবার শহীদ হয় তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। তাই লেখক বলেন, 'আমাদের এখন মনে হয়, কসিমুদ্দিও আমাদের আরো একজন শহীদ।'[২২৮]

এছাড়াও 'গুপ্তজীবন প্রকাশ্যে মৃত্যু' গল্পে জলেশ্বরীর বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী শুকুর মোহাম্মদের ব্যক্তি জীবনের নগ্ন কদর্যতার ছবি অতিলৌকিক বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন লেখক। 'জলেশ্বরীর দুই সলিম'

Dhaka University Institutional Repository

গল্পে রূপায়িত হয়েছে স্থানীয় পটভূমিতে জাতীয় রাজনৈতিক সংকটে। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে জলেশ্বরীর সাধারণ মানুষ দুই সলিমের প্রতিবাদী ভূমিকা; সেই সঙ্গে গ্রামবাসীর ঐকমত্য সৃষ্টি এই গল্পের বক্তব্য। 'যেন বা এক মহামারী থেকে' গল্পে গ্রাম্যজীবনের নষ্টামি তথা মানবতার চরম অবমাননার চিত্র বিধৃত। বুড়িচরের পটভূমিও আঞ্চলিক ভাষা এই গল্পেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'সংসদ সদস্যের জুতো' গল্পটি প্রতীকধর্মী এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান। এই গল্পে জলেশ্বরীতলার সরকারী ও বিরোধী দলের দুই নেতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত জনতার পক্ষ বিপক্ষের দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। মূলত আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি জীবনের হীনমন্যতা এই গল্পে বিধৃত হয়েছে। আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখক জাতীয় সমস্যাগুলোই গল্পে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন সামাজিক অবক্ষয়, নৈরাজ্য প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক চরম বিপর্যয়েরই বাস্তব পরিস্থিতি।

আমাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মর্হুমুহু নাটকীয়তার প্রেক্ষিতে সমাজ শরীরে নানা আঘাত লেগেছে। সমাজবাদী দায়বদ্ধ লেখকের দৃষ্টিতে সেই আঘাতের ক্ষতচিহ্নটুকু মুছে যাবার নয়। উত্তরবঙ্গের বিড়ম্বিত সমাজের নান্দীমুখ নিয়ে গল্প লেখতে প্রলুব্ধ হয়েছেন আরো অনেক লেখক। তন্মধ্যে সমাজমনস্তাত্ত্বিক গল্পকার হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯) অন্যতম। হাসান আজিজুল হকের গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি সম্পর্কে কায়েস আহমেদ (১৯৪০–১৯৯২) লিখেছিলেনঃ হাসান আজিজুল হক–এর গল্প ধারণ করে আছে দু'টি ভিন্নতর ভূগোল– একদিকে ধূসর রুক্ষবৃক্ষ বিরল রাঢ়, অন্যদিকে সুন্দরবনের কোলঘেঁষে সজল শ্যামল নরম পলির খুলনা এলাকা। ...এই দুই বিপ্রতীপ অঞ্চলের মাটি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানুষ, সময় এবং প্রকৃতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, তিনি তাঁর গল্পে এই সমস্ত কিছুকে গভীর ভালোবাসায় কিন্তু শৈল্পিক নিরাসক্তিতে দুমড়ে মুচড়ে আমূল তুলে আনেন।[২২৯]

বলা বাহুল্য, রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা হাসান আজিজুল হক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করলেও তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে এই উত্তরবঙ্গে। তাই তাঁর গল্পে–নিবন্ধে উত্তরের বিড়ম্বিত সমাজের খুঁটিনাটি চালচিত্র উঠে এসেছে। সুতরাং হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ প্রকৃতি পরিবেশের প্রয়োগ বৈচিত্র্যে উত্তরবঙ্গও তৃতীয় উপনিবেশ একথা জোর দিয়েই বলা যায়। বিশেষ করে তাঁর 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' (১৯৮৬), কিংবা 'সাঁওতালগণ' (দৈনিক সংবাদ, ৫০ বছর পূর্তি সংখ্যা, বিশেষ ক্রোড়পত্র ৪১, ঢাকা) প্রভৃতি নিবন্ধে তিনি উত্তর জনপদের মানুষ প্রকৃতি ও আর্থসামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নরূপটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> চরিত্রের সন্ধানে নয়, কাহিনীর খোঁজেও নয়, খুব কাছ থেকে নজর করে মানুষ, তার জীবিকা আর যে জগতে সে আষ্টেপৃষ্ঠে আটক আছে তা দেখার জন্যে উত্তরাঞ্চলের একটি এলাকায় গিয়েছিলাম। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই দেখতে পাই, উত্তরাঞ্চলে বড়ো–বড়ো মাঠ আছে, সেই মাঠে বন–জঙ্গল লতাপাতার তেমন বাড় নেই। সহজেই বুঝতে পারা যায়, এখানকার মাটি পুরনো। একটা উঁচু মাঠে, লালচে কাঁকর ভর্তি মাটির উপর অনেকগুলো তালগাছ খুব কাছ থেকে দেখলাম।[২৩০]

নিচুতলার মানুষ ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, ছোট চাষী, আদিবাসীদের জীবন তিনি খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। উত্তরবাংলার এইসব অপুষ্টিক্লীষ্ট, খাদ্যহীন দরিদ্র মানুষের সমাবেশে দেখেছেন– গ্রামের পর গ্রাম তারা ছেয়ে আছে। 'মরছে, ধুঁকছে, ভুগছে, গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে, শহরে এসে রিক্সা টানছে, কলে কারখানায় ঢুকছে... দলে দলে কাজের ধান্দায় এক অঞ্চল থেকে আর এক

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাদা ঘাঁটছে, নদীতে খালে মাছ হাতড়াচ্ছে, শস্যকণার খোঁজে মাটি আঁচড়াচ্ছে।'[২৩১]

সুতরাং হাসান আজিজুল হক উত্তর বাংলার মাটি মানুষ পরিবেশ ও জীবন থেকে তিল তিল করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন– তারও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন বেশ কিছু গল্পে। কাছ থেকে জীবনের রূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার যে আশ্চর্য শক্তি হাসানের চোখে রয়েছে তাঁর গল্প পড়ে তা বোঝা যায়। বিশেষ করে তাঁর 'জননী', 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত', 'বিলি ব্যবস্থা' প্রভৃতি গল্পে অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজের নির্মম সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'জননী' গল্পের প্রধান চরিত্র আয়েসা নামের একজন কাজের ঝি। তার বয়স চৌদ্দ পনের বছর। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'–র মতো মেয়েটির সর্বনাশের কারণ হলো অনন্য সাধারণ রূপলাবণ্য। তাই বিয়ের আগেই মেয়েটি একবার মা হয়েছিল। লেখকের বাসায় কাজের ঝি এর কাজ নেয়ার পর– যখন এরকম একটি অস্বাভাবিক কিন্তু অবশ্যম্ভব নয় সংবাদ শুনলেন; তখন তাঁর উপলব্ধি ঃ সকালের পরিস্কার আলোয় দেখা মেয়েটির মধু রঙের নরম ত্বক, অসাধারণ দুটি চোখ, প্রতিমার মত সুডৌল মুখ আমার মনে পড়ে যায়। এসব একবার তছনছ হয়ে যাবার পর মেয়েটি আবার গুছিয়ে নিয়েছে। মহাভারতের সত্যবতীর কথা মনে পড়লো, সঙ্গমের পরও তাঁর কুমারিত্ব নষ্ট হয়নি। ... প্রচন্ড ক্ষোভে ভিতরটা আমার জ্বলে যেতে থাকে। কী অসঙ্গত, কী বিভৎস গন্ডারের তাজা গোলাপ খাওয়ার মতো।[২৩২]

একবার ভাঙনের পর আপাতভাবে মেয়েটি নিজেকে গুছিয়ে নিলেও সে নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেনি। কিছু দিন পর লেখক তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে জানতে পারলেন, আয়েশা আবার গর্ভবতী। সেদিন লেখক আয়েশার সমবয়েসী আপন কন্যাকে কোলে নিয়ে খুব কাঁদলেন। কিন্তু স্ত্রীর চাপে আয়েশাকে বাড়ি থেকে বিদায় করলেন। লেখকের কৌতূহল কি করে একটি মানুষ পৃথিবীতে আসে তা দেখবেন। আয়েশা চলে যাবার পর মাঝে মাঝে পথের ধারে জামগাছ তলায় তাকে দেখেছেন। বাতাসে ফাঁপিয়ে তোলা মশারির মতো তার পেট ফুলে উঠেছে। 'আজ তার এই বিশাল গর্ভগৃহ দেখে মনে হয়, একটিমাত্র সন্তানের জন্যে জায়গাটি বড্ডো বড়ো– হয়তো ওখানে শত শত কলসীতে ভরা আছে একশো সন্তান। তারা জন্ম নিয়েই মাকে ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাবে। পিতৃহীন জারজেরা মায়ের হয়ে অধিকার নেবে মাটির।'[২৩৩]

বারবার তার জরায়ুতে নিষিক্ত হবে ডিম্বকোষ। আয়েশা জনহীন জন্মদ্বার খোলা রাখতে রাখতে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। বস্তুত বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয় কুমারীদের তলিয়ে যাওয়ার এক প্রতীকধর্মী বক্তব্য লেখক সমাজমনস্তত্ত্বিক বাস্তবতায় তুলে ধরেন। আয়েশা চরিত্রটি লেখকের সমাজ নিরীক্ষারই প্রতীক। পটভূমি চরিত্র ও ভাষা রাজশাহী কেন্দ্রিক হলেও এই গল্পের ব্যাপ্তি আমাদের দেশের সামগ্রিক অবক্ষয়েরই চূড়ান্ত প্রকাশ। নষ্টামি, লোভ, কপটতা, প্রবঞ্চনা জীবনের ঘোলাজলে ভেসে ভেসে চলে। সামাজিক মূল্যবোধে ধ্বস নামে। জীবনের চাহিদা নেমে আসে স্বার্থপরতায়। সেই সব দেখে শুনে হাসান যে বিচলিত হন, তা বোঝা যায় তাঁর গল্প পড়ে।[২৩৪] উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের জনজীবনের নির্মম বাস্তবতার চালচিত্র নিয়ে তাঁর 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত' এবং 'বিলি ব্যবসা' অসাধারণ দুটো গল্প। গল্পের বিষয়বস্তু উত্তরবঙ্গের ভূমিহীন কৃষক বনাম গ্রাম্যশোষক মাতব্বরের শোষণ কাহিনী। সমাজের নষ্টামি, লোভ, প্রবঞ্চনা আর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য কোথায় পৌঁছেছে হাসান আজিজুল হক তা বুঝিয়ে দেন– কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াই। কারণ, 'হাসান আজিজুল হক তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক। তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব অর্থাৎ যেখানে ৬০ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত, ৫০ কোটি মানুষ বেকার, ১৫ কোটি মানুষের চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই, ৮০ কোটি মানুষ নিরক্ষর– সেই তৃতীয় বিশ্ব। হাসান আজিজুল হকের লেখার বিষয় 'বাংলাদেশ।'[২৩৫] স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোন সরকারই সঠিক ভূমিনীতি গ্রহণ করেনি। ফলে ভূমিসংলগ্ন মানুষ রয়ে যায় ভূমিহীন। আর বিভিন্ন ফন্দিফিকির করে বিত্তবানরা হয়ে ওঠে ভূমির মালিক। 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত' গল্পে লেখকের বক্তব্য ঃ

> বাংলাদেশের দুরবগাহ বাস্তবতার ভিতরে ধাতব কিরিচের মতো তীক্ষ্ণ আলো ফেলতে মনস্থকারী একবগগা সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন এক ধুলোভরা তাতানো কাঁসার মতো দুপুর জুড়ে অকহতব্য পরিশ্রম করে এই ঘটনা জানতে পেরেছিলেন যে খাসজমি নিয়ে সরকার নোংরা টালবাহনা করলেও শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন চাষী একামতউল্লাহকে এক একর জমি দিয়েছিল।[২৩৬]

কিন্তু ভাতুয়া একামতউল্লাহ তার জোতদারের চিরকালীন গোলাম। তিনবিঘা জমিতে গম চাষ করলেও সমস্ত গমের দাবিদার হয়ে ওঠে জোতদার। একামতের মালিক, তার স্ত্রীর মালিক এবং সেই সূত্রে তার জমিরও মালিক– কারণ জোতদারের কাছে সে চিরকালীন ভাতুয়া বা বড়জোর মাহিন্দার দাসানুদাস বলেই বিবেচিত। কিন্তু একসময় একামত বিদ্রোহ করে। তার সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসে গ্রামের প্রতিবাদী যুবক তাকিবুল, নছর, ফিরু, নিরীহ নির্বিকার গ্রামের মানুষজনও। তারা আক্রমণের জন্য সারারাত জ্যোৎস্না রাত্রিতে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু 'তখন রক্ত হিম করা একটা পৈশাচিক চিৎকার করে উপুড় হয়ে পঞ্চাশ একর জমি ঢেকে যে পড়েছিলো তাকে জোতদার বলে নিঃসন্দেহে চেনা গেলেও পরে দেখা যায় তা আসলেই একখন্ড বিশাল ন্যাড়া পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়।'[২৩৭] শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন প্রজামণ্ডলীর দ্রোহ এক রকম কুহকবাস্তবতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। ভূমিহীন কৃতদাসদের বিদ্রোহের বাস্তবতা তো স্বপ্নের মধ্য দিয়েই শেষ হয়। কিংবা বলা যায়, বাস্তবতার গোলক ধাঁধায় তারা শেষ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে না অর্জিত সংগ্রাম স্বাদ ও সুফল।

'বিলি ব্যবস্থা' গল্পের পটভূমিও উত্তরবঙ্গের রংপুরের ভূমিহীন জীবন। রংপুরের তিস্তা নদীর পাশে ডালিয়া গ্রামের ভূমিহীন পরিবার ও গ্রামের জোতদারের শোষণ এই গল্পেরও উপজীব্য বিষয়। গল্পের শুরুতে লেখক জানান ঃ

> এই ডালিয়ার পথে একটা কোঁচকানো এবোডোবা গ্রামে কিছু খাস জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলোবার কথা ছিলো। সবাই জানে খাস জমির মালিক সরকার। কিন্তু প্রায় কেউই জানে না মালিকানা বলতে কি বোঝায়।[২৩৮]

শেষ পর্যন্ত নেকবখ্শ দশ কাঠা ভূমির মালিক হয়। সেই মাটি ফুঁড়ে একদিন বেরিয়ে আসে হলুদ ফুলের গালিচা। কিন্তু হলুদ সর্ষে ফুলের গালিচায় একদিন ঘটল তার জীবনের চূড়ান্ত সর্বনাশ। তার ষোল বছরের একমাত্র বোন নেকী নামের বোবা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে জোতদারের খোড়ানুলো ছেলে। মাস খানেক পর টের পায় নেকীর পেট সামান্য উচু হয়ে উঠেছে। ওদিকে মাসের শেষ সরিষার গুটি পেকে ওঠে। মালিক দাবি করে সমস্ত সরিষা ও জমি। নেকবর মালিকের কাছে আবেদন করে নেকীর সঙ্গে তার ছেলের বিয়ের জন্য। পক্ষান্তরে, মালিক গ্রাম্য মৌলভির ফোতোয়ায় নেকীকে এক বুক মাটিতে পুঁতে কংকর নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয়। কংকর নিক্ষেপের ফলে বোবা মেয়েটি চিৎকার করে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে চায়। 'প্রবল বাতাসের সঙ্গে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে জন্তুর আওয়াজ। কান পেতে শোনে নেক বখ্শ। একবার, দুইবার, তিনবার। তারপর দারুণ আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে, কি কহিছে বাহে? কি কহে সে? কান্দে? কে কান্দে? বোবা চিৎকার শোনা যায়। কে কান্দে কহিস? পয়গম্বর কাঁন্দে কহিছে

Dhaka University Institutional Repository

আমার বুন। চোখের আঁসুতে সোনার দাড়ি ভিজাইয়া আমার পয়গম্বর নবীজী কাঁন্দে। জারে জারে হইয়া কাঁদে।'[২৩৯] অত্যাচারি মানুষের জীবনে দীর্ঘশ্বাসের মত এইভাবেই মিশে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাস। সমাজের শরীরে ক্রমেই বিভিন্নভাবে শোষণের থাবা প্রসারিত হতে হতে চারদিকে ব্যূহ রচিত হচ্ছে। হাসান আজিজুল হক সেই অবক্ষয়গ্রস্ত রূঢ়বাস্তবতারই রূপকার।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজেতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও বোঝা যায়, বাংলা কথাসাহিত্যের আদিপর্ব থেকে আধুনিকতার ক্রমবিকাশের পর্ব-পর্বান্তরে বাঙালির মূলত সমাজ-অস্তিত্বের ক্রমবিকাশের রূপটিই রূপায়িত হয়েছে। 'বাংলা কথাসাহিত্য জন্মলগ্নের শুরু থেকে বাঙালির পরিচিত ভৌগোলিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে যেমন উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে নেবার চেষ্টা করেছে, তেমনি নিজস্ব বসতভূমির পারিপার্শ্বিকতার পরিধি অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করেছেন লেখকেরা।[২৪০] ফলে, বাংলার আঞ্চলিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিন্যাস, নদী, পাহাড়, সমুদ্র কিংবা বিল হাওড়, অসমতল, উঁচু নিচু ধূসর বৃক্ষবিরল লালপ্রান্তর-আঞ্চলিক সামাজিক ভাষার প্রত্যক্ষ আবহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পৃথক পৃথক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। বর্তমান নিবন্ধে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গই অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গর আঞ্চলিক জীবন প্রবণতার অনুষঙ্গগুলো যেমন স্থানিক বর্ণনায় রূপায়িত হয়েছে, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমাজ ইতিহাসের স্তরবিন্যাস। লক্ষ করা যায়, নদনদী বিল প্রভাবিত বৃত্তিক মানুষের প্রজন্ম পরম্পরায় ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। সামাজিক ও রাষ্ট্রীক মূহুর্মূহ নাটকীয় পরিবর্তনে এইসব বৃত্তিক মানুষের জীবন জীবিকার আঘাত হেনেছে নগ্ন শোষণের থাবা। তাদের লাইফ প্যাটার্ণ গেছে বদলে। কিংবা ক্রমক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতে বিনষ্টি ও বিপন্নতার মধ্যে টিকে আছে এইসব মানুষ। আবার কৃষিজীবী মানুষের জীবনেও এসেছে বিভিন্ন অভিঘাত। আঞ্চলিকভাবে তারা এইসব অভিঘাতের সঙ্গে লড়াই সংগ্রাম করেছে। বাংলার নীল বিদ্রোহ থেকে তেভাগা আন্দোলন, সর্বোপরি আঞ্চলিক পর্যায়ে কৃষিজীবী মানুষের জাতীয় আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণেরও সামাজিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে আমাদের কথাসাহিত্যের অন্তরঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় খরা, দুর্ভিক্ষ এবং নানামাত্রিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট মিলিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক ও মানবিক সংকট। উত্তরবঙ্গ যেহেতু বাংলার প্রাচীন ভূমি- তাই আদিম সমাজের আদিবাসী মানুষের অস্তিত্ব বিপন্নতার চালচিত্র ও আমাদের সাহিত্যের একটি অন্যতম পরিসর হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, এই জনপদের সমাজজীবনের যে নিস্তরঙ্গ রূপটি প্রকট হয়ে আমাদের কথাসাহিত্যে দেখা দেয়, তা হলো এই অঞ্চলের ব্যাপক মানুষই নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জীবনের বাসিন্দা। মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা তারা শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এই অমানবিক শোষণ ও লড়াইয়ের খন্ডচিত্র, তাদের সামাজিক বৃত্তিক জীবনাচারণসহ মেজাজ মর্জি ও মুখের ভাষা সব মিলিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ক্যানভাস আমূল ওঠে আসে লেখকদের কলমে। লেখকদের দেশকালের সমাজ ভাবনার মধ্য দিয়ে আমরাও সন্ধান পাই মানবিক সত্যের। উপলব্ধি করি- উত্তরবঙ্গের অতীত বর্তমান সমাজ অভিজ্ঞান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, 'বাংলা উপন্যাসে সামজবাস্তবতা', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৭৯।

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৪৬।

৩. সৈয়দ শামসুল হক, 'ভূমিকা', 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬।

৪. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০২, পৃ. ৭২।

৫. আ, স, ম, আশরাফ উদ্দিন, ''উপন্যাসে বাংলাদেশের নদী'' (প্রবন্ধ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা' ষষ্ঠ বিংশ বর্ষ, বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃ. ১৪২-১৪৩।

৬. শামসুল হক, 'নদীর নাম তিস্তা', 'স্টুডেন্ট ওয়েজ' ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ. ১।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

১২. সুবোধ লাহিড়ী, 'ভস্তার বিল', প্রকাশ ভবন, বাংলা বাজার ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭৬; পৃ. ১।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

১৪. মুহম্মদ ইদরিস আলী, 'আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা বিভাগোত্তর কাল', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৪১।

১৫. উল্লেখ্য, তিনি ১৯২৯ সালে ইংরেজিতে স্নাতক সম্মান অর্জন করেছিলেন রাজশাহী কলেজ থেকে।

১৬. লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি ঃ প্রমথনাথ বিশী; পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০১, পৃ. ১।

১৭. প্রমথনাথ বিশী, 'মুক্তবেণী' ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭১।

১৮. প্রমথনাথ বিশী, 'পদ্মা' রশুহন প্রকাশনায় কালকাতা ১লা শ্রাবণ, ১৩৪২, পৃ. ৭১।

১৯. প্রমথনাথ বিশী, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', ক্যাতায়নী বুক হাউস, কলকাতা ১৩৫২, পৃ. ১৩।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।

২২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে ঔপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৬৪৩।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

২৪. লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

২৫. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, 'ইলিউসন অ্যান্ড রিয়ালিটি' (অনুবাদঃ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৯২।

২৬. আবুবকর সিদ্দিক, 'সাহিত্যের সপ্ত প্রসপ্ত', ঐহিত্য, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬১।

২৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা', মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৯৭, পৃ. ৯-১০।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৩২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতহিাস' (৩য় খন্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্লিশার্স, কলকাতা ১৯৮১, পৃ. ২২।
৩৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'খোয়াবনামা' পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬।
৩৫. শহীদ ইকবাল, 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯।
৩৬. মোস্তফা মোহাম্মদ, ''আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য; মানুষজন সময়'' (প্রবন্ধ), 'সুন্দরম' (পত্রিকা) সম্পাদক, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪০৫, পৃ. ৪৩।
৩৭. সেলিনা হোসেন, 'চাঁদ বেনে', সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১৩।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪।
৩৯. সরদার আবদুস সাত্তার, 'কথাসাহিত্য সমীক্ষণ', বই প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ. ১৪৩।
৪০. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৯৮।
৪১. সেলিনা হোসেন, 'চাঁদ বেনে', পৃ. ১০৯।
৪২. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯৯।
৪৩. সিরাজুল ইসলাম মুনীর, 'পদ্মা উপাখ্যান' আগামী প্রকাশনী ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৯।
৪৪. সিরাজুল ইসলাম মুনীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।
৪৯. আবুবকর সিদ্দিক, 'চরবিনাশকাল', 'ইউ.পি.এল. ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৮।
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
৫২. আবুবকর সিদ্দিক, 'বাইচ', 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৯৭।
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।
৫৫. শওকত আলী, 'ভবনদী' 'লেলিহান সাধ' মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫ পৃ. ৫৯।
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০।
৫৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭ পৃ. ১২-১৩।
৫৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'পায়ের নিচে জল', রচনা সমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ২০৩।
৫৯. শহীদ ইকবাল, কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬৫।
৬০. মঞ্জু সরকার, ''আমৃত্যু আকালু' (গল্প), 'মজ্জাকালের মানুষ', ইউ. পি. এল. ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৪৬।
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
৬২. ভাস্কর চৌধুরী, 'বেহুলা', 'রক্তপাতের ব্যাকরণ' সনদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৫।
৬৩. তদেব, 'শত্রু' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।
৬৫. তদেব, রক্তপাতের ব্যাকরণ, পৃ. ৬৩।
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।
৬৮. মরিস কর্ণফোর্থ, 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' অখন্ড সংস্করণ, অনুবাদঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৯।
৬৯. Agon Arnest, 'Social Stratification', NewYork, London 1962, p.p. 70-71.
৭০. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, ''বরেন্দ্রভূমির চিরায়াত বাসিন্দাঃ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী ১৯৯৮, পৃ. ৯৫।
৭১. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস', প্যাপিরাস, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৫৭।
৭২. হোসেন উদ্দীন হোসেন, 'বাংলার বিদ্রোহ' (৬০০-১৯৪৭), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ১৫।
৭৩. গৌতম ভদ্র, 'মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ', সুবর্ণ রেখা কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৪৩।
৭৪. বদরুদ্দীন উমর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক', ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৬।
৭৫. মোহাম্মদ হাননান, 'বাঙালির ইতিহাস', অনুপম প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯৮ পৃ. ৮৫-৮৭।
৭৬. Lord William Bentink, Speech on November 8, 1929, Couted in R. Palme Dult, 'India To-day', p. 233.
৭৭. রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব' বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৮৬।
৭৮. John L. Hobbs, 'Local History and Local Library, London 1962, p. 5.
৭৯. ড. মোহাম্মদ হান্নান, 'বাঙালির ইতিহাস', অনুপম প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ৬১।
৮০. র‍্যালফ ফকস, 'নভেল এ্যান্ড দ্যা পিপল', (অনুবাদঃ সর্বজিৎ সেন/ সিদ্ধার্থ ঘোষ), পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ২।
৮১. রফিকউল্লাহ খান, 'সত্যেন সেনের উপন্যাস বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প চেতনা' আফসার ব্রাদার্স ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৯।
৮২. যতীন সরকার, 'সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস' (প্রবন্ধ) গণসাহিত্য, সম্পাদক আবুল হাসানাত, ১৯৯৩, পৃ. ২৭।
৮৩. রামশরণ শর্মা, 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র', কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪২।
৮৪. সত্যেন সেন, 'বিদ্রোহী কৈবর্ত, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা ১৩৭৬, পৃ. ১।
৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।
৮৯. সত্যেন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
৯০. R. C. Majumdar, (edited) 'The History of Bengal', 2nd Impression, Dacca, 1963, p. 153.
৯১. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।
৯২. মনসুর মুসা, 'পূর্ববাঙলার উপন্যাস' প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৩৮১ পৃ. ৩৯।
৯৩. হরিপদ দত্ত ''অনার্য্য ভূমির কথক শওকত আলী'' (প্রবন্ধ) 'নিসর্গ' (পত্রিকা) শওকত আলী সংখ্যা, সম্পাদক সরকার আশরাফ, বর্ষ ৭, সংখ্যা- ১, বগুড়া মার্চ ১৯৯২ পৃ. ৪৩।
৯৪. রফিউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯৩।
৯৫. শওকত আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২।
৯৯. মিল্টন বিশ্বাস, 'শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাসঃ প্রসঙ্গ রাজনীতি', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৬।
১০০. হামজা আলাভী ''ভারতবর্ষঃ সামন্তবাদ থেকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদে উত্তরণ'', (প্রবন্ধ), 'পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব' সম্পাদক, বদরুল আলম খান, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ', ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ২১৯।
১০১. Nurul H. Choudhury, 'Peasant Radicalism in Ninteenth Century Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 2001 p. 6.
১০২. ব্লেয়ার বি. ক্লিং, 'ব্লু মিউটিনি', (নীল বিদ্রোহ', অনুবাদঃ ফরহাদ খান, জুলফিকার আলী) ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৫।
১০৩. রফিকুল ইসলাম, 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' (প্রবন্ধ), 'বাংলাদেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
১০৪. সরদার আবদুস সাত্তার, 'কথাসাহিত্য সমীক্ষণ', বই প্রকাশনী', ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২২।
১০৫. সরদার জয়েন উদ্‌দীন, 'নীল রঙ রক্ত', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৩৭২ পৃ. ৭।
১০৬. সরদার আবদুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।
১০৭. সরদার জয়েনউদ্‌দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।
১১১. পল লাফর্গ, 'সম্পত্তির বিবর্তন' (বর্বর যুগ থেকে সভ্য যুগ), অনুবাদঃ অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশকঃ রেনুকা সাহা, ২০ কেশবসেন স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ১১।
১১২. সরদার জয়েন উদ্‌দীন, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৭।
১১৩. গোলাম কুদ্দুস, ''বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম'' (প্রবন্ধ) 'পশ্চিমবঙ্গ' তেভাগা সংখ্যা- ১৪০৪, সম্পাদক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৩০ বর্ষ সংখ্যা ৪২-৪৬, পৃ. ৬৩।
১১৪. নরহরি কবিরাজ, ''তেভাগা আন্দোলন'', পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।
১১৫. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, ''তেভাগার লড়াই'', পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
১১৬. ''তেভাগার লড়াই'', প্রতিবেদনটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে গৃহীত। 'সমাজ সমীক্ষা' (ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সস-এর মুখপত্রে (১৯৯৬) মুদ্রিত। উদ্ধৃতঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।
১১৭. শচীন্দু চক্রবর্তী, ''তেভাগা আন্দোলনের আলোচনা'' (প্রবন্ধ) 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' (সম্পাদকঃ ধনঞ্জয় দাস), বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা, ১৯৮৪, পৃ. ১২০।
১১৮. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।
১১৯. মণি সিং, 'জীবন সংগ্রাম', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
১২০. ভীষ্মদেব চৌধুরী, ''কাঁটাতারে প্রজাপতিঃ সেলিনা হোসেন'', 'সুন্দরম', সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা- ১৩৯৬, পৃ. ১১১।
১২১. মালেকা বেগম, 'ইলা মিত্র', জ্ঞান প্রকাশনী ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. সেলিনা হোসেন, 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৯ পৃ. ২৬।
১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
১২৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
১২৫. সেলিনা হোসেন, 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' এক বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ১৪০।
১২৬. মোস্তফা মোহাম্মদ, ''আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যঃ মানুষ জন ও সময়, 'সুন্দরম' সম্পাদক, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ. ৪৪।
১২৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা ১৩৯৫, পৃ. ১৩।
১২৮. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, ''বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'', 'সুন্দরম' সম্পাদক মুস্তাফা নূলউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ. ১০৮।
১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।
১৩০. ভাস্কর চৌধুরী, 'লালমাটি কালো মানুষ', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৪, পৃ. ২১।
১৩১. ভাস্কর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।
১৩৩. মশিউল আলম, "ভাস্কর চৌধুরীর কালো মানুষেরা", 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ', ঢাকা, শুক্রবার, ১৯ জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৮.
১৩৪. হাসান আজিজুল হক, "ভূমিকা", 'লালমাটি কালো মানুষ', পূর্বোক্ত।
১৩৫. সৈয়দ শামসুল হক, "নেপেন দারোগার দায়ভার", 'গল্পসমগ্র', অনন্যা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৮৩।
১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।
১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।
১৩৮. ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা ১৯৮৪, পৃ. ৩১।
১৩৯. শওকত আলী, ''নবজাতক' 'লেলিহান সাধ' মুক্তধারা ঢাকা তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ২৫।
১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।
১৪১. হরিপদ দত্ত, 'অনার্য্যভূমের কন্ধক শওকত আলী' পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।
১৪২. Encyclopedia Britarica, Vol. 1, P. 67.
১৪৩. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, ''বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতি'', 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৬-১৪৭।
১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
১৪৫. তাসাদ্‌দক হোসেন, 'মহুয়ার দেশে', কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা শ্রাবণ, ১৩৬৬ পৃ. ৯-১০।
১৪৬. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, 'আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনাঃ বিভাগোত্তরকাল', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭।
১৪৭. রিজিয়া রহমান, 'একাল চিরকাল', মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৯।
১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।
১৪৯. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ. ১১২।
১৫০. শওকত আলী, 'ফাগুয়ার পর', 'সবগল্প', অরিত্র, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৩৩।
১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
১৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।
১৫৬. শওকত আলী, 'পুশনা', সবগল্প পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।
১৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।
১৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।
১৫৯. শওকত আলী, 'রানীগঞ্জ, অনেক দূর', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২।
১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩।
১৬১. শওকত আলী, ''কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ', 'লেলিহান সাধ', মুক্তধারা, ঢাকা তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১০২।
১৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।
১৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।
১৬৪. শওকত আলী, 'ফাগুয়ার পর', 'সব গল্প' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।
১৬৫. শওকত আলী, 'রানীগঞ্জ, অনেক দূর', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।
১৬৬. শওকত আলী, 'কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ', 'লেলিহান সাধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।
১৬৭. শওকত আলী, ''শুন' হে লখিন্দর'', 'শুন' হে লখিন্দর', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ১১৮।
১৬৮. শওকত আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।
১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।
১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
১৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।
১৭২. গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।
১৭৩. বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩১।
১৭৪. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।
১৭৫. বিনতা রায় চৌধুরী, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২।
১৭৬. 'International Encyclopedia of the Social Science', IV-Vol. David, L. Shelis (edt). The Macmilan Company, New York, 1972, p. 322.
১৭৭. আনু মুহাম্মদ ও আতিউর রহমান, 'বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ একটি প্রামাণ্য চিত্র', পাপড়ি প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬০-৬২.
১৭৮. বিনতা রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫।
১৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।
১৮০. দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা, ২৫ চৈত্র, ১৩৫০ পৃ. ২।
১৮১. আনু মুহাম্মদ ও আতিউর রহমান পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।
১৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।
১৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৯০।
১৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।
১৮৫. সত্যেন সেন, 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।
১৮৬. 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭. অমর্ত্য সেন, ''ক্ষুধার রাজনৈতিক অর্থনীতি'', 'মর্ত্যের অমর্ত্য সেন', সম্পাদক, ড. মোহাম্মদ হাননান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ২৭৯।
১৮৮. এম. সাজ্জাদুর রহমান, ''পঞ্চগড়ে মঙ্গার অশনিসংকেত'', 'দৈনিক যুগান্তর' ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ পৃ. ৮।
১৮৯. ফারুক আবদুল্লাহ, ''বরেন্দ্রের অর্থনৈতিক ইতিহাস'', 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩০।
১৯০. সৈয়দ শামসুল হক, 'নারীরা' বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯।
১৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।
১৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
১৯৩. পূর্বোক্ত, 'ইহা মানুষ', শিখা প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯১ পৃ. ৩৯।
১৯৪. সৈয়দ শামসুল হক, 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', 'গল্প সমগ্র' অনন্যা, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৫৭।
১৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯।
১৯৬. শওকত আলী, 'আকাল দর্শন', 'নিসর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. শ ৩৬।
১৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮–৪৯।
১৯৮. শওকত আলী, 'অচেনা' 'শুন হে লখিন্দর', ইউ. পি.এল. ১৯৮৬, পৃ. ১০।
১৯৯. শওকত আলী, 'সোজা রাস্তা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭–১৮।
২০০. শওকত আলী, 'ডাকিনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
২০১. হরিপদ দত্ত, 'অনার্য্যভূমের কথক শওকত আলী, নিসর্গ, সম্পাদক সরকার আশরাফ, বর্ষ ৭, সংখ্যা–১, বগুড়া, ১৯৯২, পৃ. ৪৭।
২০২. সরদার আবদুস সাত্তার, 'কথাসাহিত্য সমীক্ষণ', বই প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১৫।
২০৩. মঞ্জু সরকার, 'কার্তিকের অতিথি', 'মঙ্গাকালের মানুষ', ইউ.পি.এল ঢাকা ২০০১, পৃ. ১১–১২।
২০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।
২০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।
২০৬. পূর্বোক্ত, গো–জীবন, পৃ. ২৮।
২০৭. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৫।
২০৮. মঞ্জু সরকার, 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২–৯৩।
২০৯. মঞ্জু সরকার, 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
২১০. আবুবকর সিদ্দিক, ''যে ভাবে লেখা হলঃ 'খরাদাহ'', 'সাহিত্যের সংগপ্রসংগ', ঐতিহ্য, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৭১–১৭২।
২১১. মুশাররাফ করিম, 'খরাদাহ', 'দৈনিক দেশ', ঢাকা ২৬ জুন, ১৯৮৭।
২১২. আবুবকর সিদ্দিক, 'খরাদাহ', মুক্তধারা, ঢাকা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৭৯।
২১৩. কবীর চৌধুরী, ''আবুবকর সিদ্দিকের জলরাক্ষস ও খরাদাহ'' 'প্রবন্ধ সপ্তাহ', শিল্পতরু প্রকাশানী ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৩২।
২১৪. রফিকউল্লাহ খান, ''বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ'', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।
২১৫. সৈয়দ শামসুল হক, 'দূরত্ব', 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' বিদ্যাপ্রকাশ ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসম্বের ১৯৯৬, পৃ. ৬৩।
২১৬. রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৪৭।
২১৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'দূরত্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।
২১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।
২১৯. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

২২০. সৈয়দ শামসুল হক, 'না যেও না', আফসার ব্রাদার্স ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬২।
২২১. সৈয়দ শামসুল হক, 'ত্রাহি' আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৪৮।
২২২. পূর্বোক্ত, শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ, বিদ্যা প্রকাশ ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ২০।
২২৩. 'চোখবাজি' পূর্বোক্ত, অঙ্কুর প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ৩২।
২২৪. সৈয়দ শামসুল হক, 'আরো একজন', 'গল্প সমগ্র', অনন্যা, ঢাকা ২০০১ পৃ. ৩৬২।
২২৫. পূর্বোক্ত, ''কোথায় ঘুমাবে করিমন বেওয়া'', গল্পসমগ্র ৩৪২
২২৬. পূর্বোক্ত, আরো একজন, গল্পসমগ্র, পৃ. ৩৬৪।
২২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬।
২২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬।
২২৯. কায়েস আহমেদ, ''অন্য অবলোকন'' [হাসান আজিজুল হক] কায়েস আহমেদ সমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ২৬৬।
২৩০. হাসান আজিজুল হক, 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি', 'মুক্তধারা', ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৯।
২৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।
২৩২. তদেব, 'জননী', 'রচনাসংগ্রহ-২', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৭৩।
২৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।
২৩৪. সনৎকুমার সাহা, ''হাসান আজিজুল হক ঃ ফিরে দেখা'', 'বিজ্ঞাপন পর্ব', সম্পাদকঃ রবিন ঘোষ, পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা- ৩-৪, শ্রাবণ ১৩৯৫, কলকাতা পৃ. ১০৯।
২৩৫. বাসুদেব দাশগুপ্ত, 'মৃত্যুগুহা থেকে আরো এক কিস্তি', 'বিজ্ঞাপন পর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।
২৩৬. হাসান আজিজুল হক, 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত', রচনাসংগ্রহ- ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
২৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।
২৩৮. পূর্বোক্ত, 'বিলি ব্যবস্থা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭।
২৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩।
২৪০. বারিদবরণ চক্রবর্তী, 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন', নিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শামসুল হক প্রকৃতপক্ষেই একজন সমাজমূল কেন্দ্রসন্ধানী কথাশিল্পী। উত্তর বাংলার অপর একটি জনপদ জলেশ্বরীতলার বল্লার চরের প্রেক্ষাপটে তিনি গ্রামীণ জীবনের চরম নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের চিত্রপট অংকন করেছেন তাঁর 'ত্রাহি' (১৯৮৮) উপন্যাসে। বল্লারচর নামক এই গ্রামেও লেখক দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার পক্ষ ও প্রতিপক্ষ দুই দলের এক নতুন যুদ্ধের অবতারণা। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির নির্যাতনে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বিপন্ন চিত্রই লেখক অত্যন্ত নির্মম বাস্তবতায় অবলোকন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু ওয়ারেশকে নিয়ে আমজাদ তার মামার বাড়ি বল্লারচরে আসে। আমজাদের মামা মুক্তিযোদ্ধা নেকবর আলীর সুন্দরী কন্যা নার্গিসকে বিয়ের জন্য একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় নিয়ে বল্লারচরে আসে। এসে শোনে নেকবর আলীর পুরো পরিবার বিপদগ্রস্ত। আমজাদ বন্ধুকে সংবাদটি জানাতে কুণ্ঠিতবোধ করেও শেষে বলতে বাধ্য হয় যে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধশক্তি হাফেজ ইমামউদ্দিন ও তার সহযোগীরা নেকবরের সুন্দরী কন্যা নাসির্গকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ধর্ষিতা নার্গিসকে শত্রুপক্ষ ফেরত পাঠায়। ওদিকে নেকবরের বড় ছেলে মুক্তিযোদ্ধা রসুল জেলে খুন হয়। নেকবরের বড়ছেলের নিহত হওয়া এবং মেয়ের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনায় সারা বল্লার চর জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকারে কেঁপে ওঠে জনতা। স্বাধীনতার পক্ষের মানুষের এমন বিপর্যয় গোটা অঞ্চলে মানুষের মনে ঝড় ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্র প্রশাসন এই বিপর্যয় রোধে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। ধর্ষিতা নার্গিসকে ফিরে পাবার পর নেকবর আর্তনাদ করে বলে–

> বইসেন, বইসেন সগ্গাম করি বাংলাদেশ বানায়ে কি আল্লার গোড়াত পাপ কচ্ছিনু? হিন্দু হয়া গেছেন? আগে হামরা বেশি মোছলমান ছিনু? জবাব দিবে কাই? গরীবের মুখে ভাত উঠবে, নেংটি যায়া লুংগি হইবে, বাটা বেটি নিয়া দিন গুজরান কইরবে তার জন্যে সগ্গাম কচ্ছিনু আল্লার ঘরে বাড়ি দিবার জন্যে নোয়ায় আল্লাহর পাওনা সেজদা ফাঁকি দিবার জন্য নোয়ায় জানি রাখেন। মুই রাশিয়া আমেরিকা চেনাঁ না, রাজনীতিও বোঝোঁ না, মুই বিটিশ আমলেও খাইছে, পাকিস্তানেও খাইছে, বাংলাদেশেও খায়। মানুষগুলো নিকাশ করেন। আসল বাংলাদেশ হইবে। বর্তমান চলতি থাইকলে, হামার মতো হইবেন, ব্যাটা জেলে যাইবে, বেটির ইজ্জত যাইবে, কোনদিন দেইখবেন হামার মাথা কাটি নিছে, সুপারি বাগানে পড়ি আঁছো।[২২১]

মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রামীণ জীবনের এই সামাজিক বিনষ্টি লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সত্যে প্রকাশ করেছেন। তবে কাহিনীতে, ওয়ারেশ ও নার্গিসের রোমান্টিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়ে লেখক মূলত মানবিক প্রেমের সত্যমূল্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতই দিয়েছেন। ধর্ষিতা নার্গিসকে বিয়ে করতে ওয়ারেশ সম্মত হওয়ার মধ্যে এক ধরনের উদার মানবিক মহত্তমকে লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্বাধীনতার পরও এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম নির্যাতন করে এক শ্রেণীর জাতিবিদ্বেষী মানুষ। এই ধরনের বিষয় নিয়েও সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন 'শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ' নামক (১৯৮৮) উপন্যাসটি। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের কাহিনী আলতাফ ও আমেনার প্রেমকাহিনী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লেখক এখানে গ্রামীণ জীবনে নারীর প্রতি স্থূল বিবেকহীন যুবকের পাশবিক অত্যাচারের নির্মম সত্যকে ধারণ করেছেন। সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে যুবকদের মনেও বিবেকবর্জিত কামরিরংসা উন্মত্ত পাশবিক প্রবৃত্তি নারীকে দেখে শুধু ভোগের পণ্য রূপে। তাছাড়া সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপরই অত্যাচারের প্রবণতা লক্ষণীয়। গ্রামীণ মস্তান মুজিবরের দল এলাকার হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কথাসাহিত্যে চরিত্র ও সমাজ ভাষাঃ প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ

৫.০১ ভূমিকা ঃ

কথাসাহিত্যে সমাজ ও মানুষের নানামুখী দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য গভীরভাবে সমাজসংলগ্ন এবং নানামাত্রিক সমাজদ্বন্দ্বের অনুষঙ্গী। গ্রামীণ ও আঞ্চলিক জীবন আমাদের সাহিত্যে তাই নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত জনপদ উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পটভূমি কেন্দ্রিক গল্পউপন্যাসের সমাজ-অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় বর্তমান অধ্যায়ে কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের লোকায়ত চরিত্র ও লোকভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ফলে, গল্পউপন্যাসের কাহিনীতে বর্ণিত সমাজ পরিবেশ প্রতিবেশের সঙ্গে চরিত্র ও ভাষার সাযুজ্য রক্ষায় লেখকদের সাফল্য চিহ্নিত করা যাবে। মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে সমাজ অবয়ব ও বাস্তবতার সঙ্গে চরিত্রগুলোর নিবিড় সংযোগ। চরিত্র ও ভাষার ঐক্যসূত্রের অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ এই আলোচনার লক্ষ্য।

বস্তুত কথাসাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্র দেশকাল ভাষা নিরপেক্ষ নয়। তাই গল্পউপন্যাসের কালিক স্থানিক ও ভাষিক আত্মপরিচয়ে গড়ে ওঠে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। অবশ্যই সেখানে লেখকের অভিজ্ঞতা বড় নিয়ামক হয়ে ওঠে। কারণ, সমাজবাস্তবাতার সংযোগ ছাড়া সাহিত্যে বাস্তবতা রূপ লাভ করে না। সমালোচক বলেন ঃ

> The essence of realism is social analysis, the study and depiction of the life of man in society of social relations the relationship between the individual and society and the structure of society itself. 'realism depends on the writer's cognition of reality.[১]

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে চরিত্রের সামাজিক ও ভাষিক ঐক্যসূত্র রক্ষিত না হলে সেই সাহিত্য কল্পনানির্ভর রচনা হয়ে ওঠে। সামাজিক নন্দনসূত্র সেখানে পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু চরিত্র বাস্তবতার মাত্রা অর্জন করতে পারে না। কাহিনীসাহিত্য সেখানে শিল্পপ্রধান হলেও সমাজ ও চরিত্রের বাস্তবতা ফুটে ওঠে না। স্মরণীয় যে, বাংলা কথাসাহিত্যের আদি আয়োজনে মূলত শিল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি নির্মোহ বাস্তবতার ভিত্তি। সমালোচক বলেছেন ঃ

> বাংলা গল্প-উপন্যাসে এই সাহিত্য বা শিল্পপ্রাধান্যই বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমন কি, শিল্পরচনার বিকল্প কোনো উদ্দেশ্যও কোন লেখকের মধ্যে কাজ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীসাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যে কাহিনী সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম ছোটগল্পগুলিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলির স্থান ও পাত্রপাত্রী যদিও উত্তর ও পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়ানো তবু রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি গল্পেও কখনো স্থানিক বর্ণনায় বা সংলাপে সাধু ভাষার গন্ডি ভেঙে দৈনন্দিন বাস্তবের অভিজ্ঞতার ভাষার কাছাকাছি যান নি। ... শরৎচন্দ্রের গল্পউপন্যাসেও ভাষার ভিতর দিয়ে এই প্রামাণিকতা রচনার দায় মেনে নেয়া হয়নি যদিও চরিত্রগুলো রেঙ্গুণ থেকে পশ্চিম ভারত নানা জায়গাতেই ঘুরেছে ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলোতে বসবাস করেছে।[২]

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎসাহিত্যে গ্রামের মানুষ কথা বলেছে তৎসম শব্দবহুল প্রমিত বাংলা ভাষায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কল্লোলীয় কথাকারদের গল্পউপন্যাসের গ্রামীণ স্থানিক চরিত্রে স্থানিক লোকভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এজন্যে তিরিশের

Dhaka University Institutional Repository

দশকেই বাংলা কথাসাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্প সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে বলা যায়, কথাসাহিত্যে স্থানিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এই দশকেই। 'আর, এই তিরিশের দশকেই আমাদের ভাষার তিন প্রধান ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ–মানিক– তারাশঙ্কর তাঁদের গল্পউপন্যাসের এমন এক অভূতপূর্বতার চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন যেন তাঁরা আমাদের অজানা ও তাঁদের জানা এক জগতে বসবাসের কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছেন– তা 'পথের পাঁচালীই হোক আর 'পদ্মা নদীর মাঝি'ই হোক আর 'চৈতালী ঘূর্ণি'ই হোক।৩ অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এই লোকায়ত প্রাণচর্চার প্রাক্কালেই পূর্ববঙ্গীয় জনজীবনের রূপকাররূপে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আবির্ভাব। এই ধারাক্রমে সমরেশ বসু, কমলকুমার মজুমদার, সুবোধ ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ লেখক বৃহৎবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানিক সমাজভাষা ও চরিত্রের নিবিড় ঐক্যে কাহিনী রচনা করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের এই অনবদ্য আধুনিক শিল্পভাষ্য নির্মিতির ধারাক্রমে বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও বিভিন্ন জনপদ, স্থানিক ভাষা পরিবেশ প্রতিবেশ বিধৃত মানবচরিত্রের কাহিনী রচিত হয়েছে। বিভিন্ন জনপদের, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের সাক্ষাৎ পাই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে। সমালোচকের ভাষায় ঃ

> 'মুখের ভাষাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকেই নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষাকে গল্প–উপন্যাসে নায়ক–নায়িকার মুখের ভাষা বা সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাঞ্চনমালা', শাহেদ আলীর অনেকগুলি ছোটগল্পে ('একই সমতলে' এবং 'জিব্রাইলের ডানা' দ্রষ্টব্য), মোহাম্মদ আবদুল আজিজের 'গাঁয়ের নাম পলাশপুর'; আবদুর রশীদ ওয়াকেসপুরীর 'বান', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' এবং সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নয়ান ঢুলি' (গল্পের বই) উল্লেখযোগ্য। ... গল্পের পুরো কাহিনীই কেউ আবার খাস আঞ্চলিক ভাষাতে রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'রাক্ষুসী' (বীরভূমের ভাষা) মনীশ ঘটকের 'বুচী' (ঢাকাইয়া ভাষা)।... কেউ কেউ আবার এই দুইয়ের টানাপোড়নে পড়ে একটা Compromised Language রচনায় ব্রতী হচ্ছেন সম্প্রতি। তাঁদের মধ্যে 'হাজার বছর ধরে' খ্যাত জহির রায়হানের নাম স্মরণযোগ্য। এই উপন্যাসে নোয়াখালি ফেনী অঞ্চলের উপভাষা কিছুটা কাটছাট করে নায়ক–নায়িকার সংলাপ হিসেবে চালিয়েছেন এবং কাহিনীর বর্ণনায়ও তিনি কিছু গেয়ো শব্দ পাল্টিয়ে শুদ্ধ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষা।'[৪]

উপন্যাসের ভাষা সব সময়ই তার বিষয়ানুগত। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন ও বিষয়গত নতুন নতুন অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে ভাষাকেও প্রতিনিয়ত কথাবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযোগী হতে হয়েছে।[৫] লক্ষণীয়, বাংলা কথাসাহিত্যে যতই গণমুখীনতার প্রভাব পড়েছে, ততোই ব্যবহৃত হয়েছে জনভাষাও। ফলে, সামগ্রিকভাবেই স্থানিক ভাষা ও স্থানিক চরিত্রের সংযোগে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ পেয়েছে সমাজ সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মেলবন্ধন। অথচ, তা মোটেই আঞ্চলিক সাহিত্য নয়। এদেশের কথাসাহিত্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে সর্বমানবীয় বিশ্বজনীন আবেদন। আবুল মনসুর আহমদ যথার্থই বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> 'সাহিত্যের স্থানিক ও কালিক রূপ বিশ্বসাহিত্যের ফান্ডামেন্টালের বিরোধী নয়। ব্যক্তিত্ব পার্সনালিটি যেমন সার্বজনীনতা বা ইউনিভার্সেলিটির বিরোধী নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। বরঞ্চ ব্যক্তিত্বহীন মানুষের যেমন সার্বজনীনতা থাকিতে পারে না, স্বকীয়তাহীন সাহিত্যেরও তেমনি কোন বিশ্বরূপ থাকা সম্ভব নয়। জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতাই আর্টের প্রাণ। প্রাণবন্তু হইবার জন্য এই কারণেই সাহিত্যের স্থানকে ঘনিষ্ঠ আরো ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। সত্যিকার সাহিত্যের বিচারে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ ও দেশ নাই।'[৬]

কোন কোন লেখক আবার ভিন্ন আদর্শ পোষণ করেন। তাঁদের মতে, আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্য আন্তর্জাতিক বা বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।[৭] এক্ষেত্রে বলা যায়, বিষয়টি নির্ভর করে লেখকের প্রতিভা বা যোগ্যতার ওপর। বড় প্রতিভার লেখকরা তো প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলের জনভাষ্যেই চিরায়ত বিশ্বসাহিত্য রচনা করেছেন। কাজেই, আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বা না ঘটিয়েও মহৎ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। যদি সেই সাহিত্যে মানুষের শাশ্বত চেতনা ও মূল্যবোধকে চিরকালীন বাস্তবতার ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও লক্ষণীয়, অনেক প্রতিভাবান লেখক আঞ্চলিক জীবনপটে মহৎসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আবার অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন যোগ্য প্রতিভার অভাবে। প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গের পটভূমিকেন্দ্রিক গল্পউপন্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হবে। কারণ, কোন কোন গল্পউপন্যাসে আঞ্চলিক জীবন ও জনপদের ব্যবহার থাকলেও আঞ্চলিক সমাজভাষা ব্যবহৃত হয়নি। অথচ, চরিত্রের বিকাশের জন্য সমাজভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। স্বীকার্য যে, উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতি বৈচিত্র্যমন্ডিত। 'ঘটনা প্রধান' (fiction of incident) ও 'চরিত্র প্রধান' (fiction of character) সব শ্রেণীর গল্প উপন্যাসে সামাজিক ও দার্শনিক আন্তঃপ্রেরণা (philosophical occupation) থাকে; তবু জীবন সম্পর্কিত ভাষ্য, প্লট ও চরিত্র রূপায়ন ছাড়া সামাজিক ও দার্শনিক সত্য প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই 'চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অন্বিষ্ট বিষয়বস্তু চরিত্রের অভিজ্ঞতায় রূপায়িত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের বিবৃতি সেখানে অবান্তর।'[৮] সুতরাং চরিত্র ও সমাজভাষার প্রয়োগ আঞ্চলিক কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত হয়। অথচ, বাংলা উপন্যাসে সঠিক অর্থে সঞ্চারিত হয়নি এইসব প্রাণময় উপাদান। কথাশিল্পী দেবেশ রায় লিখেছেন ঃ

> বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়নি লোকায়তের পৌরষ, বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আসেনি পুরাণ বা মিথভাষার লোকায়ত পেশি, বাংলা উপনাসের সল্লাপে আসেনি আমাদের প্রতিক্রোশে আলাদা উপভাষার খরচলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গ শ্লেষরসিকতার শান।[৯]

তবুও লোকায়াত চরিত্র ও লোকভাষার পারম্পর্য সূত্রে উত্তরবঙ্গের পটপভূমিতে বেশ কিছু সকল গল্পউপন্যাস আমরা পেয়েছি। আমাদের মনে হয় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এমন বৈচিত্র্য সত্যিই প্রশংসনীয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলার স্থানিক সমাজের ভাষার একটি রূপরেখা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত উপভাষার গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্দেশ করা যায়।

ক. ধনাত্মক দিক

১. উপভাষা বাংলা ভাষা সমীক্ষায় সহায়ক।

২. উপভাষা দেশের ভাষা বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকসম্পাত করে।

৩. চলিত ভাষার রূপ উপভাষায় কিভাবে সংরক্ষিত থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. চলিত ভাষায় অনেক অব্যবহৃত শব্দ উপভাষায় সংরক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ঋণাত্মক দিক ঃ

১. অপর অঞ্চলের উপভাষীদের নিকট এক এক অঞ্চলের ভাষা অনুধাবনে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

২. উপভাষার নির্দিষ্ট ব্যাকরণ না থাকায় ব্যাকরণগত কাঠামোর দিকটি স্পষ্ট নয়।

৩. উপভাষার শব্দ চলিত রীতির শব্দের তুলনায় কম বিস্তৃত।[১০]

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, বাংলাদেশের উপভাষা উপলব্ধির ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাজনের দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গের উপভাষাগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এবং সহজবোধ্য। ভাষাগত কাঠামোতেও লক্ষ করা যায় ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য। তবে উপভাষার নির্দিষ্ট ব্যাকরণ মেনে কথাশিল্পীরা অনেক সময় চরিত্রের সংলাপ রচনা করেননি। সেখানে দুএকটি ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যাবে। আলাদা উপভাষারূপ এইসব গল্পউপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানিক পরিবেশগতভাবে এবং চরিত্রের পেশাগত উভয় দিক দিয়েই কথাশিল্পীরা অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে লোকায়ত জীবন ও ভাষাকে রূপায়িত করেছেন। বস্তুত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি বৃহত্তম জেলাগুলোর উপভাষিক ছাঁদ চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রধান প্রধান গল্পউপন্যাসগুলো অবলোকন করা হবে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আলোচনার ক্রমসমূহ নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করা যায়।

ক. উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটভূমিতে চরিত্র ও সমাজভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য;

খ. চরিত্রের সামাজিক ও বৃত্তিক পরিচয় ও সমাজোপভাষার ব্যবহার।

৫.০২ কথাসাহিত্যের চরিত্রে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্য ঃ

উত্তরবঙ্গের পটভূমিকেন্দ্রিক গল্পউপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের ভাষা অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এইসব গল্পউপন্যাসে লেখকগণ স্থানিক বর্ণিমা ফুটিয়ে তোলার জন্য যেমন স্থানিক লৌকিক চরিত্র গ্রহণ করেছেন, তেমনি ব্যবহার করেছেন তাদের মুখের কথ্যভাষা। উত্তরবঙ্গের খন্ড খন্ড পটভূমি গল্পউপন্যাসের ল্যান্ডস্কেপ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূর্ত হয়েছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল। জেলাভিত্তিক এইসব গল্পউপন্যাসের বিচিত্র মানুষের ভিড় লক্ষণীয়। লেখকের ভাষাভঙ্গির ব্যবহারেই চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের উত্তরজনপদের সর্ব উত্তরে কুড়িগ্রাম রংপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি অত্যন্ত ভাষাসচেতন ও শব্দকুশলী লেখক। লেখকের ভাষা ও চরিত্র উপস্থাপনে এক ধরনের রোমান্টিক মনোভঙ্গি কাজ করলেও গল্প উপন্যাসে নানা আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন, ভাষার ব্যবহার করেছেন নানামাত্রায়। লেখকের বর্ণনার ভাষা ও চরিত্রের ভাষায় আদর্শরূপ, আঞ্চলিক কথ্যরূপ ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কখনো ব্যবহার করেছেন কাব্যরূপ।[১১] তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক গল্পউপন্যাসের কাহিনীতে প্রতিটি চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপভাষা (Dialect)। এইসব চরিত্রের মুখের সংলাপের মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন তাদের অন্তর্গত জীবনবোধের তাৎপর্য। তিনি চরিত্রের মুখের সংলাপে সাবলীলভাবে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু কাহিনীর গতি ভারাক্রান্ত বা শ্লথ হয়নি। এখানেই সৈয়দ শামসুল হকের অসাধারণ নৈপুণ্য।

সৈয়দ শামসুল হকের 'চোখবাজি', 'নারীরা', 'না, যেয়োনা', 'ইহা মানুষ' 'ত্রাহী', 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের রংপুর কুড়িগ্রাম অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। এইসব উপন্যাসে বিচিত্র টাইপের চরিত্রের মুখে লোকায়ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'চোখবাজি' উপন্যাসের প্রধান চিরত্র গফুর

Dhaka University Institutional Repository

মিয়া। সে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে তার সন্তান হায়দার। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পিতা গফুর মিয়া প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয় স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি দ্বারা। তার যুবতী মেয়েকে নিয়েও বিব্রতবোধ করে। তাই থানার দারোগার কাছে এসে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে ঃ

> 'টাউনের গতিক আপনারা বাইর হতে আসিয়া কতটু জাইনবেন? হামার পিছনে ঘরে বাইরে শত্রু হয়। কাঁইয়ো না চায় হামার ভালো হয়। চ্যাংড়াগুলান লাগি আছে হামার মাইয়ার বদনাম করিতে। আর বাজারের কছির মন্ডল পাছে লাগি আছে হামার কারবার নাশ করিতে। কছির মন্ডল হয় এই এলাকার বড় স্মাগলার। লাখে লাখে টাকার মাল ইন্ডিয়া হইতে চোরাপথে আনে, লাখে লাখে টাকার মাল ইন্ডিয়ায় পাঠায় ভূরজ্ঞামারির বর্ডার দিয়া। এদিকে ফের দৃষ্টি করিয়া দেখেন, ইস্টিশানের মিষ্টি আর চা দোকানগুলোয় চ্যাংড়াগুলা আড্ডা বসায়, টাউনের তামাম যুবতী মাইয়া নিয়া আলোচনা করে, মহিলা কলেজের সমুখে গিয়া কলেজ ছুটির টাইমে চক্ষের ইশারা মারে, আকথা কুকথা উচ্চারণ করে।'[১২]

রংপুরের উপভাষায় অনুনাসিক স্বরধ্বনির অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। উদ্ধৃতাংশে 'আসিয়া', 'কাঁইয়ো', শব্দে অনুনাসিক স্বরধ্বনি অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া উত্তমপুরুষে 'হামার' শব্দটি রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রী উপভাষার অধিকাংশ অঞ্চলের কথ্যরূপ। রংপুরের উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য 'কর' ধাতুর বর্তমানকালের প্রথমপুরুষের রূপ 'করিতে' ব্যবহৃত হয়। 'চ' ধ্বনি 'শ' রূপে উচ্চারিত হয় বিধায় সৈয়দ শামসুল হক অবিকৃতভাবে আঞ্চলিক রূপ 'উশ্চারণ' ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও এই আঞ্চলিক বাংলায় স্বাভাবিকভাবে সাধুরীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। লক্ষণীয়, 'করিতে' 'করিয়া' 'হইতে' 'চক্ষের' ইত্যাদি প্রয়োগ ঘটে। 'চ্যাংড়া', 'মাইয়া' ইত্যাদি রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব রূপমূল।

তেরোশ পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে উত্তরবঙ্গের পটভূমিকে কেন্দ্র করে সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন 'নারীরা' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কথকের ভূমিকায় লেখক ঘটনা বিবৃত করেছেন। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের ছাউনিতে নারী চালান হয় এবং ভাতের আশায় মেয়েরা দলবেধে নাম লেখায় নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবার জন্যে। তাদের পরিচয় হয় আঞ্চলিক বাংলায় 'ভাতের দাসী'। অপরদিকে, একশ্রেণী দালালী ও ফটকাবাজী করে রাতারাতি ধনপতি হচ্ছে। ঔপন্যাসিক কথকের ভঙ্গিতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ঘটনা বর্ননা করেন আঞ্চলিক ভাষায় ঃ

> বাপধন, বাপ মোর, ভাল করি শুনি রাখেন তোমরা, পাপ কোনো কালে গোপন থাকবার নয়, বিশেষ করিয়া এত বড় পাপ। সেই রাতে বছদ্দির জান কবচ হইবার টাইম ঠিক হয়া আছে আল্লার খাতায়। কিন্তু তাঁই যে আসলে একদিন সর্দারকে গলা টিপে মারিয়া রাখিয়া কুলিসকলের মাইয়ার ছিয়ানব্বই হাজার টাকার থলি হস্তগত করি নেয়, সে কথাও দুনিয়ার কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার তার মরিবার আগে। মুঁই তো ওয়াজ কঁরো সেই রাইতে ওয়াজ চল্লিছে সেইকালে মজলিছে হঠাৎ হামার কলবের ভিতরে এক ফেরেশতা এক স্বর ধরিয়া কয়, আচ্ছালামু আলাইকুম, একবার আসিতে হয় বছরদ্দির মহাজনী দোকানের রাস্তায়। গেইলোম দেখিলাম, মানুষটা পড়িয়া আছে, আজরাইল বসিয়া আছে বুকের উপরে, আজরাইল কঁয়- 'এলায় স্বীকার কর নিজ মুখে, বছরদ্দি পাশ ফিরিল 'হামার পাঁও ধরিয়া মাফ চাইলো সে, কইলে যে মুঁই গোনাহগার, সর্দারের রক্ত লাগি আছে মোর হাতে।'[১৩]

লক্ষণীয়, রংপুরের কথ্যভাষার ক্রিয়াপদে সাধুরীতি যথাযথভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন লেখক। এখানে থাকিবার, 'করিয়া', হইবার, মারিয়া রাখিয়া, মরিবার, ধরিয়া, আসিতে, পড়িয়া, বসিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদ রাজবংশী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও গেইলোম, দেখিলোম ইত্যাদি রাজবংশী উপভাষায় উত্তম পুরুষে অতীতকালের ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপ। তাঁই, মুঁই, কঁরো, কঁয় ইত্যাদি অনুনাসিক স্বরধ্বনির রূপ লেখক অভ্রান্তরূপে প্রয়োগ করেছেন। লক্ষণীয় পাঁও শব্দটি রংপুরের রাজবংশী উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যজাত। এখানে অনুনাসিক ধ্বনির পাশাপাশি একাক্ষরিক শব্দের শেষে 'আ' ধ্বনির স্থানে 'ও' ধ্বনির আগম ঘটেছে। সুতরাং 'পা' ধ্বনি পাঁও রূপে রংপুরের আঞ্চলিক রীতিতে প্রয়োগ করেছেন লেখক। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ চলিতরীতির মতো ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– করি, শুনি, হয়া ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মতো রংপুরের উপভাষাতেও কোন কোন শব্দের অভিশ্রুতি লক্ষণীয়। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত সচেতনভাবে রাইতে, কইলে শব্দের অভিশ্রুতি 'ই' ধ্বনির ব্যবহার করেছেন।

উত্তরবঙ্গের মাটি, মানুষ প্রকৃতি সৈয়দ শামসুল হকের লেখকসত্তায় আত্মিক–সম্পর্কসূত্রে প্রোথিত। তাঁর গল্পউপন্যাসের ভেতর মানুষজন তাদের ভাষা নিয়ে বিশ্বস্তরূপে উপস্থিত হয়েছে। ভাষা দিয়ে পরিবেশ নির্মিতিতে লেখকের ত্রুটি নেই বললেই চলে। তবে, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই যত্ন রেখেছেন চরিত্রের সংলাপ যেন নিছক ব্যবহৃত বা আরোপিত ভাষা হয়ে না দাঁড়ায়। মানভাষার সঙ্গে সঙ্গে উপভাষার শৈলীস্থাপন করে তিনি রচনায় বিশেষ ইমেজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। উপভাষায় বাক্য বিন্যাসের মধ্য দিয়ে 'Local colour' ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে ব্যবহৃত উপভাষা যে আদর্শ ভাষা থেকে আলাদা কোন কিছু নয়, তা প্রমাণের জন্যে উপভাষার সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। ফলে তার গল্পউপন্যাসের চরিত্র ও ভাষা কাহিনীর গ্রন্থিতে অভিন্ন অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাঁর আরো কয়েকটি গল্প উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. 'বোলায় তোমাকে।'

'ক্যানে?'

'ভাত খায়া যাবার কয়। হামাক পাঠেয়া দিলে। কইলে যে, যা ধরি আন।'

কাঁই কইলে?

কাঁই কইবে? বুবুজান কইলে। চলো, চলো, ভাত ধরি বসি আছে তাঁই।[১৪]

২. 'দাম বেশি নোয়ায়। হামার দোকান ভিন্ন কারো কাছে পাবার নন এই শাড়ি। তাই বলিয়া যে গলাকাটি দাম হাঁকামো তাও নোয়ায়। সাড়ে পাঁচশো দাম হামার কেনা দাম হয়। লাভ মুঁই কবিরার নঁও, হামাক সাড়ে পাঁচশো–ই ধরি দেন, নিয়া যান, বেগম সাহেবা খুশি হইবে।'[১৫]

৩. হুজুরের বড় বইনের মাইয়া। তাঁই মরি যাবার পর একে যে মাইয়া তাক আনি আইখছেন হুজুর।

ও।

দুস্কের কথা কী কমো তোমরার আগোৎ। হুজুরের ছাওয়া–পোয়া নাই। ইয়াক্ আপন হতে আপন মাইয়া বুলি পালেন ওমরায়।

... ...

ডাঙর হইছে তোর বুবু?

হয় নাই বলে? কন্ কী তোমরা? ছাওয়া–পোয়ার জননী হয়্যা যাইত এতখনে।

কেনে, বিয়াও হয় নাই কেনে?

না কন সে কথা। বেচেয়া খাইছেলো তাক্ তার বাপোমায়। সে ঘর ভাঙ্গি গেইছে। বজ্জাতের ঝাড় আছিল সে মানুষ কোনো।

তাই নাকি?

মুই অ্যালায় যাঁও।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'পারুল যে পোয়াতি, সেই কথা মায়ের মুখে শুনিয়া বড় এলায়া পড়িলাম খুশিতে। মায়ের কত শখ, ঘর ভরি যাইবে নাতি নাতিনে, হাসিবে খেলিবে, বিরান বাড়ি ঝলমল করি উঠিবে। তো মা হামাক আঁচল হতে গিট খুলিয়া একশ টাকার এখান নোট দিলে। এত ট্যাকা তুই কোঠে পালু রে; মা? দশ ভাঁজ করা মলিন পুরানা নোট, গায়ে তার সোঁদা গন্ধ। ... লাল নতুন ছোট আলু আর বিলাতি বেগুনের কথা ভুলি যাইস না, বাপ। বৌমা বড় হাউস করিছে।'[১৭]

৫. 'এইবার মুঁই ঢাকা যামো, আর একুশে ফেব্রুয়ারি দেখিমো, শহীদ মিনারে গিয়া ফুল দেমো; পত্রিকায় মুঁই দেখিছো ফুলে ফুলে ভরি গেইছে শহীদ মিনার, য্যান বেহেশতের একখান টুকরা হয়া আছে গো। মুঁই সেই শহীদ মিনারে যায়া হামার দ্যাশের তাবত শহীদের নামে সেলাম করিমো, তা হামাক দোজখে সইত্তর হাজার সর্পে ঢশায় হামার কোন দুস্ক নাই, বাহে।'[১৮]

উল্লিখিত সংলাপগুলোতে রংপুরের উপভাষার মূল কাঠামো অটুট রেখেছেন লেখক। ফলে, একদিকে চরিত্রগুলো যেমন স্বচ্ছন্দ ও বাস্তব হয়ে উঠেছে; তেমনি আঞ্চলিকতার বাতাবরণে অনুভববেদ্যতায় বিঘ্ন ঘটেনি। সৈয়দ শামসুল হকের শিল্পশৈলীর প্রয়াসের চরমতম সাফল্য এখানেই নিহিত। এইসব রচনার জন্যে যথার্থই তিনি হয়ে উঠেছেন উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিনিধি।

কথাসাহিত্যে রংপুর–গাইবান্ধা অঞ্চলের স্থানিক সমাজ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন মঞ্জু সরকার। কৃষক, দিনমজুর শ্রেণীর নিম্নবর্গীয় নরনারী তাঁর গল্পউপন্যাসের পাত্রপাত্রী। তিনিও সৈয়দ শামসুল হকের মতো চরিত্রানুগ সংলাপ রচনায় উপভাষা কাঠামো যথার্থ রূপে ব্যবহারে সফল হয়েছেন। চরিত্রগুলো যখন একে অন্যের সঙ্গে কথোপকথন করে তখন কথক চরিত্রের জীবনদৃষ্টি ও মনোভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পটভূমি ও প্রতিবেশের (Setting and Milieu) সঙ্গেও চরিত্রের মনোভঙ্গি অঙ্কিত হয়েছে মঞ্জু সরকারের গল্পউপন্যাসে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অভিবাসীদের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ভাষারূপও ব্যবহৃত হয়েছে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোর সংলাপে। তাঁর 'প্রতিমা উপাখ্যান', 'নগ্ন আগন্তুক' উপন্যাসে এবং 'অবিনাশী আয়োজন', 'মৃত্যুবাণ' ও 'মঙ্গাকালের মানুষ' গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে নিম্ন ব্রাত্যজীবী শ্রেণীর চরিত্রের মুখে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

'নগ্ন আগন্তুক' (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমি তিস্তা নদীর রহমতের চর। নদীভাঙনে বিপর্যস্ত চরবাসী অর্থনৈতিক মন্দা ও অশিক্ষা আর নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন। তারা বিশ্বাস করে অতি লৌকিক দৈবশক্তিতে। চরে একদা নগ্ন আগন্তুকের আগমনকে কেন্দ্র করে চরবাসীর মনে নানা কৌতূহল দেখা দেয়। তাকে ন্যাংটা দরবেশ বলে যত্ন করে কেউ কেউ। মোল্লার স্ত্রী দরবেশকে না খাওয়াতে পারায় অনুযোগের স্বরে স্বামীকে বলে–

> 'মেহমান যদি না খায়া খালি মুখে বাড়ি থাকি চলি যায়– সেই বাড়ির নি মঙ্গাল হয়?'
>
> 'কি হইছে বাহে চাচী?'
>
> হইবে আবার কি! আল্লা তাকে পাঠায় দিল হামার বাড়ি, আর মন্ডল চিলার মতো ছোঁ দিয়া ধরি নিয়া গেল। মন্ডল গমের গুড়া খাবার দিছে– দরবেশ বাবা তাও খায় নাই। ক্যানে, মুই কি এতক্ষণে তাকে চাইরটা গরম ভাত রাঁধি খাওয়াবার পারনু না হয়?
>
> বেতাল হওয়ার কি আছে। আল্লার বুজর্গ বান্দা যে কাকে দোয়া করবে সেটা কি কওয়া যায়?'[১৯]

সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের ভাষার লোকবিশ্বাস তথা মানসচেতনতাও ফুটে ওঠে। ধর্মনির্ভর ভাগ্যবিশ্বাসী গ্রামীণ নারী চরিত্রের বিশ্বস্ত রূপ যথার্থ ফুটে ওঠে সংলাপের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, নিয়ত দারিদ্র্যের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের কপটচারিতাও অত্যন্ত বাস্তবানুগ রূপ পেয়েছে চরিত্রের মুখের ভাষায়। 'প্রতিমা উপখ্যান' উপন্যাসের চরিত্রের শ্রেণীদ্বন্দ্বও ভাষাকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। প্রান্তিক কৃষক ও মহাজনের সংলাপ লক্ষণীয় ঃ

> বামুনের ভূঁই আবাদ করলু তুই, আর তোর আবাদ বাঁচানোর দায় মোর। মোর কাছে আসার জন্যে কাঁয় বুদ্ধি দিছে রে?'
>
> 'আর কারো কাছে তো টাকা পানু না। ধান কাটলে সুদে-আসলে শোধ করিম বাহে?'
>
> হজ্ব করার পর থাকি হারাম সুদ আর বাকির কারবার ছাড়ি দিছোঁ মুই, জানেন না তোরা? আগে শরফ দেওয়ানী ছাড়া গেরামের কামলাকিষাণরা এক পাও চলে নাই। এলায় কি আর সেই দিন আছে রে?
>
> ... যাই কন বাহে, তোমরা হইলেন গেরামের মাথা। বেপদ-আপদে তোমার কাছে না আসি হামার উপায় আছে।[২০]

ধর্মীয় চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-অনুষঙ্গী ভাষা ও চরিত্রের সংলাপে লক্ষণীয়। 'প্রতিমা উপাখ্যান' উপন্যাসের মুসলিম নায়ক আহমদ বিএসসি ব্রাহ্মণ কন্যা প্রতিমাকে বিয়ে করায় গ্রামীণ হাজি এবং আনসার কাপড়িয়ার প্রতিক্রিয়া ঃ

> 'ঘটনাটা তো আসলে হেঁদু মুসলমানের ব্যাপার। প্রতিমা হইল হিন্দু। তায় ফির বামনের বেটি। আর বিয়েস্যি হইল হামার পরেজগার মুসলমান।'
>
> ... ...
>
> 'মালাউনের ঘরের কাছে এগুলা হইল ডাল ভাত।'
>
> তাই বলিয়া সমাজে যা খুশি আকামকুকাম ওমরা করি যাইবে, হামরা তালা দিয়া থাকমো?
>
> 'বিচার হয় না দেখি তো সমাজটা পচি গেল বাহে।'
>
> সমাজ কি খালি হেঁদুরাই পচায়?
>
> আসল কথা খাঁটি মুসলমান হামরা নোয়ায়।[২১]

এখানে লক্ষণীয়, লেখক গল্প বর্ণনায় চরিত্রের সামাজিক ও ভাষিক ঐক্য গড়ে তুলেছেন। ফলে লোকায়ত জীবন ভাবনায় এক ধরনের স্থূল কদর্যরূপটি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি মূর্ত হয়েছে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপও। এই ধারাক্রমে আমরা আরো লক্ষ করি, মঞ্জু সরকার তাঁর গল্পউপন্যাসের চরিত্রের স্থানিক পরিচিতি আরো বাস্তবানুগ করে তুলেছেন স্থানিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত তিনটি জনপদে বিভিন্ন কারণে অভিবাসন ঘটেছে। অভিবাসনকারী চরিত্রগুলো উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী সমাজভাষা নিয়েই। মঞ্জু সরকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই অভিবাসনকারী চরিত্রের সংলাপে সংশ্লিষ্ট লোকভাষাকেই উপজীব্য করেছেন। তাঁর 'নগ্ন আগন্তুক' (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর চরাঞ্চল। উপন্যাসে বর্ণিত রহমতের চরে এমনই একজন অভিবাসনকারী চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন লেখকঃ

> 'রহমতের চরে নদীতে ভাঙা পোড়াকপালে মানুষ তো বৃদ্ধ একা নয়, এ গাঁয়ের প্রায় সমস্ত বাসিন্দারই এমন দশা। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি নদীতে হারিয়ে, কেউবা বেচে দিয়ে উত্তরবঙ্গের এই ফাঁকা উর্বর চরটিতে এসে বসতি গেড়েছিল তারা। দু'এক পুরুষ আগেও এই চরে জমির দর ছিল অসম্ভব সস্তা। ফসল ফলানোর জন্যে মানুষের ছিল অভাব। তাই ভাটি অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিঃস্ব মানুষের দল চরে এসে নোঙর ফেলেছিল, কিন্তু সকলেই তো আর বিশা মন্ডলে রূপান্তরিত হওয়ার কপাল নিয়ে জন্মায়নি।'[২২]

Dhaka University Institutional Repository

রহমতের চরে বিশা মন্ডল বিত্তশালী হয়ে ওঠে। সে নিয়ন্ত্রণ করে চরের সমাজ ও মানুষকে। বিশা মন্ডল যেহেতু পূর্ববঙ্গীয় মানুষ- তাই লেখক তাকে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে অভিবাসনকারী চরিত্ররূপে উপস্থাপন করলেও তার পূর্ববঙ্গীয় ভাষাকে উপজীব্য করেছেন। বিশা মন্ডলের সংলাপে তাই লক্ষ করা যায় পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। অশান্ত চরে পীর সাহেবের আগমন ঘটলে বিশা মন্ডল বলে ঃ

> 'আমি কইচিলাম না তহন-লুক না চিইনা কথা কইও না। হায় আল্লা, রহমতের চরে আজ বড় অশান্তি, বেধর্মী বেঈমানে চর ভইরা গেছে, পাপে ছাইয়া গেছে গেরাম। এতোদিনে তুমি রহম কইর‍্যা একজন নেক বান্দারে পাঠায় দিলা। আমরা তেনারে তাজিমের সাথে ধইরা রাখমু। ওই মেঞারা সরো, অহন সইরা যাও, দোওয়া চাওয়ার টাইম পাইবা অনেক।'[২৩]

উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন আলেখ্য পাওয়া যায় মঞ্জু সরকারের 'মজ্জাকালের মানুষ' সংকলনের গল্পগুলোতে। লোকায়ত জীবনের রূঢ়বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন তিনি। বস্তুত, কথাসাহিত্যে কাহিনী ও চরিত্রকে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করা শিল্পগত সিদ্ধির জন্য অপরিহার্য উপকরণ। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ এবং পরিবেশ অর্থাৎ সার্বিক জীবনগত Selective interpretation-এর রূপচিত্রের মাধ্যমে শিল্পিত টোটালিটি পাঠক মনে পরিস্ফুটিত হয়। ফলে, 'Possibilities of relating characters to particular environment'- আমরা কথাসাহিত্যে পেয়ে থাকি। সমালোচক এলিজাবেথ বাত্তয়রের ভাষায়- 'The locale of the happening always colours the happining and often to a degree shapes.[২৪] মঞ্জু সরকারের গল্পগুলোতেও আমরা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্থানিক আর্থ সামাজিক জীবনগত সমাজভাষার নবতর ব্যঞ্জনা দেখতে পাই।

তাঁর 'প্রিয় দেশবাসী' গল্পের নায়ক আমানুল্লাহ একজন দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধ। ক্ষুধা, দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের নিশ্চল অনুভূতিতেও সবকিছু স্থবির মনে হয়। তার 'শায়িত শরীর কাঠের মত অনড়, চোখ দু'টি বন্ধ।' স্থবির শায়িত বৃদ্ধকে দেখে নাতিরা বলে-

> 'ঠিকে রে, দাদা হামার মরি গেইছে। বিহান থাকি নড়ে চড়ে না, চোউখ খোলে না!'
> 'মরুক। ও বুড়া মইলে তো ন্যাটা যায়। চল তো খ্যাতাখান সরে দেখি, মরি গেইছে না বাঁচি আছে?'
> 'খপরদার। ভূতে ধরবে, মানুষ মইলে ভূত হয় জানিস না? চল্ দাদীকে খপর দেই।'[২৫]

'কার্তিকের অতিথি' গল্পের নায়ক মনতাজ আলী কামলা খেটে জীবন যাপন করে। কিন্তু মজ্জাকালে রংপুর অঞ্চলে কাজ জোটে না। তাই দূরে চলে যায় কাজের সন্ধানে। সেখানেও কাজ না পেয়ে বিনা টিকেটে রেলে ফেরার পথে রেলকর্মীর সঙ্গে বিব্রতিকর অবস্থায় পড়তে হয়।

> 'দেহি তোর টিকিট। দেইখলাম গাড়ি থেকে নামলি।'
> 'ছার, মুই বড় গরিব, এই মজ্জায় জেবন বাঁচে না তা টিকিট করি কি দিয়া কন?'
> 'শাল জেবন বাঁচে না তো ট্রেনে উঠছিলি ক্যান? বের কর টিকিট?'
> 'ছার আল্লার কিড়া, বিশ্বাস করেন একটা পয়সাও নাই। পেরায় দিনাজপুর জেলা কামৎ গেছনু। এবার যে আকাল ছার, দেশী কামলারাই কাম পায় না, তা বিদেশী কামলা আর কাঁয় নেবে? ওতি এলা গম দিয়া গরমেন্টে মাটি কাটার কাম করায়, বিদেশী কামলা নেয় না। তা ছার আপনে তো গরমেন্টের লোক- হামার এতি কি গম দেওয়া শুরু হইছে কবার পান?'
> ... ...
> 'বিশ্বাস করেন ছার, মোর বাড়ি এইতো অঘুনাতপুরের সেরাজচৌদরীর বাড়ির বগলে, মনতাজ আলী নাম, কামলা খাটি খাঁও...।'[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন অঞ্চলের কামলা খাটতে যাওয়া মনতাজ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'অবিনাশী আয়োজন' গল্পেও। মজ্জাপীড়িত মানুষগুলো গ্রামে জটলা করে শ্রেণী সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে। গ্রামীণ মহাজন সেরাজ চৌধুরী এবং শহুরে ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যের দূরত্ব মেপে দেখে কেউ কেউ। তখন মনতাজ তার বক্তব্যে বলে–

> 'ও সমসের ভাই, খালি সেরাজ চৌদরী ক্যান, দিনাজপুর বগুড়ায় কামত যায়া এবার দেখি আসছোঁ, এই কাত্তিমাসী মজ্জাতেও সেঠেকার মহাজনদের কী সান–শওকত। টাউন–বন্দরে ভদ্দরনোকদের কী ঠাটবাট। বিশ্বাস করিবার নন তোমরা ...।'[২৭]

মঞ্জু সরকার তাঁর গল্পে এই বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীর মানুষগুলোর মুখের সল্লাপে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদের ভাষা। তাই কামারশালায় সমবেত মানুষের ভাগ্যবিপর্যয়ের আত্মসমালোচনা থেকে ঘোষিত হয়–

> 'শোন হে তোমরা, মুই পেলান করছোঁ– একটা দল গড়াইম। কামলা খাটি ধুঁকি ধুঁকি মরার চাইতে বাপের বেটার মত খুন–জখম হয়া মরাও ভাল।'
>
> 'কিসের দল সমসের ভাই–
>
> 'ডাকাইতের–
>
> 'পলিটিকচের–
>
> 'নাকি দুরমুজ পাট্টি?'
>
> ডাকাতি আজনীতি বোঝো না মুই, সে শালারা মাইনষক ঠকে ধনী হইছে, তামারগুলার ধন–সম্পত্তি লুট করি খাওয়া হইবে।'[২৮]

এছাড়াও মঞ্জু রসকারের 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা', 'আবরণ', 'দহন', দুর্গত অঞ্চলের দেবতা, 'দুশমন', 'ভূতের সাথে যুদ্ধ', 'কবর যাত্রী', 'আমৃত্যু আকালু' প্রভৃতি গল্পে রংপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয়, মঞ্জু সরকারের গল্পের চরিত্রগুলো নিম্নশ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। নিম্নবর্গীয় সমাজ জীবন থেকে বিচিত্র পেশার মানুষকে তিনি গল্পের চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে চরিত্রগুলোর মধ্যে একদিকে ফুটে উঠেছে সমাজমনস্তত্ব, অন্যদিকে স্পষ্ট হয়েছে তাদের সমাজভাষাও। ব্যঙ্গ, শ্লেষ, প্রতারণা, প্রতিবাদ, কিংবা আত্মাভিমানের স্বর ফুটে উঠেছে চরিত্রের সল্লাপে। ফলে Particular environment–এ চরিত্রগুলোর সংযোগ শিল্পসিদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। এমনকি চরিত্রের বৃত্তিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়ও লেখক ব্যক্ত করেছে সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম রংপুর তিস্তা নদী অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে শামসুল হকের 'নদীর নাম তিস্তা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গফুর ডাটোয়ার সল্লাপ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। গফুরের ছেলে আসগর পৈত্রিক পেশা মৎস্য শিকার না করে অন্য পেশা গ্রহণ করতে চাইলে গফুর তার উদ্দেশ্যে বলে ঃ

> 'হ্যাঁ, হামার মাহাজনের কথা কও, মুই একশ' বার মানিম। ফেলাও তোর কালু ফালুর কথা। তোমরা জানেন না সেই জন্যে কন। হামার মাহাজনের বাপ আছিল্ গরীব। একবেলা খাবার জোটে ত আর এক বেলা উপাস দেয় আছিলও একরে আলসিয়ার ঘোড়া। কিসের কি এক্না ন্যাকাপড়া শিখছিল, ওরে বাও, তারে গরবে এক্রে মাটিতে পাও ফেলায় নাই। তুই হলু ডাটোয়ার ছাওয়া, তোর অতো ন্যাকাপড়ার দরকার কি? তুই কি চাকরি করবু? আর করবার হাউস কল্লে তো হবার

Dhaka University Institutional Repository

> নয়। আছে তোর শালা–সমুন্দি? নাই। তাইলে? তার ওপ্‌রে পরথম বউ থাকতেই ফির একটা বিয়া কচ্ছিল। নেও এ্যালা। তার ওপরে ফির না আছিল্ একখান পলো, না আছিল্ একখান জাল। মাছ ধরি যে খাইবে, তারও যদি কোনো 'আহা' থাকিল হয়। আইজ এটা ধরে, কাউল ওটা করে, কিন্তুক আটে না। আটপে কেমন করি কও? জাইত ব্যওসা ছাড়ি দিছে, আটপে তোর কোন্ পুষ্যে?'[২৯]

লক্ষণীয়, দীর্ঘ সংলাপ জুড়ে লেখক আঞ্চলিক রূপমূলগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তন্মধ্যে আলমিয়ার ন্যাকাপড়া, বাও, পাও, হাউস, এ্যালা, ব্যওসা প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ লেখক আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন চরিত্রের সংলাপে রচনায়। অপরদিকে, বগুড়া গাইবান্ধা অঞ্চলের মধ্যবর্তী বাঙালি নদীর প্রেক্ষাপটে রচিত সুবোধ লাহিড়ীর 'ভস্কার বিল' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক আবহ ও চরিত্র সৃষ্টি হলেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। নদী ও বিল জীবনকেন্দ্রিক এই অঞ্চলের মানুষের প্রভৃতি ও পেশা লেখক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু চরিত্রের স্থানিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার লক্ষে আঞ্চলিক ভাষা যথাযথ রূপে ব্যবহার করেন নি। প্রায়ই চলিত রীতির প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলেছে এইসব চরিত্র। অথচ, পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষাশিল্প গড়ে উঠলে বিষয়গৌরবেও 'ভস্তার বিল' বাংলা উপন্যাসের ধারায় উল্লেখযোগ্য রূপে সমাদৃত হতো। পরাণ, নেদু, শের প্রভৃতি মৎস্যজীবী চরিত্রের গণজীবনের দীপ্তি আরো বাস্তবানুগ রূপ লাভ করতো। লক্ষণীয়, ঔপনাসিক প্রমিত ভাষায় সংলাপ রচনা করলেও মাঝে মাঝে লোকজশব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে, চরিত্রের আবহ মাঝে মাঝে পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। করিম চরিত্রের একটি সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে। 'কাল ভোরেই আমি চট্‌কায় যাব, ইলিশ মাছের খ্যাপ দেবার জন্য।'[৩০] উল্লিখিত বাক্যের 'চট্‌কায়', 'খ্যাপ' উত্তরাঞ্চলের লোকজ শব্দ। সুতরাং চরিত্রের সংলাপে লোকজ শব্দের ব্যবহার করে লেখক স্থানিক বর্ণিমা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লেখক শওকত আলীর গল্পউপন্যাসেও বৃহত্তর দিনাজপুরের স্থানিক পটভূমি এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। শওকত আলীর কলমে নিম্নবর্গীয় বিচিত্র ধারার মানুষ এই অঞ্চলের মাটি প্রকৃতি ও অস্তিত্বের গভীর অভিব্যক্তি নিয়ে উঠে এসেছে। তাঁর প্রতিটি গল্পে এবং উপন্যাসেও লক্ষ করা যায় সমাজ মনস্কতার ছাপ। তিনি শোষণের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়া গণমানুষের জীবনসূত্র জোড়া দিয়ে দিয়ে প্রকাশ করেন তাদেরই জীবনজয়ের প্রত্যয়বহ্নি। আর সেই সঙ্গে ব্যঞ্জয় করে তোলেন তাদের মুখের আটপৌরে ভাষা। তাঁর 'আকাল দর্শন' গল্পের প্রধান চরিত্র দিনমজুর আক্কাস আলী দুর্ভিক্ষের কবলে মৃতপ্রায়। কিন্তু খাদ্য সপ্তাহের জন্য হঠাৎ মৃত্যুর অধিক জীবন প্রত্যয় নিয়ে ঝলসে ওঠে। সমাজগবেষক আবিদের উদ্দেশ্যে বলে ঃ

> পহিলে মুই বুঁঝো নাই মাহাজন; মুই ক্যানে কেহ বুঝে নাই। বুঁঝিলে কি আরে মানুষ গিলা মরে? মুই এখুন কহো শালারা খাও– ব্যাঙ্গা খাও নিন্দুর খাও কুত্তা বিলাই খাও– যুদিন ঐগুলা না মিলে তো মটা–মটা মানুষগিলাক ধরো আর খায় ফালাও। মোক কহে মুই নাকি পাগল। কহেন দি তমরা মুই পাগল? বাঁচিয়া চাহিলে খাবা হোবে নাই– না খাইলে মানুষ বাঁচে।[৩১]

শওকত আলী চরিত্রের মুখের সংলাপে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করছেন। চরিত্রের মনোভাবনা ও সামাজিক শ্রেণীস্তরও ফুটে উঠেছে তাদের সংলাপে। লক্ষণীয়, উপন্যাসের চেয়ে শওকত আলী ছোটগল্পে স্থানিক চরিত্র ও ভাষা অধিক ব্যবহার করেছেন। 'আর মা কান্দে না' গল্পেও দিনাজপুরের

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের চরিত্র লাল মোহাম্মদ দরিদ্র হতাশাগ্রস্ত যুবক। বেকারত্ব তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে রাখে। তাই বিষন্ন কণ্ঠে বলে ঃ

> এখুন বাড়িত্ যামু। তারপর আবার অনিশ্চিত হয়ে ওঠে গলার স্বর। বলে, বাড়িটাও ভাল লাগে না বাহে, কুনঠে যে যামু। শালার রাইত পোহায় যায়, তাহো নিন্দ আসে না। সংসার হইল নি এখওনও, হামার মতোন মানুষের ঘরই কি আর বাড়িই কি কহ? ... শহরও গেনু, উঠিও ঐঠেও কুন' কাম নাই, ইদিক গাঁওতু পড়ে থাকিলে কাম জুটে না। কী যে হোবে মানুষের।[৩২]

কিংবা, কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা 'নবজাতক' গল্পের মন্তাজ উত্তরবঙ্গের আধিয়ার আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ করে বলে ঃ

> 'হায় হায় উকথা কহিস না। কেহ শুনিলে ধরে লিয়ে যাবে। ভাতারখাকির কান্দরত কিষাণ সভা হইল। সভার উপর গুলি চলিল। আর ধান গাছের গোড়াত্ অক্ত জমাট হয়ে থাকিল্ কাদ'র মতোন। ধানের গোড়া শুকাল, অক্তও শুকাল– সান্তালের অক্ত, পলিয়ার অক্ত, মুসলমানের অক্ত। ওহ্ সে কতো অক্ত বাহে– আর শুনিস না বাপ, উকথা আর শুনিবা চাহিস না।'[৩৩]

এই গল্পের অপর চরিত্র হাসন আলীও স্থানিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে স্থানিক ভাষায় বলে ঃ

> কহিস না বাপ, উকথা কহিস না। উসব হামার বড় সাধের কথা। বড় ডর করে এখন। সোনাডাঙ্গার কান্দরত্ মানুষ তো নহে, মানুষের বান। বেশুমার আধিয়ার কৃষাণ, কুন্ কুন্ মুলুকের মানুষ, কেহ জানে না। কহিস না বাপ উকথা, কেহ শুনে ফালাবে। কুনো আধিয়ার কিষাণ আর উকথা কহে না। কিষাণের সাধের কথা উসব, বড় মমতার কথা। অক্ত কি গো! অক্তের বান বহে গেল্। গুলি আর লাঠির কি আওয়াজ। রহিম শেখ মরে রহিল, সান্তালপাড়া জ্বালায় দিলে আগুন লাগায়। মানুষের মুখের আওয়াজ তো নহে যেন অসমানের ঠাটা। মানুষের কাথার মগজ আইলের ধারে চান্দের আলোত চক চক করিল রাতভর। আর শুনিস না বাপ।'[৩৪]

শওকত আলীর ছোটগল্পের উল্লিখিত সংলাপগুলোর উপভাষিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়– তিনি দিনাজপুরের উপভাষা যথাযথভাবে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, দিনাজপুরের উপভাষায় শব্দের আদি ও 'অ' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়।[৩৫] অধিকরণ কারকের 'তে' বিভক্তি 'ত'–রূপে উচ্চারিত হয় এবং ভবিষ্যৎ কালের 'যাব' ক্রিয়াপদের রূপ 'যামু' হয়। লক্ষণীয় 'এখুন বাড়িত যামু'। বাক্যটিতে দিনাজপুরের উপভাষার বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। অনুরূপ 'শহরত', 'ইদিক', 'গাঁওতু' প্রভৃতি শব্দে দিনাজপুরের উপভাষার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও 'উকথা', 'উসব', 'কান্দরত', 'আলোত', 'গোড়াত' প্রভৃতি শব্দগুলো একই বৈশিষ্ট্যজাত। রংপুরের উপভাষার মতো দিনাজপুরের উপভাষাতেও 'র' ধ্বনি 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। তাই লক্ষণীয়, 'অক্ত < 'রক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য রংপুর দিনাজপুরের উপভাষার রক্ষিত হয়েছে; তা হলো– বিশেষ বিশেষ শব্দে পূর্ণাজ্ঞা অপিনিহিত। শওকত আলী অত্যন্ত সচেতন ও বাস্তব অনুষঙ্গ রূপে তাই চরিত্রের সল্লাপে 'রাইত' 'আইল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই অঞ্চলের উপভাষায় বিশেষত রাজবংশী উপভাষার কোন কোন শব্দে স্বাভাবিকভাবেই সাধুরীতি লক্ষ করা যায়। অনুনাসিক স্বরধ্বনিরও ব্যাপক ব্যবহার ঘটে। শওকত আলী ভাষাসচেতন শিল্পী। তাই 'বুঁঝিলে', 'বুঁঝো' 'বাঁচিবা', 'চাহিলে', 'খাইলে', 'থাকিলে', 'হইল', 'থাকিল', 'শুনিবা' প্রভৃতি শব্দে দিনাজপুরের উপভাষার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এই অঞ্চলের উপভাষা প্রয়োগে শওকত আলী পুরোপুরি সফল হয়েছেন। নিম্নে আরো কয়েকটি গল্পের চরিত্রের সল্লাপ উদ্ধৃত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. ঃ কী জাড় রে বাপু। ইবার আঘন মাসেই হাড্ডি কাঁপাছে বাহে, না জানি মাঘত্ কি হোবে?
ঃ 'হাঁ বাহে বেড্ডি জাড়।'...
ঃ ঈঃ শালার কুন্ জাড় নামিল বাহে।
ঃ আগিন তাপি একনা–।
ঃ আর নহে ইবার আগিন জ্বালাই, বেড্ডি জাড়...।
ঃ কিন্তুক শালাইটা, শালাইটা, কুনঠে রাখলো বাহে।[৩৬]

২. 'কুনো খবর নাই তুম্হার– মোর পর গোঁসা করে চলে গেলেন– মোর কি দোষ কহেন? মোর বুকত দুধ নাই তো মুই কি করমু– ছুয়াটাতো মোরও বুকের ধন, মোর নয়নের মণি– ওরে মোর বাপরে...।'[৩৭]

লক্ষণীয়, শওকত আলী ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত যত্নবান হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন লক্ষ করা যায় না। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের সময়কাল ও পটভূমির আবহে চরিত্রের সংলাপ রচনায় তিনি অধিক তৎসম শব্দেব ব্যবহার ঘটিয়েছেন। ফলে, একটি কালিক ও পরিবেশগত আবহ গোটা কাহিনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাহিনীকারের বর্ণনার ভাষা ও চরিত্রের ভাষার মধ্যে স্বতন্ত্ররূপ ফুটে ওঠে না। কাহিনী ও চরিত্র সমস্ত কিছুতেই লেখকের মনোভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গা কুসুম ডোমনি গৌড়বঙ্গীয় সমাজের শূদ্র শ্রেণীর মানুষ হলেও তাদের মুখের ভাষা গৌড়ীয় সামন্ত শ্রেণীর মুখের ভাষার মতোই। তবে পরবর্তীকালে লেখকের অন্যান্য উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলের স্থানিক ভাষা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'নাঢ়াই' উপন্যাসটি। এই কাহিনীতে তেভাগার প্রসঙ্গ এসেছে এবং হিন্দু মুসলমান সাওতাল তিন শ্রেণীর কৃষক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কুতুবালি দেলবর সুবল, মহিন্দর বর্মন প্রভৃতি কৃষক চরিত্রের সংলাপে লেখক দিনাজপুরে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ

মহিন্দর ঃ হামরা স্যার শুনা পাছি ইবার নাকিন জোতদাররা মজ্জার সময় আর ধান কর্জ দিবে নাই। আধিয়ার কিরষাণ যে দেড়িয়া দিবা চাহে না, ...।

দেলবর ঃ হায় হায় ইবার তাইলে তো হামার মরণ দশা। কে কহিছে তোক? এই দিককার কুনো মহাজন?

মহিন্দর ঃ এইঠেকার খবর মুই জানোঁ না। ..হামরা কাইল রাইতে খবর পাইছি, রানী সংকৈল থানার মানবদীঘি এলাকার দিক নাকি এই রকম হুকুম দিছে জোতদার মালিকরা...।[৩৮]

আঞ্চলিক বা সমাজভাষা ব্যবহারে শওকত আলীর অনন্য কীর্তি তাঁর সাঁওতাল সমাজকে নিয়ে লেখা ছোটগল্পগুলো। উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল সমাজের নানাবিধ সংকট ও জীবনাচরণের বিবিধ দিক তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের জীবনানুষঙ্গারূপে লেখক মুখের ভাষাকেও উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য, সাঁওতালদের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। তারা নিজ সমাজ ও পরিবারিক গন্ডির মধ্যে সেই মাতৃভাষা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কর্মসূত্রে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলা ভাষী হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে কথা বলে বাংলা রীতিতে। তবে তাদের উচ্চারণে ভিন্ন রূপ পায় সেই বাংলা। শওকত আলী তাঁর সাঁওতাল চরিত্রের সংলাপে বাংলার সেই বিশেষ রূপটি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। সমাজভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে এই রূপটিকে বলা যেতে পারে জনগোষ্ঠির ভাষা (Socio-lect)। সাঁওতাল জনগোষ্ঠির ভাষা ব্যবহারে লেখক তাদের অনেক লোকজশব্দ অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। সাঁওতাল জনজীবন নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হচ্ছে– 'পুশনা', 'ফাগুয়ার পর', 'রাণীগঞ্জ', অনেক দূর', 'শুন হে লাখিন্দর', 'কপিলদাশ মর্মুর শেষ কাজ' ইত্যাদি। বৃত্তিক ও সামাজিক ভাষার ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

কথাশিল্পী হাসান আজিজুর হকের ছোটগল্পেও উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। উত্তরজনপদের চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন এই গল্পের চরিত্র। মোনাজাত উদ্দিন উত্তরবঙ্গে খাসজমি বন্টনের অনিয়মের এক সরেজমিন প্রতিবেদন করতে গিয়ে সকালবেলায় স্থানীয় এক চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে তার পরামর্শে এক জোতদারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই জোতদার তার মাহিন্দার একামতউল্লাহর নামে বন্দোবস্ত জমি নিজ দখলে নিয়ে নেয়। বিনিময়ে তাকে বসবাস করতে দেয় পুকুরপাড়ে 'ভেজা ঝুরঝুরে মাটির মধ্যে'। তার সঙ্গে কথা হয় মোনাজাত উদ্দিনের।

কোথায় থাকেন বাহে?

মালিকের পুকুর পাড়ে।

মালিক খাইতে দেয়?

দেয়।

থাকিতে দেয়?

দেয়।

মাহিনা দেয়?

দেয়।

ছেলেমেয়ে বউ কি খায়?

খায় না।

কি কহিছেন বাহে?

খাইতে হইবেই কে কহিছে আপনেরে। রগড় মারিবার লাগিছেন বাহে।

না খাইলে মরি যাবে তো বাহে মাগ-ছেলেমেয়ে।

কে কহিছে আপনেরে? হামার মাগ-ছেলে খায় না, বাঁচি আছে না খেয়ে, দেখিমেন আপনে?'[৩৯]

সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন একামতউল্লাহকে যখন বুঝিয়ে দিল যে, সে এক একর জমির মালিক। যা ভোগ করছে তার জোতদার। তখন সে জোতদারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে ঃ

ঃ মালিক, তিন বিঘা গমের জমিটার নাকি হামি মালিক?

ঃ পুকুরে নামিছিলেন বাহে?

ঃ তা কহেন কেন মালিক?

ঃ চিংড়ি মাছ গুয়ায় সুড়সুড়ি দিলে বড়ো সুড়সুড়ি ধরি যায়। নাকি আরশোলা ঢুকিছে পোঁন্দে?

ঃ তা কেন কহেন মালিক?

ঃ আসমানের দিকে চাহিয়া খোয়াব দেখিতে গিয়া পরণের ত্যানা খসি পড়ে হুঁশ নেই বাহে? .....

ঃ গমের জমি হামার মালিক। সরকার হামাকে লিখি দেছে।

ঃ তুমরা সহি করি দলিল নিছেন?

ঃ জমিটা হামারে দ্যান মালিক। আপনের তো অভাব নেই। অত খাইবেন না, প্যাটত জায়গা হইবে না।

ঃ জমি লইয়া কি করিমেন বাহে তোমরা ! গরু-মহিষ নাই, সার বীজ নাই। জমি তো পড়ি থাকিবে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আজিজুল হকের 'বিলি ব্যবস্থা' গল্পেও রংপুরের স্থানিক চরিত্র ও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের চরিত্র নেক বখশ ভূমিহীন চাষী ; তার দশ কাঠা জমিতে সরষে চাষ করে। সরষে ক্ষেতে মালিকের ছেলে একদা তার বোবা যুবতী বোন নেকীকে ধর্ষণ করে। লোকমুখে রটে যায় নেকীর গর্ভধারণের কথা। এমতাবস্থায় নেক বখ্‌শ মালিককে বলে ঃ

ঃ মালিক, আমি গরিব, আপনি না মারলেও আমি এমনি এমনি করে যাবো। কদিন বাঁচবার চাই।

ঃ বাঁচো না ক্যান্ বাহে, কে ঠ্যাকায়।

ঃ আপনের ছোঁয়াটার সঙ্গে বুনটার বিয়া দিয়া দ্যান মালিক। কাজটা তো ওঁরা করিছে।

ঃ তুই দেখেছিস ওঁয়া করিছে। আমার ছোঁয়া তোর বুনকে ছুঁইয়া দেখিবে? ছোটো মুখে বড়ো কতা।

ঃ মুই তোর জবান ছিঁড়্যা নিব।''[৪১]

উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রী উপভাষার বিশিষ্ট রূপ বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বগুড়ার স্থানিক বা লোকায়াত জনজীবন এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর গল্পউপন্যাসে বহুবিচিত্র পেশার মানুষ ভিড় জমিয়ে আছে। তিনিও চরিত্রের স্থানিক পটভূমিতে স্থানিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাসে তিনি কৃষক, দিনমজুর, কামার, ফকির, ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতি হিন্দুমুসলিম পেশার মানুষের কাহিনী লিখেছেন। কাহিনীর স্থানিক পরিবেশ ও চরিত্রের স্থানিক বর্ণিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন আঞ্চলিক সংলাপের মাধ্যমে। কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ থেকে নমুনা দিলেই এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র তমিজের সংলাপ থেকে নমুনা দেয়া যায় ঃ

> 'ধান লয়, ধান লয়। ধান কেনা হবি না। এই ধান সেদ্ধ কর‍্যা চাউল বেচ্যা দিয়া আসমু গোকুলের হাটত বুঝিছো? ... খালি খাওয়ার চিন্তা! ফকিরের বেটি, জিভখানা এ্যানা খাটো করো গো খাটো করো! চাউল হামি এক হাটোত বেচমু, আবার এই দিনই পাঁচ কোশ উত্তরে দশটিকার গোরুর হাটত যায়া গোরু লিয়া আসমু।'[৪২]

কিংবা, এই উপন্যাসের অপর প্রধান চরিত্র বৈকুণ্ঠের সংলাপেরও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বগুড়ার সমাজভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমনঃ

> 'লিজে তুমি গান বান্দো, ইগলান কথা বোঝো না? ''বাখরিচুলের দইখানি, তার উপরে চেরাগদানি।'' মানে লাওয়ের উপরে প্রদীপ আছে, সেটা জ্বলে না কিসক? আগুন নাই, জ্বলে ক্যাংকা কর‍্যা? লাও ডোবে মাঝি ঘোলা জল খায়। কোম্পানির সেপাইয়ের গুলি খায়া মুনসি মরলো, তার আগে আগে উগলান স্বপন দেখিছে। ফকির কহে, মানষে মরার আগে স্বপনে ইশারা পায়।'[৪৩]

ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসেও যমুনার চরাঞ্চলের পটভূমি ও বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। গরুর পাইকারদের কথোপকথনে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গীয় উভয় উপভাষার ব্যবহার করেছেন লেখক। জালাল মাস্টার প্রমুখ চরিত্র পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু নবেজউদ্দিন করমালির মুখে উচ্চারিত হয় উত্তরবঙ্গীয় বগুড়ার আঞ্চলিক বুলি। একটি নমুনা দেয়া হলো ঃ

নবেজউদ্দিন ঃ 'জরিমানা ব্যামাক নিয়াই গোরু দিলো?' ...

করমালি ঃ কিসের অশিদ? ...শালা মনে হয় তশীলদার হছে। গোরুচোরের অশিদ নেওয়া লাগবো কিসক? পুবের মানুষ সব খাড়া হয়া আছে, পশ্চিম থ্যাকা হামরা একবার যাইতো পুবের মানুষের সাথে একত্তর হয়া হোসেন ফকিরের গুষ্টি সাফ করা হবো। কি কন আনোয়ার ভাই।'[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গের বগুড়ার স্থানিক পটভূমি ও স্থানিক ভাষার ব্যবহার তাঁর ছোটগল্পেও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে 'পায়ের নিচে জল;, 'দখল', 'অপঘাত' প্রভৃতি গল্পে বগুড়ার স্থানিক চরিত্র ও ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। 'পায়ের নিচে জল' গল্পের পটভূমি পূর্ববগুড়ার যমুনার চরাঞ্চল। এই অঞ্চলের কৃষক কিসমত সাকিদারের উক্তি ঃ

> 'ভাইয়ের নাহান মানুষ হয় না গো। ফসল তুললে বেচ্যা ট্যাকা পাঠায়া দিছি, ফসল নিবার চায় নাই, জোর কর্যা সাথে গম দিছিলাম, কল্যাম, ভাইজান আপনের কি, মটোরেত যাবো, গাড়িত যাবো, আপনাক কি উব্যান লাগবো? দুই বছর অন্তর অ্যাসা কয়, এই খুলিত বস্যা, এই এটি, ... নাগো এটি, এবিন কর্যা পুব মুখা হয়া বস্যা কয়, সাকিদার, তুমি কি গম দিছিলা গো, আটা হছে ময়দার নাহান, ধলা ফকফকা। তোমার ভাবী ঠাওরাবার পরে না আটা না ময়দা। ছোলপোল রুটি খায়া কি খুশি।'[৪৫]

'দখল' গল্পের পটভূমিও বগুড়ার বিল অঞ্চল। পঞ্চাশের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখক বংশানুক্রমিকভাবে একটি পরিবারের ইতিবৃত্ত বিবৃত করেছেন একেবারে সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত। পঞ্চাশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম শহীদ নেতা কাজী মোবারক হোসেনের বংশধর ইকবাল ঢাকা থেকে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি বগুড়ার বিলাঞ্চল পরিদর্শন করতে এলে গ্রামের মানুষজন তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। জেলেপাড়া, কৃষকপাড়া ও কুলুপাড়া ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলে তাকে সন্দেহ করে গ্রামের লোকজন। এমন পরিস্থিতিতে কথোকপথন হয় স্থানিক ভাষায় ঃ

ঃ 'গাঁও দেখেন?'

ঃ 'ক্যা বাবা উদিনকার কথা মনে নাই?'

ঃ আপনি কিসক আছেন? আপনার বাড়ি কুটি? গাঁয়ের মদ্যে ঘোরেন ক্যা, গাঁয়ের ম্যায়ামানুষ দেখেন?

ঃ আপনের খবর হামরা আগেই পাছি। আপনে মোবারক ভায়ের বেটা না?...

ঃ তোরা ব্যামাক মানষেক সন্দ করিস, ব্যামাক মানষেক বাদ দিলে তোরা কাম করবার পারবু?... বাপু তোমাক, আপনাকে তো চেনে না! তুমি ঢাকাত থাকো, নিজের গাঁওগেরাম আছে, কোনদিন ফুচকি দিয়াও দেখো না, মানুষ তোমাক চিনবি ক্যামন কর্যা কও? তোমার বাপ হামাগোরে কি আছিলো তুমি জানো? তোমার বাপ না থাকলে আজ এটি হামাগোরে পাট্টি হবার পারে? তাঁই বিছন দিয়ে গেছিলো, এখন তামাক গাঁও এক জোট হছে।'[৪৬]

'অপঘাত' গল্পের কাহিনী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। একজন নিহত মুক্তিযোদ্ধার মায়ের বিলাপ ঃ

> 'দ্যাখো তো চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাঁই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর্যা দেখ্যা লিবার পারলো! আর হামার বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ খুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো?'[৪৭]

উপরিউক্ত সংলাপগুলো বিশ্লেষণ করলে বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যাবে। যেমন ঃ

১. বগুড়ার উপভাষায় শব্দের অন্তে 'আ' ধ্বনি 'এ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়।[৪৮] 'কর্যা', 'বেচ্যা', 'বস্যা', 'ভর্যা', 'দেখ্যা', 'পড়্যা' শব্দের প্রয়োগ উপরোক্ত সংলাপগুলোতে রয়েছে।

২. কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে 'এ' বা 'আ' ধ্বনি 'এ্যা' ধ্বনি রূপে বগুড়ার উপভাষায় উচ্চারিত হয়।[৪৯] আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও সংলাপের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমনঃ 'থ্যাকা', 'ট্যাকা', 'অ্যাসা', 'ম্যায়া', 'ক্যামন', 'দ্যাখো', 'ব্যাটা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শব্দের আদিতে 'ন' ধ্বনি 'ল' রূপে উচ্চারণ এই উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয়– 'লয়', 'লিয়া', 'লিজে', 'লাওয়েল', 'লিবার' ইত্যাদি শব্দের রূপ যথাযথভাবে প্রয়োগ হয়েছে।

৪. দিনাজপুরের উপভাষার মতো বগুড়ার উপভাষাতেও অধিরণের 'তে' বিভক্তি 'ত' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ 'হাটোত', 'মটরেত', 'গাড়িত', 'খুলিত', 'ঢাকাত', 'অপঘাতত' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৫. রংপুরের উপভাষার মতো বগুড়ার উপভাষাতেও শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনি 'অ'–রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ 'অশিদ' < রশিদ।

৬. উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উপভাষার মতো বগুড়ার উপভাষাতেও সর্বনাম পদের ব্যবহার অভিন্ন রূপ লাভ করেছে। যেমনঃ 'হামার' < আমার 'হামাগোরে' < আমাদের, 'হামি' < আমি ইত্যাদি।

৭. ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, 'বগুড়ায় রো (ক্যা রো) স্ত্রীলিঙ্গা বাচক ও রে বা (ক্যা রে বা; ক্যা বারে) এবং উত্তরে ভাষার প্রভাবে (বাহে) হাবা প্রভৃতি পুংলিঙ্গাবাচক।[৫০] উপরোক্ত সংলাপে 'ক্যা বাবা', অনুরূপ রীতির প্রয়োগজাত শব্দ।

৮. এই উপভাষায় উচ্চারণ দ্রুতির জন্যে ধ্বনি ও পদের লোপ ঘটে। আবার অনায়াস উচ্চারণ প্রবণতার জন্যে শ্রুতিলোপ হয়। যেমনঃ 'কিসক' < কিসের জন্য, 'ক্যাংকো করা < কেমন করে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইলিয়াসের গল্প উপন্যাসের সংলাপে রক্ষিত হয়েছে। বস্তুত তাঁর গল্পউপন্যাসের চরিত্রগুলো অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের 'অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনায় এবং তাদের মুখে সঠিক সময়ে সঠিক সংলাপটি উচ্চারিত হওয়ায়। আঞ্চলিক সংলাপের যথার্থ ব্যবহার তার গল্পের উল্লেখযোগ্য দিক। এর ফলে কাহিনীর চরিত্র যথাযথ সামাজিক প্রেক্ষিতে অবস্থান লাভ করে।[৫১] মানুষের সংগ্রাম, সাহস, স্বপ্ন ও কল্পনা উপভাষার বাক্যভঙ্গি দিয়ে লেখক আরো বাস্তব করে তুলেছেন। সমালোচক বলেন, 'ব্যক্তির প্রতিটি কার্যক্রম, তৎপরতা, তার দোষগুণ, ভীতি ও সাহস এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ জীবন্ত করার জন্য গদ্যকে তিনি সেই লক্ষ্যে চালিত করেন। ব্যক্তিক্ষয়ের কথা তিনি একাধিক লেখায় বলেছেন। এই ব্যক্তি উপযোগী ভাষার প্রয়োজনে তিনি গল্পে ব্যবহার করেন উপভাষা। ভাষার পরতে পরতে আবার জড়িয়ে আছে শিল্পসম্মত উইটহিউমার'।[৫২]

বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় মঈনুল আহসান সাবের–এর 'কবেজ লেঠেল' উপন্যাসেও। এই উপন্যাসের কাহিনী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। স্থানিক পরিবেশ এই উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। তবে উপভাষার ব্যবহারের মধ্যদিয়ে চরিত্রের স্থানিক বর্ণিমার আভাস দিয়েছেন। এই উপন্যাসের লোকায়ত চরিত্র কবেজ। সে একজন গ্রাম্য লেঠেল। তাকে গ্রামীণ দ্বন্দ্বময় পরিবেশে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বার্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। আকমল প্রধান ও রমজান শেখ দুই গ্রাম্য মাতব্বর পরস্পরের বিরুদ্ধে কবেজ লেঠেলকে ব্যবহার করতে চায়। চরিত্রের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে লেখক ব্যবহার করেছেন উপভাষিক সংলাপ। নিচে একটি নমুনা দেয়া হলো ঃ

কবেজ ঃ 'শুনিচ্চি।'

আকমল ঃ শুনিচ্চ তো কতা কচ্চু না কিসক? ... ঠিক করি হামাক একখান কতা কতো বাপ।

কবেজ ঃ আপনি দেখি শুদুই কতা প্যাচাচ্চেন, কচ্চেন না কিচু।

আকমল ঃ ইনকা করিস না। মুখত তোর হাসি নাই ক্যা?

কবেজ ঃ হাসি ঠিকই আছি। আপনি কি কবেন কন।

আকমল ঃ মেলেটারী যদি আসে, সামলান যাবি তো?

কবেজ ঃ ক্যাক্কা করি কমু!

আকমল ঃ তুই রমজান শেখক টাইট দিবার পারবু না?

কবেজ ঃ এই কতা কচ্চেন! এতক্ষণে এই কতা কচ্চেন হামাক!

Dhaka University Institutional Repository

আকমল ঃ তোক কমু না তো কাক কমু?

কবেজ ঃ হামি কি করমু?

আকমল ঃ টাইট দিবু। শালোর বাচ্চাক টাইট দিবু।

কবেজ ঃ হামাক না কয়ে, মেলেটারী আসলি পর মেলিটারীক কন।

আকমল ঃ কইমু তো। তুই অ্যানা মাথা খাটা বাপ। একখান বুদ্ধি বাইর কর।[৫৩]

মূলত উপভাষিক সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের স্থানিক পরিচিতি গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। কিন্তু সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের কাহিনীর স্থানিক পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের স্থানিক সংলাপের ঐক্যসূত্র গড়ে ওঠেনি। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসের কাহিনী পরিবেশ পটভূমি রূপে ফারাক্কা ব্যারেজের দ্বারা প্রকটিত পদ্মা নদীর চরাঞ্চল চাঁপাই নবাবগঞ্জের বর্ণনা দিলেও চরিত্রের ভাষা রূপে বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে কাহিনী, চরিত্রের সঙ্গে ভাষার ঐক্য সমন্বিত হয়নি। চাঁদ ও আজু মৃধার মুখে ব্যবহৃত হয়েছে বগুড়ার আঞ্চলিক বুলি। যেমনঃ

ঃ 'খানকীর পো হামার'–

ঃ 'গাল পাড়বেন না কলাম।'

ঃ 'চলেন ঘুর‍্যা দেখবেন হানে। বাকী জমিত হামি ফসল ফলামো না।

ঃ বাকী আর কোনহানে? জমিত কাম কর‍্যা ভিটেটা ছ্যাড়াবু সেডাও প্যারবু না।[৫৪]

রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক পটভূমি নিয়ে আবুবকর সিদ্দিক গল্পউপন্যাসে রচনা করেছেন। তাঁর 'খরাদাহ' উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি, চরিত্র ও স্থানিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বরেন্দ্র রুক্ষ লালমাটির পোড়ো প্রান্তর নিয়ে রচিত তাঁর 'খরাদাহ' উপন্যাসটি বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। খরাদাহের সবচেয়ে জীবন্ত গণবিপ্লবী চরিত্র ভল্‌লা। ভল্‌লা ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপে লেখক আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছেন। এই উপন্যাসের ভাষাশৈলী সম্পর্কে সমালোচক বলেছেনঃ 'ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবুবকর সিদ্দিক যথেষ্ট সাহসী। ভদ্র সমাজের চোখে ইতর জনসাধারণের মুখের 'আকাঁড়া' ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি যে পরিবেশগত আবহ সৃষ্টি করেন, তা আদিম অসংস্কৃত ব্রাত্য জীবনেরই পরিপূরক। একাজ করতে গিয়ে লেখক হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই এমন এক ভাষা শিল্পের জন্ম দেন তা তার একান্তই নিজস্ব।[৫৫]

লোকায়ত চরিত্রের সংলাপে লেখক স্থানিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। ভল্‌লা ও গ্রামবাসীর সংলাপ থেকে নমুনা দেয়া হলো ঃ

ঃ 'কেনে? মোসিদ মোহাজোন হামারঘে জর্‌মোসত্তোটা কিন্যা ল্যায় নাই?

ঃ লিলচে।

ঃ মোহাজোন হামারঘে বাপচাচারঘে ভিট্যামাট্‌টি চষ্যা পথে লাম্যায় নাই?

ঃ লাম্যাল্‌চে।

ঃ ই পোড়া খর‍্যাটায় দ্যাশট্যা পুড়্যা আঙড়া হলচে। মার কোলের কচি ডবক্যা জান শুখ্যায়্যা আমসি দেলছে। মাটিবেটি পানি পানি কর‍্যা জারেজার হলচে। আর উ মোহাজোন কী কর‍্যাছে?

ঃ উ বখিল পিয়াসের পানিট্যে বেচ্যা পয়স্যা কামালচে।

ঃ হামারঘে মেইয়্যালোকের পরণবসন খস্যায়া লিচে কে? ক্যার ঘরেৎ হামারঘে মা বহিনরা আজ শত্‌কেশতো আনধুনী বেটিছাওয়া?'[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

'খরাদাহ' উপন্যাস ছাড়াও আবুবকর সিদ্দিকের কয়েকটি ছোটগল্পে নবাবগঞ্জের স্থানিক পটভূমি এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 'চরবিনাশকাল', 'বাইচ' গল্পদুটো অন্যতম। 'চরবিনাশকাল'–এ নবাবগঞ্জের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পটভূমিকে অন্বিত করা হয়েছে। কিন্তু নায়ক–নায়িকার সংলাপে লেখক ভিন্নরূপ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। গল্পের নায়ক পূর্ববঙ্গের মানুষ এবং পাটকলের শ্রমিক। নায়িকা আরিচা ঘাটের পতিতাপল্লীর বনিতা এবং নবাবগঞ্জের মহানন্দা নদী তীরবর্তী বকরীডাঙ্গা গ্রামের মেয়ে। তার প্রেমিক নাগরকে নিয়ে এই অঞ্চলে বেড়াতে আসে। ঘটনাক্রমে আধিভৌতিক পটভূমির ভিন্নরূপ পায়। লেখক মহানন্দা অঞ্চলের আমবাগান এবং খরাপীড়িত বরেন্দ্রভূমি ও চরাঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত শিল্পিতভাবে। গল্পের বুড়ী চরিত্রের সংলাপে ফুটিয়ে তোলেন নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা। বুড়ীর সংলাপ ঃ

> গ্যালো সোনের আগ্‌কার সোন। আ–ঘোন মাস ত্যাখুন। ঠিক সন্‌ঝে লাগ্যা গেলছে। গন্‌জের ঘাঁটা ঠান্‌ঠা হয়্যা আইয়ছে। হাটুয়ারা কখুন ঘরে ফির্যা গেলছে। হামি বুলে ত্যাখুন জ্বরে কাঁপতে লাগ্যাচি। পুরী বুঝিন উদিকে চুলয়ে ভাত চাপায়্যা বস্যা আছে। উত্তরে লদ্দী টপক্যা ল্যাণ্ড়ার ডালপালামাড়্যা দিয়্যা উঠ্যা আইলো আকাশবাও। পরীর কানের লতির দুলগোছা লাড়্যা দিয়া কহছিলো, আ–য়। ... হামি পছিমের চালিত্তলে কাঁথা মুড়ি দিয়া কহিনু, কুনঠে লা? ওমা আর সাড়া নাইখো। কাঁপতে কাঁপতে বাহিরে উঠ্যা আস্যা দেখনু, মাগে, কি কহবো তোকে, আখা জ্বল্যা ছাই। দুয়ার খুল্যা হাট। চৌকাঠে পড়্যা আছে পেতলের চাভিখ্যান। ডাক দিনু গলায় অক্ত তুল্যা– পুরী লো! পুরী লো! তক্ষকটা কহিল্যে– নাই লো! নাই লো! কাল অকে ডাক্যা লিল্যে..।[৫৭]

আবুবকর সিদ্দিকের 'বাইচ' গল্পের পটভূমি রাজশাহীর পশ্চিমে গোদাগাড়ির পদ্মাতীরবর্তী বাসুদেব মহিষালবাড়ির আঞ্চলিক জনপদ। আবহমান বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক লোকউৎসব বাইচ–কে কেন্দ্র করে লেখক গণজীবনের বিপ্লবীচরিত্রকে যাদুবাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন। এই গল্পে লেখক স্থানিক নাম–ভাষা ও পটভূমিকে জীবন্ত রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। চরিত্রের মুখে তিনি উপভাষার পাশাপাশি অতি দক্ষতার সঙ্গে লোকসঙ্গীত এবং নিম্নবর্গীয় সমাজের অপভাষাও (গালিগালাজ) ব্যবহার করেছেন। নিম্নে নমুনা দেয়া হলো ঃ

ঃ ওস্‌সালো, পায়ে যি গোদ লাগচে বে! কত দৌঁড়িয়ে রইবি র‍্যা?
ঃ চ ঘাটে যাই। শসালোরা জরবোর লেগিয়েচে ওখেনে।
ঃ অ্যারেভ্ভ্যাট! বাইচ্যের লা আস্যা পড়ল্যে ত্যাখুন?
ঃ লাওকেনে বাইচ্ বাইচ্ আবে উল্লু, বাইচ দেখ্যা কি তোর হোল ফাটব্যে?
ঃ হামার বাপের হোল ফাটব্যে। তোর মার ফাসকিলাশ ইনদারায় যায়্যা ফাটব্যে গুড়ুম বাহানচোত্।
ঃ হ্যাপপ্যাঠা। ভ্যা ভ্যা কর‍্যে। বাইচে প্যাটট্যে ভরবে লয়? ঘাটবাগে আয় না। সালো বেরানীর ধুমধাড়াক্কা ওখেনট্যা:। পেন্ডেলের ভিতরিবাগে লজর লাগা। লে দ্যাখ খাস্‌সিপোলাও চাপালচে।'[৫৮]

কিংবা, তাঁর 'দোররা' গল্পেও নবাবগঞ্জের গ্রাম্য নরনারী সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। গল্পের কাহিনী, চরিত্রের সংলাপে লেখক তুলে এনেছেন মানবিক মনোভঙ্গি এবং স্থানিক পরিচয়। একদিকে সামাজিক আচার সংস্কার; অন্যদিকে জৈবিক তাড়নাগ্রস্ত মানুষের সাংকেতিক ভাষারূপকেও মূর্ত করার অসাধারণ দক্ষতা তাঁর।

ঃ এ লুতু!
ঃ কহেনজী।
ঃ বুলচি তুর শরীলে ই বদগন্‌ধোটা কিসের র‍্যা?

Dhaka University Institutional Repository

'বেহুলা', 'শত্রু' প্রভৃতি গল্পে দিয়াড় অঞ্চল এবং 'লালমাটি কালো মানুষ' উপন্যাসে 'গফুরের জীবনদর্শন', 'একটি প্রতিরোধের কাহিনী', 'রক্তপাতের ব্যাকরণ', 'ফেরারী' প্রভৃতি গল্পে বরেন্দ্র জনপদের জীবনচিত্র ও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

এই দুই অঞ্চলের মানুষের আচার সংস্কার জীবনধারা ও মানসিকবোধকে লেখক যেন অনুবাদ করেছেন তাদেরই মুখে ব্যবহৃত উপভাষার মাধ্যমে। নিম্নে তার উপভাষিক বৈচিত্র্য দেখানো হলো ঃ

ক. শালির বেটিরঘে কত বুলি যে, গরম ত্যাল রেডি থুবি, তো দ্যাখ, খাইয়া সবগুলানের পাছা ভারি হইছে বটে। লড়ে (নড়ে) না। ... কুন শালিরে কুন কথা কইস জয়নাল, তুই তামুক ফাঁটিস..।[৬৩]

খ. বড় গরম মনে হয় মোল্লাজী? তা নামাজ শ্যাষ্ হইতে দ্যান। ... ফের ধরেন, মোল্লাজী সেটা যুদি নাও করেন তো ছোট মোড়লের লুঙ্গিখানা তো এখনও কোর্টের হেফাজতে আছে নাকি? সেটা উদ্ধারের পন্থা কি তাও আইজ বাহির করা দরকার।[৬৪]

গ. ঃ ক্যানে শুনি? ওরে এই মাঝপতে ক্যানে এমন আটিংপাটিং ক'তো দেখি।
ঃ এ কামে আমার মন টানে না যি।
ঃ কুন কামে।
ঃ এই ফজরার সোঁতে লাগতে।[৬৫]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোর প্রথমটিতে গ্রাম্য মাতবরের পরিবারের মহিলাদের প্রতি মনোভাব প্রকাশ পায়, দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য মাতব্বরের কাছে বিচারের ব্যাপারে পরামর্শ এবং দুজন লেঠেলের সংলাপে চরিত্রের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং পরিস্থিতির নাটকীয়তাকে লেখক সমাজসংলগ্ন উপভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের উপভাষার সীমানা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং একই ভৌগোলিক জনপদে বিভিন্ন রূপ উপভাষিক ছাঁদ রয়েছে। তাই সুনির্দিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সংলাপগুলো বিশ্লেষণ করা দুরূহ। তবে আবুবকর সিদ্দিক, হাসান আজিজুল হক ও ভাস্কর চৌধুরীর উপভাষিক ব্যবহারে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্থানিক রূপ রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি উপভাষিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। লেখকগণ স্থানিক আবহ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অনুসৃতিতে কোথাও কোথাও নিজস্ব শৈলিতে ভাষা ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশের উপভাষার শ্রেণীকরণে পাবনা অঞ্চলের উপভাষাকে বরেন্দ্রী শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয় না। পাবনার উপভাষার একটি নিজস্ব রীতি রয়েছে। অনেকাংশে কুষ্টিয়ার উপভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অঞ্চলের উপভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় সরদার জয়েনউদ্দীনের গল্পউপন্যাসে। চরিত্রের স্থানিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরদার জয়েনউদ্দীনের সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। তিনি চরিত্রের বাস্তবতায় গ্রাম্য স্ল্যাং শব্দও ব্যবহার করেছেন।

ক. নিজের পাখী উড়েছে রে করালী, আজ নিজের পাখী উঠেছে। আঁতে বুঝি ঘা লেগেছে? ক্যান সোনা দায়ানীর মেয়ে এনে দেবার সময় তো দেখতাম খুব-খু-ব মজা। বোঝ-বোঝ, এক জারের মাসের কয়দিন যায়। কার খ্যাতা কে গায় দেয়।'[৬৬]

খ. 'শালা জমিদার হইছো তো কি দু'নের আল্লা হইছো? তোমার চৌদ্দগুষ্ঠির পিন্ডি চিটকাবো আজ। চুপ করে থাকলিই বড় বার বাড়ে। অনেক থাকছি, আর না– এবার তোমার গুষ্ঠির ছেরাদ্দ।'[৬৭]

গ. 'আজকাল আবার সমাজে বড় চাপাচাপি, আর ঐ শয়তান হাজীটা ক্ষেপা শুয়োরের মতো কেন যেন আমার পিছন নিয়েছে।'[৬৮]

ঘ. মেয়েদের এ সাজসজ্জা ছেনালীপনা ঢং নিয়া চিন্তা করার তার সময় কোথায়?[৬৯]

ঙ. আজতক একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না, বাচ্চা ছাড়া কি আজকাল কামাই করা যায়?[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্যের ব্যাপারটি। স্থানিক চরিত্রের পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গ ও স্থানিক ভাষা ব্যবহারে লেখকগণ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে ভৌগোলিক জনপদকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সমাজভাষার রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫.০৩ স্থানিক সমাজের বৃত্তিক ও গোষ্ঠীভাষা এবং ট্যাবু ঃ

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে কোন একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষা রূপ গড়ে ওঠে। আবার একটি জনপদের এবং সমাজের বিভিন্ন ভাষাত্ত্বাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রূপ পায় সামাজিক শ্রেণীদূরত্ব, জাতি, ধর্মভেদ, লিঙ্গভেদ এবং বয়সের পার্থক্যের জন্যেও।[৭১] মূলত উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্রী উপভাষা অঞ্চল হলেও কয়েক মাইলের ব্যবধানে আলাদা আলাদা উপ–পরিবৃত্তি (sub-variety) গড়ে ওঠার ফলে সামগ্রিকভাবে এই উপভাষাকে বৈচিত্র্যময়রূপ দিয়েছে। আবার জনবিন্যাসের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়– অভিবাসন, প্রাচীন নৃগোষ্ঠীর ভাষার সমাজসূত্র এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উত্তরবঙ্গের স্থানিক ভাষায় নানামাত্রিক বৈচিত্র্যে এসেছে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকগণ উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন ও সংশ্লিষ্ট বৈচিত্র্যময় উপভাষাকে চরিত্রের সঙ্গে অন্বিষ্ট করেছেন। বর্তমান আলোচনায় এই বিষয়েই দৃষ্টিপাত করা হবে। চরিত্রের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান, ধর্মভেদ এবং নৃগোষ্ঠীর দ্বিভাষিকতাকে কথাশিল্পীরা সংলাপের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলেছেন। ফলে, বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আলোচনাকেই নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

ক. স্থানিক চরিত্রের সামাজিক শ্রেণীভেদে ভাষাবৈষম্য;
খ. ধর্মভিত্তিক শ্রেণী ও ভাষাভেদ;
গ. নৃগোষ্ঠীর দ্বিভাষিক ভাষা–প্রকৃতিঃ সাঁওতালী বাংলা;
ঘ. নিষিদ্ধবাচকতা বা ট্যাবু।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের স্থানিক সমাজপটে স্থানিক চরিত্রের বৃত্তিক এবং গোষ্ঠীভাষা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

৫.০৪ স্থানিক চরিত্রের সামাজিক শ্রেণীভেদে ভাষাবৈষম্য ঃ

কৃষি নির্ভর উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি। তবুও সামাজিক শ্রেণীস্তর এক নয়। তাই ভাষার ব্যবহারিক রীতি প্রকৃতিও একাধিক। ভৌগোলিক বিভাজন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ব্যবহারিক উপভাষার সামাজিক ও বৃত্তিক ভাষার পার্থক্য আছে। সমাজতাত্ত্বিকগণ মানুষের সামাজিক শ্রেণীকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে, শিক্ষাগত, পেশাগত, অর্থনৈতিক আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বিভক্ত করা যায়।[৭২] সমাজভাষাবিজ্ঞানী ডবলু লেবভ সামাজিক শ্রেণীকরণে নিম্নশ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই চারটি স্তরে নির্দেশ করেছেন। তিনি নিউইয়র্কের ভাষা গবেষণায় সামাজিক শ্রেণীর স্তরবিন্যাসে বাচক পরিস্থিতির একটি চিত্র প্রদান করেছেন। বর্তমান গবেষণায় উত্তরবঙ্গের সমাজভাষার বাচকপরিস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বিষয়টি প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ইউলিয়াম ডোনসের শ্রেণীচিত্রটি[৭৪] এখানে উল্লেখ করাও প্রয়োজন। তিনি বাচক পরিস্থিতিকে নিম্নরূপে নির্দেশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪ ঃ শ্রেণীভিত্তিক বাচক পরিস্থিতি

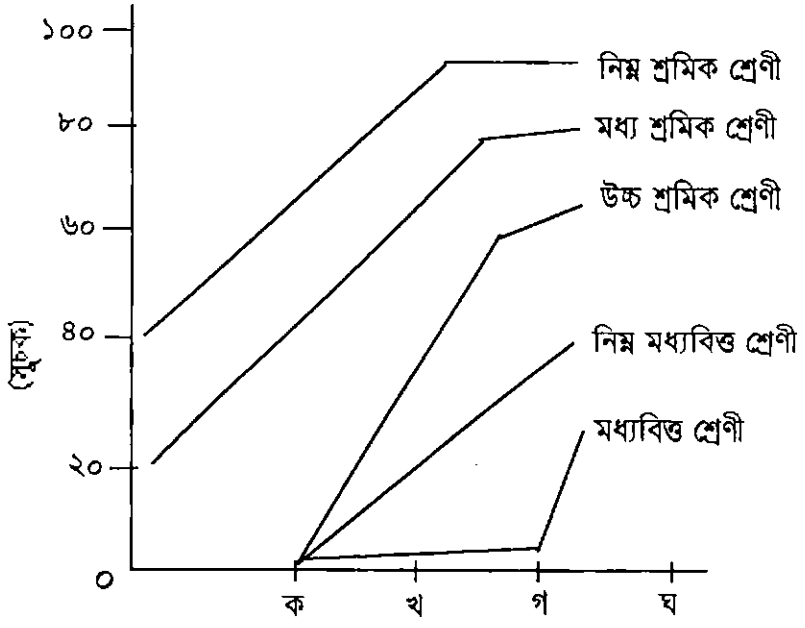

ক. শব্দ তালিকা রীতি খ. পঠনরীতি গ. সতর্করীতি ঘ. অসতর্করীতি

	শৈলী			
শ্রেণী	শব্দ তালিকা	পঠনরীতি	সতর্করীতি	অসতর্করীতি
১. মধ্যমধ্যবিত্ত	০০০	০০০	০০৩	০২৮
২. নিম্নমধ্যবিত্ত	০০০	০১০	০১৫	০৪২
৩. উচ্চ শ্রমিক শ্রেণী	০০৫	০১৫	০৭৪	০৮৭
৪. মধ্য শ্রমিক শ্রেণী	০২৩	০৪৪	০৮৮	০৯৫
৫. নিম্ন শ্রমিক শ্রেণী	০২৯	০৬৬	০৯৮	১০০

এই সূচক রেখাচিত্রের দ্বারা কোন একটি ভাষার বাচকশ্রেণীর অবস্থান ও ভাষিকগুণাগুণ বিশ্লেষণ করা যায়। সাধারণত বৃত্তিক ক্ষেত্রে যারা বেশি নিম্নবর্গীয় জীবন যাপন করে– তাদের ভাষিক পরিস্থিতিতে লক্ষ করা যায় শব্দের সীমাবদ্ধতা, উচ্চারণে অসতর্কতা এবং অশুদ্ধরীতি। এছাড়াও তারা অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল বাক্য ব্যবহার করে। কাজেই বাক্যের অসতর্করীতি, গঠনগত দুর্বলতা এবং অশুদ্ধ উচ্চারণের সূচক নির্ধারিত হয় শ্রেণীগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই। আমরা লক্ষ করি, উত্তরবঙ্গের সমাজকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের চরিত্রেও লেখকগণ বৃত্তিক শ্রেণী অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, হয়তো কথাশিল্পীগণ সমাজভাষার ভাষাতাত্ত্বিকরীতি অনুসরণ করে চরিত্রের ভাষা নির্মাণ করেন নি। তবুও খুব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যরূপে কোন কোন লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের বৃত্তিক ভাষারূপ রক্ষিত হয়েছে। বৃত্তিক ভাষা ব্যবহারে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

সৈয়দ শামসুল হক–এর 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসের হায়দার, আলম, মনি প্রভৃতি শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর চরিত্র। অপরদিকে, এই উপন্যাসের মহিউদ্দীন, মোমেনা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত চরিত্র। তাদের সংলাপে ভাষাগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আলম ঃ 'মহিভাই সে রকম মানুষ না।'

হায়দার ঃ 'কত মানুষ দেখলাম।'

আলম ঃ 'চুপ, কি বলছিস?'

হায়দার ঃ মতিভাই কি সাধু? ... বশিরকে নিয়ে বাইরে যাবার মানে কি? আঁ?

আলম ঃ 'মহিভাই ফুলকিকে ভালবাসে।'

হায়দার ঃ 'জানি, জানি ; আমি রংপুরের মানুষ, রংপুরের দোষ জানি না?[৭৫]

(খ) মোমেনা ঃ 'তোমরা যাবার নন?'

মহিউদ্দীন ঃ 'কোন্‌ঠে?'

মোমেনা ঃ ক্যানে? মাঠে। ... মাঠে তোমার কাম নাই? এলাও বসি আছেন?

মহিউদ্দীন ঃ 'কোন কামের কথা পুছ করিস?'

মোমেনা ঃ 'যেমন তোমরা সেইদিন মাঠোৎ গেইছিলেন?'[৭৬]

উপরিউক্ত সংলাপে লক্ষণীয়, শব্দ বাক্যগঠন, উচ্চারণ রীতির শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা থেকেই চরিত্রের বৃত্তিক পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে (ক) উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় (খ) সংলাপে চরিত্রের অসতর্ক অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অসমাপ্ত বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে লেখক তাদের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান চিহ্নিত করেছেন।

লেখক অনুরূপ ভাষাকৌশল অবলম্বন করেছেন তাঁর 'না, যেয়ো না' উপন্যাসেও। রাজারহাটে কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলেজের আয়া চরিত্রের সংলাপেও শ্রেণীভাষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছাত্রীদের কমনরুমের টয়লেটের দেয়ালে দেশের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে কলেজের এক অধ্যাপিকাকে জড়িয়ে কটূমন্তব্য লেখাকে কেন্দ্র করে বাক্য বিনিময় ঘটে।

প্রিন্সিপাল ঃ ''খালি যদি অসভ্য কথা হয়, তাও বোঝা যায়। সামাল দেয়া যায়। অসভ্য কথা, তার উপরে রাজনীতি? দেশের প্রেসিডেন্ট নিয়ে অসভ্য কথা? মার্শাল ল'য়ের টাইম। এখন যদি এই কথা পুলিশ কি বিডিআরের কানে যায়, তাহলে আমাদের কলেজ থাকবে?'' ....

উক্ত সংলাপের পর লেখকের বর্ণনা– ''দীর্ঘদিন রাজারহাটে বাস করে রংপুরি জবান যতটুকু আয়ত্ব করেছেন তা প্রয়োগ করে বলেন।''

'তুই বেটি কি করিস? আলোপাতা খাইস বসি বসিয়া? আর চ্যাংড়াকোনো আসিয়া লিখি যায় অসভ্য কথা? মেয়েদের কমনরুমের চাবি ছেলেরা পাইল কি করিয়া? জবাব দে হামাক।'

আয়া ঃ 'আমি থাইকতে কাঁয়ও আসে নাই। মুঁই থাকিতে বেটা ছাওয়ার ছায়া না পড়িবার পায় না, জানি রাখেন। আলোপাতা খাঁও, হামার পয়সায় খাঁও। উয়ার সাথে ইয়ার কি সম্পর্ক? গরীবের উপর অত্যাচারের যুগ পড়িছে, হামরা তো গরীবের অধম। মায়না বাড়েয়া দিবার কইলে তোমরা দাঁত মুখ খেঁচি আসেন।'[৭৭]

বৃত্তিক বা শ্রেণীগত ভাষাভেদের ব্যবহার শওকত আলীর গল্পেও লক্ষণীয়। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত তাঁর 'সোজারাস্তা', 'আকাল দর্শন' গল্প দুটো থেকে আমরা বৃত্তিক ভাষার নমুনা গ্রহণ করতে পারি। 'সোজা রাস্তা' গল্পের তিনটি চরিত্রের একজন সরকারী কর্মকর্তা, একজন গ্রাম্য মুসলিম মাতব্বর কালু মন্ডল এবং অন্যজন হিন্দু দিনমজুর অনন্ত দাস। নিম্নে তাদের বৃত্তিক বুলির নমুনা দেয়া হলো ঃ

কর্মকর্তা ঃ 'নাম কি?'

অনন্ত ঃ 'আইজ্ঞা অনন্ত দাস।'

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ঃ 'পেশা? ... কোনো কাজ করো না?

কালুমন্ডল ঃ কি, কথা বুঝো না?

অনন্ত ঃ আইজ্ঞা, হ্যাঁ।

কালুমন্ডল ঃ সায়েবের কথার জবাব দাও না কেন?

'অনন্ত দাস ছোট মন্ডলের মুখেও খটমট সায়েবী বুলি শুনে বুঝতে পারে না কি বলবে। শুধু বলে, 'আইজ্ঞা জবাব দিমু, লিচ্চয় দিমু।'...

কালুমন্ডল ঃ 'এ্যাই ব্যাটা, বুঝে শুনে কথা কহিস, সায়েব রিলিফের লোক।'

আনন্দ দাস ঃ 'হুজুর জাড়ে ইবার খুব কষ্ট গেইছে হামার, একখান কম্বল হামাক দিবায় নাগিবে।'[৭৮]

শওকত আলীর 'আকাল দর্শন' গল্পের আবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং আক্কাস রংপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত দিনমজুর কুলি। তাদের উভয়ের সংলাপ রচনায় লেখক বৃত্তিক বুলির প্রয়োগ ঘটেয়েছেন। নমুনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আবিদ ঃ আরে বসে কেন, কি হলো তোর?

আক্কাস ঃ 'আর মোর পাও চলে না বাহে, মোক কনে খাবার জিনিষ দ্যাও– ফের মোর ভোক লাগিছে।

ঃ 'খাবার জিনিস এখন কোথায় পাবো বল? ... দ্যাখ্ খামোকা ঝামেলা পাকাস না...।'

ঃ উকথা তো তমরা পহিলেই কহিছেন, মোর ফম আছে– কিন্তুক মোর পাও যে এখন চলে না?

ঃ 'এতোক্ষণ চললো আর এখন চলবে না?'

ঃ মোর পাও দুখান কি তমার চাকর নফর বাহে আঁ? তমরা হুকুম দিলেই চলবে? পাও তো চলে শরীলের বলে।'[৭৯]

লেখকের 'শুন' হে লখিন্দর' গল্পেও শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী বৃত্তিক বুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গল্পের মহাজন শ্রেণীর প্রতিনিধি লক্ষ্মীকান্ত এবং দিনমজুর শ্রেণীর সাঁওতালের প্রতিনিধি গুপীনাথ। তাদের সংলাপের ভাষাতেও লেখক স্পষ্ট করে তোলেন শ্রেণীভাষার রূপ।

লক্ষ্মীকান্ত ঃ 'হয়েছে বাপ, আর জ্বালাস নে, গত বছরের পাওনা টাকাটা চাস তো, পাবি। এখন তোর এই কাটাকাটির কাজটা বন্ধ কর– ভগবানের জীব তো–

গুপীনাথ ঃ হাঁ, ভগমানের জীব। ... কিন্তুক কুন ভগমানের জীব সিটা কহ? হামার ভগমান মাবিষহরি–হামরা সান্তাল, কালিনাগ হামার ভাই, হাঁ। ... চোপ সালা, তুই কুছু কহিস না, হামার সঙ্গে সদাগরের ব্যাটা লখিন্দরের হিসাব–নিকাশ– তোর কি?'[৮০]

বস্তুত, সামাজিক শ্রেণীভাষার স্তরভেদ বেশ স্পষ্ট। তাই গল্প ও উপন্যাসের সংলাপেও আমরা দেখি, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সাজানো সতর্ক ভাষায় কথা বলে। পাশাপাশি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করে আঞ্চলিক অশুদ্ধ ভাষা। কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যেও আমরা এইরূপ শ্রেণীভাষার ব্যবহার লক্ষ করি। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প থেকে উদাহরণ গ্রহণ করা যায়। এই বিষয়ে তাঁর 'পায়ের নিচে জল' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পের প্রধান চরিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজির ছাত্র আতিক স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করে। বগুড়ার চরাঞ্চলে পিতৃপুরুষের জমির বর্গাদার কৃষক কিসমতের সঙ্গে দেখা করতে এসে উভয়ের বাক্য বিনিময় হয়। এই ভাষা ব্যবহারেও তাদের শ্রেণীগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিসমতঃ 'তোমরা কয়ো ভাই মাঘ মাসোত একবার আসো, চরের মদ্যে খুব পাখি বসে, শিকার করব্যার পারবা।'

Dhaka University Institutional Repository

আতিকঃ 'আব্বা বোধহয় এখানে এসে শিকার করতেন, না?'

কিসমতঃ 'শীতের সময় তাই বন্দুক ছাড়া কুনোদিন আসে নাই।'

আতিকঃ 'শেষবার আব্বা যখন আসে, স্বাধীনতার আগের বছর, তখনো বন্দুক নিয়ে এসেছিলেন। হুঁ, আমার মনে আছে। শিকারে সেবার আপনি সঙ্গে ছিলেন।

কিসমতঃ তোমরা বাপু কী দেখছো? আমি বাপু মেলা শিকারী দেখছি, তোমার বাপের নাহান কাকো দেখি নাই। কী কমু, পাখি না উড়লেই তাঁই গুলি করে নাই।'[৮১]

আখতারুজ্জামানের আর একটি বিখ্যাত গল্প 'ফোঁড়া'। গল্পে শিক্ষিত যুবক মামুনের সঙ্গে রিক্সাচালকের কথোপকথনের ভাষায় শ্রেণীগত প্রভেদ স্পষ্ট।

রিক্সা চালক ঃ 'হাসপাতালে আসিছিলেন কিসক?'

মামুন ঃ 'কাজ ছিল।'

রিক্সা চালক ঃ 'হামাক চিনলেন না? নুইমুদ্দি হামার মামাতো ভাই। ... আপনার মনে নাই? তার এই খবর পায়া হামিই তো তার বৌ ব্যাটা বিটিকে লিয়া হাসপাতালে আসিছিনু।

মামুন ঃ 'নইমুদ্দিন হাসপাতাল থেকে পালাল কেন?'

রিক্সা চালক ঃ 'পালাবি কিসক? ছোলপোলের সাথে ঈদ করব্যার বাড়িত গেছে?'

মামুন ঃ 'ঈদ করার জন্যে হাসপাতাল থেকে রোগী বাড়ি যেতে পারে?'

রিক্সা চালক ঃ ছুটি লিয়া গেছে।

মামুন ঃ এ কী অফিস না কারখানা যে ছুটি নেবে? এই শরীর নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ল, অবস্থা কী হতে পারে, জানো?'[৮২]

কুশলী কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের গল্পেও সমাজ ভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁর 'জননী' গল্প থেকে আমরা নমুনা গ্রহণ করতে পারি। 'জননী' গল্পের কাজের ঝি আয়েশা এবং গৃহকর্ত্রীর ভাষাভেদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

গৃহকর্ত্রী ঃ 'কাজ করবি?

আয়েশা ঃ করবো না ক্যানে?

গৃহকর্ত্রী ঃ থাকবি তো আমাদের বাসায় রাতে?

আয়েশা ঃ সাঁঝ বেলায় মায়ের ঠেয়ে যাবো।[৮৩]

আবুবকর সিদ্দিকের 'বাইচ' গল্পেও বৃত্তিকবুলির প্রয়োগ ঘটেছে। গল্পে সাধারণ অশিক্ষিত মাঝি-কৃষক শ্রেণী, গ্রাম্য মাতব্বর চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রভৃতি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণীর চরিত্র রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ রচনায় লেখক ভাষাসচেতন থেকেছেন এবং শ্রেণীভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সাধারণ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলোর মধ্যে আইজুদ্দি মাঝি, লাঠিয়াল আহাদালীমাতব্বর প্রভৃতি; অন্যদিকে ইউ.পি. চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান, থানার দারোগা এবং জেলা প্রশাসক ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক পদমর্যাদার চরিত্রের মৌখিক ভাষা ব্যবহারে লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে ক্রমান্বয়ে চরিত্রের সংলাপগুলো উদ্ধৃতি করলেই শ্রেণীভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আইজুদ্দি মাঝি ঃ হামারাঘে আচে হুজুর। সোনার কলস উঠ্যা গেলচে তো পেতলেরট্যা আচে ভি তক। সত্‌রো বচ্ছর পর ই বাইচে আইনু। কলস না লিয়া আইজুদ্দি মাতবর বাইচেথেথ জেবনে ঘরে ফিরে নাইখ। আইজ ফিরল্যে কপালে ঝাঁটাকাঠি। প্যেতয় না যান সেপাই পাঠায়্যা দ্যাখেন কেনে বাচাড়ির খোলে। ঝিবহুরা দিয়্যা দিলছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানঃ 'আঁই আঁই আইজ্জিমাদ্‌বর! হামার ইনুয়ানে বসত কর‍্যা তু জ্যালাহাকিম্যের সঁথ ব্যাদোবি করো আঁই। মাপ চাহ। তু মাপট্যে চাহ বা——— বা ——— হানচোত্‌।'

আহাদালী লেঠেল ঃ "ফরিয়াদ আচে হুজুরহাকিম। হামারঘে চরবাসুদেবপুর ইনুয়ানের ই চ্যারম্যান কোকিলবাবুজিট্যে হামারঘে ভোটগুলান খায়্যা লিল্যে। আর আইজ হাঁরা দশগাঁয়ের মাগছ্যাল্যা না খায়ামরি। ইলিফের ট্যাকা, ওয়াকপোরগামের ট্যাকা, কাজের বদল গহম, এ্যাশনের চাইলত্যাল সভি উ সুমুন্দি অরি ভোগে লাগালছে। হামারঘে মাবাহিন উলঙ্‌গোউদম। চ্যাত্তপোলারা শুখালছে।'

দারোগা ঃ 'অর্ডারপ্লিজ স্যার। মিউটিনি। কৃষকবিদ্রোহ স্যার'।

পৌরসভার চেয়ারম্যান ঃ সামান্য ইনতেজাম করেছি শ্যার। মিটিং এরপর একটু থাকবেন শ্যার স্টাফ নিয়ে।

জেলা প্রশাসক ঃ না না করেছেন কি ওপেন পাবলিকের সামনে এ্যাঃ ।

পৌরসভার চেয়ারম্যান ঃ কোনো অসুবিধে নেই স্যার। চেয়ারটেবিল সব রেডি। শহরের এলাইটদেরও বলা হয়ে গেছে শ্যার।

জেলা প্রশাসক ঃ 'আহা! আপনার বাসাই তো ভালো ছিল। এ একেবারে পাবলিক প্লেস।'[৮৪]

উপরোক্ত সংলাপগুলো থেকে আমরা বক্তার শ্রেণীচরিত্র এবং ভাষিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারি। বস্তুত উত্তরবঙ্গের সমাজভাষিক চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কথাশিল্পীরা বৃত্তিকভাষাকে অবলম্বন করেছেন। এখানে আমরা তার সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করেই মোটামুটিভাবে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। বৃত্তিকবুলি যে, চরিত্রের একটি প্রধানগুণ লেখকগণ তা অনুসরণ করেছেন।। নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভাষা যে অশিষ্ট এবং ব্যাকরণগতঘাটতি রয়েছে তা ভাষাবিজ্ঞানী বার্ণস্টাইনেরা স্বীকার করতেন।[৮৫] গরীবের ভাষা ও ধনীর ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজভাষা বিজ্ঞানের এই বিষয়টি স্বীকৃত সত্য। বলাই বাহুল্য, আমাদের কথাশিল্পীরাও সেই সামাজিক ও ভাষিক সত্যকে অঙ্গীকার করেছেন। ফলে, উত্তরবঙ্গের সমাজভাষা ব্যবহারে বৃত্তিকভাষার ভেদ লক্ষ করা যায়। কারণ, লেখকগণ চরিত্রের শিক্ষা, রুচি এবং পেশাগত জীবন অনুষঙ্গী ভাষাকেই সাহিত্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। সমাজভাষাতত্ত্বে স্বীকার করা হয়, 'সামাজিক ভাষার বৈষম্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষা, রুচিবোধ ও সংস্কৃতি পেশা ও অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে।'[৮৬]

৫.০৫ ধর্মভিত্তিক শ্রেণী ও ভাষাভেদ ঃ

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-সংস্কার ও প্রথাগত স্বাতন্ত্র্য ধর্মীয় বর্ণভেদ ও আচার সংস্কারের ভিন্নতার কারণেও ভাষাবৈষম্য ঘটে। পৃথিবীর যে কোন দেশেরই বিভিন্ন জাতপাত এবং নৃগোষ্ঠী যখন একই ভাষায় কথা বলে, তখন তাদের বাকব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়, প্রভেদ সূচিত হয়।'[৮৭] ড. রাজীব হুমায়ুন বলেনঃ 'একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানের কারণে হোক, একই ধর্মের বিভিন্ন মত অনুশাসনের কারণে হোক; ধর্মকেন্দ্রিক ভাষা-বির্তর্কর কারণে হোক অথবা ধর্মভিত্তিক ভাষা-পরিকল্পনার কারণেই হোক না কেন, পৃথিবীর যে কোন ভাষার শব্দ, পদবিন্যাস তথা সামগ্রিক ভাষা কাঠামোতে ধর্মের কারণে ভাষাবৈচিত্র্য আনতে পারে।'[৮৮] বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে আমরা দেখেছি, এখানে মূলত মুসলমান হিন্দু এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বসবাস। এছাড়াও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ও খুব স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করেন। তাই উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটভূমিক কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে মূলত মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. 'দেখো, মুঁই কী করিবার পারোঁ– ভগমানের দয়া হইলে সব–এ তো হয়, এ্যালা দেখেন, তুমার আল্লা ভগমান কী থুইছে তুমার কপালত।'[৯৩]

ঘ. 'হায় ভগমান, তুমি মানুষকে কুকুর বেড়ালের মত কেন বানিয়েছো গো?'[৯৪]

ঙ. ঃ যাবো নাকিরে দিদি?

ঃ এ্যাই কি হচ্ছে ওদিকে? অত গুজ গুজ কিসের?

ঃ কে? কে– আপনি? এখানে কেন?

ঃ আজ্ঞে...। আজ্ঞে আমি দূরের মানুষ। ...

ঃ নাম?

ঃ অরবিন্দ।

ঃ অরবিন্দ রায়।

ঃ কী রকম রায়?

ঃ আজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ।[৯৫]

চ. 'মহাদেবের নিজের হাতে কাটা দিঘি, তাও কাটলেন মা দুর্গার কথায়, এ দিঘিতে ব্রাহ্মণও কোদাল বসাতে সাহস পায় না। আর অন্য জাতের হাতের কোদাল পড়লে কৈলাসনাথ সহ্য করেন কীভাবে? বলো, তুমিই বলো।'[৯৬]

ছ. ও ভগমান রে, কোন ভূতে ফির ধরিল কানাইকে; যন্ত্রপাতি কেমন বাইশার ডাড়ায় ফেলে দিছিস রে, .. ওরে ভগমান রে...।[৯৭]

উপর্যুক্ত সংলাপের ভাষায় লক্ষণীয়, হিন্দু ধর্মীয়, স্বজনমূলক ও সম্বোধনসূচক এবং সামাজিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষিত শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। ফলে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যভেদে চরিত্রের স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে তাদের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। 'মহাদেব', 'কৈলাসনাথ' 'ভগমান', 'ব্রহ্মময়ী' ইত্যাদি ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক শব্দাবলি। অন্যদিকে, সাড়াদানসূচক শব্দে 'আজ্ঞে', সম্বোধনসূচক শব্দ 'দিদি' ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় ভাষাভেদের নমুনা।

কথাসাহিত্যে মুসলমান চরিত্রের ভাষারূপ ঃ

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ পরিবেশ ও পটভূমির বিষয় বিন্যাসে রচিত কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার অন্তরঙ্গ ব্যবহারের মধ্যেও রক্ষিত হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃথক ভাষারূপ। ধর্মীয় আবহপুষ্ট শব্দাবলি খুব স্বাভাবিক ও সহজাতরূপে উচ্চারিত হয়েছে সংলাপের বাক্যবন্ধে। ফলে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যঞ্জনাময় বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

ক. 'ফুলকি, আমার পরিস্কার তহবন্দ দে, মা। ওজুর পানি দে। আমি বাবার স্থানে যাবো। আল্লাহ্‌র কাছে আমি কান্দিবো হে আল্লাহ তুমি মহিউদ্দিনের মন ঘুরায়ে দেও। ইসলামের রাস্তায় তারে আনো হে রাব্বুল আল আমিন।'[৯৮]

খ. 'অনেক মনে করে কন্যা সন্তান বড় হতভাগ্যেরই হয়, তারা ভুলে যায়, জগতে প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন– আমাদের পেয়ারা নবীর নবুয়তে প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাঁর বয়াৎ গ্রহণ করেছিলেন– কোন পুরুষ নয়, একনারী তিনি বিবি খাদিজা। ... জগতে 'প্রথম' তিনি হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লেমের কদম মোবারক স্পর্শ করে বলেছিলেন– ইয়া হযরত, আপনিই আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ, আমি আপনার মারফতে প্রকাশিত আল্লাহর খাঁটি ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হলাম।'[৯৯]

গ. 'ছুটবাউরে, অরা আল্লা–খোদার মানুষ, উমহার কথা হামার বুঝে কাম নাই। উসব কথা তোর–মোর মতন লোক বুঝিবে নাই– বরং– তই চুপ করে থাক, আর বকবক করিস না, বেশি কথা কহিলে গুনাহ হয়।'[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. 'সে নাদান নাছারা কওমের বেদীন বেদায়েতী বেশরীয়তী মুরতাদী শেরেকী কুফরী ফলানা বদকারী কামের দরুন হেলে পড়া ইসলামের পাক কেল্লায় প্যালা ঠেকানোর মহান জেহাদে হাজেরান মজলিশকে দাওয়াত জানিয়ে জেহাদী জোশে নারা তোলেঃ নারায়ে তকবীর– আল্লাহু আকবর।'[১০১]

ঙ. 'আল্লায় তগো এক ছটাক বুদ্ধি দেয় নাই, জাহেল কর‍্যা রাখছে। কও তো জাহেলে জানোয়ারে তফাৎ কী'?[১০২]

চ. 'আল্লার গজব দিতো না কিয়ার লাই, কন? ঈমান আমান নাই, খালি নাফরমানী কাম, নিজেগো মধ্যে মারামারি কাড়াকাড়ি।'[১০৩]

ছ. 'শহীদ মিনারে গিয়েছিল কসিমদ্দি, ফুল দিয়েছিল, আল্লাহ তাকে মাফ করে নাই, সাথে সাথে উঠায়া দিয়া গেছে, ফুল দিয়া সে নামতে পর্যন্ত পারে নাই, বাসের নিচে জীবন দিছে, মালেকুল মওত তার জান কবচ করছে। হেই, মুসলমান সাবধান, সাবধান, সাবধান।'[১০৪]

জ. 'আল্লা তুমি আমারে দুনিয়ার মইদ্যে দোজখ দ্যাখাও ক্যালায়? ... আমারে তুমি যত খুশি গোর আজাব করো, মগর এই দুনিয়ার দোজখ থাইকা আমারে নাজাত দাও।'[১০৫]

সংলাপগুলোর মধ্যে মুসলমান সমাজের বিশেষ ভাবাবহ ফুটে উঠেছে। আর ভাষার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রূপটির মাধ্যমেই ঘটেছে তার নিয়ামক প্রকাশ। বস্তুত ভাষা যে কোন জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক আবহেই মূর্ত হয়ে ওঠে। সেখানে ব্যক্তি, জাতির সমাজদর্শন প্রাধান্য পায়। এই বিবেচনায় লক্ষ করি, বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান সমাজে ঐক্যমিলনের সংস্কৃতি যেমন ঋদ্ধ করেছে ভাষাকে, তেমনি ক্ষুদ্র, স্থূল সাম্প্রদায়িকতাবোধের ফলে ভাষাতেও ব্যক্ত হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া। ফলে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে প্রতিক্রিয়ারও এক ধরনের বিদ্বেষীভাষাভঙ্গি। সাহিত্যেও সমাজ বাস্তবতার অনুষঙ্গারূপে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার ভাষার উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. নায়ের বাবু ঃ 'মোষের দিঘিত নালা কাটা যাবি না। মহাদেবের লিজের হাতে কাটা দিঘি, মোসলমানে কোদাল ধরলে ঠাকুর কোদ্দ হবি।'

কাদের ঃ মোসলমানের ভালো দেখলেই হিন্দুর গাও জ্বলে। ... হিন্দু জমিদার ফুটানি মারে মোসলমান প্রজার রক্ত চুষে।'[১০৬]

খ. কালাম মাঝি ঃ 'শালা মালাউনের বাচ্চা, হামার ঘরত থাকিস, আর হামারই জাত লিয়া মুখ খারাপ করিস?'[১০৭]

গ. তখনে কহিছনু, মোছলমানের দ্যাশত থাকি যাবার নয়। ভিটা-মাটি বেচে এন্ডিয়া চলো, এন্ডিয়া চলো।'[১০৮]

ঘ. 'পাকিস্তান শুধু মোসলমানের নয়, হিন্দুরও দেশ। হিন্দু ভাইগণ যদি এই দেশকে আপন মনে না করে, এদেশের মালসম্পত্তি সামান যদি উপারে পাঠায় তবে পাকিস্তানের বুকেত ছুরি মারো হয়। হিন্দু হোক আর মোসলমান হোক, এদেশের সয়সম্পত্তি নষ্ট করলে পাকিস্তানের পাকজমিনে তার জায়গা নাই।'[১০৯]

বস্তুত এই অনুষঙ্গের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে লেখকগণের সমাজ অভিজ্ঞতা। তাই সামজিক প্রেক্ষণবিন্দুতে জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বগুলোকে প্রকাশ করার বাহন হয়ে উঠেছে কথাশিল্পীদের গদ্যভাষ্য। ফলে, সমাজভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মভিত্তিক ভাষাভেদের রূপটিও।

Dhaka University Institutional Repository

বাহসরা তোর সর্বনাশ করবে। তুই ধ্বংস হবি। ফুলাও হাসে প্রেতাত্মার মতো। অবশেষে সাম্পাহান মারা গেলে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। 'ভাত রান্না করে শ্মশানের ধারে নিয়ে এল চম্পা। সঙ্গে এলো পাড়ার মেয়েরা। রান্না ভাত আর সাদা মোরগ বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হল বোঙ্গাকে। বোঙ্গা সন্তুষ্ট থাকলে সাম্পাহান টুডু ভূত হয়ে এসে উপদ্রপ করবে না।'[১৩৪]

বস্তুত শাদা মোরগ বলি দিলে মৃতব্যক্তি ভূত হয়ে ফিরে আসবে না, এবং বোঙ্গা সন্তুষ্ট থাকবে এমন বোধ– সাঁওতালদের মধ্যে রয়েছে। মারাংবুরু বা বোঙ্গা তাদের ত্রাতাও। যে কোন সংকট থেকে এই দেবতা তাদের রক্ষা করতে পারে। শওকত আলীর 'পুশনা' গল্পেও এই দেবতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সাঁওতালদের লোকবিশ্বাস। একদা সাদা চামড়ার সাহেবরা তাদের উপর অত্যাচার করায় বুঢ়া বোঙ্গা স্বপ্ন দেখালেন।

> ''মারাং বুরু আসছেন। ঘোড়ায় চড়ে আসবেন মারাং বুরু। পরনে নেঙটি, কাঁধে তার লাঠি আর সেই লাঠির মাথায় পুটলি বাঁধা। মারাং খবর ছুটে গেলো দেশ থেকে দেশান্তরে। কোথায় কোন দেশ দুমকা, ছোট নাগপুর, হাজারীবাগ সব দেশের সাঁওতালের কাছে খবর গেল।বুঢ়া বোঙ্গা খবর পাঠালেন। সেই লোক গাছের ওপর চড়ে গাছ সুদ্ধ আকাশে উড়ে উড়ে খবর দিতে লাগল।'[১৩৫]

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়, সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষের মধ্যে এই বোধসমূহ কাজ করে। বলাই বাহুল্য, সেই বৃহৎ অংশটি গ্রামকেন্দ্রিক। কথাশিল্পীদের সমাজ জীবন পর্যবেক্ষণে নিম্নবর্গীয়, মানুষের এই রীতিপ্রথা ও বিশ্বাসগুলো সাহিত্যে উঠে এসেছে। তবে পাশাপাশি লক্ষ করা যায়, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে এবং রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে লেখকগণ পরিশীলিত সাহিত্যিক রীতি অবলম্বন করায় ট্যাবুকেন্দ্রিক সমাজ ভাষার মূলসংশ্রয়গুলো পুরোপুরিভাবে চরিত্রের অনুষঙ্গী হয়ে ওঠেনি। ফলে, সমাজ কাঠামোতে ব্যবহৃত ট্যাবু কেন্দ্রিক ভাষার উপাদানগুলো একেবারে সরাসরি সাহিত্যে অন্বিত হতে পারেনি। কারণ সাহিত্য যেহেতু সার্বজনীন মানবিক আবেদনমুখ্য শিল্প। তাই সমাজভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপাদান এতে প্রতিফলিত নাও হতে পারে। তবুও কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যেমনঃ

ক. নারীপুরুষের শব্দনির্বাচনের তারতম্য; এবং

খ. নারীর অভিভাষিক বৈশিষ্ট্য।

উত্তরবঙ্গের পটভূমিকেন্দ্রিক গল্পউপন্যাস থেকেই এই বিষয়ে উদাহরণসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. নারীপুরুষের শব্দনির্বাচনের তারতম্য ঃ

ভাষা ব্যবহারে নারীরা পুরুষের তুলনরায় রক্ষণশীল। স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার কারণে কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল শব্দ নারীভাষায় খুব কম উচ্চারিত হয়। সাহিত্যেও নারী ও পুরুষ চরিত্রের ভাষা সংজ্ঞাপনে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

গঙ্গাময়ী ঃ হাঁ বুড়ো এই দেখছো তুমি। আমার চরিত্র দেখছো এখানে বসে বসে। আর আমি তোমায় ঘিউ তেল কলা দিয়ে পূজো করছি। হায় ভগোয়ান, এ বুড়ো মরে যায় না কেন গো!

বনোয়ারীলালঃ শালা বুড়ো বয়সে লেজ গজাচ্ছে তোমার। নিজের বেটির মতো বউয়ের ওপর খারাপ নজর দাও। ... এ শালা লুচ্চা, নিজের বউ থাকতে অন্যের বউয়ের দিকে নজর ছিলো। রাণ্ডীবাজি করেছে বুড়ো বয়সেও। এ শালার আদতই হলো বজ্জাতের আদত।[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

শওকত আলীর 'ফাগুয়ার পর' গল্পের এই প্রথম সল্লাপটি গঙ্গামায়ীর এবং দ্বিতীয় সল্লাপ তার স্বামী বনোয়ারী লালের। তারা বৃদ্ধ বাবাকে ভৎর্সনা করতে এমন ভাষা ব্যবহার করেছে। ফলে বানোয়ারী লালের ভাষায় স্ল্যাং শব্দ ব্যবহৃত হলেও গঙ্গামায়ীর ভাষায় শ্ল্যাং শব্দ ববৃহত হয়নি। অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ মঞ্জু সরকারের 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা' গল্পে লক্ষ করা যায়। কানাই তার জাতব্যবসা নাপিতের কাজ ছেড়ে দিতে চাইলে মা ও ছেলের মধ্যে যে বাক্যবিনিময় হয়, তাতেও নারীপুরুষের ভাষায় শব্দনির্বাচনের তারতম্য ফুটে ওঠে।

মা ঃ 'সাতপুরুষের ব্যবসা ছাড়ি দিয়া তুই কি করবু রে পাগলা? প্যাট চলবে কেমন করি? পাগলামি করিস না বাবা, সকাল যা, চাউল আনলে এলায় ভাত রাধি দেইম, গরম গরম খায়া ভোলানাথের হাটে যাইস।'

কানাইঃ চোপ নাউয়ার বেটি। ... হারামজাদী সংসার চলে না তো ছাওয়া ফোঁড়াছিস ক্যানে?'[১৩৭]

বস্তুত, পুরুষ চরিত্রে স্ল্যাং-এর ব্যবহার অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। সেই তুলনায় নারী চরিত্রে স্ল্যাং এর ব্যবহার কম। কারণ, নারীর লজ্জাশীল মানসিকতার জন্যে ভাষাবৈষম্য ঘটে।

খ. নারীর অতিভাষিক বৈশিষ্ট্য ঃ

অতিভাষিকতা (Paralinguistics) নারীর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও ধ্বনি কোমলতা, স্বরের প্রলম্বিত লয়, এবং বচনের দৈর্ঘ্যও বেশি থাকে। যেমন আব্দার বা বায়না করার সময় তারা বিলম্বিত লয়ে কথা বলে ঃ

– 'দা– ও – ও না?'

– 'ব – অ – লো – না।'

বিস্ময় প্রকাশেও প্রারম্ভিক স্বর উঁচু লয় থেকে পরে নিম্নস্বর হয়।[১৩৮] যেমনঃ 'আ–আ –রে–এ– এ।'

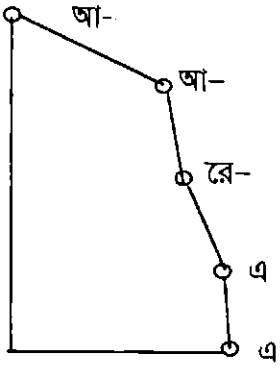

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নারীর মানসিকতামূলক (mentalism) প্রয়োগ পদ্ধতির ফলশ্রুতি। কথাসাহিত্যেও নারীচরিত্রের ভাষায় এরূপ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

ক. মা ডাকতোঃ 'বেনুউউট খেতে এলিনিই...'

ঃ 'এই তোও ওও ....।'[১৩৯]

খ. ঃ হায় রে নিব্বুংশে খরা! টুকুন ম্যাঘ নাইখ ই ভর জ্যাষ্ঠিতে! ভুঁইমন্ডল জ্বল্যা খাক্!

ঃ এ মা গে, পানি দে। মা গে পানি দে। লইতো মাই দে। গলাটে দুখাইছে মা গে!

ঃ কী তেষ্টা গ! বুক জ্বল্যা গেচে! দে ... দে ... জানট্যে দে-- খাই--- খায়্যা জুড়্যাই-- আঁ--- আঁ, ইত্যাদি।[১৪০]

Dhaka University Institutional Repository

থাকে সারাটা বিলজুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাকে যদি একনজর দেখা যায়– এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আকাশের মেঘ খেদায়।[১২৫] লক্ষণীয়, এই অলৌকিক সত্তার প্রতি এক ধরনের মোহগ্রস্ত বিশ্বাস নিয়ে উপন্যাসের গ্রামীণ চরিত্রগুলো ঘটনার গ্রন্থিতে জড়িয়ে যায়। বলা যায়, ট্যাবু এ উপন্যাসে একধরনের অ্যাবসার্ডরীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। খোয়াবনামার ঘটনায় জানা যায়, একদা সন্ন্যাসীদের থানে উচ্চবর্ণ জমিদার হিন্দুরা পূজা করতেন না। সেটা ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু জমিদারের নায়েব নিম্নবর্গীয় হিন্দু কামারদের বলে– 'এখন আমাদের দরকার এক হওয়া। জমিদার বাবু এখন থেকে সন্ন্যাসীর স্থানে দূর্গাপূজা করবেন। জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব হিন্দু সেখানে মিলিত হবে, ভক্তিভাবে মিলিত হবে। মুসলমানদের দেখে না, ঈদ ফিদ কি সব হলে সব পালে পালে জুটে যায় ময়দানে। সেখানে কি তোমাদের ঢুকতে দেয়।'[১২৬] অর্থাৎ পরস্পরের ধর্মস্থান পবিত্র বলে কেউ কারো ধর্মস্থানে প্রবেশ করে না। সেখানেও নিহিত থাকে অমঙ্গল বা অশুভ আশঙ্কা।

অনুরূপ পবিত্র আত্মার প্রতি অসম্মানের জন্য অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় মঞ্জু সরকারের 'নগ্ন আগন্তুক' উপন্যাসেও। ধারণা করা হয় তিস্তা নদীর 'রহমতের চর' নামক গ্রামটিতে বেধর্মী পাপাচারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে তাই আল্লাহ একজন নেকবান্দাকে এই চরে পাঠিয়েছে।[১২৭] কিন্তু গ্রামবাসী নবাগত উলঙ্গ মানুষটিকে নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাকে তাড়িয়ে দিতে যায়। আবার কেউ কেউ তাকে পবিত্র আত্মা জ্ঞান করে। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীর অলৌকিক বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বর বিশু মন্ডল শোনায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

> 'অনেক দিন আগের কথা। এক হাটের মধ্যে আসলেন এরকম এক ল্যাংটা মানুষ। লোকে ভাবল পাগল। সেই ল্যাংটা পাগল আস্তানা গাড়লেন হাটের কাছেই, এক বটবৃক্ষের তলায়। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না তিনি, খেতেন না কোনো কিছু। তা একবার হলো কি, দেশে আসল এক জবর খরা। সেই খরায় ক্ষেতের ধান পুড়ে ছাই, মাটি ফেটে খাঁক, মেঘের তবু দেখা নাই। গ্রামের মানুষ আল্লাহারে কতো ডাকল, ব্যাঙের বিয়ে দিল– বৃষ্টি তবু নামল না। শেষে কয়েকজন মোমেন মুসলমান গেল সেই ল্যাংটা দরবেশের কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পায়ের উপর। ও বাবা, পাপিষ্ঠ আমরা, খোদাতালা নারাজ, আপনার দোয়া ছাড়া আর উপায় নাই। বাবা মাথা নাড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে রোদ-জ্বলা লাল আসমানে উড়ে আসল কালো মেঘের পাহাড়। বাবা হাসলেন। অমনই বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে, তারপর মেঘ গলে এক হাঁটু পানি নামল পৃথিবীতে।[১২৮]

বিশা মন্ডল তার অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামবাসীকে সাবধান করে দেয় যেন নগ্ন আগন্তুককে কোন অসম্মান না করে। গ্রামের যুবকদের উদ্দেশ্যে বিশা মন্ডল সাবধান বাণী উচ্চারণ করেঃ 'ও হানিফ, লুক না চিইনা যা-তা কইও না। ক্ষতি হইব তোমার। আমার মন ডাকি কবার লাগছে বাহে, এ পাগুল যে সে লোক নয়। দক্ষিণ দ্যাশে মাছের পিঠেতে চড়ি এক আউলিয়া আইছিল, মানুষ তারে পয়লা চিনবার পারে নাই। অহন সে আউলিয়া মাজারে কত ভিড়, তেনার উরস শরীফে লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় ফিবছর।[১২৯]

গ্রামের অপর যুবক হানিফ এই প্রসঙ্গে আরো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গ্রামবাসী কাছে। সেখানেও পবিত্র ব্যক্তির প্রতি অসম্মানের জন্যে চরম শাস্তির উদাহরণ বিবৃত করে। 'দূরান্তের কথা কন ক্যানে চা' জি,

Dhaka University Institutional Repository

হামার জেলার টাউনেও সিনেমা হলের সেই ল্যাংটা দরবেশ নিজের চক্ষে দেখেছি আমি। সিনেমা দেখতে আসি একজন লাথি দিছিল সেই ল্যাংটা দরবেশকে। তারপর বাড়ি গিয়ে দেখে তার পুরুষাঙ্গ নাই। এ ঘটনা কেনা জানে? তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী মিলেটারীরা যখন সেই ল্যাংটা দরবেশকে মুক্তিফৌজ মনে করিয়া গুলি করল, পুরষাঙ্গ খসি পড়িয়া কাটা মুরগির মতো দাপায় মরি গেইছে সব মেলেটারী।'[১৩০]

প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার সমাজমানসে বদ্ধমূল ধারণা রূপে গণ্য হয়ে থাকে। এমন কি, বিভিন্ন মহামারীর মূলেও অশুভ অদৃশ্যশক্তির ইঙ্গিত থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। এমন আর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে 'নদীর নাম তিস্তা' উপন্যাসে। নদীর খেয়াঘাটের চালা ঘরে ঘুমিয়ে থাকে অধর পাটনী। একদিন রাতে পাটের শনের মতো পাকা চুলের থুথড়ে বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে এসে তাকে জাগিয়ে বলে নদীর ওপারে পার করে দেবার জন্যে। কিন্তু রাতদুপুরে অধর পাটনী তাকে নদীপার করতে সম্মত না হলে বুড়ি তাকে বাধ্য করে। 'অধরের দিকে অপলক চোখ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বুড়ী। অধর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে আসে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ত, কিন্তু পরক্ষণেই বুড়ী অভয় দিয়ে বলেছিলঃ যা তোর ভয় নাই। হামি এ্যালা ডাটেয়া পাড়া যামো। ওটে যাবার আগৎ জোলাপাড়াটা একবার দেখি যাই।'[১৩১] কয়েকদিন পরের এক রাত্রিতে সেই কলেরা বুড়ী জোলাপাড়া থেকে ডাটোয়াপাড়ায় ঢুকতে দেখে কুলসুমের দাদী। ডাটোয়া পাড়ায় নকুর বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াছিল। ''মনে মনে আল্লাহর নাম জপ করতে করতে ঘরে এসে দরজায় খিল এঁটে দিয়েছিল কুলসুমের দাদী। রাতেই ভেদবমি শুরু হয়েছিল নকুর বউ-এর। সকালের মধ্যেই সব শেষ। তারপর শুরু হয়েছে নকুর ছেলে দুটার।'[১৩২]

মধ্য রাত্রিতে এমন আর অশুভ পিশাচের খপ্পরে পড়ে মঞ্জু সরকারের 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' গল্পের নায়ক মফিজ মাছুয়া। চড়কবিলে ভয়ঙ্কর পিশাচের অস্তিত্ব নিয়ে এলাকায় কিংবদন্তী রয়েছে। এই পিশাচের খপ্পরে পড়লে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে। এমনকি মফিজ মাছুয়ার স্ত্রীকে এই পিশাচ শাসিয়েছে যে, তার হাড় রক্ত মাংশ সব খাবে। কিন্তু মফিজ মাছুয়া গভীর অন্ধকার রাত্রিতে বিলে মাছ ধরতে এসে এই পিশাচের কবলে পড়ে। বৃষ্টির তীব্র ছাপটায় সে মাঝ রাত্রিতে জনশূন্য বিলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললে–

> ''মফিজের আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, বিলের সেই কিংবদন্তীর ভয়ংকর পিশাচটির কবলেই পড়েছে সে। মাছের লোভ দেখিয়েই কি খবিসটা এমন বর্ষার রাতে তাকে নিধুয়াপাথারে ডেকে এনেছে? পরিচিত মানুষের গলায় সে মাছুয়া মফিজের নাম ধরে ডেকেছিল? নাকি স্ত্রীর শরীরে ভয় করায় মফিজ তাকে বোতলে ভরতে চেয়েছিল বলেই এমন প্রতিশোধ? কানের কাছে নাকি সুরে কথা বলছে কে? তোর রক্ত খাইম, তোর কলিজা খাইম...।'[১৩৩]

হিন্দু মুসলমান সমাজের চেয়ে ট্যাবুর বিশ্বাস সাঁওতাল সমাজে বেশি। রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের ট্যাবুর পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতালদের সব শুভশক্তির দেবতা হচ্ছে বোঙ্গা দেবতা। তাই যে কোন অমঙ্গল অশুভ থেকে মুক্তির জন্যে বোঙ্গার পূজা দিয়ে থাকে। এই উপন্যাসে সাম্পাহান সাঁওতালকে সাপে কাটলে কড়িচালান দেয়া, মন্ত্রপড়ে বিষ ঝাড়া হয়। কিন্তু সাপ আসে না বিষ তুলে নিতে। মা বিষহরির মন্ত্র পড়ে বাগুরা বেসরা। ফুলাও একটি অনিষ্টকারী চরিত্র। সবার ক্ষোভ ফুলাও এর ওপর। মারাঙী বুড়োই বলে– 'এল–হেই ফুলাও। তুই কেন এলিরে। মহৎ যে তোকে খাগড়াবনে আসা নিষেধ বলেছে' এবং বাগরা তাকে অভিশাপ দিয়ে বলে, 'হেই ফুলাও ধ্বংস হয়ে যাবি। বিষহরীর

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মানসিকতামূলক এই ধরনের বাক্যরীতিকেও সমাজভাষাতত্ত্বে ট্যাবু বলে গণ্য করা হয়। তবে স্বামীর নাম বা বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম উচ্চারণে জড়তা, গোপন ভাষা সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা নারীর এই ধরনের নিষিদ্ধভাবাচক দিকগুলো ভাষাতত্ত্বের ট্যাবুরূপে গৃহীত। কথাসাহিত্যের চরিত্রের ভাষা ব্যবহারে একেবারে এইসব তত্ত্বসূত্র মেনে লেখকগণ সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। বলা যায়, সমাজ অনুষজ্ঞারূপে চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতার বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে ঔপন্যাসিক বা গল্পকারগণ এই ধরনের সমাজ অনুষজ্ঞী ট্যাবু বা ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। উত্তরবঙ্গের পটভূমিপ্রধান কথাসাহিত্যেও এই ডিসকোর্স নতুন মাত্রা পেয়েছে সন্দেহ নেই।

৫.০৮ কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের লোকজশব্দ ও ফোক-মোটিফ ঃ

উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটনির্ভর কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নানা মাত্রিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষত স্থানিক সমাজমানসের মধ্যে প্রবহমান ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-প্রথা সংস্কার ইত্যাদি মিলিয়ে কথাসাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রাকৃতজীবনের উপাসক। এর মধ্যে ফোকলোর বা লৌকিক জীবনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে বর্তমান প্রসঙ্গে তারই অন্বেষণ এই আলোচনার লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গের লোকায়াত সমাজমানস ও লোকজভাষিক শব্দরূপ সম্পর্কেও একটি বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রয়েছে- এই আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, কথাসাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের দুটো ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমত লেখকের বিবৃতি অংশ (narration) দ্বিতীয়ত চরিত্রের সংলাপের (dialogue) অংশ।[১৪১] বিবৃতিমূলক ভাষ্যে কাহিনীর বিষয়বস্তু রূপ পায়। অন্যদিকে, চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে ফুটে ওঠে নির্দিষ্ট সমাজমানসের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ। এই সব অনুষঙ্গে বিবৃত হয় লোকায়ত জীবনের স্বরূপ এবং লোকজ ভাষার শব্দরূপও স্থান করে নেয় প্রধান অনুষজ্ঞারূপেই। মোটকথা, 'কাহিনীর বর্ণনাস্রোতে উপভাষার ততটা স্থান নেই, যতটা আছে সংলাপে।'[১৪২] বলা বাহুল্য, চরিত্রের মুখে এই ধরনের সংলাপ ব্যবহারের মূলে লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্যে সক্রিয় থাকে, তা হচ্ছে গ্রামীণ বা এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে রূপায়িত করা। সমালোচকের ভাষায়ঃ 'A regional writer is on who concentrates much attention on a particular area and uses it and the people who inhabit it as basis of or his or her stories. Such a locale is likely to be a rural and or provincial.'[১৪৩]

সুতরাং আমাদের কথাশিল্পীগণ উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীকে রূপায়িত করতে গিয়ে চরিত্রের সংলাপে লোকজশব্দ এবং ফোক-মোটিফ গূঢ়তর তাৎপর্যে অঙ্গীকার করে নেন। লক্ষণীয়, স্থানিক জীবনের ঘনিষ্ঠরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকগণ শুধুমাত্র চরিত্রের সংলাপেই নয়, কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গিতেও ক্ষেত্র বিশেষে লোকজশব্দ ব্যবহার করেছেন। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক. লেখকের বর্ণনাভিত্তিতে লোকজশব্দের ব্যবহার;

খ. চরিত্রের সংলাপে লোকজ শব্দের ব্যবহার;

গ. ফোক-মোটিফ-এ লোকজ শব্দের ব্যবহার।

উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটসন্ধানী কথাসাহিত্যে ফোক মোটিফ এর বিভিন্ন শাখায় বিচিত্র বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রবাদ-প্রবচন

২. লৌকিক সংস্কার

৩. লোক সঙ্গীত

৪. তন্ত্রমন্ত্র ও লোক চিকিৎসা

পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো। উত্তরবঙ্গীয় লোকায়ত সমাজজীবনের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গগুলো এতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক. লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে লোকজ শব্দের ব্যবহার ঃ

আঞ্চলিক বর্ণিমা পরিস্ফুটনের জন্যে লেখকগণ কাহিনীর বর্ণনারীতিতে লোকজ শব্দের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লোকজ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আঞ্চলিক অবস্থাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। যেমন ঃ

১. সাতজন খানেওয়ালা। কামাই-এর মরদ একা ওই। (শা. হ., ভস্তার বিল, পৃ. ৭)

২. নেদু উপুড় হয়ে ডহরের মধ্যে হাত দিয়ে মাছগুলো ঠিক করে রাখছে। (ঐ/ পৃ. ২০)

৩. কিন্তু বিল ডাকবার পর এ গ্রামের মৎস্যজীবীদের বিল 'ব্যাছ' দেওয়া যাবে না, অন্য জায়গা থেকে নতুন লোক এনে কাজ করাবে তা এখনও কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। (ঐ/ পৃ. ১২২)

৪. কিছু বাঁশের খলপাও পেতে দেওয়া হয়েছে। ... একটা মাটির 'ভাঁড়ে' এক 'টিমা' তামাক, কয়েকটা 'হুঁকো' এক 'মালশায়' আগুন। (ঐ/ পৃ. ১২২)

৫. ঝুনিয়া, টুরি, গাঙনি- ওরা তো ছিলোই 'ডবকা ছুঁড়ি' পেত্যঁ পর্যন্ত নাচের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। (শ. আ./ 'পুশনা', স. গ. পৃ. ৫৪)

৬. 'সুচন্দ 'গপগপিয়ে' কয়েক গ্রাস ভাত খেতে এক গ্লাস পানি খায়। ... সুখিয়া হাজার রকম কথা তুলে 'বকবকিয়ে' যাচ্ছে। (সে. হো./ কাঁটাতারে প্রজাপতি', পৃ. ৯০)

৭. 'তমিজের বাপ সন্ধ্যারাতে বসে ভাত খাচ্ছে, 'ল্যাম্বোর', কালচে আলোয় ঘর একটু থমকে ছিল..।' (আ. ই./খোয়াবনামা'/ পৃ. ১৯)

৮. 'তবে 'বারোভাতারি খানকি খিদেকে' কাবু করবার কায়দাও কুলসুমের জানা আছে।' (ঐ/ পৃ. ২৪)

৯. ''তমিজের বাপের সঙ্গে বিয়ের কতো আগে থেকে কালাম মাঝির বাঁশ ঝাড়ের ভেতর ছাপরা ঘরে থাকতেই তো তার থাল-বাসন, 'ধোয়াপাকলা' কাপড় কাচা, মুখ ধোয়া, 'হেগে ছোচা', গোসল করা সবই তো হয়েছে এই ডোবাতেই।'' (ঐ/ পৃ. ২৫)

১০. 'বাহাউদ্দিন ডান চোখের 'কানচি' দিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।' (আ. সি./ 'খরাদাহ', পৃ. ৪২)

১১. কাহারদের গলা শুনে মসিদ খার দামী বাঁদীরা 'বারদুয়ারে', গোঁত্তা খেয়ে পড়েছিল বড় দ্যাখার জন্যে। .. কনে বাড়িতে দাঁড়িয়েই তারা পিচকেটে পানের পিক ফেলার সাথে সাথে 'গুদগুদানি' লাগিয়ে দ্যায়..। (ঐ/ পৃ. ৪৭)

১২. 'বেচারার কী ন্যালাভোলা 'চেহারাছুরৎ' খুলেছে গোবেড়েন খেয়ে।' (আ. সি./ 'দোররা', 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ, পৃ. ৪৪)

১৩. 'শীতের রোদ 'ভাঁটিবেলার' দিকে নিস্তেজ স্বভাবত।' (ঐ/ পৃ. ৪৫)

১৪. 'বানে মরতুং বিষ্টিতে বিষ্টিতে গা ভাসতোক, লায়ে চোড়তুং, তেবেও আবাদ দিল-এবংপ্রকার, শব্দাবলী উচ্চারণ করে তারা...।' (ভা. চৌ./রক্তপাতের ব্যাকরণ', পৃ. ১০)

১৫. ফি-সন কার্তিক মাস ভো কামলাদের কাছে আকালের মাত্রই। কথায় আছে 'ভাদরমাসী কুত্তা' 'মাঘমাসী জাড়' আর 'কাতিমাসী মঙ্গা। (ম.স./ 'মঙ্গাকালের মানুষ/ পৃ. ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

খ. চরিত্রের সংলাপে লোকজ শব্দের ব্যবহার ঃ

আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকের বড় নিয়ামক শক্তি হলো তাঁর অভিজ্ঞতা। সমালোচকের মতে, 'The artist must strick to his range'.[১৪৪] অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচিত মানুষ ও তাদের মুখের ভাষা যথাযথভাবে পরিস্ফুট করতেও শিল্পীর দায়বদ্ধতা রয়ে যায়। বাংলাদেশের কথাশিল্পীরা উত্তরবঙ্গের স্থানিক চরিত্র ও স্থানিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতোপূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লোকজ শব্দ প্রধান কয়েকটি সংলাপের উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এইসব সংলাপে উত্তরবঙ্গের লোকজ শব্দের বিশিষ্ট রূপ ও বিশেষত্ব প্রকাশ পায়।

১. 'এই নেদু, 'ক্যাওড়া' হালটা দে।' (শা. হ./ ভস্তার বিল, পৃ. ৮১)

২. 'এই শের, আসার সময় নৌকা থেকে 'ট্যাটাটা' নিয়ে আসিস।' (ঐ/পৃ. ৮৬)

৩. মোর ঘরটাত এনা 'কাদোর ন্যাপ' দিবা নাগবে। (ত. হো./ 'মহুয়ার দেশে', পৃ. ১৭)

৪. না, 'পাইট' খাটপা মুই পারিম না। .. 'মাগ্লা' খাটি দেইস তুই ওমার বাড়িত মাঝে মাঝে'। (ঐ/পৃ. ৪০)

৫. 'পী লে বাপু, যেত্তা তুহার দ্দি চাহে।' (শ. আ/ফাগুয়ার পর', স, গ. পৃ. ৩৭)

৬. 'তোর ঘরে তো 'দাকা' শুধু খা ওখানে বসে বসে। .. শিকারের 'জিল' আর কোথায় পাবি?' (ঐ/ পৃ. ৫২)

৭. 'কেমন করে যিশুর জন্ম হলো 'জাড়ের দিনে, আকাশে মস্ত তারা উঠেছিল, যিশু 'মায়েশ' চরাতে আঠে।' (ঐ/ 'রানীগঞ্জ অনেক দূর' /পৃ. ২০৩)

৮. 'হ্যা, এট্যাই খাঁটি হাঁর ভালোবাসার বাড়ি। ঐ তো ঐ হাঁর ভালোবাসা কাঁকালে কলসি কৈর‍্যা নদীতে পানি আনতে যাইছে।' (সে.হো/ কাঁটাতারে প্রজাপতি/ পৃ. ৪২)।

৯. মা, ঘরত কি কিছু নাই? খুব 'তোক' নাগছে বাহে, দুইদিন কিছু খাও নাই।' (ম. স. /মঙ্গাকালের মানুষ, পৃ. ১৪)

১০. ক্যারে কুলসুম, 'আত্রে' ঘরে দুয়ার দিস নাই? কাল তালতলাত হাঁটুপানি জমিছিলো রে, তাই ঘুর‍্যা তোর ঘরের খুলির উপর দিয়া গেনু। তোর দুয়ার দেখি খোলা? 'ভুলকি' দিয়া দেখি তুই নিন্দ পাড়িচ্ছু।' (আ.ই. /খোয়াবনামা, পৃ. ২৬)

১১. হাসান হামার ব্যাটা যদি না হয়, সম্পত্তি তাঁই পাবার নয়, উপায়ে' লাগিয়া হামার ব্যাটার বউ হামার উপরে ক্ষিপ্ত হয়া এমন কথা কইছে যা হামার মতো পাপীও মুখে 'আইনতে' থরথর করি কাঁপি উঠে। (সৈ. শা. হ/গুপ্তজীবন প্রকাশ্য মৃত্যু', গ. স./পৃ. ৩৬২)

গ. ফোক্-মোটিফ ঃ

কথাশিল্পীরা নিজ দেশ সমাজ ও ভৌগোলিক জনজীবনকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে লোকায়ত সংস্কৃতিকেও সাহিত্যের অন্যতম উপাদান করে নেন। তাই লোকায়ত উপাদানগুলো সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই জন্যে অতিশয় নিষ্ঠা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনচর্চায় কথাশিল্পীদের মধ্যেও লোকসাহিত্যে মোটিফ সম্পর্কে বলা হয়ঃ 'A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In orer to have this power it must have something unusual and striking about it.'[১৪৫]

লোককাহিনীর অন্তর্বয়বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একক (unit) কে মোটিফ বলা হয়। থম্পসনের মোটিফ সূচী অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে B (জীবজন্তু) এবং G (অলৌকিক) শ্রেণীভূক্ত মোটিফের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'দূরত্ব' এ গরু (জন্তু) ও অলৌকিক শক্তি দুই-ই প্রকাশ পায়। শওকত আলীর নবজাতক ও ভবনদী গল্পে জীবরূপে গরু-এর মোটিফ ব্যবহৃত। সাপের

Dhaka University Institutional Repository

মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে শওকত আলীর শুন হে লখিন্দর' গল্প ও রিজিয়া রহমানের একাল চিরকাল উপন্যাসে। বস্তুত লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান প্রবাদ প্রবচন, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীতের ব্যবহার কথাসাহিত্যের ডিসকোর্সে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ উদ্ধৃত হলো।

১. প্রবাদ প্রবচন (idioms) ঃ

ক. 'নরম কাঠে ছুতারের বল।' (ভস্তার বিল/ পৃ. ৯)

খ. 'হাজার ইঁদুর মেরে বিড়াল যাবে হজ্বে।' (ঐ/ পৃ. ১১৯)

গ. 'বাঘের মাথায় গোস্তের ডালি।' (ঐ/ পৃ. ১২৮)

ঘ. 'চোরের দশ রাত্রি, সাউদের একরাত্রি।' (ঐ/ পৃ. ১২৮)

ঙ. 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।' (ঐ/ পৃ. ১৪৬)

চ. 'ঘাস ছাড়া গরু আর অন্য কিছু বোঝে না।' (শওকত আলী, স. গ./ পৃ. ৫১)

ছ. 'বাঁটু মানুষক বিশ্বাস নাই। ... বাঁটু লোক খোদারও দুশমন।' (ঐ/ পৃ. ২১৩)

জ. 'দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা, পরদুয়ারি তার প্রজা।' ('খোয়াবনামা', পৃ. ২৪)

ঝ. 'পুরানা চাল ভাতে বাড়ে।' (ঐ/ পৃ. ৭১)

ঞ. 'বৌ হলো ডালভাতের থালি। রসের হাঁড়ি জোয়ান শালি।' (ঐ/ পৃ. ১৬৩)

ট. বানেতে ভাসিল ধান না ভাঙিও মন
পেয়াজরসুনে হইবে দিগুন ফলন।' (ঐ/ পৃ. ২৩৭)

ঠ. 'আড় মাছে পাড় দেয়, বেলে মাছে এলে দেয়।' (ঐ/ পৃ. ৩২৩)

ড. কুন্ লদ্দীর পানি কুন লদ্দীতে বহায়?
হাড়ে মাসে চিনি হামি।
বুল্যে,– সানকিতে ভাত বধনায় পানি।
তোর কুলের খবর সব হামি জানি।।
হ্যাক কর্যা ফেলনু কাশ।
অতে জরমিলো কৈবত্ত দাস।। ('ছায়া প্রধান অঘ্রাণ'/ পৃ. ৪৫)

ঢ. 'ভাত দেওয়ার মুরদ নাই কিল দেওয়ার গোঁসাই।' (মজ্ঞাকালের মানুষ/ পৃ. ৫৯)

ণ. ইন্দুরে খাইলো ধান বড়ো কুদা বাত।
জানিয়া রাখিও বান্দার কমিলো হায়াৎ।। (খোয়াবনামা/ পৃ. ২২৮)

২. লৌকিক সংস্কার (Folk-Reformation) ঃ

ক. কালকে যেয়ে তুরখুন সাহেবের দরগায় পাঁচটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসিস। ('ভস্তার বিল'/ পৃ. ৬৭)

খ. ও ফকির, কওতো, পাছারাতে দেখলাম, হামাগোরে কুয়ার পানি ক্যামা গরম ঠেকিছে। বালটি দিয়া তুল্যা গাও ধোমো, পিঠোত পানি ঢালিচ্ছি, তামান পিঠ জ্বলে পড়্যা গেলো গো। এই খাবের মাজেজাটা কি কওতো বাপু। (খোয়াবনামা'/ পৃ. ২৮)

গ. 'তিন মাস আগেও পীর সাহেবের, মহাস্থানের শাহ সাহেবের পানিপড়া নিয়া আসিছি দুইবার, সাড়ে চার আনা দিলাম মাজারত....।' (ঐ/ পৃ. ৭৭)

ঘ. 'শূন্যের সঙ্গে ডিমের সাদৃশ্য থাকায় হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার কয়েকটা দিন ছেলেকে স্কুলে যাবার সময় ভাতের সঙ্গে ডিম দেয়নি।....।' (ঐ/ পৃ. ৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. 'হামাগোরে আলাদা জামাত হানাফির গোরস্থান, হামার দাদা পরদাদা তার পরদাদা সোগলি এটি আছে। মোমবাতি হামাক দেওয়ায় লাগিবে।' (ঐ/ পৃ. ১১৫)

চ. 'ফকির মনে হয় কাল নাতনির ওপর আসর করিছিলো।' (ঐ/ পৃ. ১৫৬)

ছ. 'জীবন কি মায়াময়– কেহ তুমার নহে বাহে– স্বামী নহে স্ত্রী নহে সন্তান নহে– তুমার জবাব কেহ দিবে নাই রোজ হাশরের শেষ বিচারের দিনে। কেহ চিনিবে না। খালি একজন চিনিবা পারে। সে হইল আমার মুরশিদ। মুরিদ–মুরশিদের সম্পর্ক একদিনের নহে....।' (শ. আ./স. গ. পৃ. ২৯৫)

জ. 'ধলা ফুলের বাসনা কম, ধলা গরুর দুধ পিঠা কম, ধলা মেঘে পানি নাই।' (শা. আ./স. গ. পৃ. ২০০২)

ঝ. ঃ 'তাহলে তো, মাছ ধরবে না জালে। পূর্ণিমা কবেরে?

ঃ আর সাতদিন পর।'

ঃ পূর্ণিমার পরে আর মাছ পড়বে না জালে। (ভস্তার বিল/ পৃ. ৪৯)

ঞ. 'রামচন্দ্রপুরের হাটের বাড়িতে প্যাচা ডাকলে ওর শাশুড়ি কুপির আলোতে লোহা পোড়াতো। বলতো, প্যাঁচার ডাক অশুভ। লোহা পুড়িয়া দিলে অমঙ্গল দূর হয়।' (সে. হো./ 'কাটাতারে প্রজাপতি', পৃ. ২২৯)

৩. লোকসঙ্গীত (Folk Song) ঃ

উত্তরবঙ্গে জনজীবনে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত প্রচলিত। ভৌগোলিক সংস্কৃতি ও জাতিগত সংস্কৃতির কারণেও বিভিন্ন ধরনের লোকগান প্রচলিত আছে। কথাসাহিত্যেও তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমনঃ

ক. সাঁওতালী গান ঃ

১. দেশ চঙ আচুরেন, জা গো মাঞ তুদে দএ রাগে কান।
দিশম চঙ বিহুরেন্ জা গো মাঞ গো ঞ্যমে দত্র সাহেদা।।
আচুর তে হুঁ আচুরেন্, জা গো মাঞ তুদে দত্র রাগে কান।
বিহুর তে হুঁ বিহুরেন্ জা গো মাঞ গো ক্রুৎমে দত্র সাহেদা।।
('মহুয়ার দেশে' /পৃ. ১০)

অর্থাৎ, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে তাই আমাদেরও জাগতে হবে। পৃথিবী ঘুরছে আমাদেরও চেতনা জাগ্রাত হতে হবে। পৃথিবী ঘুরছে মাদলের তালে তালে আমরা শুনতে পাই।

২. 'দাই না দাই মারাং দাই, ফেলা সে দাই না ওডোং লেন্মে।
হাথি লেকান্ পরব দাই না, দারাকান্ দ।।
দাই না দাই মারাং দাই, দেলা সেদাই না ওডোং লেন্মে।
হাথি লেকান্ পরব দাই না, আতাং আদেরমে।। (ঐ/ পৃ. ১৪৫)

অর্থাৎ, বড় বোন তুমি বেরিয়ে এসে দেখো, বিশাল হাতির মতো উৎসব আসছে।

৩. 'আপে ওড়াঃ বেহাই শাউড়ী ওড়া
আলে ওডাঃ বেহাই খাপার ঘারা
হোত্রতে দাগ্দ রেবেড়ু রেবেড়ু সাড়ে আ,
পুরুষাই হোত্ররেদ বেয়াড় গি আ।' (ঐ/ পৃ. ১৫২)

অর্থাৎ, বিয়াই তোমাদের বাড়ি খড়ের তৈরি, আমাদের বাড়ি টিনের। ঝড় বৃষ্টির সময় ঝম্ঝম্ শব্দ হয়। পূর্বদিক দিক থেকে বাতাস এলে আমাদের শরীর জুড়িয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'সাক্তিাঞ্ দিশম্ পোড়ামাকো,
হেঃ ই আকান দুড়ুপ আকান।
মিরু ঢোন্টা হুকামাই আগুইমে,
গরুড় জাঙ্গা নল মাই
তিউইঞ দারাত্রমে।।' (ঐ/ পৃ. ১৫৬)

অর্থাৎ, দূর দেশ থেকে আমি একজন অতিথি এসে বসেছি। টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো হুকা এবং গড়ুর পাখির পায়ের মতো নলটা সঙ্গে নিয়ে এসো।

৫. পিরীত পিরীত, পিরীত হিলি হো
পিরীত দো হিলি হো লাইঞ মাসে হো
... ...
যাহা তিনরেম উইহার লেখান
উইহার লেখান দোদু মেঁত ডাক জুরুয়া।।
('একাল চিরকাল'/ পৃ. ২৯)

অর্থাৎ, আমি যেখান থেকে আসি তুমি জিজ্ঞেস করো প্রেম কি জিনিষ? ও বউদি! তুমিই বলে দাও প্রেম কি জিনিষ?

৬. হায় হায় জলপুরী বে
হায় হায় নুকীন মানেবা
হায় হায় বঁসার আঁকাকীন
হায় হায় নুকীন মানেবা।। (ঐ/ পৃ. ৬৯)

অর্থাৎ, হায় হায় এই অথৈ জলের মধ্যে এ মানব জাতি বসে আছে। হায় হায় ওরে মানব জাতি।

খ. **পুঁথি প্রভাবিত গান ঃ**

১. শোনো শোনো শোনো রে ভাই হিন্দু মোসলমান।
মোহাজেরের দুস্কু কিছু কবির বয়ান।।
বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত মোহাজের।
পাকিস্তানেতে তারা হইয়াছে হাজের।।
... ...
আল্লা ও রসুলে তারা রেখেছে ইমান।
ইমান রাখিতে গিয়া দিল শত জান।। ('খোয়াবনামা'/ পৃ. ৩০৬)

২. কাফের হস্তে মায়েবোনে হারালো ইর্জত।
সব্বোশ্রান্ত হইয়া হেথায় করিলো হিজরত।।
হেথা হইতে যায় চলিয়া হিন্দু ভাইগণে।
মাতৃভূমি ত্যাগে বড়ো দাগা পায় গো মনে।। (ঐ পৃ. ৩০৭)

৩. ফকিরে সোয়ার দেখে কালনিদ্রাবশে।
কাঁপে পানি ফাটে খাক ফোঁসায় আতশে।।
দুনিয়ায় যাহাদের জনম মরণ।
বুকে বল নাহি দেখে এমত স্বপন।। (ঐ/ পৃ. ৩১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'জন্মিলেন আল্লাহর নবী পিতৃহারা হইলেন
হইলেন এতিম নবী হামার বয়েসে
তবুও অল্লাহর নবী বাঁচিলেন বটে
মানুষ মারিলো পাথর, বুদ্ধি নাইকো ঘটে....।' (ভা. চৌ./সীমাংসা পর্ব পৃ. ৪২)

৫. আসমানে সাজিল মেঘ হাতির হাওদা।
ঘরেতে বসিল মজনু জপে আল্লাহ খোদা।
সাগরেদ না বাহিরিও মাস দুই কাল।
পানির বেগানা পথে নসিব কাঙাল। (খোয়াবনামা/পৃ. ৩৪)

৬. দশনামী প্রভুগণে বন্দিয়া পবিত্র মনে
গিরিসেনা দাঁড়ায় কাতারে।
ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি মনে
গোরা কাটো আদেশ হুঙ্করে। ('ঐ'/ পৃ. ৪৩)

৭. বিসমিল্লা বলিয়া শুরু করে কেরামত।
ভারতবাসীর উপরে আল্লা কর রহমত– শুন সব্রজনে
শুন সব্রজনে শুর্ধ মনে হিন্দু মোসলমান। (ঐ/ পৃ. ১৪৫)

গ. ছড়াগান ঃ

১. 'এক মুঠ সরিষা, এক মুঠ রাই
বুনতে বুনতে বাথানে যাই
বাথানে আছে কপিলা গায়
কপিলা গাইয়ের দুধ খায়
দুধু খাইয়া ঘুমাতে যাই।' ('মীমাংসা পর্ব'/ পৃ. ৩৬)

২. পাছপলানি কান্‌দে।
পাশমারানি ফান্‌দে।।
টান দে যাদু টান্‌ দে।
কোপা বৈঠা টান দে।।
মাথার পরে মাবুদ ভাই
নায়ের গোড়ায় বদর সাঁই।। ('ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ'/ পৃ. ১০০)

৩. তানার লানতে মাটি ফাটিয়া চৌচির।
নবস্রোত তালাশিয়া দরিয়া অস্থির।।
সেইমতো ব্রহ্মপুত্র বহে যমুনায়।
করতোয়া হইল ক্ষীণতোয়া শীর্ণকায়।।
আহারে কুলীন নদী নাবিল পঙ্কিলে।
ফকিরে ঠিকানা পায় মহামীন বিলে।। (খোয়াবনামা/ পৃ. ৩০)

ঘ. ভাটিয়ালী গান ঃ

১. বাও রে বাও রে।
মন বাচাড়ি বাও রে।।
আলী কালীর কির‍্যা।
চাইয়ো না ভাই ফির‍্যা।। 'বাইচ', ('ছায়া প্রধান অঘ্রাণ' পৃ. ১০০)

২. জোরে জোরে সোনার বৈঠা বায় রে।।
কী করিব্যো কুন্‌ঠে যাব্যো শূনো হারে দয়াল।
ময়নার বাড়ি হামার বাড়ি মাঝে নলের আড়াল। (ঐ/ পৃ. ১০৮)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. ভাওয়াইয়া গান ঃ

১. দীঘির ঘাটত যায় লো কমলা কাঁখেতে কলস
কমরে হেলন দেখে বানিয়ার মনত জাগে রস।
হামার ভীতি চাও কইন্যা হামার ভিতি চাও
তুমার তানে কইন্যা হামার পরাণ করিছে ভাও। ('নাঢ়াই'/ পৃ. ৯৩)

২. 'বন্ধু হে এ্যালা হামার হোবে কুন উপায়
পরাণ হামার যায়।
গোপের বালা গলাত নালা হামার ভিতি চায়
হায় হায় পরাণ হামার যায়
বন্ধুহে এ্যালা হোবে কুন উপায়।' (নাঢ়াই/ পৃ. ৯৪)

৩. লাল ডুগাডুগ কুসুমলটি নাকে তাহার তিনটি খুঁটি সাড়া।
সেই পুরুষের সবই বির্থা যে দিলো না তাহার দুয়ারে পাড়া।' (খোয়াবনামা/ পৃ. ১৯০)

৪. নাগর হলো মাঝির বেটা তারে এখন বোঝায় কেটা
কুসুম রাণীর আধমনি বুক ধরা তো নয় মাছটি মরা।
বিশসেরী বুক ধরা তো নয় বেড়জালে বাঘাড়টি ধরা। (ঐ/ পৃ. ১৯০)

৫. যদি কালা পীরিত করিবার রে চান,
ধান ভাঙিয়া কালা কোষটা রে বন
পাটাশাক তুলিতে যৈবন করিব দান। (নদীর নাম তিস্‌তা/ পৃ. ৬৪)

চ. বাউল গান ঃ

১. পার্শ্বে বিবি নিন্দে মগন চান্দ কোলে জাগে গগন
খোয়াবে কান্দিল বেটা না রাখে হদিস।
হায়রে একেলা পড়িয়া থাকে শিথানের বালিশ।। ('খোয়াবনামা' পৃ. ১৭৬)

২. ত্যজিল দেহের আরাম নিদ্রা তাহার হইলো হারাম
হাড্ডিতে লোহুতে ফকির পোষে দশদিশ।
ফকির বাহিরিলো পথে না থাকে উদ্দিশ
শিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাসের বালিশ।। (ঐ/ পৃ. ১৭৭)

৩. আমার হইল ভাবের ব্যারাম।
এই ব্যারামের নাইকো আরাম, গো- ও ও ও?' (ঐ/ পৃ. ১৭৮)

৪. মাঝি বিনা বিল আর জল বিনা মাছ।
পুত্রহীন মাতৃকোল পুষ্প বিনা গাছ।।
আওরতে না পায় যদি মরদের চুম।
যতো জেওর দাও তারে রাতে নাহি ঘুম।। (ঐ/ পৃ. ২০০)

৫. বিলে না পরশ যদি পায় মাঝি অঙ্গ।
জল শুকাইয়া যায়, না থাকে তরঙ্গ।।
মেরামতে বলে শুন শুন দিয়া মন।
কাৎলাহারে জল কান্দে আয় মাঝিগণ।। (ঐ / পৃ. ২০০)

৪. তন্ত্রমন্ত্র ও লোককিচিৎসা ঃ

বাংলাদেশে তন্ত্রমন্ত্র ও লোকচিকিৎসা মূলত লোক-বিশ্বাসেরই আর এক অভিপ্রায়। তন্মধ্যে সর্প অভিপ্রায় (Snak Motif) অন্যতম। সমালোচক বলেনঃ

> 'সর্প অভিপ্রায় (Snak Motif) সমস্ত পৃথিবীর একটি অতি প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়, পৃথিবীর বহু আদিবাসীর মধ্যে সর্প অভিপ্রায় আছে। পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মধ্যে সর্প-সম্পর্কিত উপকথা, ইতিকথা নানারকম ধর্মীয় উপাসনা আদিম বিশ্বাস, সর্প সম্পর্কিত ঔষধাদিও সাহিত্যে প্রচলিত আছে।'[১৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও উত্তরবঙ্গের সমাজ অনুষঙ্গে এই লৌকিক অভিপ্রায় (Snak Motif) ব্যক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

ক. সাপের বিষ ছাড়া মন্ত্র;
খ. পানি পড়া;
গ. তাবিজ বা মাদুলী; ও

নিম্নে এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত লৌকিক অভিপ্রায়গুলো উদ্ধৃত করা হলো।

ক. সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র ঃ

১. 'ইনগণগিরি যতি যর্তি মালভী
অগুনো বড় পাত
হরি মাতলম, মাতলম বিষ
কে ঝাড়ে?' ('একাল চিরকাল'/ পৃ. ১১৪)

২. 'হরি মাতলম
মাতলম বিষ
কে ঝাড়ে?
মায় ঝাড়ে।
নাম নাম রে বিষ
পাতাল স্বর্গে। (ঐ/ পৃ. ১১৪)

৩. হামি গাওনা করি না, হামি মন্তর পড়ি। যে মন্তরে সাঁপের রাগ ঠান্ডা হয়, সেই মন্তর হামার। বিষটা তো আর কিছু নহে, বিষ হইল রাগ। রাগ হইলে সাপে দশায়। হামার মন্তর রাগ থামায়, ফির রাগ জাগায়। ('শুন' হে লখিন্দর'/পৃ. ১২৫)

খ. পানি পড়া ঃ

১. ''শেষে জীবন যখন যায় যায়, সেই সময় কে একজন খবর দিয়েছিল, ছাইতমতলার গতিরাম মুচি এসব রোগের ওষুধ জানে ভাল। দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল গতিরামের কাছে। পানি পড়া এনে খাইয়েছিল বউকে।'' ('নদীর নাম তিস্তা'/পৃ. ৪৯)

২. 'মরিয়ম মরুর দেশের ফুল। আসন্ন সন্তান সম্ভবা রমনীদের প্রসব বেদনা উপশমের আশায় এই শুকনো ফুল পানিতে ভেজানোর সৎকারের কথা সে জানে, দেখেছেও অনেকবার।' ('পদ্মা উপাখ্যান' পৃ. ৯)

গ. তাবিজ বা মাদুলী ঃ

১. 'ফকির চাঁদের বউ পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়িতে উঠেছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করেও ফকির চাঁদ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না। অবশেষে নাড়ুকে গিয়ে ধরলে সে। নাড়ু একটা তাবিজ বানিয়ে বেঁধে দিলে ফকির চাঁদের বাজুতে। আর ব্যস, যাকে এতদিন সাধ্যসাধনা করে আনা যায়নি, সেই বউ তার পরের দিন সুর সুর করে এসে হাজির হলো ফকির চাঁদের ঘরে।' ('নদীর নাম তিস্তা' পৃ. ৮০)

২. 'দূষীর আঁচড় থেকে বউকে মুক্ত করার জন্যে দুই টাকায় মৌলভীর কাছ থেকে একটা তাবিজ এনে দিয়েছে মফিজ। ... কালী ফকির বলেছে, তাবিজে হবে না, পিশাচটাকে শিশিতে ভরতে হবে।' ('মজ্ঞাকালের মানুষ'/ পৃ. ১০০)

প্রকৃতপক্ষে লোকবৃত্তের ধারণাটি বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের শিল্পচেতনায় অঙ্গীকৃত হয়ে ওঠে সমাজবাস্তবতার দায়বদ্ধতা থেকেই। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্টতার কারণেই লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছে, তেমনি নিরলঙ্কৃত লোকজ শব্দও ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গরূপে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনভাবনার একটি নতুন তাৎপর্য বিশ্লেষিত হলো, একথা নিঃশংসয়ে বলা যায়। কথাসাহিত্যের স্থানিক চরিত্রে সমাজভাষার প্রয়োগ, ট্যাবু ও লৌকিক জীবনভাবনার সমাজতাত্ত্বিক একটি রূপরেখা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. Boris Suchkov, "A History of Realism", Moscow, 1973, p.p. 17-18.
২. দেবেশ রায়, ''উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে'' প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৯।
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।
৪. কাজী নূরুন্নবী, ''সাহিত্যের ভাষা'' (প্রবন্ধ) 'সওগাত' সম্পাদকঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মাঘ ১৩৭৩, পৃ. ২০৩।
৫. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে শিল্পীরীতি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৭।
৬. আবুল মনসুর আহমদ, 'আমাদের সাহিত্যের প্রাণরূপ ও আঙ্গিক'', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০, পৃ. ২৬।
৭. আবুল ফজল, 'কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা'', 'সাহিত্যের সীমানা' ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৫৬।
৮. অলোক রায় (সম্পাদিত), ''সাহিত্য কোষ: কথাসাহিত্য'', 'সাহিত্যলোক কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ২১৮।
৯. দেবেশ রায়, ''উপন্যাস নিয়ে'', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১ পৃ. ৪২।
১০. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ''বাঙ্গাদেশের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার'' (প্রবন্ধ) 'সাহিত্যিকী' সম্পাদক মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, সপ্তবিংশ খণ্ড ১৩৯৮, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাঃ বিঃ পৃ. ১৬২।
১১. সৈয়দ শামসুল হকের 'আয়না বিবির পালা', 'বুকঝিম এক ভালোবাসা', 'অন্তর্গত' প্রভৃতি উপন্যাসে গদ্য ও কবিতা গান মিলিয়ে ভাষার কাব্যরূপ নির্মিত হয়েছে।
১২. সৈয়দ শামসুল হক, 'চোখবাজি' অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯।
১৩. তদেব, 'নারীরা' বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', পৃ. ২০৪।
১৫. তদেব, 'না, যেয়ো না', পৃ. ৪৬।
১৬. তদেব, 'অচিন্ত্য পূর্ণিমা', উ. স. ১ পৃ. ১২৫।
১৭. তদেব, 'জারজ', গ. স. পৃ. ৩৮৪।
১৮. তদেব, 'আরো একজন', গ. স. পৃ. ৩৬৪।
১৯. মঞ্জু সরকার, 'নগ্ন আগন্তুক', মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৩০।
২০. মঞ্জু সরকার, 'প্রতিমা উপাখ্যান', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ৭৮।
২১. তদেব, পৃ. ৪৩-৪৪।
২২. তদেব, 'নগ্ন আগন্তুক', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২০।
২৩. তদেব, পৃ. ২০।
২৪. Eligabeth Bower, 'Notes on Writing Novel: Picture and Conversations. 1975, p. 177.
২৫. মঞ্জু সরকার, ''প্রিয় দেশবাসী'', 'মজাকালের মানুষ', ইউ. পি. এল. ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১।
২৬. তদেব, 'কার্তিকের অতিথি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
২৭. তদেব, 'অবিনাশী আয়োজন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।
২৯. শামসুল হক, 'নদীর নাম ি্সতা', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৩, পৃ. ৬৮।
৩০. সুবোধ লাহিড়ী, 'ভস্তার বিল' প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ১৩।
৩১. শওকত আলী, ''আকাল দর্শন'', 'উন্মুল বাসনা', 'নিসর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. শ ৪৯।
৩২. শওকত আলী, 'আর মা কান্দে না', 'লেলিহান সাধ', মুক্তধারা, ঢাকা তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৭।
৩৩. তদেব, 'নবজাতক', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।
৩৫. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'বরেন্দ্র ভূমির ভাষা' পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. শওকত আলী, ''লেলিহান সাধ'' পৃ. ৩৫।
৩৭. তদেব, ''সোজারাস্তা'', 'শুন' হে লখিন্দর', ইউ. পি. এল. ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৮।
৩৮. শওকত আলী, 'নাঢ়াই', বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৪।
৩৯. হাসান আজিজুল হক, "মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত", 'রচনা সংগ্রহ'-২ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৫১।
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩।
৪১. হাসান আজিজুল হক, 'বিলি ব্যবস্থা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯।
৪২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৪০।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮।
৪৪. তদেব, 'চিলেকোঠার সেপাই', 'রচনাসমগ্র'-২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ- ১৯৯৯, পৃ. ২১০।
৪৫. তদেব, ''পায়ের নিচে জল'', 'রচনাসমগ্র'-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ২০৪।
৪৬. তদেব, 'দখল', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।
৪৭. তদেব, 'অপঘাত', 'রচনাসমগ্র'-১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।
৪৮. আবদুর রহীম খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৩।
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৩।
৫০. মনিরুজ্জামান, 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৩।
৫১. খালেকুজ্জামান ইলিয়াস, ''ভূমিকা'', 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র'-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ৪।
৫২. সুশান্ত মজুমদার, ''আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পঃ নতুন স্তর, সুর ও আস্বাদ'' (প্রবন্ধ), 'শৈলী', সম্পাদক, কায়সুল হক, ঢাকা ১ জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ. ৩১।
৫৩. মঈনুল আহসান সাবের, 'কবেজ লেঠেল', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ১৯।
৫৪. সেলিনা হোসেন, 'চাঁদবেনে' সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১০২।
৫৫. স্বরোচিষ সরকার, 'রূঢ় বাস্তবের কথাচিত্র' 'সাহিত্যপত্র', সম্পাদক বিজলীপ্রভা সাহা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৮৪১।
৫৬. আবুবকর সিদ্দিক, 'খরাদাহ', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১১০।
৫৭. তদেব, ''চরবিনাশকাল'', 'চরবিনাশকাল', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ৪৮।
৫৮. তদেব, ''বাইচ'', 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা ২০০০, পৃ. ৯৪-৯৫।
৫৯. তদেব, 'দোররা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।
৬০. হাসান আজিজুল হক, 'জননী', 'রচনাসংগ্রহ'-২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৭২।
৬১. সিরাজুল ইসলাম মুনির, 'পদ্মা উপাখ্যান', আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫।
৬২. হাসান আজিজুল হক, 'ভূমিকা', 'লালমাটি কালোমানুষ' ভাস্কর চৌধুরী স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৪।
৬৩. ভাস্কর চৌধুরী, 'আষাঢ়ুর জীবনদর্শন', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৫, পৃ. ১৩-১৪।
৬৪. তদেব, 'মীমাংসাপর্ব', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৪০৪, পৃ. ৪৩।
৬৫. তদেব, 'শত্রু', 'রক্তপাতের ব্যাকরণ', সনদ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৪৪।
৬৬. সরদার জয়েনউদ্দীন, 'করালী', 'নয়ান ঢুলী', ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৫৯, পৃ. ২।
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।
৬৮. তদেব, পৃ. ২৩।
৬৯. তদেব, 'সবজানের সংসার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।
৭০. তদেব, 'মা' 'অষ্টপ্রহর', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৭৭, পৃ. ২৪।
৭১. রাজীব হুমায়ুন, 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্বচর্চা পরিষদ এবং দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩০।
৭২. মৃণাল নাথ, 'সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা', বাংলাদেশ ভাষাসমিতি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. W. Labov, 'The Study of Language in its Social Context." 'Language And Social Context', Edited by Pier Paolo Giglioli, Penguin Books. Reprinted, 1987, p. 284.
৭৪. William Downes, 'Language And Society', 'Cambridge University Press, 2nd edition, 1998, p. 111.
৭৫. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', 'বিদ্যাপ্রকাশ', ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৯।
৭৬. তদেব, পৃ. ১৯২।
৭৭. তদেব, 'না, যেয়ো না', আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯।
৭৮. শওকত আলী, 'সোজারাস্তা' 'শুন হে লখিন্দর', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ২০।
৭৯. তদেব, 'আকাল দর্শন', 'নিসর্গ', শওকত আলী সংখ্যা, বগুড়া, সম্পাদকঃ সরকার আশরাফ, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৯৯২, পৃ. শ ৪৬।
৮০. তদেব, ''শুন' হে লখিন্দর'', 'শুন' হে লখিন্দর', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১২০।
৮১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস,'পায়ের নিচে জল', 'রচনা সমগ্র'-১, মাওলা ব্রাদাস,ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ২০৭।
৮২. তদেব, "ফোঁড়া", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮।
৮৩. হাসান আজিজুল হক, "জননী", 'রচনাসংগ্রহ'-২, পৃ. ২৭২।
৮৪. আবুবকর সিদ্দিক, "বাইচ", 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৩-১০৭।
৮৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, পবিত্র সরকার, 'ভাষা দেশকাল' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ১৩৯।
৮৬. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৬।
৮৭. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৮।
৮৮. রাজীব হুমায়ুন, 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', বাংলাদেশে ভাষাচর্চা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৬।
৮৯. রাজীব হুমায়ুন, ''সমাজ ভাষাবিজ্ঞান'', 'ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ, ঢাকা, প্রথম বর্ষ ১৯৮০ প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর, পৃ. ৩৮।
৯০. রিজিয়া রহমান, 'একাল চিরকাল', মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১১৯।
৯১. শওকত আলী, ''ভগবানের ডাক'', 'সবগল্প', অরিত্র, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৪৩।
৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।
৯৩. তদেব, 'নাঢ়াই', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১।
৯৪. তদেব, ''ডাইন'', 'সবগল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।
৯৫. তদেব, 'চৈত্রমেঘ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬।
৯৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।
৯৭. মঞ্জু সরকার, 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা', 'মজাকালের মানুষ' ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫।
৯৮. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮০।
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮।
১০০. শওকত আলী, ''দুই গজুয়া'', 'শুন হে লখিন্দর', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
১০১. আববুকর সিদ্দিক, ''দোররা'', 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৪।
১০২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ''পায়ের নিচে জল'' রচনাসমগ্র-' পৃ. ২০০।
১০৩. মঞ্জু সরকার, ''কার্তিকের অতিথি'', 'মজাকালের মানুষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।
১০৪. সৈয়দ শামসুল হক, ''আরো একজন'', 'গল্পসমগ্র', অনন্যা, ২০০১, পৃ. ৩৬৬।
১০৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ''দোজখের ওম'', 'রচনাসমগগ্র'-১, পৃ. ৩০৪।
১০৬. তদেব, 'খোয়াবনামা', পৃ. ৭৩।
১০৭. তদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. মঞ্জু সরকার, ''অধিনাশী আয়োজন', পৃ. ৪৭।
১০৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা', পৃ. ৩০৭।
১১০. আবদুস সাত্তার, 'উপজাতীয় সাংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ. ১-২।
১১১. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৯।
১১২. তাসাদ্দুক হোসেন, 'মহুয়ার দেশে' কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা ১৩৬৬, পৃ. ১২।
১১৩. রিজিয়া রহমান, 'একাল চিরকাল', মুক্তধারা, ১৯৮৪, পৃ. ১৩৮।
১১৪. শওকত আলী, ''পুশনা', 'সব গল্প', পৃ. ৫২।
১১৫. তদেব, 'শুন' হে লখিন্দর', পৃ. ১২৬।
১১৬. ভাস্কর চৌধুরী, 'লালমাটি কালো মানুষ', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৪, পৃ. ১৭।
১১৭. সৈয়দ শামসুল হক, ''নেপেন দারোগার দায়ভার'', 'গল্পসমগ্র', অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৮২.
১১৮. শওকত আলী, ''ফাগুয়ার পর'', 'সব গল্প', পৃ. ৩৪।
১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
১২১. World Book of Encyclopedia, World Book Inc. USA. 1992, P. 3-4.
১২২. Peter Trudgill, 'Sociolinguistics', Penguin Books, 1974, P.P. 86-87.
১২৩. সৈয়দ শামসুল হক, ''দূরত্ব'', 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস', বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৪১-১৪২।
১২৪. শামসুল হক, 'নদীর নাম তিস্তা', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৩, পৃ. ৭৯।
১২৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ৯।
১২৬. তদেব, পৃ. ২৪৭।
১২৭. মঞ্জু সরকার, 'নগ্ন আগন্তুক', মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ২০।
১২৮. তদেব, পৃ. ১৭।
১২৯. তদেব, পৃ. ১৫।
১৩০. তদেব, পৃ. ১৫।
১৩১. শামসুল হক, 'নদীর নাম তিস্তা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
১৩২. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।
১৩৩. মঞ্জু সরকার, 'ভূতের সাথে যুদ্ধ', 'মজ্ঞাকালের মানুষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
১৩৪. রিজিয়া রহমান, 'একাল চিরকাল', মুক্তধারা, ১৯৮৪, পৃ. ১১৯।
১৩৫. শওকত আলী, 'পুশনা', 'সবগল্প' অরিত্র ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৩।
১৩৬. শওকত আলী, 'ফাগুয়ার পর', 'সবগল্প' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
১৩৭. মঞ্জু সরকার, 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা', 'মহাকালের মানুষ' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
১৩৮. সোহানা বিলকিস, ''বাংলা উপন্যাসে নারীভাষা'' (প্রবন্ধ), 'ভাষা-সাহিত্য পত্র', সম্পাদকঃ হায়াৎ মামুদ, সপ্তবিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৪১।
১৩৯. আবুবকর সিদ্দিক, ''ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০।
১৪০. আবুবকর সিদ্দিক, 'খরাদাহ', মুক্তধারা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৯।
১৪১. রামেশ্বর শ, ''বঙ্কিম উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি'', বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮২-৮৩, পৃ. ৪৮।
১৪২. আশিসকুমার দে, ''উপন্যাসের শৈলী', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬।
১৪৩. J. A. Caddon, A Dictionary of Literary Terms, New York, 1976, p. 560.
১৪৪. Robert Lidel, 'Treatise on the Novel', First Edidtion, 1947, p. 48.
১৪৫. Stith Thompson, 'The Folktable', The Dryden Press, NewYork, 1951, p. 415.
১৪৬. সুহাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''তারাশঙ্করের লোক সংস্কৃতি চেতনাঃ দুটি উপন্যাস'', (প্রবন্ধ) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, 'তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাই. লি. কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভৌগোলিক জনপদ। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কারণেই দেশের পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয় কিংবা বৃহৎ বঙ্গাদেশের অন্যান্য জনপদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক জনপদ জীবন ও স্থানিক ভাষা নিয়ে পূর্ববর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে বিস্তৃতপরিসর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণীয়, এই ভৌগোলিক সমাজ কাঠামো নিয়ে রচিত কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক জীবনাচরণ, ভাষাসংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ উপজীব্য হয়ে উঠেছে। দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীরাও জীবনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে, দায়বাদী সাহসী অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন শিল্প অভীপ্সা নির্মাণে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসূত্রে লক্ষণীয়, প্রতিটি ভৌগোলিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা মানবসমাজের কতকগুলো স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য থাকে। তন্মধ্যে অসম জীবনধারা, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী বৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, জীবনাচরণে, বিশ্বাসে ও সংস্কারের পৃথক পৃথক ধরণ থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয় সমাজঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যেও। উত্তরবঙ্গেরও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, স্থানিক সমাজের নানা সংস্কার আচরণ, নানামুখী দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক বিবর্তন, কালপরম্পরা জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেরও প্রণোদনাময় উপাদানরূপে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে বর্তমান ২০০৩ সালের মধ্যে এই জনপদ নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, আবুবকর সিদ্দিক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, মঞ্জু সরকার, ভাস্কর চৌধুরী, শামসুল হক, সুবোধ লাহিড়ী, সত্যেন সেন প্রমুখ কথাশিল্পী উল্লেখযোগ্য গল্পউপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁদের সৃষ্ট কথাসাহিত্যে গত পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের কাল অবয়বের ভেতর এই জনপদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপচিত্র যেমন ফুটে উঠেছে; তেমনি স্থানিক ভাষা বৈচিত্র্যেরও স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই পর্যবেক্ষণে একথা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক রাষ্ট্রিক অভিঘাতের নানাস্তর নানা স্থানিক উপাখ্যানের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সমাজবিবর্তনের ধারাক্রম নিয়ে রচিত কথাসাহিত্যের মধ্যে স্বতন্ত্র সমাজাভিজ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে। তন্মধ্যে চুম্বকসত্যটুকুই এখানে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১. হিন্দু মুসলিম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের অধিবাসী। তারা কৃষি নির্ভর বৃত্তিক জীবনে অভ্যস্ত। তন্মধ্যে ভূমিজজনগোষ্ঠীই ভূমিহীন এবং দারিদ্র্যসীমার সর্বনিম্নে তাদের বসবাস। অর্থাৎ এমন সমাজ ব্যবস্থায় বৃহত্তর জনজীবন সংকটাবর্তিত।

২. খাদ্য ঘাটতি, দুর্ভিক্ষপীড়িত জনজীবনে আছে নানা প্রকার সামাজিক শোষণ, অনাচার, অবক্ষয়ের নানা চিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এই জনমণ্ডলিতে রয়েছে লোকায়ত সংস্কার, প্রথা প্রচলন এবং লৌকিক বিশ্বাস। স্থানিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করেছে তাদের স্থানিক মৌখিক ভাষার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমেও।

৪. উত্তরবঙ্গের প্রাকৃত নিম্নশ্রেণীর জনজীবনের ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান ধারণা, আশা বিশ্বাসের নিগূঢ় প্রভাব ফুটে ওঠে কথাশিল্পীদের শিল্পাভিজ্ঞানে।

সমাজ ও মানুষের এই শিল্প প্রতীতিকেই উত্তরবঙ্গের নির্দিষ্ট ল্যাণ্ডস্কেপে সফলভাবে রূপায়িত করেছেন এদেশের কথাশিল্পীরা। খরা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রীয় অসম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় চিরকালিন অবহেলিত এই জনপদ গোষ্ঠী জীবনের চালচিত্রই মুখ্যরূপে ফুটে উঠেছে এই আলোচনায়। সেই সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডেরই অন্যতম অনুষঙ্গ-- উত্তরবঙ্গীয় বরেন্দ্রী উপভাষার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সামগ্রিক মূল্যায়ণের প্রেক্ষিতে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, উত্তরবঙ্গীয় সমাজ ও ভাষার প্রতিটি মোটিফ এবং মূল্যবোধের প্রতি বাংলাদেশের কথাশিল্পীরা শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক পাঠকৃতিতে এই প্রেক্ষিতটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ল্যাণ্ডস্কেপ ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের আলোকে বিচার বিশ্লেষণে অনাবিস্কৃত একটি দিক আবিস্কৃত হয়েছে বলে দাবি করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আলোচিত উপন্যাসের তালিকা ঃ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : 'খোয়াবনামা', মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৯৭।
: 'চিলেকোঠার সেপাই', মাওলা ব্রাসার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
আবুবকর সিদ্দিক : 'খরাদাহ', মুক্তধারা, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৮৭।
তাসাদ্‌দক হোসেন : 'মহুয়ার দেশে', কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৬৬।
প্রমথনাথ বিশী : 'মুক্তবেণী', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭১।
: 'পদ্মা'. রওহন প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১লা শ্রাবণ, ১৩৪২।
: 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', ক্যাতায়নী বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৫২।
ভাস্কর চৌধুরী : 'আষাঢুর জীবনদর্শন', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৫,
: 'মীমাংসোপর্ব', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৪।
: 'লালমাটি কালো মানুষ', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৪।
মঈনুল আহসান সাবের : 'কবেজ লেঠেল', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
মঞ্জু সরকার : 'প্রতিমা উপাখ্যান', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০।
: 'নগ্ন আগন্তুক', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬।
রিজিয়া রহমান : 'একাল চিরকাল', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪।
শওকত আলী : 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', ইউ.পি.এল. ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৭।
: 'নাঢ়াই', বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩।
শামসুল হক : 'নদীর নাম তিস্‌তা', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৩।
সত্যেন সেন : 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৩৭৬।
সরদার জয়েন উদ্‌দীন : 'নীল রঙ রক্ত', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭২।
সিরাজুল ইসলাম মুনীর : 'পদ্মা উপাখ্যান', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫।
সেলিনা হোসেন : 'চাঁদ বেনে', সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪।
: 'কাঁটাতারে প্রজাপতি', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৯।
: 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' – এক, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৪।
সুবোধ লাহিড়ী : 'ভস্তার বিল', প্রকাশ ভবন, বাংলাবাজার ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭৬।
সৈয়দ শামসুল হক : 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৫।
: 'নারীরা', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯।
: 'ইহা মানুষ', শিখা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১।
: 'না যেও না', আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯১।
: 'ত্রাহি', আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৮।
: 'শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৮।
: 'চোখবাজি', অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৪।
: 'অচিন্ত্য পূর্ণিমা',– উপন্যাস সমগ্র, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৬।
: 'দূরত্ব', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৬।

খ. আলোচিত গল্পের তালিকা ঃ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : "পায়ের নিচে জল", 'দুধভাতে উৎপাত', র.স.১, মাওলা ব্রাসার্দ, ঢাকা ১৯৯৯।
: "দখল", ঐ
: অপঘাত", 'দোজখের ওম', র.স. ১, ঐ।
: "ফোঁড়া", ঐ
: ''দোজখের ওম", ঐ

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর সিদ্দিক	:	'চরবিনাশকাল', ইউ.পি.এল. ঢাকা ১৯৮৭।
	:	"বাইচ", 'ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা ২০০০।
	:	"দোররা", ঐ
ভাস্কর চৌধুরী	:	"বেহুলা", 'রক্তপাতের ব্যাকরণ', সনদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।
	:	"শত্রু", ঐ
	:	"রক্তপাতের ব্যাকরণ", ঐ
মঞ্জু সরকার	:	"আমৃত্যু আকালু", 'মজ্ঞাকালের মানুষ', ইউ.পি.এল. ঢাকা ২০০১।
	:	কার্তিকের অতিথি", ঐ
	:	"গো-জীবন", ঐ
	:	"দূর্গত অঞ্চলের দেবতা", ঐ
	:	"ভূতের সাথে যুদ্ধ", ঐ
	:	"প্রিয় দেশবাসী", ঐ
	:	"অবিনাশী আয়োজন", ঐ
	:	"কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা", ঐ
শওকত আলী	:	"ভবনদী", 'লেলিহান সাধ', মুক্তধারা, ঢাকা তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫।
	:	"নবজাতক", ঐ
	:	"কপিলদাস মর্মুর শেষ কাজ", ঐ
	:	"আর মা কান্দে না", ঐ
	:	"লেলিহান সাধ", ঐ
	:	"সোজারাস্তা", 'শুন হে লখিন্দর', ইউ.পি.এল. ঢাকা ১৯৮৬।
	:	"শুন হে লখিন্দর", ঐ
	:	"দুই গজুয়া", ঐ
	:	"অচেনা", ঐ
	:	"ডাকিনী", ঐ
	:	'আকাল দর্শন", 'উম্মুল বাসনা', প্রথম সংস্করণ, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল নেই।
	:	"ভগবানের ডাক", 'সব গল্প', অরিত্র, ঢাকা ২০০১।
	:	'ডাইন", 'সব গল্প', ঐ
	:	"চৈত্রমেঘ", ঐ
	:	"পুশনা", ঐ
	:	"ফাগুয়ার পর", ঐ
	:	"রাণীগঞ্জ, অনেক দূর", ঐ
সরদার জয়েন উদ্‌দীন	:	"করালী", 'নয়ান চুলী', ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৩৫৯।
	:	"সবজ্ঞানের সংসার", ঐ
	:	"মা", 'অষ্টপ্রহর', ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৩৭৭।
সৈয়দ শামসুল হক	:	"নেপেন দারোগার দায়ভার", 'গল্পসমগ্র', অনন্যা পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০১।
	:	"প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান", 'গল্পসমগ্র', ঐ
	:	"আরো একজন", 'গল্পসমগ্র', ঐ
	:	"কোথায় ঘুমাবে করিমন বেওয়া", 'গল্পসমগ্র', ঐ
	:	জারজ", 'গল্পসমগ্র', ঐ

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আজিজুল হক : ''মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত", রচনা সংগ্রহ'-২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০১।
: "বিলি ব্যবস্থা", ঐ
: "জননী", ঐ

গ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ ঃ

অরুণ মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১৯৭৪
১৩৬৮ : 'কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
১৯৮৭ : বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শরৎপাবলিশিং, কলকাতা।
অলোক রায় (সম্পাদিত) : 'সাহিত্য কোষ: কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা।
১৯৯৩
অরূপকুমার ভট্টাচার্য : 'আঞ্চলিকতা: বাংলা উপন্যাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা।
১৯৮৭
অজয় রায় : 'আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৭
১৯৭৭ : 'বাঙলা ও বাঙালি', বাংলা একাডেমী ঢাকা।
আমিন ইসলাম : "সমাজ সংস্কৃতি এবং সাহিত', সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৯১
আফজালুল বাসার (অনূদিত): 'বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব', বাংলা একাডেমী ঢাকা,
১৯৯১
আহমদ ছফা : 'জাগ্রত বাংলাদেশ', মুক্তধারা ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ।
১৩৯০
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', নয়াউদ্যোগ কলকাতা।
১৯৯৭
আজহার ইসলাম : 'বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৬
আর্ণস্ট ফিশার : 'দি নেসেসিটি অব আর্ট', (শফিকুল ইসলাম অনূদিত) সংঘ প্রকাশ, ঢাকা।
১৯৯৭
আবুবকর সিদ্দিক : 'সাহিত্যের সংগ প্রসংগ', ঐতিহ্য ঢাকা।
২০০১
আনু মুহাম্মদ ও আতিউর রহমান: 'বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ একটি প্রামাণ্য চিত্র', পাপড়ি প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯৮৩
আব্দুস সাত্তার : 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৭৯
আশিস কুমার দে : 'উপন্যাসের শৈলী', প্যাপিরাস, কলকাতা,
১৯৮৩
এ.কে. নাজমুল করিম : 'সাহিত্য ও সামজবিজ্ঞান', সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৮৪
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত) : 'তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য', মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রাঃ লিঃ. কলকাতা।
১৩৮৪
কাজী আব্দুল ওদুদ : 'বাংলার জাগরণ ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।
১৩৬৩
করুণাময় গোস্বামী (সম্পাদিত) : 'বাংলা সংস্কৃতির শর্তবর্ষ', সুধীজন পাঠাগার', নারায়ণগঞ্জ।
১৪০০

Dhaka University Institutional Repository

কামরুদ্দীন আহমদদ : 'পূর্ববাঙ্গার সমাজ ও রাজনীতি', স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স ঢাকা।
১৩৭৬

কবীর চৌধুরী : 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯৯২

ক্রিস্টোফার কডওয়েল : 'ইলিউসন অ্যান্ড রিয়ালিটি', (অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা।
১৯৮২

কায়েস আহমদ : 'অন্য অবলোকন', [হাসান আজিজুল হক] কায়েস আহমদ সমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
১৯৯৩

কার্তিক লাহিড়ী : 'বাস্তবতা ও বাঙ্গা উপন্যাস', সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা।
১৯৭৪

কৃষ্ণপদ গোস্বামী : 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ।
২০০১

গৌতম ভদ্র : 'মুঘল যুগে কৃষি–অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ', সুবর্ণ রেখা কলকাতা।
১৯৯১

গৌরমোহন রায় : 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।
১৯৯৪

গোপাল হালদার : 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', (দ্বিতয়ি খণ্ড) অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ।
১৪০৪

জয়ন্তকুমার ঘোষাল : 'বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', পুস্তক বিপণী, কলকাতা
১৯৯২

টেরি ঈগলটন : 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা', (ভাষান্তর : নিরঞ্জন গোস্বামী), দীপায়ন কলকাতা।
১৩৩৮

তপোধীর ভট্টাচার্য : 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ', পুস্তক বিপণী, কলকাতা।
১৯৯৬

তোফায়েল আহমদ : 'যুগে যুগে বাঙ্গাদেশ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
১৯৯২

দিলীপ কুমার নাহা : 'প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা', সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স কলিকাতা।
২০০০

দেবেশ রায় : 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস কলকাতা।
১৯৯৪

১৯৯১ : 'উপন্যাস নিয়ে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) : 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন', বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা।
১৯৮৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প', ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ।
১৩৭৪

১৩৭৮ : 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', প্রকাশভবন, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন', কলকাতা।
১৯৮৩

নির্মল দাশ : 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', সাহিত্য বিহার কলকাতা।
১৯৯৭

নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালরি ইতিহাস', আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ।
১৪০২

পবিত্র সরকার : 'ভাষা দেশকাল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা।
১৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

পল লাফর্গ : 'সম্পত্তির বিবর্তন', (বর্বর যুগ থেকে সভ্যযুগ), অনুবাদ : অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯৪ প্রকাশক: রেনুকা সাহা, ২০ কেশবসেন স্ট্রীট কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব', র‍্যাডিক্যাল, ইম্প্রেশন, কলকাতা। ১৯৯৪

পি.এম. সফিকুল ইসলাম : 'রাজশাহীর উপভাষা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯২

বদররুদ্দীন উমর : 'মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা। ১৯৮৫

১৯৯২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বারিদবরণ চক্রবর্তী : 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা। ১৯৯১

বিনতা রায় চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা। ১৯৯৭।

বিমল কৃষ্ণ সরকার : 'ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন', প্রকাশভবন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ। ১৩৯৬

বীরেন দত্ত : 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণী, কলকাতা। ১৯৯৮

ব্লেয়ার বি.রিং, : 'ব্লু মিউটিনি (নীল বিদ্রোহ, অনুবাদ : ফরহাদ খান, জুলফিকার আলী) ইণ্টারন্যাশনাল ১৯৯৫ সেন্টার ফর বেঙ্গল।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : 'স্বদেশ ও সাহিত্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা। ১৯৯৩

মরিস কর্ণফোর্থ : 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', অখণ্ড সংস্করণ, অনুবাদ : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৭ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

মণি সিং : 'জীবন সংগ্রাম', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৮৬

মনিরুজ্জামান : 'উপভাষাচর্চার ভূমিকা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৪

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ (সম্পাদিত) : 'লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ', মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৯

মনসুর মুসা (সম্পাদিত) : 'বাঙলাদেশ', বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নওরোজ কিতাবস্থান, ঢাকা। ১৯৭৪

১৩৮১ : 'পূর্ববাঙলার উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা।

মালেকা বেগম : 'ইলা মিত্র', জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৮৯

মিল্টন বিশ্বাস : 'শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ রাজনীতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত) : 'বাঙ্গালাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ। ১৯৭৩

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ', বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ। ১৯৯৪

মুহম্মদ ইদরিস আলী : 'আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৮

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত): 'বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা। ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল : 'কৃষক সভার ইতিহাস', নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা।
১৩৭৬

মুহম্মদ আব্দুল্লাহ : 'হাকিম হাবিবুর রহমান', ইসলামি ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।
১৯৮১

মোহাম্মদ হান্নান : 'বাঙালির ইতিহাস', অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯৯৮

১৯৯১ : 'মর্ত্যের অমর্ত্য সেন', অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মৃণাল নাথ : 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।
১৯৯৯

১৯৮৯ : 'সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা', বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা।

রণজিৎকুমার সমদ্দার : 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব',
১৯৮২ বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, কলকাতা।

রবিন পাল : 'কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ', শ্রীভূমি পাবলিশিং কলকাতা।
১৯৮০

রফিকউল্লাহ খান : 'বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৭

১৯৯১ : সত্যেন সেনের উপন্যাস বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পচেতনা, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

রামশরণ শর্মা : 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র: কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী কলকাতা।
১৯৮৯

রাজীব হুমায়ুন : 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', বাংলাদেশ ভাষাচর্চা পরিষদ, ঢাকা।
১৯৯৩

রামেশ্বর শ : 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১৩৯০

র‍্যালফ ফকস : 'নভেল এ্যাণ্ড দ্যা পিপল', (অনুবাদ : সর্বজিৎ সেন/সিদ্ধার্থ ঘোষ),
১৯৮০ পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা।

লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় : 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি: প্রমথনাথ বিশী', পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
২০০১

লিলি দত্ত : 'কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', দে'জ বুক সেণ্টার, কলকাতা।
১৯৮২

শহীদ ইকবাল : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
১৯৯৭

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী : 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ।
১৩৬৮

শীতল ঘোষ : 'ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস', বর্ণালী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ।
১৯৯৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,
১৯৯২ নবম সংস্করণ।

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলাদেশের ইতিহাস', (৩য় খণ্ড), জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলকাতা।
১৯৮১

সরদার আব্দুস সাত্তার : 'কথাসাহিত্য সমীক্ষণ', বই প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯৯৭

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ।
১৯৮০

১৯৯৩ : 'বাংলা উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক দর্পণ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সফর আলী আকন্দ : 'বাঙালির আত্মপরিচয়', আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সত্যেন সেন : 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সং।
১৩৯৩ : 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম', কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা প্রকাশ উল্লেখ নেই।
সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও অনুবাদ): 'মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা', একাডেমী, পাবলিশার্স, ঢাকা।
১৯৮৫
সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
১৯৮৪
সুধীর চক্রবর্তী(সম্পাদক) : 'ধ্রুবপদ', বার্ষিক সংকলন-৪, কলকাতা।
২০০০
সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খন্ড, কলকাতা।
১৯৬৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : 'বাঙালিকে কে বাঁচাবে', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
১৯৯১
সৈয়দ আমীরুল ইসলাম : 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস', প্যাপিরাস, ঢাকা।
১৯৯৬
সৈয়দ আকরম হোসেন : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 'বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৮৫
হাসান আজিজুল হক : 'অপ্রকাশের ভার', ইউ.পি.এল. ঢাকা।
১৯৮৮
১৯৮৬ : 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি', মুক্তধারা, ঢাকা।
১৯৯৮ : 'অতলের আঁধি জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।
হায়াৎ মামুদ (সম্পাদনা) : 'লেভ তলস্তয়', বাংলা অস্ট্রো এশীয় লেখক ইউনিয়ন, মুক্তধারা, ঢাকা।
১৯৮৫
হোসেন উদ্দীন হোসেন : বাংলার বিদ্রোহ', (৬০০-১৯৪৭), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।
১৯৯৯
হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক) : 'বাঙলা ভাষা', দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৮৫
হীরেন চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা।
১৯৮৩
১৯৮২ : বাংলা উপন্যাসে শিল্পীরীতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

ঘ. সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তালিকা ঃ

Abul Kalam Manzur Morshed : 'A Study of Standard Bengali And the Noakhali Dialect', 1985 Bangla Academy, Dhaka.
Agon Arnest Bangal : Social Stratification : Newyork, London. 1962
Baris Suchkov : 'A History of Realism', Moscow, 1973
B.B. Misra : The Indian middle classes', Bombay. 1961
David Daiches : 'Literature And society', victor gollanoz ltd. London. 1938
D.H. Lawrence : 'Lady Chatterley's lover', Penguin Books. London. 1961
Eligabeth Bower : 'Notes on writing Novel', Picture and Conversations. 1975

Dhaka University Institutional Repository

Emile Legouis 1971 : 'A short History of English literatiure', Oxford University press, London.

E. M. Forster 1963 : 'Aspects of the Novel', Penguin Books, London.

G. A. Grierson 1963 : 'Liguistic Survey of India', Vol. V. Indo. Aryan Family, Eastern Group. Part-I, Reprint Motilal Basashi Das Delhi.

Irving Howe 1985 : 'Masters of World literature- Thomas Hardy', Macmillan press, Ltd. London

J. A Caddon 1976 : 'A Dictionary of Literary Terms', Newyork.

John L. Hobbs 1962 : 'Local History and Local Library', London.

Kamruddin Ahmed 1975 : 'A Socio-politial History of Bengal and the Birth of Bangladesh', Inside Library. Dhaka, 4th Edition.

Leueis A. Coser (ed.) 1963 : Sociology through Literature' Prentic Hall, London.

Lee. T. Lemon 1981 : 'A Glossary for the study of English', reprinted, Delhi.

Mario Pei 1957 : 'The Story of Language', George allen and Unein Ltd. London, 2nd Ipression.

1958 : 'Language for Everybody', C.G. edition London.

M. Abu Bakar 1982 : ' Journal Asiatic society of Pakistan', Vol. XV. No. 1.

M. H. Abrams 1933 : 'A Glossary of literary Terms', A prism ueidian Edition, Prism Books P{vt Ltd, Banglar, India.

Nurul H. Choudhury 2001 : 'Peasant Radicalism in Ninteenth Century Bengal', Asiatic Society of Bangladesh.

Ralph Fox 1954 : 'The Novel and the People', ProgressPublishers Moscow.

R.C. Majumdar (edited) 1963 : 'The History of Bengal', 2nd Impression, Dacca.

R.P. Dutt 1992 : 'India Today' Manisha, Calcutta.

Rene Wellck And Austen Warren : 'Theory of literature', in penguin Books, London. 1985

Shambhu Chandra Chowdhoury : 'Notes on Rangpur Dialect', Indian Linguistics, 1965 Reprinted Vol-II.

Stith Thompson 1951 : 'The Folklable', The Dryden press, Newyork.

Sunitikumar Chaterji 1962 : 'The origin and Development of the Bengali language', Part- I Calcutta University Press.

Terry Eagleton 1982 : 'Cretisism and Ideology', London, Verso.

Thomas Hardy 1978 : 'The return of the Notive', penguin. Books,

William Downes 1968 : 'language And Society', Cambridge University Press, 2nd Edition.

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্র–পত্রিকার তালিকা ঃ

অজিত কুমার ঘোষ : 'যশোহরের ভাষা", (প্রবন্ধ), 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা', ৩য় বর্ষ জুলাই, কলিকাতা।

অনিমেষ পাল : ''ঢাকা জেলার একটি উপভাষার মহাপ্রাণতা এবং স্বর", 'নিসর্গ', ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা, সম্পাদক, মনিরুজ্জামান সংকলন ২, ১৩৮০।

অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া : ''বরিশাল জেলার কথ্যভাষা", 'দৈনিক আজাদ', ৬ জানুয়ারী ১৯৫৭।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : ''বাংলাদেশের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভষার ব্যবহার", (প্রবন্ধ) 'সাহিত্যিকী', সম্পাদক মুহম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া, সপ্তবিংশ খণ্ড ১৩৯৮, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল মনসুর আহমদ : "আমাদের সাহিত্যের প্রাণরূপ ও আঙ্গিক", 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা শ্রাবণ–আশ্বিন, ১৩৭০।

আব্দুর রহীম খোন্দকার : ''গৌড়ীয় উপভাষা", 'সাহিত্যিকী', বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক, মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ল, ১৮শ বর্ষ, শরৎ–বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৮।

আলমগীর জলীল : ''রাজশাহীর লোকভাষা", 'মাসিক মোহাম্মদী', ৩৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৯।

———— : "বগুড়ার লোকভাষা", মাসিক মোহাম্মদী, ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৬৯।

আ.স. ম. আশরাফ উদ্দিন : ''উপন্যাসে বাংলাদেশের নদী", (প্রবন্ধ) 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ষষ্ঠ বিংশ বর্ষ, বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৮৮।

এম. সাজ্জাদুর রহমান : "পঞ্চগড়ে মঙ্গার অশনিসংকেত", দৈনিক যুগান্তর ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০২।

কাজী নূরুন্নবী : "সাহিত্যের ভাষা", (প্রবন্ধ) 'সওগাত', সম্পাদকঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মাঘ, ১৩৭৩।

গোলাম কুদ্দুস : ''বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম", (প্রবন্ধ) 'পশ্চিমবঙ্গ', তেভাগা সংখ্যা–১৪০৪, সম্পাদক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৩০ বর্ষ সংখ্যা ৪২–৪৬।

নরহরি কবিরাজ : "তেভাগা আন্দোলন", 'পশ্চিমবঙ্গ', তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪ সম্পাদক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৩০ বর্ষ, সংখ্যা ৪২–৪৬।

বাবর আলী : ''সাতক্ষীরার উপভাষা", (প্রবন্ধ) 'সওগাত', সম্পাদক, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ–১৩৭৩।

বাসুদেব দাশগুপ্ত, : ''মৃত্যুগুহা থেকে আরো একটি কিস্তি", বিজ্ঞাপণ পর্ব, সম্পাদক রবিন ঘোষ, পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা ৩–৪ শ্রাবণ ১৩৯৫, কলকাতা

ভীষ্মদেব চৌধুরী : 'কাঁটাতারে প্রজাপতি : সেলিনা হোসেন", 'সুন্দরম', সম্পাদক মুস্তফা নূরউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা–১৩৯৬।

মজহারুদ্দীন ভুঁইয়া : "ময়মনসিংহ জিলার ভাষা", (প্রবন্ধ) 'মাসিক মোহাম্মদী', সম্পাদক, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পঞ্চদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৪৮।

মনসুর মুসা : ''বাঙলাদেশের ভাষাপরিস্থিতি", (প্রবন্ধ) 'নিসর্গ ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা', সম্পাদক মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি,চট্টগ্রাম সংকলন–২, ১৩৮০।

মশিউল আলম : "ভাস্কর চৌধুরীর কালো মানুষেরা", 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ', ঢাকা, শুক্রবার, ১৯ জুন, ১৯৯৮।

মুহম্মদ আবদুল হাই : "ঢাকাই উপভাষা", (প্রবন্ধ) 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা শীত, ১৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ ইদরিস আলী, : "বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ", সুন্দররম', সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা, ১৩৯৬।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : 'উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, জেলাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা", ১৮৭২–১৯৩১, (প্রবন্ধ), 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা', সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, চতুর্দশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন–১৯৯৬।

মোস্তফা মোহাম্মদ : "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য : মানুষ জন ও সময়", 'সুন্দরম', সম্পাদক, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪০৫।

যতীন সরকার : "সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস", (প্রবন্ধ) গণসাহিত্য (সম্পাদক) আবুল হাসানাত, অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ–ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা।

রাজীব হুমায়ুন : ''পুরোনো ঢাকার ভাষা", (প্রবন্ধ), 'নিবন্ধমালা', ১৯৯৪, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

———— : "সমাজ ভাষাবিজ্ঞান", 'ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা', 'হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ, ঢাকা, প্রথম বর্ষ ১৯৮০ প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর।

রামেশ্বর শ. : "বঙ্কিম উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি", 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা', বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৮২–৮৩।

সনৎকুমার সাহা : ''হাসান আজিজুল হক : ফিরে দেখা. "বিজ্ঞাপণ পর্ব', সম্পাদক : রবিন ঘোষ, পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা – ৩–৪, শ্রাবণ, ১৩৯৫, কলকাতা।

সুশান্ত মজুমদার : "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পঃ নতুন স্তর, সুর ও আস্বাদ" (প্রবন্ধ), 'শৈলী', সম্পাদক, কায়সুল হক, ঢাকা ১ জানুয়ারী, ১৯৯৭।

সেলীমা বেগম : "যশোরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", (প্রবন্ধ) 'সাহিত্যিকী' বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টাবিংশ খণ্ড, চৈত্র, ১৩৯৯।

সোহানা বিলকিস : ''বাংলা উপন্যাসে নারীভাষা", (প্রবন্ধ) 'ভাষা–সাহিত্য পত্র', সম্পাদক ঃ হায়াৎ মামুদ সপ্তবিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্বরেচিষ সরকার : "রূঢ় বাস্তবের কথাচিত্র", 'সাহিত্যপত্র', সম্পাদক বিজলীপ্রভা সাহা, ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা, জানুয়ারী–মার্চ, ১৯৮৮।

হরিপদ দত্ত : "অনার্য্যভূমের কথক শওকত আলী", 'নিসর্গ', সম্পাদক সরকার আশরাফ, বর্ষ ৭, সংখ্যা–১, বগুড়া, ১৯৯২।

চ. অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. আহমদ শরীফ (সম্পাদক) : 'বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯।

২. রাজশেখর বসু (সংকলিত) : 'চলন্তিকা', এম. পি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮১।

৩. আবুল ফজল, তসিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস', রাজশাহী, ১৯৯৮।

৪. শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) : সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬।

৫. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত) : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৫।

৬. শামসুজ্জামান খান (প্রকাশক) : 'বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪।

৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮. নূরুল ইসলাম খান (প্রধান সম্পাদক)': 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বৃহত্তর রাজশাহী, উপ-নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় তেজগাঁও, ঢাকা আগস্ট ১৯৯১।

৯. A. S. Hornby . 'Oxford Advanced Learners', Dictionary of current English. The English Book Society and Oxford University Press. 3rd Edition. 1974.

১০. Zila Statistics Rajshahi 1987, September, 1987, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, Bangladesh.

১১. Zila Statistics Bogra Region, July 1986, Bangladesh Bureau of Statistics. Dhaka, Bangladesh.

১২. Encyclopedia Britarica. Vol I.

১৩. Rearranged and Analized frond population census 2001, preliminary Report, (BBS 2001)

১৪. Wold Book of Encyclopedia, World Book Inc. USA. 1992.

১৫. Oxford School Atlas, 30th Revised Edition, Oxford University Press, 2002.

১৬. J. T. Arten, Census of India. 1921, Volume-1. Calcutta Superintendent Government Printing, India, 1924.